গ্রীক এবং হিন্দু।

প্রস্তাবনা।

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥"

কার্য্য মাত্রেরই উদ্দেশ্য আছে, উদ্দেশ্য মাত্রের হেতু আছে, এবং হেতুর আবার সার্থকতা আছে। কার্য্যানুষ্ঠানে যথায় এই চতুর্ব্বিধ ক্রমেরই সুসিদ্ধি, তথায়ই কার্য্যের পূর্ণতা, এবং সেই কার্য্যই যথার্থতঃ সুফল-ফলবান হইয়া থাকে। নতুবা কার্য্য, কার্য্যমধ্যে গণ্য নহে; তাহা গন্তব্য পথে গতিপণ্ড মাত্র। দুর্ভাগ্যক্রমে এই সাংসারিক কার্য্য-ক্ষেত্রে গতিপণ্ডই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, এবং অধিকাংশই প্রতিকৃতি-প্রতারিত, এই গতিপণ্ডকেই আকাঙ্ক্ষিত পুরুষার্থ ভাবিয়া, চিত্তকে প্রবোধ দানে জীবন ব্যাপার নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

মনুষ্য-শক্তি-সাধ্য যাবতীয় কার্য্য দ্বিবিধ প্রকরণে সম্পাদিত হইয়া থাকে। এক ইচ্ছাতীতে, অপর ইচ্ছাধীনে; অথবা এক প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্ত্তিতায়, অপর মনুষ্য বা স্বকৃত নিয়মের বশ-বর্ত্তিতায়। মনুষ্য বা স্বকৃত নিয়ম মনুষ্যের স্বেচ্ছাসম্ভূত, অতএব উহা স্বাধীন; কিন্তু স্বাধীন হইলেও, উহা প্রাকৃতিক নিয়মের অঙ্কশয়ন-শায়ী। সুতরাং যতক্ষণ মনুষ্যকৃত নিয়মের কার্য্য প্রকৃতি-অনুকূলে, ততক্ষণ উহা সাত্ত্বিক এবং সুফলপ্রদ; এবং যখনই আবার প্রকৃতি-প্রতিকূলে, তখনই অসাত্ত্বিক এবং অফলপ্রদ হইয়া থাকে। ফলতঃ, মনুষ্য সেই বিশ্ব-পরিচালিনী মহাশক্তি রাশি মধ্যে স্ফাটিকত্বে পরিণত

শক্তিখণ্ড স্বরূপ; সুতরাং পৃথক বটে অথচ পৃথক নহে, সেইরূপ আবার অপৃথক বটে অথচ অপৃথক নহে।

এই উভয়বিধ কর্ম্মসূত্র বাহিয়া আমাদিগের জীবন-গতি। অতএব আমাদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া কার্য্যপ্রবর্ত্ত হইতে হইলে, অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যভূত সার্থকতা লাভার্থে সঙ্গে সঙ্গে এই দ্বিবিধ বিষয়ের অবধারণ কর্ত্তব্য। প্রথমে, প্রাকৃতিক নিয়ম কিরূপে সেই প্রবর্ত্তিত কার্য্যের উপকরণ ও উপায় সমূহের সঙ্কুলান করিতেছে; দ্বিতীয়ে, আমরা কিরূপ হইলে, এবং কিরূপে সেই উপকরণরাশি ও উপায় সমূহ ব্যবহার করিতে পারিলে, প্রকৃতি অনুকূলা হইবায়, অনুষ্ঠানের উ[illegible]ভূত স্বার্থকতা লাভে যথাসম্ভব সমর্থ হইতে পারি। যে কোন বিষয় হউক, অগ্রে তাহার প্রাকৃতিক প্রকৃতি অবধারণ, এবং তাহাকেই অবলম্বন ও ভক্তি ভাবে গ্রহণ ব্যতীত, যদৃচ্ছা তাহার অনুষ্ঠান করিলে, সুমঙ্গলের সম্ভাবনা অতি অল্পই। এই অবধারণা অন্তে, স্বেচ্ছা এবং আত্ম-কর্ম্মশক্তিকে সাত্ত্বিক করিয়া, সেই প্রকৃতি অনুসরণে কার্য্য করিলেই, পূর্ব্বকথিত চতুর্ব্বিধ ক্রমেরই সুসিদ্ধি সাধন হইতে পারে; এবং কার্য্যকারকও কার্য্য-পূর্ণতা-নীত আনন্দে আনন্দবান হইয়া থাকেন।

অদ্য আমরা আমাদিগের জাতীয় কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া, অনুষ্ঠান হেতু সমাগত একটী গুরুতর বিষয়ের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। তাহা এই,—প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য জাতীয় সংমিলনে, পাশ্চাত্য সহ আমাদিগের গুণবিনিময়ে, আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিগত এবং জাতিগত, উভয়তঃ উন্নয়ন কৃতি সাধন। পাশ্চাত্য প্রতিরূপ আধুনিক ইউরোপীয়গণ; এবং প্রাচ্য প্রতিরূপ আধুনিক ভারত সন্তান। পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তিভূমি স্বরূপ গ্রীক; এবং প্রাচ্য সভ্যতার ভিত্তিভূমি স্বরূপ প্রাচীন হিন্দু।

ভিত্তিভূমির প্রাকৃতিক প্রকৃতি অবধারিত হইলে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রকৃতি অবধারণা সহজ হইয়া আইসে। ফলতঃ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভিত্তিরই সর্ব্বতোভাবে পদানুসরণ করিয়া থাকে; স্থূল দৃশ্যে পার্থক্য যাহা

কিছু দৃষ্ট হয়, তাহা কেবল উভয়ের রূপান্তর ভেদ মাত্র, আন্তরিক প্রকৃতি-ভেদ নহে। এই প্রবন্ধে সেই ভিত্তিভূমিদ্বয়ের প্রাকৃতিক প্রকৃতি অবধারণা উদ্দেশ্য। স্বেচ্ছাসম্ভূত প্রকৃত্যাদির জ্ঞানার্থে সাহিত্য ইতিহাসাদি বহুতর বিষয় জাজ্জল্যমান রহিয়াছে।

আমরা এই প্রবন্ধ ভাগে গ্রীক এবং হিন্দু এক বংশজ হইলেও, কালে কি কি প্রাকৃতিক কারণযোগে কিরূপ বিভিন্ন স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং অপরিহার্য্যভাবে তাহা কতদূর তাহাদের মর্ম্মে মর্ম্মে বসিয়া, তাহাদের কার্য্যক্ষেত্র ও কার্য্যের কতদূর রূপান্তর সাধন করিয়াছে, তাহার আলোচনায় তাহাদের প্রকৃতি অবধারণ করিব। এবং উপসংহার ভাগে, সঙ্ক্ষেপতঃ আমরা কিরূপ সাত্ত্বিক প্রকৃতি হইলে, তাহার উপর স্বেচ্ছা শক্তির প্রকৃত প্রয়োগে, কথিত বিনিময় বা যে কোন যথার্থ কার্য্যে পারগ হইতে পারি, তাহার নিরাকরণে চেষ্টা পাইব।

যে কোন বিষয়ের উপর পূর্ণ দর্শন লাভ, এ পর্য্যন্ত মনুষ্য-শক্তিকে প্রদত্ত হয় নাই। একদেশ দর্শনই মনুষ্য-শক্তির প্রধানতঃ সম্বল; তাহারও আবার উত্তম অধম আদি উচ্চেতর ভেদ আছে। এমন স্থলে অনুষ্ঠিত প্রবন্ধের কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে আর কোন কথা বাহুল্য করিয়া বলিতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র! অতঃপর ইহাতে অকৃতকার্য্যতা যাহা, তাহা আমার; কৃতকার্য্যতা যাহা, তাহা অনন্ত কার্য্যমূলে প্রযুক্ত হইয়া, অনন্ত কার্য্যফল প্রসবে রত হউক।

ইতি প্রস্তাবনা।

প্রথম প্রস্তাব।

পিতৃভূমি।

ফলদ্বয় একই বৃক্ষে উৎপন্ন হইয়া বিভিন্ন গতিদ্বয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাতে দোষ কাহার? ফলের দোষ কি? কার্য্যকারণ সংযোগে তাহাদের ভাগ্যে যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিল, অতএব নিয়তি প্রবলা। কৃত-আয়োজনের উপার্জ্জিত ফলের নাম নিয়তি। ইহারি অন্যতর আখ্যা ভাগ্য। নিয়তি দেবীরূপে আয়ত্বাতীত দোষ-গুণবিহীন, পরিচ্ছিন্ন, নিত্য স্বস্বভাবে প্রভাময়ী। যৎকর্ত্তৃক যেভাবে ও যেরূপে অর্চ্চিত হয়েন, তাহার নিকট সেইরূপ ভাবে প্রতীয়-মানা হইয়া থাকেন। অতএব উপস্থিত শুভাশুভের কারণ অর্চ্চনা প্রণালীকে বলিতে হইবে, নিয়তি নহেন। বৃক্ষস্থ ফল জড়বস্তু, সে অর্চ্চনার উপর স্বেচ্ছাবিহীন, সুতরাং বলিতে হইবে সে অপরের ইচ্ছায় চালিত। কিন্তু মনুষ্য অজড় ও জ্ঞানময়, তাহারা স্বয়ং না তাহারাও অন্যের দ্বারা চালিত হইয়া থাকে? কে ইহার মীমাংসা করিবে?

এ জগতে বহুবিধ মহামহোপাধ্যায়গণ সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হইয়া, এ বিষয়ের যথাশক্তি ও যথাবুদ্ধি মীমাংসা করিয়া, এবং অবশ্য-গ্রহণীয় সত্যজ্ঞানে তাহা মানবগণকে গ্রহণজন্য শিক্ষা দিয়া গিয়া-ছেন। দেশভেদে, কালভেদে, জাতিভেদে বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র, এ বিষয়ের নিজ নিজ মীমাংসা, স্বয়ং ঈশ্বরকৃত মীমাংসাজ্ঞানে, আজি পর্য্যন্ত এ জগতে প্রচার করিয়া ফিরিতেছে। কিন্তু এক্ষণে গণ-নার অতীত বিষয় এই যে, এত মীমাংসার একটি মীমাংসাও আজি পর্য্যন্ত জনসমাজ সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত গ্রহণ করিয়া, এবং তাহা-তেই শান্ত রহিয়া, নবানুসন্ধানে নিবৃত্ত হইতে পারিল না। কেমন

করিয়া হইবে? অনন্ত আবর্ত্তনশীল কালচক্রের নেমি বাহিয়া যাহা-দের স্থিতি, তাহাদের ত সেরূপ নিবৃত্ত হইয়া থাকিবার কথা নহে! কাল স্ববেগে বেগবান, এবং নিরন্তর তাড়না করিয়া ছুটাইয়া লইয়া যাইতেছে। মীমাংসা অচল; কিন্তু মানবীয় প্রকৃতি এবং ধারণা-শক্তি সচল, সুতরাং কিরূপে নিবৃত্ত থাকিবে! কিন্তু তাহা বলিয়া ইহাও মনে ভাবিওনা যে মীমাংসা-প্রচারকগণ মিথ্যাবাদী, এবং জ্ঞানপূর্ব্বক আপন আপন মিথ্যাধর্ম্ম এবং মতাদি প্রচারের দ্বারা লোকমণ্ডলীর উপর ভ্রান্তিকৌতুক এবং জুয়াচুরী চালাইয়া গিয়া-ছেন; তাহা নহে। তাঁহারাও স্ব স্ব জ্ঞান-সীমান্তমধ্যে যথাসম্ভব সত্য-প্রচার করিয়া গিয়াছেন: তাঁহাদিগেরও প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম, মত মীমাং-স্যাদি, প্রকৃত ঈশ্বরকৃত মীমাংসা প্রচারই বটে; কিন্তু সেই সীমান্ত মধ্যে এবং সেই সময়ের জন্য, ও সেই দেশ এবং পাত্রের উপ-যোগী ভাবে। তোমার আমার জীবনপ্রবাহে এখন আর তাহা সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতেছেনা বটে, কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিও, তাহাকেই সোপানস্বরূপ করিয়া তোমার আমার জীবন প্রবাহ এত-দূর প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে; এবং এইরূপ প্রবাহিত হইয়া যাইতেও থাকিবে।

বাইবেল শাস্ত্রানুসারে মনুষ্য সর্ব্বত্রেই স্বেচ্ছাময়; শুভাশুভ যাহা কিছু, তাহা তাহার নিজ ইচ্ছা চালনের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকে; এমন কি, সমগ্র প্রকৃতির বিকৃতি সাধন পর্য্যন্ত তাহাদেরই ইচ্ছাদোষে সমুৎপন্ন হইয়াছে, ইতরজীবে পর্য্যন্ত সেই এক মান-বীয় ইচ্ছাদোষে বিকৃতি ঘটিয়াছে। আমাদিগের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম-শাস্ত্র শ্রুতি অনুসারে, কর্ম্মসূত্র মানবীয় ভাগ্যের পরিচালক; কিন্তু এ কর্ম্মসূত্রের মূল অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্বাধীন ইচ্ছাই প্রবলা, এবং স্বাধীন ইচ্ছা হইতেই কর্ম্মসূত্রের উৎপত্তি। অতএব কথিত শাস্ত্রদ্বয়ের মতে বলিতে হইবে যে, মানব যথেচ্ছা আয়োজন করিয়া যথেচ্ছা ফললাভ করিতে সমর্থ হয়; অথবা দৃষ্টা-দৃষ্ট পূর্ব্ব ফললাভ কেবল একমাত্র যথেচ্ছা আয়োজন হইতেই প্রাপ্ত

হওয়া যায়। আবার শ্রুতির মতে যে কর্ম্মসূত্রের মূল স্বাধীন ইচ্ছা, সাংখ্যকারের মতে তাহার "মূলে মূলাভাবাৎ অমূলং মূলম্।" দার্শনিক মত সাধারণতঃ আসবাবের মধ্যে হইলেও, একথাটি নিতান্ত মন্দ নহে। স্বেচ্ছায় মনুষ্যের অনেক কার্য্যের উৎপাদন করিয়া থাকে বটে, কিন্তু সকল কার্য্যের নহে;—সৃষ্টির দিন হইতে এ পর্য্যন্ত কয়জন লোক ইচ্ছাবশে বা ইচ্ছার পরিচালনে অদৃষ্টপূর্ব্ব ফললাভে সমর্থ হইয়াছে; এবং কতই না লব্ধফল ইচ্ছার পরিচালনকে অতিক্রম করিয়া সমুৎপন্ন হইয়াছে! অথবা বলিতে পার, মানব স্বয়ং তাহার কোন্ ইচ্ছাবশে মানব হইয়াছে? তবে কি এ স্বেচ্ছা আকাশকুসুম, কি না মাত্র? তাহা নহে, ইহারও অস্তিত্ব আছে। আছে বটে, কিন্তু তাহা পরিচালনের উপকরণ কোথায়?—বাহ্যজগতে। বাহ্যজগৎ যখন যেরূপ উপকরণ দিতেছে, মানবীয় স্বেচ্ছা কেবল তদনুসারিণী হইয়াই পরিচালিত হইতে সক্ষম; তদতিরিক্ত গমনে অসমর্থ। কিন্তু বাহ্যজগৎ যে স্বয়ং পরিচালিত হইতেছে, মানবীয় স্বেচ্ছা পরিচালনের উপকরণরাশি যোগাইতেছে, এবং সমস্ত চরাচরকে চালাইয়া লইয়া ফিরিতেছে, সে আবার কাহার ইচ্ছাবশে, সে ইচ্ছার কর্ত্তা কে? এবং তাহার কর্ম্মসূত্র আবার কোথা হইতে উৎপন্ন? ইহারই "মূলে মূলাভাবাৎ অমূলং মূলম্," রূপক অর্থে বলিতে পারা যায়; এই কর্ম্মসূত্র সম্বন্ধে আপাততঃ এই পর্য্যন্ত বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, ইহা নিয়ন্তা-নিয়োজন অনুরূপ প্রাপ্তশক্তি প্রকৃতি হইতে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ও প্রাকৃতিক ক্রিয়া। স্বর্গে নক্ষত্রমণ্ডল, মর্ত্ত্যে পার্থিব বস্তু নিকর, এক কথায় এই বিশ্বস্থিত পরমাণুটি পর্য্যন্ত, সেই মোহমন্ত্রে পরিচালিত হইয়া থাকে। এই কর্ম্মসূত্রবশেই (মানবীয় হইতে পৃথক করিয়া যাহাকে প্রাকৃতিক কর্ম্মসূত্র বলা যায়) জড়বস্তু কল চালিত হইয়া বিভিন্ন গতিশীল প্রাপ্ত হয়; অজড়বস্তু জ্ঞানময় মনুষ্যও ইহার দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। প্রাকৃতিক কর্ম্মসূত্রই মূল, মানবীয় কর্ম্মসূত্র তাহার পরে। প্রাকৃতিক কর্ম্মসূত্র হইতে অদৃষ্টপূর্ব্ব, ইচ্ছাতীতে ফললাভ; মানবীয় কর্ম্মসূত্র হইতে দৃষ্টপূর্ব্ব,

ইচ্ছাধীনে ফললাভ; নিয়তি দেবী এ উভয় উৎপ-উৎপন্ন আয়োজনেরই যথাযোগ্য ফলদায়িনী হইয়া থাকেন।

যে কর্ম্মসূত্রকে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ও প্রাকৃতিক ক্রিয়া বলিয়া উপরে ব্যাখ্যা করা গেল, তাহার আবার নিগূঢ় মূলানুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, সেই কর্ম্মসূত্রের মূল নিয়ন্তা-নিযুক্ত নিয়ম, এবং উহা স্বয়ং তাহার বাহ্যপ্রচার মাত্র। যেহেতু উদ্দেশ্য হইতে নিয়মের উদ্ভব; অতএব নিয়ম এবং তৎপ্রচারণরূপী কর্ম্মসূত্র, সেই উদ্দেশ্য অনুরূপ কার্য্যসাধন জন্যই গতিশীল হইয়া থাকে। এখন বলা বাহুল্য যে কেবল ব্যক্তিগত মানবজীবন নহে, সমুদয় মানবীয় জীবন-সমষ্টিও, অখণ্ডিত একত্ব ভাবে নিয়ন্তৃ-সম্ভব কোন মহদুদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত সেই কর্ম্মসূত্রবশে, যথানির্দ্দিষ্ট পথে অবিরত গতিশীল হইয়া ছুটিতেছে। সেই মহৎ উদ্দেশ্যের বিভিন্ন ভাব-যুক্ত বিভিন্ন দিক্ বা অংশ সমূহের ক্রম পূর্ণতাসাধন করিয়া, সম্পূর্ণ পূর্ণতামুখে আনয়ন করিবার নিমিত্ত; সেই মানবীয় জীবন সমষ্টি, তৎ তৎ অংশ সংখ্যা অনুসারে, খণ্ডে খণ্ডে খণ্ডিত হইয়া, কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়াছে। জীবন সমষ্টির সেই খণ্ড সমূহের প্রতিখণ্ড, এক একটি বিভিন্ন জাতীয় জীবন। সেই জাতীয় জীবন যাহারা অনুসরণ করিয়া থাকে, বা করিতে বাধ্য, তাহাদের যে সমষ্টি তাহাকেই জাতি বলা যায়। এই জাতি সমূহের মধ্যে যে যেমন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া থাকে, এবং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ও প্রাকৃতিক ক্রিয়া (অর্থাৎ উপরে যাহাকে প্রাকৃতিক কর্ম্মসূত্র নামে নামযুক্ত করা গিয়াছে) তাহাদের যাহাকে যেমন পরিচালন করিয়া লইয়া ফিরে; তাহারা তদনুরূপ বিভিন্ন প্রকৃতি ধারণ করিয়া অন্য হইতে আপন পৃথকত্ব জ্ঞাপন করিয়া থাকে। পুনশ্চ, আপন আপন কর্ম্মক্ষেত্রে আদিষ্ট কার্য্য হইতে যাহাতে বিচলিত হইয়া পলাইতে না পারে, কথিত কর্ম্মসূত্র তৎপক্ষে একরূপ নিগড় স্বরূপ। প্রকৃতি তাহার অনন্ত বিশ্রুতস্বরে নিরন্তরই এই ঘোষণা করিতেছে যে, তুমি যে কার্য্যক্ষেত্রে উদ্ভব হইয়া জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ, সর্ব্বান্তঃকরণে, স্বীয় মানবীয়

কর্ম্মসূত্রের পরিচালনে, সেই কার্য্য ক্ষেত্রেরই অনুসরণ কর, যেহেতু তজ্জন্যই তোমার উৎপত্তি; যদি ব্যতিক্রম করিতে চাও, তবে ব্যতিক্রম-গতি পরিমাণে ক্রমধ্বংসে ধ্বংস হইবে; ধ্বংস ভিন্ন তোমার গত্যন্তর নাই। অতএব কখনও তাহা করিওনা, আত্ম কর্ম্মবোধে প্রবুদ্ধ হও, হইয়া সেইরূপ আচরণ কর। বাঙ্গালি বাবু! সাহেব হইওনা।

অতএব এ সংসার ক্ষেত্রে সমগ্র মানবজাতির প্রতি অবলোকন করিলে, যতক্ষণ যাহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সমাধা না হইবে, ততক্ষণ তাহার কাহাকেই ফেলিবার যো নাই; ফেলিবার সময় হইলে তোমাকে আমাকে তজ্জন্য ক্লেশ পাইতে হইবে না, তাহারা আপনা হইতেই উত্তরাধিকারীবর্গকে স্থান দিয়া কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইবে। পুনশ্চ, কার্য্যফল যাহার, এবং যাহার আজ্ঞায় কার্য্যের আরব্ধ, তাহার নিকট সকল কর্ম্মেরই সমান আগ্রহের বিষয়ীভূত। এই কথাগুলি মনে রাখিয়া জাতীয় জীবন সমালোচন করিলে, ইহাই আলোচ্য এবং ইহাই কেবল দেখিতে হইবে যে, কোন জাতি কিরূপ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার কার্য্য কি, এবং সে কার্য্যসমাধায় কতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়া সফলতা লাভ করিয়াছে। কার্য্যকর্ত্তার আদিষ্ট কার্য্য সামান্য হইলেও, কার্য্যকারক যদি তাহা সুশৃঙ্খলে ও সাত্ত্বিক ভাবে সমাধা করিতে পারিয়া থাকে, তাহা হইলেই সে কার্য্যকারককে ধন্য বলিতে হইবে। কিন্তু যথায় অফলতা, ন্যস্ত কার্য্যের ভার তথায় উচ্চ হইলেও, কার্য্যকারক অধমের মধ্যে পরিগণিত হয়। ইহার পর কোন জাতি সাংসারিক ব্যাপারে ছোট, কোন জাতি বড়, এ আলোচনা উহা হইতে স্বতন্ত্র, এবং এরূপ আলোচনার যে মীমাংসা, তাহা কেবল পাগলেরই তুষ্টিকর হইয়া থাকে। কিন্তু মনুষ্য শরীরী হওয়ায় কিয়দংশে পাগল বলিতে হইবে; অতএব সেই পাগলামির তৃপ্তি করিয়া, তৃপ্ত্যন্তে অবশ্যম্ভাবী গাম্ভীর্য্য ও গুরুকর্ম্মানুসরণ তাহার মনে উদয় করাইবার নিমিত্ত, ওরূপ মীমাংসারও আবশ্যক হইয়া থাকে। জাতীয় ছোট বড় ন্যস্ত কার্য্যের লঘুত্ব গুরুত্ব লইয়া; যেমন একজন

মনস্তত্ত্ববিৎ ও একজন শিল্পকার, উভয়ই সমাজের পক্ষে সমান আবশ্যকীয় বটে, কিন্তু তথাপি কার্য্যের গুরুত্ব হেতু মনস্তত্ত্ববিদের আসন প্রথম, দ্বিতীয় আসন শিল্পকারের। জাতীয় ছোটত্ব বড়ত্বও তদ্রূপ। আমাদিগের প্রস্তাবিত জাতিদ্বয়ের মধ্যে কে ছোট কে বড়, তাহা পাঠকেরা আপনাপনি আলোচনা দ্বারা স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে মীমাংসা করিয়া লইবেন। তৎপক্ষে আমাদিগকে কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই।

গ্রীক এবং হিন্দু, এ উভয় জাতিও, নিয়ন্তার সেই মহদুদ্দেশ্য সাধন ক্ষেত্রে দুইটি বিভিন্ন ভাব লইয়া এ জগতে সমাগত হইয়াছে। সুতরাং ইহারা এক পিতৃসন্তান হইলেও, এবং প্রতিকূল সহস্র উপায় অবলম্বন (যদি তাহা সম্ভব হয়) করিলেও, তথাপি কর্ম্মসূত্রবশে তাহাদিগকে পৃথকত্ব অবলম্বন করিতে হইবেই হইবে। এক্ষণে দেখা যাউক সেই পৃথকত্ব কিরূপে উপস্থিত এবং গঠিত হইয়াছে।

একবংশত্ব সত্ত্বেও, হিন্দু এবং গ্রীক জাতির অবস্থা এবং প্রকৃতিগত বৈষম্য কর্ম্মসূত্রের নিয়োজন ও কর্ম্মক্ষেত্র বশে উদ্ভূত। আদিতে আমি এবং একজন গ্রীক পৃথক্ ছিলাম না। আমার এবং একজন গ্রীকের পিতৃভূমি স্বতন্ত্র নহে,—বাইবেল ভূমিও নহে। পিতা মাতা স্বতন্ত্র, বা আদম ও ইবও নহে। কুলপতি স্বতন্ত্র বা মুসা নহে। রাজা স্বতন্ত্র বা দাউদ নহে। আমাদিগের উভয়েরই পিতৃস্থান সেই,

"সপ্তর্ষিণাং স্থিতির্যত্র যত্র মন্দাকিনী নদী।
দেবর্ষিচরিতং রম্যং যত্র চৈত্ররথং বনং॥"

এবম্ভূত সর্ব্বসুখপ্রদ স্বর্গসম উত্তরকুরুবর্ষ। মূর্ত্তিমান্ সৌম্যরূপে যথায় সপ্ত-ঋষি বাস করিতেছেন, যথায় সুধাস্রাবিণী কলনাদিনী মন্দাকিনী নদী প্রবাহিত হইতেছে, যে স্থান দেবর্ষি চরিতে পরিকীর্ত্তিত, এবং যথায় চৈত্ররথকানন দেব-গন্ধর্ব্ব-বিলাস-যোগ্য প্রাকৃতিক মাধুর্য্য পূর্ণভাবে বিস্তার করিতেছে, সেই স্বর্গসম উত্তরকুরুবর্ষ আমাদিগের পিতৃস্থান।[১]

১। Prichard's Physical History of Mankind, Max Muller's Science of Language, Muir's Sanscrit Texts, Vol II এই সকল গ্রন্থ একবংশত্বের প্রমাণ স্থলে দ্রষ্টব্য। ইহা ভিন্ন ইউরোপীয় ডলফিন হইতে বঙ্গীয় পুঁটিমাছ পর্য্যন্ত আমও

কর্ম্মসূত্রের পরিচালনে, সেই কার্য্য ক্ষেত্রেরই অনুসরণ কর, যেহেতু তজ্জন্যই তোমার উৎপত্তি; যদি ব্যতিক্রম করিতে চাও, তবে ব্যতিক্রম-গতি পরিমাণে ক্রমধ্বংসে ধ্বংস হইবে; ধ্বংস ভিন্ন তোমার গত্যন্তর নাই। অতএব কখনও তাহা করিওনা, আত্ম কর্ম্মবোধে প্রবুদ্ধ হও, হইয়া সেইরূপ আচরণ কর। বাঙ্গালি বাবু! সাহেব হইওনা।

অতএব এ সংসার ক্ষেত্রে সমগ্র নানাজাতির প্রতি অবলোকন করিলে, যতক্ষণ যাহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সমাধা না হইবে, ততক্ষণ তাহার কাহাকেই ফেলিবার যো নাই; ফেলিবার সময় হইলে তোমাকে আমাকে তজ্জন্য ক্লেশ পাইতে হইবে না, তাহারা আপনা হইতেই উত্তরাধিকারীবর্গকে স্থান দিয়া কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইবে। পুনশ্চ, কার্য্যফল যাহার, এবং যাহার আজ্ঞায় কার্য্যের আরব্ধ, তাহার নিকট সকল কর্ম্মকারকই সমান আগ্রহের বিষয়ীভূত। এই কথাগুলি মনে রাখিয়া জাতীয় জীবন সমালোচন করিলে, ইহাই আলোচ্য এবং ইহাই কেবল দেখিতে হইবে যে, কোন জাতি কিরূপ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার কার্য্য কি, এবং সে কার্য্যসমাধায় কতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়া সফলতা লাভ করিয়াছে। কার্য্যকর্ত্তার আদিষ্ট কার্য্য সামান্য হইলেও, কার্য্য-কারক যদি তাহা সুশৃঙ্খলে ও সাত্ত্বিক ভাবে সমাধা করিতে পারিয়া থাকে, তাহা হইলেই সে কার্য্যকারককে ধন্য বলিতে হইবে। কিন্তু যথায় অফলতা, ন্যস্ত কার্য্যের ভার তথায় উচ্চ হইলেও, কার্য্য-কারক অধমের মধ্যে পরিগণিত হয়। ইহার পর কোন জাতি সাংসারিক ব্যাপারে ছোট, কোন জাতি বড়, এ আলোচনা উহা হইতে স্বতন্ত্র, এবং এরূপ আলোচনার যে মীমাংসা, তাহা কেবল পাগলেরই তুষ্টিকর হইয়া থাকে। কিন্তু মনুষ্য শরীরী হওয়ায় কিয়দংশে পাগল বলিতে হইবে; অতএব সেই পাগলামির তৃপ্তি করিয়া, তৃপ্ত্যন্তে অবশ্যম্ভাবী গাম্ভীর্য্য ও গুরুকর্ম্মানুসরণ তাহার মনে উদয় করাইবার নিমিত্ত, ওরূপ মীমাংসারও আবশ্যক হইয়া থাকে। জাতীয় ছোট বড় ন্যস্ত কার্য্যের লঘুত্ব গুরুত্ব লইয়া; যেমন একজন

মনস্তত্ত্ববিৎ ও একজন শিল্পকার, উভয়ই সমাজের পক্ষে সমান আবশ্যকীয় বটে, কিন্তু তথাপি কার্য্যের গুরুত্ব হেতু মনস্তত্ত্ববিদের আসন প্রথম, দ্বিতীয় আসন শিল্পকারের। জাতীয় ছোটত্ব বড়ত্বও তদ্রূপ। আমাদিগের প্রস্তাবিত জাতিদ্বয়ের মধ্যে কে ছোট কে বড়, তাহা পাঠকেরা আপনাপনি আলোচনা দ্বারা স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে মীমাংসা করিয়া লইবেন। তৎপক্ষে আমাদিগকে কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই।

গ্রীক এবং হিন্দু, এ উভয় জাতিও, নিয়ন্তার সেই মহদুদ্দেশ্য সাধন ক্ষেত্রে দুইটি বিভিন্ন ভার লইয়া এ জগতে সমাগত হইয়াছে। সুতরাং ইহারা এক পিতৃসন্তান হইলেও, এবং প্রতিকূল সহস্র উপায় অবলম্বন (যদি তাহা সম্ভব হয়) করিলেও, তথাপি কর্ম্মসূত্রবশে তাহাদিগকে পৃথকত্ব অবলম্বন করিতে হইবেই হইবে। এক্ষণে দেখা যাউক সেই পৃথকত্ব কিরূপে উপস্থিত এবং গঠিত হইয়াছে।

একবংশত্ব সত্বেও, হিন্দু এবং গ্রীক জাতির অবস্থা এবং প্রকৃতিগত বৈষম্য কর্ম্মসূত্রের নিয়োজন ও কর্ম্মক্ষেত্র বশে উদ্ভূত। আদিতে আমি এবং একজন গ্রীক পৃথক্ ছিলাম না। আমার এবং একজন গ্রীকের পিতৃভূমি স্বতন্ত্র নহে,—বাইবেল ভূমিও নহে। পিতা মাতা স্বতন্ত্র, বা আদম ও ইবও নহে। কুলপতি স্বতন্ত্র বা মুসা নহে। রাজা স্বতন্ত্র বা দাউদ নহে। আমাদিগের উভয়েরই পিতৃস্থান সেই,

"সপ্তর্ষিণাং স্থিতির্যত্র যত্র মন্দাকিনী নদী।
দেবর্ষিচরিতং রম্যং যত্র চৈত্ররথং বনং॥"

এবম্ভূত সর্ব্বসুখপ্রদ স্বর্গসম উত্তরকুরুবর্ষ। মুর্ত্তিমান্ সৌম্যরূপে যথায় সপ্ত-ঋষি বাস করিতেছেন, যথায় সুধাস্রাবিণী কলনাদিনী মন্দাকিনী নদী প্রবাহিত হইতেছে, যে স্থান দেবর্ষি-চরিতে পরিকীর্ত্তিত, এবং যথায় চৈত্ররথকানন দেব-গন্ধর্ব্ব-বিলাস-যোগ্য প্রাকৃতিক-মাধুর্য্য পূর্ণভাবে বিস্তার করিতেছে, সেই স্বর্গসম উত্তরকুরুবর্ষ আমাদিগের পিতৃস্থান।[১]

১। Prichard's Physical History of Mankind, Max Muller's Science of Language, Muir's Sanscrit Texts, Vol. II. এই সকল গ্রন্থ একবংশত্বের প্রমাণ স্থলে দ্রষ্টব্য। ইহা ভিন্ন ইউরোপীয় ডলফিন হইতে বঙ্গীয় পুঁটিমাছ পর্য্যন্ত আরও

আমাদের পিতা বিধাতার মানসপুত্র স্বায়ম্ভুব, এবং মাতা বিধাতৃদুহিতা শতরূপা। কুলপতি সপ্ত-ঋষি, অদ্যাপি যাঁহারা জ্যোতির্ম্ময় গগনে জ্যোতি বিস্তারে গগনকে শোভনতর করিতেছেন। রাজ্যেশ্বর প্রিয়ব্রত, সকাননা সাগরাম্বরা সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর উপর যাঁহার আধিপত্য। মধুস্রাবী একই ভাষা, যুগযুগান্ত গত হইয়াছে, তথাপি আজি পর্য্যন্ত ভাষাদ্বয়ে শাব্দিক ও বৈয়াকরণিক একতা তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। এইরূপে একস্থানে, এক পিতৃদেবতার বশবর্ত্তিতায়, এক-দেবতা-পূজক হইয়া, গ্রীক এবং হিন্দুগণ একজাতি থাকিয়া, একই ভাবে ও একই বৃত্তিশালী হইয়া, আহার বিহার বিলাস বিস্তার পূর্ব্বক কালযাপন করিতেন। ভিন্নতার নাম মাত্রও পরিজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু কোন সংযোগই চিরদিনের নহে! পিতা পুত্রে পৃথক হইয়া থাকে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় পৃথক হইয়া থাকে, সুতরাং এ সংযোগও চিরদিন থাকিবার নহে। যে বিধাতৃনির্দ্দিষ্ট কার্য্যপালন জন্য এতদিন ইহারা সংযোগবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছিল, এতদিনে তাহার সমাধা হইয়া আসিল। সংযোগে পালনযোগ্য ন্যস্ত-কার্য্য সমাধা হইলেই, একক হউক বা অপর নবসংযোগে হউক, নূতন আদিষ্ট

কত কত গ্রন্থের এতদ্বিষয় প্রতিপাদন করিতে উৎপত্তি হইয়াছে। আমার প্রবন্ধস্থিত কথা সত্য কি মিথ্যা তাহার মীমাংসায় যাহাদের সন্দেহ হইবে, আজীবন বসিয়া সেই সকল গ্রন্থ দেখিবার ভার তাঁহাদের উপরে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম। পদে পদে, বিশেষতঃ যে সকল কথা ও মীমাংসা সর্ব্বজন পরিচিত, তথায় রাশি রাশি কেতাবের নাম তুলিয়া প্রমাণ প্রয়োগের কি সত্য সত্যই আবশ্যক হইয়া থাকে? বিশেষতঃ যে দেশে স্কুলের বালকেরা পর্য্যন্ত ঋগ্বেদের বচন উঠাইয়া প্রমাণ প্রয়োগে লজ্জিত হয় না, তথায় কি তদ্রূপ প্রমাণ প্রয়োগের বস্তুতঃ কোন মূল্য থাকিতে পারে? যাহাহউক, পাঠকগণকে বলিয়া রাখি, আমাদ্বারা বঙ্গীয় পাণ্ডিত্যের অনুকরণে সর্ব্বদা প্রমাণ প্রয়োগের কার্য্যটা বড় একটা ঘটিয়া উঠিবে না; এবং ভরসা করি, ঘটিয়া উঠিবে না বলেই যে আমার কথায় তাঁহারা একেবারে অবিশ্বাস করিবেন, এমন নহে। যদি করেন, তবে হয় তাঁহারা মনে ভাবিয়া থাকেন, আমি দাগী আশামি; নতুবা সকলে যাহা জানে তাহা তাঁহারা জানেন না। নিতান্ত আবশ্যক স্থলে প্রমাণ প্রয়োগের ত্রুটি হইবে না।—লেখক।

বলা বাহুল্য যে লেখকের এতটা ভূমিকা, অস্মানাহ্ বঙ্গীয় পাণ্ডিত্যকে নিতান্তই ফাঁকি দিবার ফিকর! ছি! একটা কেরেব ভাল নহে।—বাঞ্ছারাম।

কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। পূর্ব্বসংযোগ আর রক্ষা হইবার কথা নহে।

কালবশে ইহাদিগেরও সংমিলন ভাঙ্গিল। মহদুত্তেজক অভাবের বৃদ্ধি হইল, স্বস্থান প্রচুর বোধ হইল না; অথবা যে কোন কারণের উপস্থিতি ও যাহাকেই উপলক্ষ্য করিয়া হউক, আবশ্যক বোধে, পার্থক্য অবলম্বন পূর্ব্বক, ইহারা সুখ লালসায় স্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া, যদৃচ্ছা অভিগমনে প্রবৃত্ত হইল। হিন্দুগণ অপেক্ষাকৃত অল্প ভ্রমণেই হলস্কন্ধে, হস্তে ধনুর্ব্বাণ, বিশাল হিমাদ্রিচূড়া লঙ্ঘন করিয়া, পুণ্যসলিলা সরস্বতী এবং সপ্তসিন্ধুতটে অবতীর্ণ হইলেন। অন্যদিকে গ্রীকগণ বহুতর নদনদী পর্ব্বত বন দেশ অতিক্রম করিয়া, বহুরক্তপাতে, বহুকষ্টে ও বহুশ্রমে, বহুদূর ভ্রমণান্তে সমুদ্রতীরবর্ত্তী হেলাসভূমিতে পদার্পণ করিলেন। স্ব স্ব উপনিবেশস্থলে পদার্পণ মাত্রেই শান্তিলাভ উভয়ের মধ্যে কাহারই ভাগ্যে বিধাতা লিখেন নাই। উভয়েই উভয় দেশে পদার্পণ মাত্র দেখিলেন যে, তত্তৎ স্থানের আদিম অধিবাসিগণ উভয়েরই নিকট প্রতিদ্বন্দ্বীভাবে দণ্ডায়মান।—ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী, দৈত্যকুল; হেলাসে পিলাসগী। উভয়েই উভয়কে দমন করিয়া, এবং দাসত্বপদে আনিয়া, আপনাপন প্রভুত্ব স্থাপনের সূত্রপাত করিলেন। বিভিন্ন ঘটনা ও অবস্থা-সঙ্কুল পথাতিক্রমের বিভিন্নতা পরিত্যাগ করিলে, উভয়জাতির মধ্যে ছাড়াছাড়ি হইয়া দূরান্তরে পতিত হইলেও, বৃত্তির এখনও একতা পক্ষে বিশেষ ব্যত্যয় ঘটিয়া উঠে নাই বলিতে হইবে। কিন্তু এ একতা আর অধিক ক্ষণ থাকে না। স্ব স্ব বিভিন্ন কর্ম্মক্ষেত্রে ইহাদের প্রবেশ আরম্ভ হইল।

হিন্দু এবং গ্রীক, এতদুভয় জাতি যৎকালে স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, স্ব স্ব গন্তব্য এবং অধিকৃত দেশদ্বয়ে পদার্পণ করিয়াছিল, সেই সময়ে, সেই দূরতম স্মৃতির বহির্ভূত ইতিহাসের অভ্যুদয় সময়ে, সমস্ত জগত ঘোর মূর্খতা অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। পার্শ্বস্থ মানব সমস্ত তখন একরূপ পাশব-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বনে বনে, গিরি গহ্বরে, সমুদ্রবেলায়, ক্ষুব্ধচিত্তে আহার লালসায়, যদৃচ্ছা বিচরণ করিয়া বেড়াইত। মিসর এবং ফিনিসীয়

সভ্যতার স্তিমিতালোক তখনও প্রজ্বলিত হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না। যদি হইয়া থাকে, তবে তাহা বোধ হয় তত্তৎ দেশমধ্যেই আবদ্ধ, এবং দেশবহির্ভাগের যে কোন বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কবিরহিত ছিল। সুতরাং হিন্দু এবং গ্রীক উভয়জাতিই স্বীয় স্বীয় গন্তব্য পথের সহচর, সহায় বা পরিচালক বন্ধু; অথবা প্রতিকূল ক্রিয়া উৎপাদক শত্রু স্বরূপ দ্বিতীয় কাহাকে প্রাপ্ত হয়েন নাই। এই দীর্ঘ পথ বোধ হয় ইহাঁরা স্ব স্ব দিকে ক্ষণিক নিরাশ্রমী জাতীয় সংস্রব ভিন্ন, একাকীই অতিবাহন করিয়াছিলেন।

যে শৈশব, যৌবন ও জরা মানবীয় ব্যক্তিগত জীবনে, বা বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ সম্বন্ধেই নিত্য নিরন্তর অভিনীত; মানবীয় জাতীয় জীবন, জ্ঞানজীবন ইত্যাদি সম্বন্ধেও, অবিকল তাহাই। দেশ কাল পাত্র আদি পার্থক্যবোধক মায়া ভেদ করিলেই, অনন্ত পূর্ণতাময়ী বিশ্বনিয়মের কি অপূর্ব্ব একতাই লক্ষিত হয়; এখান হইতে সেখান, একাল হইতে সেকাল, একাজ হইতে সেকাজ, সকলেই প্রসারণ হইতে সঙ্কুচনে পর্ব্বে পর্ব্বে গুটিত হইয়া শেষে আসিয়া একতায় মিশিয়া, বিশ্বরূপে পরিণতি পূর্ব্বক, কি পরিস্ফুট স্বরেই দেশকালাদির নশ্বরত্ব জ্ঞাপন করিয়া থাকে! সে যাহা হউক, মানবচিত্ত শৈশবে বিচারবিহীন, বিকার-বিহীন, দুগ্ধমথিত সদ্যনবনীতবৎ নির্ম্মল, কোমল, টল্ টল্ করিতেছে; পিপীলিকাটি পর্য্যন্ত তাহার উপর দিয়া চলিয়া গেলে, তাহাতে পায়ের দাগ বসিয়া থাকে। অনন্ত গর্ভ হইতে অপেক্ষাকৃত নবাগত, সংসার-চাতুরীতে অপরিচিত এবং বোধশূন্য; সুতরাং চক্ষু নলিন, নবীন, পূর্ব্বদর্শনশূন্য এবং অকপট। যে যে ভাবে নয়ন সমক্ষে উপস্থিত হইতেছে; চাতুরীশূন্য, সর্ব্ব বস্তুতে সমদর্শী, অকপটচিত্ত তাহাকে বিনা বাক্যব্যয়ে অবিকল সেই ভাবে গ্রহণ করিতেছে। এ সময়ে যে কোন বস্তু, ইচ্ছা করিলেই, সেই নেত্র এবং চিত্ত সমক্ষে, রোষ, তোষ, ভয়, বিশ্বাস, মোহ প্রভৃতি, যাহা ইচ্ছা, তাহাই উৎপাদনে সমর্থ হয়। এ সময়ে প্রবলতা সহকারে যে যে ভাবে সেই চিত্তকে আকর্ষণ করিবে, উহা যথাদিষ্ট রূপে মোহতাড়িত

হইয়া সেই ভাবে আকর্ষিত এবং অনুরূপ ভাবে শিক্ষিত হইবে। গ্রীক-জাতি এবং হিন্দুগণ উভয়েই সেই প্রাচীন বা ইতিহাসের অভ্যুদয় কালে যদিও ব্যক্তিগত ধর্ম্মভীকতা, ধর্ম্মবুদ্ধি, বলবীর্য্য, সাহস ও বীরদর্প প্রভৃতি মনুষ্যোচিত গুণে পরিপূরিত ছিল ; কিন্তু সে সকল গুণ অপার উন্নতগামী গুণ সংসারের গণনায় অতি নিম্ন পর্য্যায়েতেই অবস্থান করে বলিতে হইবে। যে যে গুণের উৎকর্ষে মনুষ্যত্ব বোধ হয়, যে জ্ঞানের প্রাচুর্য্যে মনুষ্যত্ব প্রকাশ ও দীপ্তিমান হইয়া থাকে, সমাজ এবং সংসার যাহার কল্যাণে স্বর্গখণ্ড রূপে প্রতীয়মান হয়, এবম্প্রকার গুণ ও জ্ঞানের আধার স্বরূপ মানবীয় জ্ঞান-জীবনের তাহাদিগের এই শৈশবকাল। তাহাদিগের জাতীয় জীবনেরও এই শৈশবকাল। মানবীয় এবং জাতীয়-চিত্তও অনুরূপ শৈশবোচিত। এ সময়ের দর্শনস্থলীয় প্রধানতঃ জড়জগৎস্থ ভৌতিক ব্যাপার, চৈতন্যজগৎ ও তদুৎপন্ন ঘাত প্রতিঘাত আদি অতিশয় বিরল। যাহাহউক যথারূপা বাহ্যজগৎ এ সময়ে যে ভাবে, যে মূর্ত্তিতে, চিত্তকে আকর্ষণ করিবে; উহা সেই ভাবে আকর্ষিত, এবং তাহাতে পূর্ণ ও তাহাতে শিক্ষিত হইবে। এই আদি এবং নৈসর্গিক শিক্ষাই বর্ত্তমান এবং প্রায় সমগ্র ভাবী জীবন প্রবাহেরও পরিচালক হইয়া থাকে; এবং উহা যে ভাবে হউক, একবার তদ্রূপ পরিচালকরূপে দণ্ডায়মান হইতে পারিলে, বহুযত্নেও তাহার মোহ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হওয়া যায় না।

কিন্তু এ স্থলে এক কথা বলা কর্ত্তব্য। পুনরুক্তি বা অনাবশ্যক হইলেও বলিতে ক্ষতি নাই। উপরে যে প্রাকৃতিক প্রকরণ ব্যাপার কথিত হইল, তদ্দ্বারা যেন এরূপ কোন মতে বিবেচিত না হয় যে, একমাত্র বাহ্য জগৎই মানব জীবনের গতি চাতুর্য্য এবং তাহার সুখ দুঃখ সম্পাদন পক্ষে বলবতী, অথবা, মানব-প্রকৃতি আত্ম-স্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাহ্য জগতেই লীন হইয়াছে। আমাদিগের সম্বন্ধে প্রকৃতি কেবল কর্ম্মক্ষেত্র নির্ব্বাচন এবং কর্ম্মভিত্তি নিরূপণ ও কর্ম্মার্থে উপকরণাদি সম্প্রদান করিয়া থাকেন; আমরা সেই কর্ম্মক্ষেত্র মধ্যে সেই কর্ম্মভিত্তিকে আশ্রয় করিয়া, সেই উপকরণরাশির সদ্ব্যবহারে ও স্বেচ্ছাশক্তির পরি-চালনে কর্ম্মরাশির সমুৎপাদন করিয়া থাকি। এখানে সেই প্রাকৃতিক

কর্ম্মক্ষেত্র নির্ব্বাচন এবং কর্ম্মভিত্তি নিরূপণ, ইহারই সমালোচনা করিয়া যাওয়া যাইতেছে। এস্থলে আরও একটি বিষয় পরিষ্কার করিয়া বলা কর্ত্তব্য। আমরা এই প্রস্তাব মধ্যে কোথাও প্রকৃতি, কোথাও বাহ্য-জগৎ, কোথাও বা মনুষ্যপ্রকৃতি, এবম্ভূত দেড়গণ্ডি শব্দ সমূহ ব্যবহার করিয়া আসিতেছি; কিন্তু এই প্রত্যেক শব্দ কি কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে? দার্শনিকের ন্যায় কোন বিশেষ শব্দকে বিশেষ অর্থদানে সেই শব্দের অর্থ সঙ্কীর্ণতা সাধন করা আমাদিগের কখনই রুচিকর নহে; বরং সর্ব্বান্তকরণে সেরূপ কার্য্যকে ঘৃণাই করিয়া থাকি। তথাপি দেখিতেছি, এই প্রস্তাব মধ্যে, প্রকৃতি সম্বন্ধীয় নিকটার্থবোধক বিবিধ শব্দের একত্র সংঘটন হেতু, ক্ষণিকের নিমিত্ত প্রত্যেকের অর্থ নির্ব্বাচন কিয়ৎ পরিমাণে আবশ্যক হইতেছে। অতএব প্রকৃতি অর্থে, যাহার নির্ব্বাচন ও ক্রিয়াফলে কর্ম্মসূত্রের উৎপত্তি, যাহা নিয়ন্তার পরবর্ত্তী আর সকলের আদি, যাহা নিয়ন্তার আজ্ঞাবশে কর্ম্মসূত্রের পরিচালন করিতেছে, যাহা সর্ব্বব্যাপিনী এবং যাহার আদি অন্ত কেবল নিয়ন্তায় সন্নিহিত, তাহাই কেবল প্রকৃতি পদে বাচ্য। তদ্ব্যতীত আর সমস্ত, অর্থাৎ যাহা পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড তাহা বাহ্যজগৎ। মনুষ্য প্রকৃতির অর্থে চলিত অর্থ, উহার আর বিশেষ অর্থবাচনের আবশ্যকতা নাই।

বাহ্যজগৎ এবং মানবপ্রকৃতি, এ উভয়ে স্বতন্ত্র পদার্থ; কিন্তু এক্ষণে এই প্রবন্ধের পরিবোধার্থে এতদুভয়ের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ যেরূপ তাহার বিশেষরূপে অবধারণার আবশ্যক। বাহ্যজগৎ যাহা তাহা নিয়ন্তৃ-ইচ্ছা-পরিচালিত; আর মনুষ্যপ্রকৃতি যাহা তাহা সেই বাহ্য-জগৎস্থ বা নিয়ন্তৃ-ইচ্ছা-শরনশায়ী হইলেও, স্বতন্ত্র ভাবে স্বীয় ইচ্ছা পরিচালনে সক্ষম। কিন্তু মানবপ্রকৃতি স্বেচ্ছাশক্তি-সম্পন্ন হইলেও বিনা অবলম্বনে কার্য্যকালে অক্ষম; অতএব কার্য্যকালে বাহ্যজগতের মুখাপেক্ষী, তাহার সহিত সংযোগ এবং তাহার আশ্রয় ব্যতীত কার্য্য করিতে পারে না। অন্তর, মন, অহঙ্কার, প্রজ্ঞা, মেধা, মতি, মনীষা, স্মৃতি, ক্রতু, ইচ্ছা, ইত্যাদি বৃত্তি নিচয় মনুষ্যপ্রকৃতির পিতৃদত্ত সম্পত্তি,

বাহ্যজগৎ হইতে প্রাপ্ত হয় নাই। চার্ব্বাক বা আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিষ্য-গণ বলিতে পারে, এবং বলিয়া থাকে যে, আদিম কাল হইতে চেতন অচেতন এতদ্ভবের ক্রমান্বয় সঙ্ঘাতে উক্ত সমস্ত বৃত্তি উদ্ভাবিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে। তাহা যাহাদের হইয়া থাকে হউক, আমার হয় নাই; এবং যে সে কথা গ্রহণ করিতে চাহে, তাহারই পক্ষে তাহা গ্রহীতব্য। আমার পক্ষে সহজে যাহা বিশ্ব ক্রিয়ার সহিত অক্ষুণ্ণ সামঞ্জস্য সাধক, এবং যাহার সিদ্ধান্তে চিত্ত অপার অশান্তির স্থল হইয়া না দাঁড়ায়, এবং যদর্থে কুতর্কের অপ্রয়োজন, তাহাই সর্ব্বোত্তোভাবে শ্রেয় এবং গ্রহণীয়। ঐ ঐ চেতনাচেতন সঙ্ঘাতে ঐ ঐ বৃত্তি প্রবৃত্তি শক্ত্যাদি উৎপন্ন হয় না, তবে তদ্দ্বারা জাগ্রত এবং বিকশিত হইয়া থাকে বটে। সে যাহা হউক, উপরি উক্ত ঐ সকল বৃত্ত্যাদি মনুষ্য-প্রকৃতির আছে বটে, কিন্তু বাহ্যজগতের সহ সংস্রব বিরহে, ঐ সকল বৃত্তি অকার্য্যকর। উহারা শাণিত অস্ত্রস্বরূপ, কর্ত্তনযোগ্য দ্রব্য পাইলে নানাবিধ কার্য্যের উৎপন্ন করিল; এবং সেই কার্য্যে সেই ধার যত্ন পূর্ব্বক প্রয়োজিত করিলে, হয়ত ধারেরও বৃদ্ধি হইল; কিন্তু যদি তাহা না পাইল, তবে অকার্য্যকর হইয়া অবয়বটি মাত্র লইয়া পড়িয়া থাকে, এবং অব্যবহারে মরিচা পড়ায় হয়ত ধারের একবারেই ধ্বংস হয়। বাহ্য-জগতের সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইলে পর, বৃত্ত্যাদি লইয়া করিব কি? আমার স্মৃতি আছে, কিন্তু কি স্মরণ করিব;—আমার স্মরণীয় বস্তু কোথায়? আমার মনীষা আছে, কিন্তু কি লইয়া তাহা খাটাইব;—সে দৃষ্ট-বস্তুমার্গ অবলম্বন ভিন্ন অদৃষ্টবস্তু অনুভবের সম্ভব শরীরধারীর পক্ষে অসাধ্য, সে বস্তু কোথায়? আমার অহঙ্কার আছে, কিন্তু কাহার সহিত পার্থক্য দর্শাইয়া এই বোধের ভাব সম্যক উপলব্ধি করিব; তুলনীয় বস্তুর অভাব। আর আর বৃত্ত্যাদি সম্বন্ধেও তৎ তৎ প্রকার; এই সকল বৃত্ত্যাদি নিয়োগ বা অনিয়োগে, উৎকর্ষ বা অপকর্ষ ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমরা সাধরণ মানবীয় কার্য্য সমূহেও ইহা নিত্য প্রত্যক্ষবৎ দেখিতেছি। ফলতঃ বৃত্ত্যাদি সমস্ত বাহ্যজগতের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে, এবম্ভূত অকার্য্য-কর হইয়া উঠে যে মানবপ্রকৃতি অস্তিত্ব সত্বেও, অস্তিত্ব বিহীনতা

অপেক্ষা অধমভাব প্রাপ্ত হইয়া, অতিশয় অবাঞ্ছনীয় এবং হেয়তম হইয়া যায়। কিন্তু সর্ব্বদর্শী নিয়ন্তার তাহা অভিপ্রেত নহে, সে অভিপ্রায়ে প্রতি পদার্থের সার্থকতা নিত্য নিয়ম।

অতএব মানবপ্রকৃতি বাহ্যজগতের সংযোগ ভিন্ন যে কোন কার্য্যসাধনে সম্পূর্ণ অসমর্থ। আমরা যাহা করি, যাহা বলি, বা আমরা যাহা ভাবি, সে সকলেরই ভাব অগ্রে আমরা বাহ্যজগৎ হইতে সংগ্রহ করিয়াছি; নতুবা সেরূপ করিতে, সেরূপ বলিতে, সেরূপ ভাবিতে, বা কিছুই নিষ্পন্ন করিতে পারিতাম না। মানব চিত্তের সহ বাহ্যজগতের সংযোগ, প্রথমটি দ্বিতীয়টির ভাসে প্রতিভাসিত হওয়া মাত্র; যদ্রূপ কোন বর্ণবিশিষ্ট পুষ্প বা বস্তু বিশেষের নিকটে স্ফাটিকপাত্র নিকটস্থিত হইলে, সেই পুষ্প বা বস্তুর বর্ণে প্রতিভাসিত হইয়া সেই বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই প্রতিভাসই চিত্তমধ্যে কুথিত ভাবরাশিরূপে পরিণত হইয়া ভাবীকার্য্য ভিত্তি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। কিন্তু বাহ্যজগৎ কি সরল অথচ কৌশলময়ী সূক্ষ্মতর, কুটতর অদৃশ্য পন্থা দিয়াই এই সুমহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে, আমরা তাহার কিছুই অনুভব করিতে পারিনা, এবং মনেও কখন এমন খট্‌কা হয় না যে তলে তলে এতটা কাণ্ড হইয়া যাইতেছে।

ধীর শান্ত অনিল-বাহী বাসন্ত প্রদোষে মেঘ-তমসাচ্ছন্ন নভোমণ্ডল দেখিয়া আমার মন সহসা তমসাচ্ছন্ন হইয়া ম্লান ভাবে এরূপ অভাবনীয় চিন্তামগ্ন হইল কি জন্য? দেহ পিঞ্জরে প্রাণ যেন আকুল হইয়া উঠিল, কি সকল কথা মনে হইতেছিল, হইতে হইতে আবার নষ্ট স্বপ্নবৎ যেন কোথায় ছুটিয়া পলাইয়া যাইতেছে। কোথায় আকাশের দূর প্রান্তে মেঘমালা ঝুলিতেছে, আর কোথায় আমি এই দূরসংসার-কান্তার বা ভূমিকান্তারে পতিত রহিয়াছি, উভয়ে এই বিষম দূরত্বে অবস্থিত, তথাপি কেন উহার দ্বারা আমার চিত্ত আকর্ষিত এবং তাহাতে ভাবান্তর আসিয়া উপস্থিত হইল;—ঐ মেঘের সহ আমার মনের কি সম্বন্ধ বলিতে পার যে তাহাতে এই ভাবান্তরের সম্ভব হইতে পারে? কোকিলের মধুর স্বরে শ্রবণের তৃপ্তি, পূর্ণচন্দ্র দর্শনে চিত্তের প্রফুল্লতা;

নক্ষত্রখচিত নীল চন্দ্রাতপ নভঃস্থল দর্শনে মনোমধ্যে অনৈসর্গিক ভাবের উদয়, ও ভাবসমূহের অনন্ত-প্রসারিণী তরঙ্গসঙ্কুল ঘাত প্রতিঘাত, দূরস্থ গীত বাদ্যধ্বনি শ্রবণে চিত্তের অস্থির-প্রসন্নতা, নির্ঝরিণী-পরি-শোভিত গিরিগুহা মধ্যস্থ কান্তার ভাগ হইতে বহুবিধ বিহঙ্গরব মিশ্রিত প্রতিধ্বনিতে মনোমধ্যে জন্মান্তরীণ ভাবের উদয়; এ সকল কি কারণে হইয়া থাকে? উর্দ্ধে বিদ্যুৎ বজ্রাদি-যুক্ত নিবিড় ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশ-মণ্ডল, নিম্নে স্বচ্ছন্দ-অন্ধকারময়ী রজনী, টিপ্ টিপ্ খদ্যোতমালা জ্বলিতেছে, বিদ্যুৎ ঝলসে অন্ধকার আরও অধিকতর অন্ধকারে পরিণত হইতেছে, পতঙ্গের ঝিঁ ঝিঁ রব, জলের তর তর ধ্বনি, ভেকের কলরব, বায়ুর শন্ শন্ শব্দ, এবম্ভূত সময়ে চিত্ত কেন চমকিত, সঙ্কুচিত, এবং ভীত হইয়া, আত্মদার্ঢ্যতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সেই সেই ভাবে লীন হইয়া থাকে? কোথায় মানবচিত্ত, আর কোথায় সেই সেই বস্তু; তথাপি, আবার জিজ্ঞাসা করি, তাহাতে কেন আকর্ষিত, উত্তেজিত, এবং ভাবান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে? কি কারণেই বা সেই ভাবান্তর ভাব, দৃশ্যাদৃশ্য ভাবে আমার ভাবী কার্য্য প্রবাহের প্রসূতি স্বরূপ হয়? এ চৌম্বকীয় গুণ ইহাদের মধ্যে কে সংযোজিত করিল? বাঙ্গালাম, গেটের সেই নিসর্গ-আত্মার বাক্যে স্মরণ হয় কি?

"'Tis thus at the roaring loom of time I ply,
And weave for God the Garment thou see'st Him by."

নিনাদ-আবর্ত্তময়ী কাল-তন্তুমাঝে
করি নিত্য গতায়াত আমি এইরূপে,
করিয়া বয়ন বিভু বসন বিভূতি,
দেখিতেছ তাঁকে তুমি উপলক্ষ্য যাহে।

ইহাও সেই নিসর্গগৃহে কালতন্তু-বিনির্ম্মিত ভূতেশের বসনাংশ বয়ন মাত্র। চুম্বকের চৌম্বকীয় গুণ যাহা হইতে, ইহাদের এই চৌম্বকীয় গুণও তথায় উৎপন্ন। যাহার আজ্ঞায় ফুল ফুটিতেছে, ফল পাকিতেছে, নক্ষত্রমণ্ডল ঘুরিতেছে, পরমাণু উড়িতেছে, আমরা বুঝিতে পারি বা না পারি, উহাও সেই বিশ্বকর্ম্মার কৌশল এবং কার্য্য। অথবা যাহারই হউক এবং আমরা

তাহা বুঝিতে পারি বা না পারি, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, বাহ্যজগৎ ও মানব-চিত্তের মধ্যে সমধর্ম্মী বস্তুসম্ভব একটি চৌম্বকীয় আকর্ষণ নিত্য অবস্থান করিতেছে, ইহা লুকাইবার নহে, হারাইবার নহে, ধ্বংস হইবারও নহে। অনন্তরূপা বিশ্বব্যাপিনী একত্বময়ী মহাশক্তির ইহা অবিরল এক-এবং-সর্ব্ব অভ্যন্তর পরিচালিত শিরা ধমনী আদির সঞ্চরণ ক্রিয়া মাত্র! যে গুণরাশির সমাবেশে জগৎ নির্ম্মাণ, মনুষ্যও তাহার সারসমাবেশে; এ নিমিত্ত একস্থানে সেই চৌম্বকীয় গুণের আবির্ভাব হইলে, সর্ব্বত্রই তাহা পরিচালিত হইয়া অনুকূল ক্রিয়ার উৎপাদন করিয়া থাকে। অসমধর্ম্মী পদার্থ বা সমধর্ম্মী পদার্থের আতিশয্য বিষ, প্রতিকূল ক্রিয়া তাহার প্রভাবে উৎপাদন হয়। আত্মিক ও ভৌতিক, উভয় বিষয়েতেই, প্রকৃত চিকিৎসা-বিদ্যা যাহা তাহা এই বিষেরই হরণ পূরণ সাধন মাত্র।

জাগতিক এই আকর্ষণ সূত্র যতই সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম হউক, যতই কূটমার্গ দিয়া গমন করুক. সেই কূটমার্গবাহনকালীন যতই বিভিন্ন ভাবের সহ সংস্রবে ও তদাতিশয্যে যতই তাহার আত্মগোপিত হউক, আমরা তাহা দেখিতে পাই বা নাপাই, কিন্তু যখন আয়োজন পূর্ণ হইবে, এবং উপযুক্ত কালের সুবিধা পাইবে, তখনই তোমার দ্বারা সে যথাসম্ভব কার্য্য করাইয়া লইবেই লইবে। পুনশ্চ এখানেই যে তাহার ক্ষান্তি হইল, তাহা নহে; এক বিষয়ের বিরতি, আর এক বিষয়ের আরম্ভ মাত্র। এবং আমরা যাহাকে বিরতি বলি, তাহা সেই বিষয়ের পূর্ণতা-সাধক কারণ সমূহের সার-সমাবেশের অতিক্রমক্রিয়া মাত্র বলিয়া জানিও। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, এ সার-সমাবেশ ও তাহার উত্তরোত্তর কার্য্যকারণ-ভাবত্বে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব কারণের ধ্বংস হইতেছে না; কেবল উত্তরোত্তর সার হইতে আরও সারত্বে, সূক্ষ্ম হইতে আরও সূক্ষ্মতায় পরিণত হইয়া ভূমিপ্রোথিত ভিত্তির ন্যায় অদর্শন হইয়া যাইতেছে মাত্র। যাহা হউক ক্ষুদ্র হইতে মহৎ, সমস্ত বিষয়েই বাহ্যজগৎ মানব-চিত্তকে আকর্ষিত করিয়া, তাহার ভাবান্তর সাধন, ও তাহাকে আপন ভাবে ভাব-যুক্ত করিতেছে; লৌহ চুম্বকের ন্যায় পরস্পর গাত্র সংলগ্ন হইতেছে না বটে, কিন্তু লৌহ চুম্বকের কার্য্যাপেক্ষাও গূঢ়ভাবে গুরুতর কার্য্য সমূহ,

বাহ্যজগৎ বাহিরে এবং মানবচিত্ত অন্তরে থাকিলেও, এতদুভয়ের মধ্যে সুসম্পন্ন হইতেছে; এই জন্য বলিতেছি, এতদুভয়ের সংযোগ, একের বিভাসে অপরের বিভাসিত হওয়া মাত্র। এ সংযোগ তোমার আমার বারণ বা রূপান্তর করিবার ক্ষমতা নাই। কর্ম্মসূত্রবশে উহা যথাসম্ভব সংঘটিত; এবং কর্ম্মক্ষেত্রমধ্যে আমাদের অবলম্বন স্বরূপ হইয়া থাকে।

বাহ্যজগতের ভাব একরূপ নহে, বহুতর, অসংখ্য। ইহার মূর্ত্তিভেদে ভাবভেদ। দেশ কাল ও পাত্র অনুসারে ইহার যখন যে ভাববিশেষ মানবচিত্ত সহ সংস্রবে আইসে, তখন তদ্বৎকার্য্য প্রসবিত হয়। এই সংস্রব ও তৎসহগামী উত্তেজনা যে কত গুরুতম ও কত গূঢ়ভাবে কার্য্য কবিতে পারে, তাহা উপরে কথিত হইয়াছে। পুনশ্চ ঐ সংস্রব ও উত্তেজনা যে চিত্তেই সমাবেশ এবং তদতিরিক্তে কেবল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দৃষ্টক্রিয়া গুলি মাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হয় না তাহা, কোন বিষয় হইতে উৎপন্ন যে মনের ভাব সেই ভাব হইতে যে সমস্ত ক্রিয়া গুলি করিবার জন্য চিত্তে প্রসন্নতা উপস্থিত হয়, তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ মিলাইয়া দেখিলেই জানিতে পাবা যাইবে। কোন বস্তু দৃষ্টে তোমার মন চকিতবৎ ভাবান্তর প্রাপ্ত হইল; সেই ভাবান্তর-প্রাপ্ত মনে তোমার যতগুলি ও যে প্রকারের কার্য্য করিতে ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি জন্মিবে, জানিও সেই সমস্ত কার্য্যকলাপ এবং তাহাদের প্রসূতিস্বরূপ ভাবান্তরটী উভয়েই একজাতীয় পদার্থ। যে সকল কার্য্যে ইচ্ছা জন্মে, সেই সকল কার্য্য ইচ্ছাগত থাকুক বা কর্ম্মরূপে দৃশ্যমান হউক, তাহারা সেই প্রসূতির অবশ্যম্ভাবী সন্ততি। অতএব যে বস্তু হইতে ভাবান্তরের উৎপত্তি সেই বস্তু, ভাবান্তর, ভাবান্তব হইতে উদ্ভূত কার্য্য-ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি, এবং সেই ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি হইতে যে কার্য্য কৃত, ইহারা সকলেই একধর্ম্মী পদার্থ; একসূত্রে গ্রথিত এবং একই তাড়িতবেগে বিকম্পিত; প্রভেদ কেবল এই মাত্র যে কেহ উৎপন্ন ও কেহ উৎপাদক।

আবার সময়ান্তরে মন অন্যরূপ ভাববিশেষে আকর্ষিত বা সংযোজিত হইলে, অন্যতর ভাবান্তর ও ফল প্রসবিত হয়। এক ভাবান্তরে মন আকৃষ্ট থাকিলে যে অন্য অন্য ভাবান্তর স্থান পায় না, তাহা নহে। ভাবান্তর-

উৎপাদিনী বাহ্যজগতের মূর্ত্তি যেমন অসংখ্য ও অপার বৈচিত্রময়ী, বৈচিত্র-প্রকটনকারী কালও তেমনি নিত্য আবর্ত্তনশীল, ভাবান্তরগ্রাহী মানবীয় চিত্ত-দর্পণও নিতান্ত সামান্য নহে। সুতরাং পর পর, উপরি উপরি, বা যুগপৎ একই সঙ্গে বহুভাবান্তরের সমাবেশ হইয়া থাকে; এবং ইহা হইতেই মানবচিত্ত বৈচিত্রময়ী ও একধা বহুকার্য্যশীলের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। সান্নিধ্যস্থিত বস্তুবিশেষ হইতে স্ফাটিক পাত্র যে বর্ণ প্রাপ্ত হয়, আবার বিভিন্ন বর্ণ বিশিষ্ট পদার্থ সংযোগে যেমন সেই পূর্ব্ব-প্রাপ্ত বর্ণের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে, তেমনি বাহ্যজগতের কোন এক ভাবের সহ সংযুক্ত মানবপ্রকৃতি যদি অদৃষ্টপূর্ব্ব বা যে কোন প্রকারে আবার ভাববিশেষের দ্বারা আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তৎপরিমাণ অনুরূপ পূর্ব্বভাবের ও তদুৎপন্ন কার্য্যের ব্যতিক্রম ঘটনা হয়। পুনশ্চ ব্যতিক্রম শব্দ শুনিলেই যে হেয় ভাবের উদয় হইবে, তাহা নহে। দিগন্তস্থলে সৎ ও অসতের ভাব যেন একই প্রকারের বলিয়া আপাততঃ প্রতীয়মান; ও তাহাদের বাহ্যসঞ্চালন দৃষ্টে, সৎ অসৎ, অসৎ সৎ, অথবা উভয়ই অভিন্ন, এরূপ ভ্রম হয় বটে, কিন্তু সে কেবল ভ্রমই এবং তদতিরিক্ত আর কিছুই নহে। ব্যতিক্রম ছন্ন ও অসংলগ্ন হইলেই হেয়; নতুবা, উহা যখন আবার সুগ্রথিত, সুসজ্জিত ও সামঞ্জস্যযুক্ত, তখন অন্যদিকে যে অধিক পরিমাণে হেয়র কারণ হইত, এখানে সেই অধিক পরিমাণে বৈচিত্রময়ী শোভার কারণ হইয়া থাকে। যে মূল বস্তুর ভাসে স্ফাটিক পাত্র প্রথমে প্রতিভাসিত হইয়াছে, তাহাকেই জমি করিয়া সুসজ্জিত ভাবে অন্য বস্তুভাস প্রয়োগ করিলে চক্ষুতৃপ্তিরই কারণ হইয়া থাকে; কিন্তু অতৃপ্তির কারণ হয় তখন, যখন সুসজ্জিত করণ ও চক্ষুতৃপ্তির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া অন্য বস্তুভাস সংযোগবিহীন, ছিন্ন ভিন্ন, যদৃচ্ছাক্ষিপ্ত ভাবে প্রয়োজিত হয়। মানবচিত্তে ভাবান্তর সমাবেশ সম্বন্ধেও অবিকল তদ্রূপ। এই সংযোগবিহীন ছন্ন সমাবেশের ফল হইতেই, আমরা ব্যক্তি বা জাতি বিশেষে যে স্বভাবের কার্য্য নিয়তঃ প্রত্যাশা করিয়া থাকি, মধ্যে মধ্যে তাহার অতৃপ্তিকর দূষণীয় ব্যতিক্রম দেখিতে পাই।

সুসজ্জিত ভাবে ভাবান্তর সমাবেশ কার্য্য আত্মিক শক্তিচালনার

উপর নির্ভর করিয়া থাকে, এবং সে আত্মিক শক্তিচালনার আবার অপকর্ষ বা উৎকর্ষ ভাব কালসাপেক্ষ। কিন্তু তাহা বলিয়া ইহা ভাবিও না যে সেই চালনার সাত্ত্বিক ভাবও কালসাপেক্ষ, তাহা নহে; উহা কালের অপেক্ষা রাখে না, কারণ সে অপেক্ষা রাখিলে প্রতি কর্ম্মকারক আপন শ্রমসার্থকতার পরিমাণ ও তদুৎপন্ন শান্তি পাইবে কোথায়? সে যাহা হউক, কেবল সুসজ্জিতকরণাদি কার্য্যই আত্মিক শক্তিচালনার উপর নির্ভর করিয়া থাকে; কিন্তু যে সকল বস্তুর যোগে প্রতিভাসিত হওয়া, তাহাদের আয়োজনের উপর সে অধিকারও ক্ষমতাবিহীন। আবার প্রতিভাসিত পদার্থ যে বিভিন্ন প্রকৃতি ধারণ করিয়া থাকে, তাহাও সেই প্রতিভাসদাতা আয়োজিত বস্তু সমূহের স্বভাব হইতে; সুসজ্জিতকারী আত্মিক শক্তি হইতে নহে। প্রত্যুত সুসজ্জিতকারী আত্মিক শক্তি, যথায় যেরূপ বস্তু সংগ্রহ দেখিয়া থাকে, তথায় সেইরূপে ও তাহারই অনুগামী হয়। ফলতঃ যেখানে যেরূপ বস্তু দেখা যায়, সেখানে যেরূপে সুসজ্জিত করিলে তাহাদের ভাল দেখায় সেইরূপই করিতে হয়।

কি ব্যক্তিবিশেষে, কি জাতিবিশেষে, সুসজ্জিতকারী আত্মিক শক্তির যথোপযুক্ত পরিচালনার অভাব হইলেই তাহা হেয় হইয়া থাকে, এবং কালের প্রতি তরঙ্গাঘাতে মূলশূন্যবৎ একবার এদিক একবার ওদিক করিয়া শেষে বিলয় প্রাপ্ত হয়। অতএব কি ব্যক্তিগত, কি জাতিগত উভয় জীবন পরিচালনে, কথিত আত্মিক শক্তির একান্ত আবশ্যকতা। যে সকল বস্তুর ভাসে প্রতিভাসিত হওয়া অর্থাৎ যাহাদের সংস্রবে কথিত ভাবান্তর উপস্থিত হওয়ার বিষয় উপরে বলিয়া আসিলাম, তাহারা ব্যক্তিগত বা জাতিগত প্রকৃতি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। জাতি সম্বন্ধে উহারই প্রসাদাৎ জাতীয় প্রকৃতি; এবং আত্মিক শক্তির পরিচালনে যে তারতম্য তাহাই উৎকর্ষ বা অপকর্ষ, সভ্যতা বা অসভ্যতা, উন্নতি বা অবনতি, ইহা প্রকটিত করিয়া থাকে। অথবা উ টাইয়া দেখিলে, সেই উৎকর্ষ বা অপকর্ষাদি ভাব, সেই আত্মিক শক্তি পরিচালনার পরিমাণ। পুনশ্চ ইহাও মনে থাকে যেন যে, আত্মিক শক্তি পরিচালনায় সফলতালাভ কালসাপেক্ষ।* যিনি এই তত্ত্ব সম্যক্ অবগত, এবং বাহ্যজগত ও মানব-প্রকৃতির সহ সম্বন্ধ

অবধারণ পূর্ব্বক প্রত্যেক কার্য্যে উভয়ের স্বাতন্ত্র্য এবং সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া, এতৎ জাতীয় জীবনদ্বয় সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবেন; তিনিই তদ্বিষয়ে পটুতা লাভে কৃতকার্য্য হইবেন, এবং মানব জীবন প্রবাহের অদ্ভুত কৌশল জ্ঞাত হইয়া আনন্দ লাভে সমর্থ হইবেন।

বলিয়াছি যে জাতিদ্বয়ের জ্ঞান জীবনের এই শৈশবকাল। চিত্ত তরল; কোন একটি বস্তুসংঘাতে, সহসা বিপুল তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হয়। সুতরাং এ সময়ে ইহারা বাহ্যজগতের যে যে ভাবের সহিত সংযোগে আসিয়াছে, তাহাতেই তরঙ্গায়িত হইয়া, অনুরূপ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এই উভয় জাতি স্ব স্ব উপনিবেশিত দেশে পদার্পণ করিলে পর, বাহ্যজগৎ কাহার নিকট কিরূপ ভাবে প্রতীয়মান হইয়া প্রত্যেকের ভাবী জীবনপ্রবাহ, এবং তজ্জনিত শুভাশুভের কিরূপ ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল, তাহা আপাততঃ প্রবোধার্থে অতি স্থূল স্থূল বিষয় লইয়া দেখা যাউক।

হিন্দু এবং গ্রীকেরা স্ব স্ব গন্তব্যস্থানে গমনান্তে পৃথক হইবার পূর্ব্বে, মধ্য আসিয়ায়, যে স্থানকে উত্তরকুরুবর্ষ বলিত তথায়, একত্র মিলিয়া বাস করিতেন। এই উত্তরকুরুস্থ আর্য্যবংশ সামান্য ছিল না যেহেতু, পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের গণনা অনুসারে স্কান্দিনেবীয়, টিউটন, রোমক, পারসীক প্রভৃতি অপরাপর বহুতর জাতিসমস্তও এই বংশ হইতে উৎপন্ন। দেশমধ্যে স্থান এবং আহার সঙ্কুলান না হওয়ায়, ইহারা ক্রমে ক্রমে স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুখলালসায় বহির্গত হইয়া নানা স্থানবাসী হইয়াছিল। এই দেশ আয়তনে সঙ্কীর্ণ; এবং আকৃতিতে ক্ষেত্র, মরু, পর্ব্বতাদিতে পর্য্যায়-ক্রমে পরিব্যাপ্ত। সুতরাং এখানে বহুপরিবারের স্থান সঙ্কুলান হইবার কথা নহে। কিন্তু যে টুকু স্থান অনুকূল, তাহা উৎকৃষ্ট; প্রকৃতিমূর্ত্তি না সামান্য না মহান, তৃপ্তিকর; নদীসকল সামান্যপ্রাণা ও স্বচ্ছসলিলা; জল-বায়ু স্বাস্থ্যকর, এবং ভূমিও সুন্দরফলরসাদি প্রদান করিয়া থাকে। এই স্থানকে আশ্রয় করিয়া একাল ধরিয়া কতই না রাজ্য উদিত ও পতিত হইয়াছে। মৃগয়ামাত্র-উপজীবী অরণ্যচর তাতারবংশের যখন যে এই অনুকূল স্থানকে আশ্রয় করিতে পারিয়াছে, তখনই সেই এক অভিনব রাজ্যের অভ্যুত্থান করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত পার্শ্বস্থিত অপরাপর

জাতীয় বিদ্বেষ সংঘাতে কখনই কেহ তদ্রূপ রাজ্য স্থায়ী করিতে সমর্থ হয় নাই। যাহা ঐতিহাসিক সময়ে অভিনয় হইতেছে দেখা গিয়াছে, ইতিহাসের অভ্যুদয় সময় হইতেই সে অভিনয়ের আরম্ভ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। হিন্দু এবং গ্রীকের আদি পুরুষেরাও সেই অভিনয় সূত্রে বিতাড়িত হয়েন; এবং তাহাদের পূর্ব্বগত স্কান্দিনেবীয় ও রোমকেরাও নিঃসন্দেহই সেই কারণে বিতাড়িত হইয়া থাকিবে।

প্রকৃতির অনম্নুগৃহিত যাহারা তাহারাই অগ্রে বিতাড়িত হইয়া থাকে। একথা যদি সত্য হয়, তবে সে নিয়ম অনুসারে দেখিতে গেলে স্কান্দিনেবীয় প্রভৃতি পূর্ব্বগত জাতি সমস্ত হইতে গ্রীক অধিক অনুগৃহিত; এবং সর্ব্বশেষে বহির্গত হইয়াছিলেন যাঁহারা, হিন্দুদিগের সেই পূর্ব্বপুরুষগণ, আবার গ্রীকদিগেরও অপেক্ষা অনুগৃহিত বলিতে হইবে। কার্য্যেও সেইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমে বহির্গত জাতিগণ যখন নূতন দেশে নূতন অবস্থা বশে নূতন জীবন রচনা করিতে বাধ্য এবং ব্যাপৃত হইয়াছিল; তখন স্বস্থানস্থিত জাতির সেরূপ নূতন জীবন রচনা ব্যাপারের আনাবশ্যকতা হেতু, স্বচ্ছন্দে আত্ম অবস্থার উন্নতিকল্পে সময়াতিবাহন করিবার কথা। এবং ইহার ফলও যে বিভিন্ন ও ইতরবিশেষ হইবে; এবং পরেও যে রোমক প্রভৃতির অপেক্ষা ইহাদের সভ্যতা আগে উদয় ও বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তৎপক্ষে ইহা যে এক অন্যতম কারণ, তাহা বলিবার আবশ্যক রাখে না। অতএব যখন অন্যান্য জাতি অপরদেশে নীত হইয়াও বন্যজন্তুর ন্যায় বিচরণ করিয়া ফিরিতেছে, গ্রীক এবং তদপেক্ষা হিন্দুর পূর্ব্বপুরুষেরা তখনও স্বস্থানেই আপন অবস্থার উৎকর্ষে সভ্যতার সূত্রপাত করিতে সক্ষম হইয়াছেন। যে জাতি যেরূপ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়, তাহার মানসিক বৃত্তি যে সেই পরিমাণে সতেজ হইয়াছে, সেই উৎকর্ষ ভাব তাহার পরিচয় দিয়া থাকে। সুতরাং বাহ্যজগৎ হইতে ভাব গ্রহণ ও তাহার উপরে কার্য্যকরণে মানসিক শক্তিও সেই পরিমাণে সতেজ হয়। কিন্তু মানসিক শক্তির মধ্যে অনুভব ও কল্পনা অর্থাৎ চিত্তশক্তিই সর্ব্বাগ্রে সতেজ ভাব প্রাপ্ত হয়, কালে বুদ্ধি ও কালে যুক্তি-শক্তির তেজস্বিতা হইয়া থাকে। শ্রদ্ধাশক্তি সমগ্রের লব্ধফল স্বরূপ হইবায়, সকলেরই সঙ্গে ও

সর্ব্বাবস্থায় সাহানুভূতিযুক্ত থাকে; এ নিমিত্ত কেবল চিত্তশক্তির সঙ্গেও শ্রদ্ধার সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, মানবীয় কালের এই প্রথম উৎকর্ষ ভাবের উদয় অবস্থায় চিত্ত-শক্তিরই আধিক্য হওয়ার কথা। হিন্দুর পূর্ব্বপুরুষেরা গ্রীকদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের অপেক্ষা পরে বহির্গত হইবায়, সেই আধিক্য অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিতে হইবে। এইরূপ উৎকর্ষ বা আপকর্ষ ভাব এবং এইরূপ চিত্তবৃত্তি লইয়া, ও গন্তব্য স্থানের নিমিত্ত এইরূপ উপযুক্ত হইয়া, ইহারা উত্তরকুরুবর্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সুখের আশায় বা দুঃখে তাপিত হইয়া, বহির্গত হইয়াছিলেন।

গ্রীকেরা পূর্ব্বে বহির্গত ও বিগত হইয়া গিয়াছে। যে যে কারণের তাড়নায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব জাতিসকল বিতাড়িত, হিন্দুরাও এতদিন পরে সেই তাড়নায় অস্থির হইয়া বহির্গত হইলেন। গ্রীক এবং অন্যান্য জাতিরা পশ্চিম পথে গিয়াছে।[২] যে কারণে স্বদেশ ছাড়িতে হইল, আবার পাছে পূর্ব্বগত জাতিবর্গের সংঘর্ষে সেই কারণ উপস্থিত হয়, বোধ করি ইহারা সেই আশঙ্কা করিয়াই দক্ষিণ পথ অবলম্বন করিয়া অজ্ঞাত, অপরিচিত ভারত-মুখে প্রধাবিত হইলেন। এইরূপে হিন্দুরা স্বল্পপ্রাণ উত্তরকুরুবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া, সুখলালসায়, মনের সাহসে, অল্পশ্রমে, অনুরূপ স্বল্পপ্রাণ নদী পর্ব্বত কানন প্রভৃতি লঙ্ঘন করিয়া, ভারতক্ষেত্রে উপনিবিষ্ট হইলেন। হয়ত এখানে উপনিবিষ্ট হওয়ার পূর্ব্বে তাঁহারা মনে মনে ভাবিয়াছিলেন যে যেখানে যাইতেছি, সেখানকার জাগতিক মূর্ত্তি ও আহার প্রচুর, অথচ উত্তরকুরুবর্ষের ন্যায় চিত্তের সামঞ্জস্যসাধক হইবে। কিন্তু আশার কি বিপরীত ফল। তাঁহারা ভারতে পদার্পণ মাত্রে দেখিলেন, যে ভারতীয় জাগতিক মূর্ত্তি অভূতপূর্ব্ব ভাববিশিষ্ট। ভয়বাৎসল্যের এককালে যুগপৎ উৎপাদক। উত্তরে বিশাল হিমাদ্রিগিরি ধবল মূর্ত্তি ধরিয়া শত শৃঙ্গে, বিরাটদেহে, গগনভেদ পূর্ব্বক নক্ষত্রমণ্ডল স্পর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। পাদদেশে ও পার্শ্বে সপ্তসিন্ধু বায়ুবিক্ষোভিত

২। Prichard's Researches into Physical History of Mankind, Vol III, 390—403 Vol IV, 603 ইত্যাদি দেখ।

সাগরতরঙ্গ অনুকরণ করিয়া, বেগভরে প্রবাহিত হইতেছে। দক্ষিণে গ্রীষ্মমণ্ডলবিভূতিমণ্ডিত মরুস্থল। যে দিকে নয়ন প্রসারিত কর, নয়নপথ অতিক্রম করিয়া ভীমমূর্ত্তিধারিণী নিবিড় বনভূমি, উন্নতশীর্ষ বৃক্ষাবলী গগনস্পর্শ করিতে উদ্যত হইয়াছে। ভীষণস্বভাব শ্বাপদকুল রব তুলিয়া বনভূমি আন্দোলিত ও কম্পিত করিতেছে। ঊর্দ্ধে গগনসাগরে ঘোরদর্শন শকুন্তবর্গ সন্তরণ দিতেছে। নিম্নে বিভৎসমূর্ত্তিবিশিষ্ট খলস্বভাব বিষধর সরিসৃপকুল, ধীরে ধীরে, মন্থরগমনে, অতর্কিত ভাবে তৃণশস্প আচ্ছাদিত হইয়া, পদে পদে পদক্ষেপে আশঙ্কা জন্মাইতেছে। ব্যোমমার্গে মেঘদল বিদ্যুৎবজ্রঘোষে যদৃচ্ছা বিচরণ পূর্ব্বক বিভীষিকা উৎপাদন করিয়া ফিরিতেছে। পবনদেব রোষভরে পর্ব্বতচূড়া মথিয়া, বৃক্ষকানন উৎপাটিয়া, আমূল-জগৎ-কম্পনে রত। উত্তরকুরুস্থহিমানীমুক্ত হইয়া নিশানাথ এখানে যথার্থতই সুধাংশু অংশু; এবং দিনদেব সহস্র রশ্মিতে বিভূষিত হইয়া, অচিন্তনীয় পুরুষ নিয়ন্তার প্রত্যক্ষ প্রভাব জ্ঞাত করিতে করিতে উদয়গিরি হইতে অস্তশিখরে গমনাগমন করিতেছেন। নিশা নিবিড়; কখন বা নিবিড়তম হইয়া কেবল খদ্যোতমালায়, কখন বা নীল উজ্জল মণিখচিত চন্দ্রাতপতলে প্রদীপ্ত মণিসহস্রের স্তিমিতালোকে প্রতিভাসিত হইতেছে। এদিকে বসুন্ধরা মাতৃস্নেহ-পরবশ হইয়া, অযাচিতভাবে ফল মূল প্রভৃতি আহারীয় এবং আশ্রয় দানে, যেন সান্ত্বনা এবং অভয় প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ফলতঃ বাহ্যজগৎ যেন এখানে আর্য্যগণকে রোষ ও ক্ষমামিশ্রিত বিকটভঙ্গিতে সদর্পে কহিতেছে, "দেখ এ তোমার করকানিহারপীড়িত সামান্যপ্রাণ উত্তর-কুরুবর্ষ নহে যে, যে কোন বিষয় সহজে আয়ত্ত করিতে চাহিবে। অনেক তেজে আসিয়াছিলে, কিন্তু আমার মূর্ত্তি দেখিলেত! আমার বিকট হাসা একবার দেখিবে?—না, তাহা হইলে তুমি বাঁচিবে না। এখন দেখ তুমি কত ক্ষুদ্র, দর্প দূর কর, আমার পায়ে নত হও, ভয়বিস্ময়ে নিয়ত আমাকে দর্শন ও আমার উপাসনা কর; খাইতে দিতেছি খাও, তাহার জন্য ভাবিতে হইবে না; কিন্তু দেখিও মাথা তুলিওনা।" আর্য্যগণও মাথা তুলেন নাই!*

* উপরোক্ত কয়েক পংক্তি বোধ করি আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্যসিংহদিগের বোম্বেটে বাঙ্গালার অনুকরণে লিখিত হইয়াছে ইতি।—বাঞ্ছারাম।

আর্য্যগণ আহার পাইলেন বটে, কিন্তু গা মেলিতে পারিলেন না; এরূপ ভয়ে ভয়ে আহারীয় প্রাপ্তিতে সুখ কোথায়? সর্ব্বদাই জড়সড়, সর্ব্বদাই ভীত, বুদ্ধিশুদ্ধি বাহিরে লুপ্ত হইয়া প্রবিষ্টঅঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাংসপিণ্ড কীচকের ন্যায় ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া আকুলিত করিতে লাগিল। চিত্তবৃত্তি বাহিরের প্রফুল্লতা হারাইয়া, অভ্যন্তরে তৎস্থল পূরণার্থে অনুসন্ধানরত হইল। আর্য্যগণ অপরিচিত দেশে আসিয়া, নিতান্তই অপরিচিতের ন্যায় অনুভব করিতে লাগিলেন। প্রকৃতিহস্ত সর্ব্বত্রই বলবান্; যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় তাহাই আয়ত্ত এবং ধারণার অতীত; অধিকন্তু ভয়-প্রদর্শন করিয়া থাকে। রাত্রি ইহাদিগের নিকট অদৃষ্টচর অনৈসর্গিক জীবকুলের বিহার কাল; অরণ্য ভিষণ শ্বাপদ কুল ও ভীষণ দানব দেবাদির বাসস্থান, নদী সকল যথার্থই সাগরের উপযুক্ত ললনা; পর্ব্বত সকল উন্নতশীরে ক্রকুটীভীষণ রোষকষায়িত নয়ন বিস্ফারণ করিয়া রহিয়াছে; দুর্জ্জয় পবন এক এক সাপটে সর্ব্ব-উচ্ছেদকারী সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব জ্ঞাপন করিতেছে; ভূমিকম্প, উল্কাপাত, ঋতুচরগণের উন্মাদমূর্ত্তি, দিগ্বিকাশিনী তড়িল্লতা, ঘনঘোরবজ্র নির্ঘোষ, এসকলে সামান্য মানবমন কেমন করিয়া সুস্থির থাকিবে? চতুর্দ্দিকেই ভয়ের কারণ। বালকে এই এই বিষয়ে যেরূপ ভাবযুক্ত চিত্তবিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যদি তাহার কখন ধারণা ও পরিমাণ করিয়া থাক; তাহাহইলে জ্ঞানজীবনস্থ এই আর্য্যবালকেরও তাৎকালিক মনের অবস্থা অনেকাংশে অনুভব করিতে সমর্থ হইবে।

জাগতিক মূর্ত্তির ভাবপ্রদর্শন এইরূপ। ইহার পরে আবার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দৌরাত্ম্য—শ্বাপদকুলের,এবং শ্বাপদকুল অপেক্ষাও ভীষণতর ভারতের আদিম নিবাসীগণের। একদিকে গোত্র বাঁধিয়া গোরক্ষাদি রক্ষা করিতে হইল; অন্যদিকে হস্তে ধনুর্ব্বাণ আদিমনিবাসী দৈত্যবর্গের সম্মুখীন হইয়া তাহাদের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতে বিব্রত হইয়া উঠিলেন। মনের বিকল অবস্থায় যাহারা আসিয়া উত্তেজনা এবং শত্রুতা আচরণ করিয়া থাকে, তাহাদের উপর যে ক্রোধাগ্নি উদ্দীপিত হয়, সেরূপ ধ্বংসেচ্ছা প্রবৃত্তির উদ্দীপন অন্যত্র হয় না। বলা বাহুল্য যে এই দৈত্যগণ সহ সংগ্রামে আর্য্যেরা নিতান্তই নৃশংসভাবে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; এবং

এই দৈত্যগণের উচ্ছেদবাসনাই বহুদিন পর্য্যন্ত ইহাদের জপমালা স্বরূপ হইয়াছিল।[৩] বেদের অর্দ্ধেকের অতিরিক্ত সূক্ত এই দৈত্যবংশের উচ্ছেদ কামনা ও তাহার প্রার্থনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে; এই সময়ে আর্য্যগণ নিত্য শত শত নররক্তে স্নান করিয়া তবে জল গ্রহণ করিতেন; এবং এই আর্য্যদস্যুরণস্থলেই, অসুরবিনাশিনী কালী, মহিষমর্দ্দিনী দুর্গা, শুম্ভ ও নিশুম্ভ-ঘাতিনী জগদ্ধাত্রী ইত্যাদি দেব দেবী ও দেবাসুর সংগ্রাম কাহিনীর ভাবী উৎপত্তির সূত্রপাত হয়। আর্য্যেরা এই দৈত্যবর্গ লইয়া বহুক্লেশ পাইয়াছিলেন; এবং শেষে অনেক কষ্টে ও অনেক রক্তপাতে তাহাদিগকে বশ্যতায় আনিতে হইয়াছিল বলিয়াই, মানবচিত্তের স্বভাবসুলভ প্রতিশোধ-আকাঙ্ক্ষা ও বিদ্বেষ ভাবের ক্রীড়ায় অনিবার্য্যমোহে, আর্য্যগণ দৈত্যসন্ততি শূদ্রবর্গকে সমাজের মধ্যে এতাদৃক হেয়পদ দান ও তাহাদের উপর এতটা অত্যাচার করিয়াছিলেন। পুনশ্চ মানব যখন যে পরিমাণে ঊর্দ্ধে মাথা তুলিতে ও পার্শ্বে গা মেলিতে না পারে, তখন নিম্নমুখে যেন তাহার প্রতিশোধস্বরূপ সেই পরিমাণে নির্ম্মম ও কঠোর ভাব অবলম্বন করিয়া থাকে। সুতরাং ইহাও শূদ্রদিগের উপর অত্যাচারের এক অন্যতম কারণ, কারণ আমরা দেখিতেছি ঊর্দ্ধে এবং পার্শ্বে আর্য্যগণের ভীতির সীমাপরিসীমা ছিল না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আর্য্যগণ ভারতে আসিবার পূর্ব্বেই, গ্রীকদিগের অপেক্ষা সম্ভবত অধিক পরিমাণে অনুভব ও কল্পনা শক্তি লাভ করিয়া আসিয়াছিলেন। তাহা কার্য্যে খাটাইবার পদার্থও এখানে গ্রীকদিগের অপেক্ষা তাঁহারা প্রচুর পাইলেন। ভারতের প্রকৃতি যেমন ভয়ঙ্করী ও সর্ব্বদিকেই ধারণার অতীত বিপুলা,তেমনিই আবার তাহার চিত্ত-উন্মাদনকারী বিরাটবেশ ও মহতী মূর্ত্তি। একদিকে যেমন মেঘ বিদ্যুৎ বায়ু অরণ্যানী প্রভৃতি ভীতি উৎপাদন করিতেছে,অন্যদিকে তেমনি সূর্য্য চন্দ্র-বসুন্ধরা আদি হর্ষের কারণ হইতেছে,আবার একথা সমগ্র জাগতিক মূর্ত্তি সুমহান্ বিস্ময় রসে ও বিশালতায় চিত্তকে আনত করিয়া ফেলিতেছে।

৩। ঋক্ বে ১। ১১৭, ২। ১১, ইত্যাদি অর্দ্ধেকের অতিরিক্ত সূক্ত দ্রষ্টব্য।

এমন স্থলে আর্য্যচিত্ত একদিকে অপরিমিত ভয়, অন্যদিকে তাহার তুল রক্ষক অপরিমিত ভক্তি, এবং একধা সমগ্র দর্শনে আপনার নগণ্যত্ব এবং অনৈসর্গিক শক্তির সর্ব্বশক্তিমানত্ব অনুভব করিতে লাগিলেন। ক্রমে অনুভাব্য বিষয়ের কুল পাইবার আশায় অপার কল্পনা পথে প্রধাবিত হইলেন। এ কল্পনার পথ ধাবনে ক্ষান্তি নাই, এক ক্ষান্তি কিঞ্চিৎ হইত আহার চিন্তায়, কিন্তু তাঁহারা যে রত্নপ্রসবিনী ভূমিতে পদার্পণ করিয়াছিলেন তথায় আহারীয় পদার্থের জন্য চিন্তা করিবার কথা নহে। তখন অন্য বিলাসবস্তুরও উদয় হয় নাই যে, তাহার জন্য সময় ব্যয় করিবেন। লোকে বলিয়া থাকে যে মানবীয় সামান্য অভাব সকল পূরণ হইলে, তদ্দ্বারা যে অবসরকাল পাওয়া যায় তাহা প্রধানতঃ সাংসারিক উচ্চ অভাবের উদ্ভাবন ও তাহার পূরণে ব্যয় হইয়া থাকে। কিন্তু আর্য্যদিগের সে অবসরকাল এখানে আর এক রকমে ব্যয় হইতে চলিল; অন্য দিকে অবহেলার প্রমাণ স্বরূপ অধিক কি বলিব,—যে কৃষি-প্রণালী বৈদিক সময়ে আরম্ভ হইয়াছিল, বোধ হয় এপর্য্যন্তও তাহাই হিন্দুদিগের মধ্যে অক্ষুণ্ণভাবে চলিয়া আসিতেছে। যাহাহউক, তথাপি যে বৈদিক সময়ে বহুবিধ উত্তমোত্তম বিলাস বস্তু আদির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা যে আর্য্যশক্তি নিতান্ত তিক্ত, এবং ভগ্নপদ হইলেও কিছু না কিছু কার্য্যকরণে সক্ষম, তাহারই পরিচায়ক;—উহা কেবল আংশিক মাত্র শক্তিপ্রয়োগের ফল। পূর্ণশক্তি প্রয়োগ হইলে না জানি আরও কি হইত! সেই পূর্ণশক্তি প্রয়োগের অভাবেই, ভারতে বড় বড় শোভাময় ফুলে শেষে কণ্টকময় ধুত্তরা ফলের জন্ম হইয়াছে।

হর্ষের কারণ অপেক্ষা ভয়ের কারণ যে সমস্ত, তাহারাই সাধারণতঃ মানবচিত্তের উপর অধিক আধিপত্য করিয়া থাকে; বস্তুতঃ অনুভবস্থলেও ভয়ের কারণগুলি কিছু অধিকরূপে অনুভূত হয়। এ স্থলে আর্য্যদিগের পক্ষে সে কথা আরও কিছু গুরুতর রূপে খাটিতেছে। হর্ষের কারণ বলিয়া অনুভূত যাঁহারা, তাঁহাদের প্রদত্ত ফল যত অনুভব করিতে পারা যাউক বা না যাউক; কিন্তু ভয়ের কারণ যাঁহারা, তাহাদের প্রদত্ত ফল

প্রত্যক্ষবৎ ও পদে পদে অনুভবনীয় হইতেছে। অতএব ভয়বাহুল্য অত্যন্ত বেশি, সুতরাং সে সকল হইতে শান্তির একান্ত প্রয়োজন। অনৈসর্গিক শক্তির দমনে বা সমতায় শান্তি দানে অনৈসর্গিক শক্তিই সমর্থ হইবার কথা। এজন্য আর্য্যেরা সকল কার্য্য ফেলিয়া সেই কার্য্যে ব্রতী হইলেন। যাবতীয় নৈসর্গিক শক্তি মূর্ত্তিভেদে দেবতারূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উপাস্য হইয়া উঠিল। বেদোক্ত যাবতীয় দেব দেবী এই নৈসর্গিক শক্তিরই রূপ কল্পনা।[৪] এমন ভীতি ও চিত্তবৈক্লব্য স্থলে যে কেহ উপকারে আইসে, সেই শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া থাকে, এ নিমিত্ত আর্য্যের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাদি গুণ এমন কি পশুপক্ষ্যাদি পর্য্যন্তে প্রধাবিত হইতে লাগিল। এইরূপ শান্তি ও দেবকার্য্যের আধিক্য হেতু, পৃথিবীর আর সমস্ত স্থান অপেক্ষা একমাত্র ভারত ধর্ম্মভূমি ও কর্ম্মভূমি বলিয়া দৃষ্ট হইতে চলিল। উত্তর-কুরুর স্মৃতি তখনও বিলোপ প্রাপ্ত হয় নাই; সুতরাং দূরস্মৃতির মোহিনী কল্পনায় উত্তরকুরু এখন ইহাদের নিকট কেবল সুখময় স্থান। দেবপিতৃগণ তথায় কর্ম্ম হইতে অবসর পূর্ব্বক বাস করেন; কিন্তু তথাপি তাহা ধর্ম্মভূমি বা কর্ম্মভূমি নহে, তথা হইতেও পতন আছে। কর্ম্ম ও ধর্ম্মভূমি যাহা তাহা ভারত, ইহাই স্থির ধারণা হইয়া দাঁড়াইল।[৫]

এক্ষণে মোটের উপরে দেখা যাইতেছে, ভারতে আগত হইলে পর আর্য্যচরিত্র এরূপে পরিবর্ত্তিত হইল। প্রথমে অপরিমিত ভীতির কারণ হইতে অতিশয় ভয়; আবার তাহার বৈপরীত্যভাবে হর্ষের কারণ দৃষ্টে সেইরূপ অতিশয় ভক্তি; এবং তদনন্তর বিশাল ও সমগ্র জাগতিক মূর্ত্তি দৃষ্টে, ভয় ও ভক্তি উভয়েরই বিবরীভূত শক্তির মহত্ত্ব ও বিরাট ভাবের ধারণা। দৈত্যবর্গের সহ প্রতিসংঘর্ষে নীচের প্রতি ক্রূরতা। এই

৪। বাল্মীকি ও তাৎসাময়িক বৃত্তান্তের ব্রহ্মবিদ্যায় কর্ম্মকাণ্ড ভগে বৈদিক দেবতা নিচয়ের বিষয় দ্রষ্টব্য।

৫। মহাভারত ৬।৫ ১৪ "উত্তরাশ্চৈব কুরবঃ" ইত্যাদি; পুনশ্চ ৬ ৫।৪০—৪৬ "উত্তরোত্তরমেতেভ্যো বর্ষমুদ্রিচ্যতে গুণৈঃ" ইত্যাদি। আরও বহুশাস্ত্রে অথবা যে কোন শাস্ত্রে এরূপ উক্ত হইয়াছে।

সকলের আবার প্রতিপ্রসবে ভয় হইতে নম্রতা, ভক্তি হইতে কৃতজ্ঞতা ও বাৎসল্য, ও বিরাটধারণা হইতে বৈরাগ্য, ক্রুৎতা হইতে শ্রেণীবিশেষস্বাভিষ্ট সাধন। পুনশ্চ নম্রতা হইতে ধৈর্য্য, কৃতজ্ঞতা হইতে দয়া, বাৎসল্য হইতে ক্ষমা, এবং বৈরাগ্য হইতে সমাজবিরতি। এই সকলেরই মধ্য দিয়া আবার গ্রন্থনসূত্রস্বরূপে চিত্তশক্তি সর্ব্বত্র পরিচালিত, ও চিত্তের অবলম্বন পদার্থ কল্পনা এই গুণগুলির সহ একধা এবং পৃথকরূপে প্রত্যেকের সহ জড়িত; এই নিমিত্ত হিন্দুরা উপরে উক্ত বা অনুক্ত যে কোন গুণের চালনা ও যে বিষয়েরই আলোচনা করিতে গিয়াছেন, তাহাতেই অযথা বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছেন, এবং এত বাড়াবাড়ি করিয়াও তথাপি তাঁহাদিগের মনের তৃপ্তি হয় নাই। মন্বন্তরাদি পৌরাণিক কল্পনার কথা বা লোকব্যবহার আদি দূরে থাকুক, সামান্য একটা বংশ কোন রাজার বর্ণনা করিবেন, তাহাতেও স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল এবং কালের দিগন্ত ধরিয়া টানাটানি![৬] ইহার অতিরিক্ত আরও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্বভাব ও গুণ বিশ্লেষণ আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। তাহা আলোচকবর্গের নিজের নিজের উপরে নির্ভর করিয়া থাকে।

অতঃপর গ্রীকদিগের প্রতি একবার দেখা যাউক। গ্রীকভূমি হিমানীপীড়িত কুরুবর্ষ হইতেও স্বল্প-প্রাণ। যাহারা স্বস্থান পরিত্যাগান্তে বহুদূর অতিক্রম করিতে গিয়া, গ্রীস অপেক্ষা ভীষণতর জাগতিক মূর্ত্তিকে উপহাস করিতে করিতে সমাগত হইয়াছে, তাহাদের নিকট ইনি কি ভয় প্রদর্শন করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন; ইহার প্রাণ স্বল্প,

---

৬। বাঞ্ছারাম বাবুকে ইহার আভাস দেওয়ার জন্য অপেক্ষাকৃত বহু আধুনিক গ্রন্থ নৈষধ হইতে একটি রাজপ্রতাপ যশবর্ণনার শ্লোক যথেষ্ট বোধে উঠাইয়া দিলাম।

তাদৃগ্দীর্ঘবিরিঞ্চিবাসরবিধৌ জানামি যৎকর্ত্তৃতাং,
শঙ্কে যৎপ্রতিবিম্বমম্বুধিপয়ঃ পূরোদরে বাড়বঃ।
ব্যোমব্যাপিবিপক্ষরাজকযশস্তারাঃ পরাভাবুকঃ,
কাসামস্য ন স প্রতাপতপনঃ পারঞ্জিরাং গাহতে॥—নৈষধ ১২।১১।

বোধ করি আর কোন দেশের কাব্যে এরূপ অদ্ভুত রূপক-উপমা দেখাইতে সমর্থ হইবে না।

শক্তিও স্বল্প। দর্শনসম্পন্ন-দৃঢ়তাযুক্ত মানবচিত্তকে মোহাভিভূত করিয়া, নিয়ত ভয়বিস্ময়ের অধীন রাখা ইহার কার্য্য নহে। ভারতে যেমন জাগতিক মূর্ত্তিদর্শনে মানবচিত্ত, বাহ্যজগতের নিকট আত্মপরাধীনতা স্বীকার করিয়া দাসবৎ রহিল; গ্রীকেরা তেমনি জাগতিক মূর্ত্তির ভীষণতার অভাবে সাহস লাভ করিয়া, তদধীনতা সত্ত্বেও তাহার উপর প্রভুর ন্যায় কার্য্য করিতে লাগিল। গ্রীসে জাগতিক মূর্ত্তি উর্দ্ধ অধে সামান্য প্রাপ্ত। সুতরাং তাহার অসামান্য ভাবেত কখনই নহে, যদিও বা তাহার অপরিচিততায় তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া ক্ষণমাত্র বিস্মিত হইয়াছিল; কিন্তু পরক্ষণেই কিক্রসের উপন্যাসস্থ ভেককুল যেমন জুপিতুরের নিকট যাচ্ঞা করায় তৎকর্ত্তৃক একখণ্ড কাষ্ঠদণ্ড তাহাদিগকে রাজা স্বরূপ প্রদত্ত হইলে, ভেকগণ তদাগমনে কিয়ৎক্ষণ ভীত, কিন্তু পরক্ষণেই যেমন সেই ভয়ের অপনয়নে, রাজার উপর আরোহণ পূর্ব্বক টিটিকার-নৃত্য এবং তাহাতে মলমূত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক, দেবতার নিকট আর একটি রাজার প্রার্থনা করিয়াছিল; গ্রীকেরাও তদ্রূপ সেই ভয়ের কারণ সকলের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, সদর্পে বাহ্যজগতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—"তোমার আর কি বিভীষিকা আছে উপস্থিত কর, ইহাতে কিছুই হইল না। পূর্ব্বে যে কিছু একটু ভয় ছিল, তোমার নিকট পর্য্যন্ত আসিতে বহু বিভীষিকা দৃষ্টে, বহু বিভীষিকা অতিক্রমে তাহা অভ্যস্ত হইয়া তিরোহিত হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে তোমার একটু ভয় প্রদর্শনে মন্দ লাগিল না, নির্ভয়তা আরও বাড়িল। তুমি ভাবিয়াছ, আমাদের জীবনোপায় পদার্থ সমস্ত লুকাইয়া রাখিবে, তাহা পারিবে না; তোমাকে চিনিয়াছি, আমরা তাহা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিব।"

এক্ষণে ভারত চরিত্রের ন্যায় গ্রীক চরিত্র বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে সাহস, অহঙ্কার, এবং ধারণার সৌম্যভাব ইহাদের চরিত্রের ভিত্তিস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। ইহাদের প্রতিপ্রসবে সাহস হইতে পৌরুষভাব, অহঙ্কার হইতে অধ্যবসায় এবং সৌম্যধারণা হইতে সংসাররতি। পুনশ্চ পৌরুষভাব হইতে নির্ম্মায়িকতা, অধ্যবসায় হইতে সুখানুসরণ, এবং সংসাররতি হইতে সামাজিকতা। ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইহাদের সকলের মধ্য দিয়া গ্রন্থনসূত্র স্বরূপে কল্পনান্যূন অপক্ষ মানুষী বুদ্ধি সর্ব্বত্র পরিচালিত। এই মানুষী বুদ্ধি প্রত্যেকের এবং সকল গুণেরই সহ সংযোজিত; এই নিমিত্ত গ্রীকদিগের কোন বিষয়েই কল্পনার প্রাধান্যে যে বাড়াবাড়ি তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং দর্শকদৃষ্টে সকলেই যেন যুক্তিযুক্ত মানুষী ভাবে প্রতীয়মান হয়। এমন কি ইহাদের দেবতারা পর্য্যন্ত সাধারণ মনুষ্যের ন্যায়; এবং দেবকার্য্য সমস্ত সাধারণ মানবীয় কার্য্যের অনুরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

এক্ষণে পুনরুক্তিস্বরূপে আমার একটি কথা বলা কর্ত্তব্য। যেন এরূপ বিবেচিত না হয় যে, কেবল একমাত্র উপনিবেশিত স্থানের জাগতিক মূর্ত্তিই এই এই জাতীয় প্রকৃতির নির্ম্মাণ পক্ষে কারণ স্থলীয় হইয়াছে। সে কথা কিয়ৎপরিমাণে খাটিতে পারিত, যদি এ উভয়জাতি তাহাদের সেই স্ব স্ব উপনিবেশিত দেশেই সৃষ্ট এবং বর্দ্ধিত উভয়ই হইতেন। কিন্তু তাহা নহে। ইঁহারা সৃষ্ট হইয়াছিলেন এক জায়গায়, বর্দ্ধিত হইতে আসিলেন আর এক জায়গায়। আসিবার পূর্ব্বেও যে ইহাঁরা পশুবৎ অজ্ঞানান্ধ ছিলেন, তাহা নহে; তখনও ইহারা পারিবারিক সম্বন্ধ স্থাপন, পুর নগর গৃহ নৌকাদি নির্ম্মাণ, ধাতু ব্যবহার, হল চালন, রাজশাসনাদি স্থাপন বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তাহার পর পূর্ব্বস্থান পরিত্যাগান্তে উপনিবেশিত স্থানাভিমুখে আসিবার সময়েও, ইহাঁদের বহুতর কারণের ঘাতপ্রতিঘাত ও বহুতর জাগতিক মূর্ত্তির আকর্ষণী শক্তির মধ্য দিয়া গতি করিতে হইয়াছিল; অথবা তাহাই বা বলিতেছি কি জন্য? এই বিশ্বের যাবতীয় পদার্থই যখন অনন্তভাবময়ী, এবং কার্য্যকারণসম্বন্ধপরম্পরা যখন কি পূর্ব্ব কি পর উভয়মুখেই অনন্ত, তখন যে আমার এই আলোচিত বিষয়ের একটি ব্যতীত আরও কারণ ছিল তাহা বুঝাইতে যাওয়া অধিক বাক্যব্যয় মাত্র। আমরা স্থূলদর্শী মানব, সূক্ষ্মকারণপরম্পরা সমগ্র একধা অনুভব ও তাহার ব্যক্তিকরণ শক্তি আমাদিগের তাদৃক নাই। এ নিমিত্ত আমরা স্থূল কারণেরই পক্ষপাতী হইয়া থাকি, এবং এখানেও সেই স্থূল কারণের মাত্র অনুসরণ করা গিয়াছে। পুনশ্চ স্থূল কারণের পার্শ্ববর্ত্তী

সহযোগী সূক্ষ্মকারণ সকল যেমন সহজে বর্ণনার বিষয় হয় না এবং । অচিন্তনীয় হইয়া উঠে; স্থূলকারণের গর্ভেও তেমনি আবার তদ্রূপ সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম কারণ সমূহ নিহিত রহিয়া থাকে, এবং তাহাদিগের বর্ণনীয়তা প্রভৃতি সম্বন্ধেও অবিকল তদ্রূপ বলা যাইতে পারে। সেই সকল কারণ তর্ক বা বর্ণনার বিষয়ীভূত তত নহে, যত ভক্তিসংযুত অনুভব-শক্তির বিষয়ীভূত হয়। বাপু বাঞ্ছারাম, সেরূপ অনুভব-শক্তির পরিচালনে রাজি আছ কি?

উপরে যাহা আলোচনা করিয়া আসিলাম, তদ্দ্বারা এক্ষণে কথঞ্চিৎ লক্ষিত হইতেছে যে গ্রীক এবং হিন্দু, এতদুভয় জাতির চিত্তবেগ, পূর্ব্বে যাহা একই দিকে প্রবাহিত হইত, এখানে তাহা যথাপ্রারব্ধ কর্ম্মসূত্র-বিচালিত হইয়া দ্বিধাভাবে বিপরীতদিগ্‌গামী হইতে লাগিল।* এইরূপে

---

*। জাগতিক মূর্ত্তি অনুসারে জাতীয় প্রকৃতি নির্ম্মাণ বিষয়ে, প্রয়োজন (necessity) ও যদৃচ্ছিক্য ভাবের (chance) দাসানুদাস বকল নামা জনৈক ইংলণ্ডীয় বচনবাগীশ আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। এতদর্থে প্রধানতঃ, তৎপ্রণীত History of Civilisation নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য। নিয়ামক এবং প্রবর্ত্তক ইত্যাদি কারণ পরম্পরার সঙক্তি অনুসন্ধান ইহার ততটা উদ্দেশ্য নহে, যতটা বচন পসরার উদ্‌ঘাটন, পোষিত মতের সংস্থাপন, নিজপাণ্ডিত্য প্রকটন, এবং বহুপুস্তকের সহ নিজ পরিচয় জ্ঞাপন উদ্দেশ্য। সামান্য কথা যাহা সকলে জানে, তাহার প্রমাণস্থলেও বহুতর গ্রন্থের উল্লেখ। দক্ষিণ আমেরিকার পেরুদেশ ভূমিকম্পের জ্বালায় চিরকালই অস্থির, কিন্তু দেখ একবার তাহার প্রমাণ কত! (History of Civilisation vol. I, note 190)। কিন্তু নাস্তিক-চূড়ামণি এই উদরদাসের গ্রন্থের বঙ্গসন্তান মহলে বড় প্রতিপত্তি। এমন কি, যদি এই গ্রন্থ এবং সঙ্গে সঙ্গে টড সাহেবের রাজস্থান খানি না থাকিত, তাহা হইলে বঙ্গের অর্দ্ধেক সাময়িক পত্রিকা আজি পর্য্যন্ত মাতৃগর্ভে থাকিত, এবং অর্দ্ধেকেরও অধিক সাহিত্যসিংহদের জন্মানরই আবশ্যক হইত না। জ্ঞাত অজ্ঞাত তরবতর ভাষায় তরবতর পুস্তক হইতে হয়, আবশ্যকে এবং অনাবশ্যকে রাশি রাশি অসংলগ্ন, প্রমাণ প্রয়োগ ইত্যাদি পক্ষেও বঙ্গসন্তানের শিক্ষা বোধ করি এই বকল সাহেবের কল্যাণে। বকল সাহেব যদি কিছু দিনের জন্য ভারতীয় মাজিষ্ট্রেট অথবা হাইকোর্টের আধুনিক জজ হইতেন, তাহা হইলে একটু ভাল হইত।

কর্ম্মসূত্রবশে, নবনব কর্ম্মক্ষেত্রে, বিভিন্ন জাতীয় প্রকৃতির সূত্রপাত হইল। অতঃপর সেই জাতীয় প্রকৃতির পরিপোষণ পদার্থ কি কি, দ্বিতীয় প্রস্তাবে তাহা যথাযথ আলোচ্য।

ইতি প্রথম প্রস্তাব।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

মাতৃভূমি।

পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ দ্বারা ইহা স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, উত্তরকুরু হইতে যে যে জাতি বহির্গত হইয়া, বিভিন্ন দেশে আগমন পূর্ব্বক উপনিবেশ স্থাপন করিয়া, কালে ঐতিহাসিক গণনায় পরিগণিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে হিন্দু, গ্রীক এবং রোমক, এই তিন জাতির মধ্যে রোমকেরা সর্ব্বপ্রথমে আদিস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ইতালি ভূমিতে উপনিবেশ স্থাপন করে। তৎপরে গ্রীকেরা বহির্গত হয়। এবং সর্ব্বশেষে, রোমক এবং গ্রীকদিগের স্থানান্তর হওনের কিছুকাল পরে, ভাবী হিন্দুজাতিদিগের পিতৃপুরুষেরা ইরাণীদিগকে সঙ্গে লইয়া আদি স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ভারতে আগত হইয়া, পঞ্চনদের ধারে এবং স্বরস্বতী-তটে বাসস্থান নিরূপণ করিয়া জাতীয় গৌরব বিস্তারে রত হইয়াছিল। পুরাতত্ত্ববিৎদিগের এই সিদ্ধান্ত মত গ্রীকেরা গন্তব্য স্থানে অগ্রে উপস্থিত হইলেও, পরে আগত হিন্দুদিগের আঢ্যতা এবং সভ্যতা কি কারণে গ্রীকদিগের অপেক্ষা বহুপূর্ব্বে উদয় হইয়াছিল, এবং পরিণামে কেনই বা পরে উদিত গ্রীক সভ্যতা, হিন্দু সভ্যতাকে বহুল বিষয়ে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়; আবার গ্রীকসভ্যতাই বা কেন বহুল বিষয়ে হিন্দুসভ্যতার কখনই সমকক্ষতায় উঠিতে পারে নাই; এবং জাতীয় প্রকৃতির কিরূপ কিরূপ পরিপোষণ ও সম্প্রসারণে তদ্রূপ সংঘটিত হয়, তাহাই এ প্রস্তাবে যথাযথ আলোচ্য।

* এস্থলে কারণ দ্বিবিধ, এক ব্যবহারিক, অপর গৌণ। বিভিন্ন ব্যক্তি বা জাতি সহ সংস্রব হেতু, আচার ব্যবহারের বিনিময়ে, কৌলিক আচার ব্যবহারের বিকার বা পরিবর্ত্তনাদি সংঘটিত সুতরাং রূপান্তর প্রাপ্তি হয়;—এরূপ কারণকেই আমরা এস্থলে ব্যবহারিক শব্দে নির্দ্দেশ করিতেছি। অপর জমির গুণাগুণ, জলবায়ু ও আহারীয় নির্ব্বাচন আদিকে গৌণ কারণস্থলে ধরা যাইতেছে।

পৃথিবী মনুষ্যনিবাস হওয়া অবধি কথিত ব্যবহারিক কারণের কার্য্য নিরন্তর হইয়া গিয়াছে, হইতেছে এবং হইতেও থাকিবে। মানবের সভ্যাবস্থায় যেমন ভিন্ন ভিন্ন জাতিসহ সংস্রবের কারণ অসংখ্য; জাতি হইতে জাত্যন্তর গৃহীত বিষয়ের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার উপায়ও তেমনি সভ্য জাতির মধ্যে অসংখ্য রহিয়াছে; কিন্তু তথাপি দেখা যাইতেছে যে কত শত বিভিন্ন বিভিন্ন গৃহীত বিষয়ের জাত্যন্তর বোধ একেবারে বিদূরিত হইবায়, তাহা জাতীয় বিষয় রূপে পরিগণিত হইয়া যায়। অসভ্য, অর্দ্ধসভ্য, অথবা প্রাথমিক জাতিদিগের মধ্যে, জাত্যন্তর হইতে গৃহীত বিষয়ের স্বাতন্ত্র্যরক্ষার নিমিত্ত, সেরূপ উপায় সমূহের অস্তিত্ব অতি অল্প; সুতরাং সেরূপ স্থলে, বিভিন্ন জাতীয় সংস্রবে গৃহীত বা বিনিময়লব্ধ বিষয়, প্রায় সমগ্রতই যে একেবারে স্বজাতীয় বস্তুপদে অধিরূঢ় হইয়া যাইবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

অবনীতে সভ্যতা-সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে, সভ্যতার আনুষঙ্গিক যে সকল জাতীয় সংস্রবের কারণ, সে সমুদয় যদিও বর্ত্তমান ছিলনা, তথাপি জাতীয় সংস্রব অন্যান্য উপায় দ্বারা সমাধা হইত। সভ্যতা সময়ে মানব আশ্রমী হইয়া একস্থানে বাস করিয়া থাকে, কেবল কার্য্যব্যপদেশে কোন নিয়মিত সময়ের জন্য স্থানান্তরিত হয়, এবং সেই সময়েই উক্তরূপ নানা কারণ তাড়নায় যাহা কিছু বিজাতীয় সংস্রব ঘটিয়া থাকে। কিন্তু অসভ্যাবস্থার নিয়ম অন্যরূপ। অসভ্যাবস্থায় মানব নিরাশ্রমী, পশুপালন বা মৃগয়ামাত্রজীবিকা; যথায় যথায় তাহার সুবিধা, তথায় অনবরত বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিয়া ফিরিতেছে। যে স্থান হইতে প্রথম যাত্রা করিল, হয়ত আর কখনও সেই স্থানে পুনরাগমন করিবে না;

এবং এ গমন যে কোথায় গিয়া নিবৃত্তি হইবে, নিবৃত্তি হইবার পূর্ব্বে কত কত স্থান পদতলগত হইয়া যাইবে, তাহা কে বলিতে পারে? বোধ করি এক অদৃষ্ট ভিন্ন আর কেহই বলিতে পারে না। এই স্থান-পরিবর্ত্তন সময়ে পথিমধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জাতি সহ সংস্রব ঘটিয়া থাকে। যেখানে যেখানে ঘাস, জল বা মৃগ প্রচুর দেখিল, সেই থানেই অদৃষ্টপূর্ব্ব অপরিচিত বহুতর জাতির, একই উদ্দেশ্যযুত ভ্রমণাবর্ত্তন হেতু, একত্র সমাবেশ সাধন হইল। সেই সময়েই ও সেই দিন কয়েকের জন্য সংস্রবে, সংমিলিত জাতি সমূহের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের আচার ব্যবহার গ্রহণ প্রভৃতি ও অপরাপর বিনিময় কার্য্যাদি সমাধা হয়। আবার যখন সে স্থানের বাস ফুরাইল, তখন সর্ব্বসম্বন্ধবিরহিত হইয়া যে যাহার গন্তব্যপথে প্রস্থান করিল; হয়ত ইহকালের মত আর কখনও পুনর্ম্মিলন হইবে না। কাল গত হইল, জাতীয় সংস্রব বিস্মৃতি-সাগরে ডুবিল,—কিন্তু বিনিময়াদি লব্ধ বিষয় সমূহ যাহা, তাহা অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়া, স্থায়ীভাবে জাতীয় সম্পত্তির পদে অধিষ্ঠিত হইয়া রহিল।

সভ্য সময়েতেও যে ব্যবহারিক কারণ কিরূপ দুর্দ্দমনীয় ও গূঢ়ভাবে কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইব। সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্র এক অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এবং কৌতুকাবহ উপন্যাসে পরিপূর্ণ। এই নিমিত্ত ইহা অতি প্রাচীন কাল হইতেই জনসমাজে সর্ব্বদা সমাদৃত। বিশেষ কোন জাতীয় সংস্রব সূত্রে পারশ্যরাজ খস্রু নওসেরোয়া ইহার সুখ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া ৫৭০ খৃষ্টাব্দে পহ্লবী অর্থাৎ তাৎকালিকী পারশ্য ভাষায় ইহার অনুবাদ করাইয়াছিলেন। পরে পারশ্য যখন মহম্মদশিষ্যগণের দ্বারা অধিকৃত হয়,সেই সময়ে আরবী ভাষা মুসলমানদিগের প্রচলিত ভাষা হওয়ায়, ৭৬০ খৃষ্টাব্দে আলম কাফা নামে একজন আরব উহা আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। আলম কাফার আরবী অনুবাদ হইতে, সিমি-ওন নামক এক ব্যক্তি দ্বারা খৃষ্টের একাদশ শতাব্দীতে গ্রীকভাষায় অনু-বাদিত হয়। ঐ গ্রীকের আবার লাটিন অনুবাদ ১৫৯৭ শকে প্রকাশিত হয়। পুনশ্চ অন্যদিকে আরবী অনুবাদ হইতে রাবি জোয়েল ঐ পুস্তকের

অনুবাদ করেন। ১২৯৭ শকের লাটিন অনুবাদ ক্রমে বিস্মৃতি-পতিত হইয়া যায়। তদনন্তর রাবি জোয়েলের হিব্রু অনুবাদ হইতে, এক অভূতপূর্ব্ব নূতন পুস্তক জ্ঞানে, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রায় ইউরোপীয় ভাষায় নীত হইয়া সমস্ত ইউরোপে বিস্তৃত হয়। এ যাবৎ ইউরোপ ভূমে লোকের বিশ্বাস এই দৃঢ়রূপে ছিল যে, ঐ সকল উপন্যাস সমূহ হিব্রুজাতির জাতীয় সম্পত্তি। এদিকে আবার পঞ্চদশ শতাব্দীতে আরবী অনুবাদ হইতে হুসেন বেগ নামক জনৈক পারশ্য দেশীয় লেখক, পারশ্য ভাষায় অনুবাদ, ও নানাবিধ নব অলঙ্কার দানে তাহাদের নূতনত্ব সম্পাদন পূর্ব্বক, অন্যান্য গল্পের সহ সমাবেশ করিয়া, আনোয়ার সোহেলি নামে প্রকাশ করেন। উহা সপ্তদশ শতাব্দীতে সৈয়দ দাযুদ ইস্পাহানী কর্ত্তৃক ফরাশী ভাষায় নীত হইয়া, নূতন আকারে পিল্পেকৃত (Fables of Pilpay) গল্পাবলী নামে প্রচার হয়। তাহার পর মনুষ্যমনে গবেষণাবৃত্তির কার্য্যবশে অনুসন্ধানের আরম্ভ হইয়া স্থিরীকৃত হয় যে, এত গোলযোগের মূল সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্র মাত্র। এপর্য্যন্ত উহাকে অনেকেই আপন আপন জাতীয় সম্পত্তি বলিয়া ভাবিয়াছে, এবং ক্রমাগত বহুকাল ধরিয়া হস্তান্তর হইতে থাকায় আকার পরিবর্ত্তনও এত হইয়াছিল যে সহজে মূলের সহ উহার সম্বন্ধ স্থাপন করিতে শঙ্কা হইত।

অতএব যখন ঐতিহাসিক এবং সভ্যতালোকময় সময়ে একখানি লিখিত গ্রন্থ সম্বন্ধে এরূপ ঘটিয়া থাকে, তখন সেই দূরগত আদিম সময়ে এবং অলিখিত কালের অলিখিত বিশেষ লোকব্যবহারাদি বিষয়ে কতই কি না হইয়া গিয়াছে; তখন কত আপন বস্তু পরের, ও পরের কত বস্তু আপন হইয়াছে তাহা কে বলিতে পারে? গ্রীকদিগেরও সেই আদিম কাল, এবং হিন্দুদিগেরও সেই আদিম কাল। পুরাতত্ত্ববিদেরা প্রমাণ সহ কহেন যে গ্রীকেরা পিতৃস্থান পরিত্যাগ করিয়া যেমন হিন্দুদিগের বহুপূর্ব্বে বাহির হইয়াছিল, গ্রীকভূমেও যে তেমনি ইহারা ভারতীয়দিগের ভারতে আগমনের বহুপূর্ব্বে গিয়া পৌছায় এরূপ বোধ হয় না; প্রায়ই সমকালে অথবা অল্প ইতর বিশেষে আগুপাছু হইয়া পৌছায়। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত

হইতেছে যে স্বস্থান ত্যাগানন্তর গন্তব্য স্থানে আসিতে, হিন্দু দিগের অপেক্ষা গ্রীকদিগকে অনেক ভ্রমণ-ঘূর্ণাবর্ত্তনে বিঘূর্ণিত হইতে হইয়াছিল। পুনশ্চ গন্তব্য স্থানে আসিতে হিন্দুদিগকে যে পরিমাণে পথ বাহন করিয়া আসিতে হইয় ছিল, তাহাবে সঙ্গে তুলনা করিলে গ্রীকেব পথ অসীম ও অপাব অবস্থাসঙ্কুল বলিতে হয়। তাহাব পর হিন্দুরা যে পথে গিয়াছিলেন, সে পথে নিবাশ্রমী জাতির চলাচল ভাগ অতি বিবল; কিন্তু গ্রীকেবা যে পথে গিয়াছিল, তাহা আবহমান কাল হইতে বহুতর নিবাশ্রমী জাতিব নিত্য পথ। সুতরাং দীর্ঘকাল ধবিয়া দূবতর পথ বাহিতে এবং পথিমধ্যে বহুতর জাতীয় সংস্রবে আসিবায়, গ্রীকদিগেব যে বহুল পরিমাণে পৈতৃক আচাব ব্যবহাবেব লোপ, কিয়দংশেব বা বিকাব, ও কিয়দংশেব স্থানে যে কতকগুলি নূতন বিষয়েব অধিষ্ঠান হইবে, ও সেই সকল হইতে হিন্দুদিগেব অপেক্ষা যে গ্রীকদিগের মধ্যে বহুপরিমাণে পৃথকত্ব জন্মিবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? তাহাব পব, সঙ্গগুণে উন্নত ভাবও অবনত হয এবং অবনত ভাবও উন্নত হয়। গ্রীকদিগেব সংস্রবে আগত জাতিরা সর্ব্বাংশে গ্রীকদিগের অপেক্ষা হেয় ভিন্ন উন্নত ছিল না, সুতবাং তাহাদেব সংস্রবে গ্রীকদিগের উন্নতি না হইয়া অপকর্ষতাই প্রাপ্ত হইবাব কথা। এইরূপ অপকর্ষ প্রাপ্তিকেও, হিন্দুদিগের অপেক্ষা গ্রীক সভ্যতাব পবে উদয় পক্ষে, একটি অন্যতম এবং প্রধান কারণ স্বরূপে নির্দ্দেশ কবা যাইতে পাবে। একে পিতৃস্থান পরিত্যাগ সময়ে হিন্দুব অপেক্ষা ইহারা কম পরিমাণে উৎকর্ষভাব প্রাপ্ত হয়, তাহাব উপর জাতীয় সংস্রব হেতু এই অপকর্ষেব চাপাচাপি, সুতরাং কেন ইহাদেব জাতীয় উৎকর্ষ হিন্দুদিগেব অপেক্ষা মন্থবগতি না হইবে? হিন্দুদিগেব পথবাহনও অতি অল্প, পথবাহন কালীন বিভিন্ন জাতীয় সংস্রব যাহা ঘটিয়াছিল তাহাও অতি সামান্য, এই জন্য পৈতৃক আচার ব্যবহাব হইতে ইহাদেব পবিবর্ত্তনভাগও অতি অল্প। পুবাতত্ত্ববিৎগণের বিশ্বাস এরূপ যে আদিম আর্য্যদিগের যাহা কিছু রীতি নীতি ছিল, তাহাব প্রকৃত আভাষ কেবল একমাত্র প্রাচীন হিন্দুচরিত্রেই পাওয়া যায়।

অতঃপব গৌণ কাবণেব বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা কবা যাউক।

...রিক কারণ যেমন গন্তব্যস্থানে আগমনের পূর্ব্ব হইতেই কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে; গৌণ কারণ তাহা নহে। তাহার কার্য্য প্রায় সর্ব্বতোভাবে গন্তব্য স্থানে উপনীত হওয়ার পর হইতেই আরম্ভ হয়।

বিজ্ঞানবিদেরা অনেক মস্তিষ্ক চালনা দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন যে, মানবের সামান্যতর বৃত্তি সমুদায় যতদিন স্বচ্ছন্দতার সহিত পরিতৃপ্ত না হয়, ততদিন তন্নিমিত্ত ব্যস্ততা বশতঃ মানবগণ অন্যবিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে অপারগ হইয়া থাকে। হিন্দুরা এই অপারগতা হইতে প্রায় ভারতে আগমনের দিন হইতেই বোধ হয় নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন। ভারতের যে স্থানে যাও তথায়ই স্বচ্ছসলিলা নদীসকল প্রবাহিত; বর্ষাগমে পল্লল দ্বারা সন্নিকটস্থ ভূমি সমস্তকে উর্ব্বরা করিতে পটু। স্বভাবত ভূমি সর্ব্বত্র এরূপ অনুকূলা যে অতি অযত্নপূর্ব্বক একমুষ্টি বীজ ছড়াইলেও অল্পদিনে তাহার ফললাভ করিতে সমর্থ হওয়া যায়; এবং হয়ত আবার সে প্রাচীন কালে ভূমি অক্ষুণ্ণ থাকাতে অনেক স্থানে শস্য যদৃচ্ছা উৎপন্ন এবং বিকীর্ণ হইয়া থাকিত। যেখানে যাও, কানন সকল যতই ভীষণদর্শন হউক, বৃক্ষাবলী পরিপক্ক সুস্বাদ ফলভরে সর্ব্বত্রই অবনত হইয়া রহিয়াছে। পর্ব্বত সকলও সর্ব্বত্র ফল রস প্রদান করিয়া পথিকের ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিয়া থাকে। •অথবা সংক্ষেপে আকবরের রাজস্ব সচিব তোড়লমল্লের কথায়, এদেশ এতই সৌভাগ্যশালী যে, বিধাতা ইহার অধিবাসীদিগের নিমিত্ত বৃক্ষের উপরেও দুই দুই রুটি ও এক পেয়ালা জল রাখিয়াদিয়াছেন। হিমাদ্রি এবং সন্নিকটস্থ পর্ব্বত সমূহ রত্নাধার, ইচ্ছা করিলেই তাহা হইতে নানা রত্ন উত্তোলিত ও ব্যবহৃত হইতে পারে। যে দেশের এমন অবস্থা, সেখানকার অধিবাসীর আর সামান্য-বৃত্তি-পরিতৃপ্তি-বিষয়িণী চিন্তা কোথায়? ইহার ফল, হিত অহিত, উভয়ই আছে।

মনুষ্যের স্বভাব এই যে সমবেতসাধ্য কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, আজ্ঞাদাতা এবং আজ্ঞাপ্রতিপালক, এতদুভয় পর্য্যায় সংস্থাপন না করিলে সে কার্য্য আরম্ভ এবং সাধন করিতে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া থাকে, হয় ত অন্তে একবারেই অসমর্থ হইয়া পড়ে। কোন নূতন সমাজ সংস্থাপন করিতে হইলেও, এই নিয়ম অভিনীত হইয়া থাকে। যাহারা

অপেক্ষাকৃত গুণসম্পন্ন, তাহারা পর্য্যায়ভেদে নেতার পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং যাহারা অল্পগুণসম্পন্ন তাহারা নীত হয়। নেতৃগণ বুদ্ধি, কৌশল বা বল, যথাসম্ভব পরিচালন দ্বারা, নীত ব্যক্তিগণকে আপদ বিপদ হইতে রক্ষণ, এবং তাহাদের স্বস্থানে সংস্থিতি সাধন করিয়া থাকে। নীতগণও কৃতজ্ঞতাবশে এবং প্রাপ্ত উপকারের বিনিময় স্বরূপে সৌভাগ্যের অংশ, নেতাদিগের উচ্চ নীচ পর্য্যায় অনুসারে তাহাদিগকে প্রদান করিয়া থাকে। এই নিয়ম হইতে সময় সহযোগে নেতৃগণ ক্রমে রাজা, রাজপারিষদ, ভূম্যধিকারী প্রভৃতি আঢ্য শ্রেণীতে স্থাপিত হয়। এই শ্রেণীস্থের সংখ্যা স্বভাবতঃ এবং কার্য্যগতিকে অল্প। অপরাপর ব্যক্তিগণকে কালে উহাদের আঢ্যতা বশে, ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক, উহাদের আজ্ঞাকারী হইতে হয়। সুতরাং নিম্নশ্রেণীস্থবর্গের আজ্ঞাধীনতা অবস্থা হেতু, কালে কালে আঢ্যেরা স্বার্থবশবর্ত্তিতায় তাহাদিগকে খাটাইয়া, আপনাদের পূর্ব্ব হইতে পুষ্ট সৌভাগ্য, আরও পুষ্ট করিয়া লইতে ক্ষমবান হয়। কিন্তু এখনও, এ আদিম অবস্থাতেও, লোক দাসবৎ আজ্ঞাকারী, বা উচ্চ এবং অধমের মধ্যে অপরিমিত ব্যবধান স্থাপন, এ সকল ঘটিয়া উঠে না। অধম শ্রেণী এখনও, অপরের জন্য না খাটিলেও, আপন ভাগ্যমাত্রে নির্ভর করিয়া স্বচ্ছন্দে স্বচ্ছলতার সহিত সময় অতিবাহিত করিতে সমর্থ হয়। এবং উচ্চশ্রেণীও ইহাদিগকে কার্য্যে নিয়োজিত করিতে হইলে, উহাদের উপর হেয়ভাব ও অনাদর প্রদর্শনে কার্য্যসিদ্ধি করিয়া লইতে সমর্থ হয় না।

কিন্তু অতঃপর এই যে অবস্থা বৈষম্য—তাহার যথাভাবে স্থিতি বা তাহার বৃদ্ধি বা হ্রাসতা; দেশের শীতাতপ, উর্ব্বরতা বা অনুর্ব্বরতা গুণের উপর বহুলাংশে নির্ভর করিয়া থাকে। যথা প্রকৃতি শরীর সঞ্চালন এবং শারীরিক কার্য্যসাধনোপযুক্ত শরীরজ তাপরাশি, পার্শ্বস্থ বায়ুরাশির সংস্পর্শে, তাহার শৈত্য বা উষ্ণতা অনুসারে, হ্রাস বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শৈত্যে যথায় তাপের হ্রাস হয়, তথায় তাপের সমতা রক্ষার্থে, ক্ষতিপূরণ জন্য মাংস, মাদক বা তৈলাক্ত দ্রব্য, আহারার্থে প্রয়োজন হয়; এবং পরিশ্রম দ্বারা শরীর সঞ্চালন ও বস্ত্রাদি দ্বারা বায়ুমণ্ডলস্থ শৈত্য হইতে সর্ব্বদা শরীর রক্ষার আবশ্যকতা হইয়া থাকে। আর যথায়

হেতু তাপের বৃদ্ধি হয়, তথায় তদ্রূপ আহারের অপ্রয়োজন, কারণ ফল মূল শস্য প্রভৃতি অল্পায়াসলভ্য দ্রব্যই প্রচুর বলিয়া গণ্য হয়। শ্রম দ্বারা তাপবৃদ্ধির অনাবশ্যক। অনুপার্জ্জিত তাপেই অলসতা বৃদ্ধি হওয়ায়, পরিশ্রম করিতে মানবচিত্ত প্রবৃত্তিশূন্য হয়। পরন্তু শরীরে কোন প্রকার আবরণেরও অনাবশ্যক। গ্রীষ্মপ্রধান দেশ প্রায়ই সজল এবং উর্ব্বরা। কিন্তু যদি জলশূন্য অনুর্ব্বরা হয়, তাহা হইলে আবার সজল ও উর্ব্বরা উষ্ণদেশ, এবং নির্জ্জল ও অনুর্ব্বরা উষ্ণদেশের মধ্যে প্রভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। প্রথমোক্ত দেশের বায়ু সজল ও উত্তপ্ত এবং উর্ব্বরা ; শেষোক্ত দেশের বায়ুও উষ্ণ বটে, কিন্তু শুষ্ক, এবং দেশে জলশূন্যতা হেতু ভূমি অনুর্ব্বরা। এই নিমিত্ত শেষোক্ত দেশের লোকেরা দুষ্প্রাপ্য আহারীয়ের নিমিত্ত বাধ্য হইয়া শ্রম করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহাতে সক্ষমও হইয়া থাকে ; কারণ জলীয় বাষ্পযুক্ত উষ্ণ বায়ুমধ্যে দেহ হইতে তাপ নির্গমন পক্ষে যে প্রতিবন্ধক জন্মে, শুষ্ক উত্তপ্ত বায়ুমধ্যে সে প্রতিবন্ধক জন্মে না বলিয়া, তাহাদের শ্রমজনিত তাপ সহ্য করিতে ক্লেশ বোধ হয় না, এবং এতৎ কারণে ও অবস্থা গুণে প্রথমোক্ত দেশের অধিবাসী অপেক্ষা অধিক পরিশ্রমপ্রিয় ও কষ্টসহ হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত অপেক্ষাকৃত সজল, উর্ব্বরা ও উত্তপ্ত বঙ্গদেশস্থ এবং অপেক্ষাকৃত অনুর্ব্বরা, নির্জ্জল ও প্রায় সম বা অধিক পরিমাণে উত্তপ্ত উত্তর পশ্চিম অঞ্চলস্থ অধিবাসীদিগের মধ্যে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এখানে দেখিতে পাইবে যে, একজন বাঙ্গালী কতদূর অলস, পরিশ্রমকাতর, ভীরু এবং দুর্ব্বল; আর একজন হিন্দুস্থানী কতদূর উদ্যোগী, পরিশ্রমপ্রিয়, সাহসী এবং সবল। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ন্যায় আবার শীতপ্রধান দেশেরও দুইরূপ অবস্থা আছে। যথায় শৈত্যের ভাগ অত্যন্ত অধিক এবং বায়ু সজল, তথায় ভূমি একেবারে অনুর্ব্বরা, এবং আহারীয় অতিশয় দুষ্প্রাপ্য অথচ তাপবৃদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন ; সেখানকার লোকের চিরকাল অতিরিক্ত পরিশ্রম ও দুঃখভোগ করিতে জীবন অতিবাহিত হয়, সুখের দিন ভাগ্যে একদিনও ঘটে না। আর যেখানে শৈত্যভাগ অপেক্ষাকৃত অল্প, এবং বায়ু শুষ্ক, এবং ভূমি অপেক্ষাকৃত উর্ব্বরা, সেখানে লোকে নিয়মিত

পরিশ্রম দ্বারা অভাব পরিপূরণ করিয়া, চিত্তের তৃপ্তি সাধন করিতে এতদুভয়ের মধ্যে প্রথমটির আদর্শস্থল,—লাপলাণ্ড প্রভৃতি উত্তর কেন্দ্র দেশ সমুদায়। আর দ্বিতীয়টির আদর্শস্থল,—পৃথিবীর সমমণ্ডলস্থ দেশ-সমূহ।

যথায় দেশ সজল এবং উত্তপ্ত এবং ভূমি উর্ব্বরা, তথায় কষ্টলভ্য মাংস মাদক বা তৈলাংশ দ্রব্য প্রভৃতি আহারীয় দ্রব্যের অপ্রয়োজন হেতু, মানবেরা অনায়াসলভ্য ফল ফুল শস্যাদি সংগ্রহ দ্বারা ক্ষুৎপিপাসা প্রভৃতি পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ হয়। এবং শৈত্যপ্রধান দেশে তাপবৃদ্ধি করণ জন্য ব্যয়-বাহুল্য এবং কষ্টলভ্য যে সকল গাত্রাবরণের সর্ব্বদা আবশ্যক হয়, এখানে তন্নিমিত্ত তাহাদের সেরূপ ভাবিতে হয় না। এক কথায় অন্ন বস্ত্র যে পরিমাণে আবশ্যক, তাহা অনায়াসেই লাভ হইয়া থাকে। মাল-থুস নামক জনৈক ইংরাজ গ্রন্থকার কর্ত্তৃক লোকতত্ত্ব-নিরূপণ-বিষয়ক পুস্তকে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রেই অন্ন বস্ত্রের স্বচ্ছলতা হইলেই, মানবের বংশ তদিতর অবস্থা অপেক্ষা শীঘ্র শীঘ্র যথাপরিমিত, কখন কখন বা অধিক স্বচ্ছলতা হেতু অপরিমিতভাবে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। একথা নিতান্ত অসত্য নহে। সুতরাং এই মত ধরিতে গেলে, উক্তরূপ প্রকৃতি-বিশিষ্ট উর্ব্বর ও উষ্ণ দেশে অচিরাৎ লোক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই লোকবৃদ্ধিসহকারে এবং মানবের অলসপ্রিয়তা হইতে, আহারীয় বস্তুর অপেক্ষাকৃত দুষ্প্রাপ্যতা উপস্থিত হওয়ায়, বর্ত্তমান অপেক্ষা অধিক উৎপাদনের জন্য সেইরূপ অধিক পরিমাণে শ্রমের আবশ্যক হইয়া থাকে। তাহা হইলে কাজেই শ্রমজীবীর সংখ্যা অধিক হইয়া পড়ে, কাজেই পরিশ্রমের মূল্যও কমিয়া যায়; এবং এই সুযোগে পূর্ব্বার্জ্জিত ধনযুক্ত সৌভাগ্যশালীগণ, অল্পব্যয়ে অধিক শ্রম বিনিময়ে পাইয়া, বহুধন সঞ্চয় বা যথা-অভীপ্সিত কার্য্যকরণে সমর্থ হয়; এবং অন্য দিকে শ্রমশালীরা সেই পরিমাণে নির্ধন, এবং সৌভাগ্যশালীদের পদনত হইয়া আইসে। এই নিমিত্ত এবম্ভূত দেশমধ্যে অতি অল্প দিনেই, উচ্চ ও নিম্নশ্রেণী, স্পষ্টরূপে স্থাপিত এবং তাহাদের মধ্যে অপরিমিত বিষয়বৈষম্য ঘটিয়া উঠে;—সুতরাং সামাজিক উৎকর্ষ বা অপকর্ষের ভাব সর্ব্বজনীন না হইয়া,

একচেটিয়া ভাবে উচ্চশ্রেণীস্থের উপরে অর্পিত হয়। আঢ্য বা উচ্চশ্রেণীরা সম্পত্তিলাভে, আলস্যপ্রিয়তা গুণবিশিষ্ট মনুষ্যদিগের ইতরবৃত্তিসমূহের স্বভাবসুলভ, সুতরাং আশু সুখোৎপাদক, বিলাসবিস্তারে রত হয়; এবং যে বুদ্ধি অন্যাবস্থায় অপরাপর বহুবিধ গুরুতর কার্য্যে ব্যয়িত হইত, এক্ষণে তৎপক্ষে অল্পই ব্যয় করিয়া অধিকাংশ অভিনব বিলাসদ্রব্যের উদ্ভাবন, সৃষ্টি ও তাহার ব্যবহার এবং রক্ষণকার্য্যে, নিয়োজিত করা হয়। তাহার সিদ্ধি পক্ষে লোক সকলও আজ্ঞাকারী থাকায়, দেশমধ্যে অচিরে শিল্প, কারু, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি কার্য্যের প্রাদুর্ভাব এবং প্রাচুর্য্য হওয়ায় অনুগামিনী সভ্যতার প্রকটিত মূর্ত্তিও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু এই সভ্যতা, সমাজের মধ্যে সমাজস্থগণ উচ্চতর ভেদযুক্ত হওয়ায়, সর্ব্বজনীন হইতে পায় না। সুতরাং উহা আভ্যন্তরিক না হইয়া বাহ্যিক-ভাবে অবস্থিতি করিয়া থাকে, এবং যখন ইহার ধ্বংসকাল আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন হয় ত সমাজকে একেবারে উচ্ছেদ প্রাপ্ত হইতে হয়; নয় ত তাহাকে এমন মুমূর্ষাবস্থায় নিক্ষিপ্ত করিয়া গিয়া থাকে যে, তাহাকে পুনর্ব্বার সজীব করিতে বহুযত্ন ও বহুকাল ব্যয়িত হইবার আবশ্যক।

বকল সাহেব লিখিত সভ্যতাবিষয়ক ইতিহাস গ্রন্থে লিখিত আছে[১] যে, এইরূপ ধনবৈষম্য হইতেই মিসর দেশের আদিম সভ্যতার উদ্ভব হয়। ঐ সভ্যতা বাহ্যিক দৃশ্যে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট যাহাই থাকুক, ফলতঃ উহা সর্ব্বজনীন ছিল না। সকল শ্রেণীতে সমভাবে বিকীর্ণ হয় নাই। উচ্চ-শ্রেণীস্থেরা যেমন অপরিমিত-ধনশালী হইয়া বিলাসরত হইয়াছিল; নিম্ন শ্রেণীস্থেরা তেমনি নিঃসম্বল ও দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া, কোনরূপে জীবন অতি-বাহিত করিতে, কালক্ষেপ করিত; এবং সর্ব্বদা আঢ্যগণের পদাবনত থাকিত। এতদূর পদাবনত থাকিত যে আঢ্যেরা যাহা মনে করিতেন, তাহাদের দ্বারা তাহাই সম্পাদন করিয়া লইতেন। মিসরদেশীয় পীরা-মিড প্রভৃতি প্রাচীন কার্য্যসমূহকে তৎপক্ষে সাক্ষ্যস্থল স্বরূপ অনেকে তাহাদিগের নামোল্লেখ করিয়া থাকেন। এই পীরামিড সকল ইউরোপীয়

১ Buckle's History of Civilisation, Vol. 1., P.P. 88-92.

গণনায়, পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য্য কীর্ত্তিমধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। সপ্তাশ্চর্য্যের আর ছয়টির কতকাল হইল ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই সপ্তম আশ্চর্য্য পীরামিডগণ, অচল ও অটলভাবে, বিরাটবেশে, মেঘমুকুটে শিরোভূষিত করিয়া, অদ্যাপি দর্শকের মনে বিস্ময় ও চমৎকারিত্ব যুগপৎ উৎপাদন করিয়া, মিসরীয়দিগের বিগত গৌরব ঘোষণা করিতেছে। কত কাল-স্রোত ইহাদের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি ইহারা সেই একই ভাবে অবস্থান করিতেছে; আবার কত কালস্রোত যে সেইরূপে অতিক্রম করিয়া কত যুগযুগান্ত অবস্থিতি করিবে, তাহা কে বলিতে পারে? এই স্থানে যত পীরামিড আছে,তন্মধ্যে গিজা নগরের পীরামিড, যাহা স্থফি নামক মিসর অধিপতির সমাধি মন্দির বলিয়া নিরূপিত হয়, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ এবং বিস্ময়কর। হিরোদোতস নামক প্রসিদ্ধ গ্রীক ইতিহাসবেত্তার হিসাব অনুসারে, এই পীরামিড নির্ম্মাণ করিতে প্রতিনিয়ত লক্ষাধিক লোক নিয়োজিত ছিল। এবং কুড়ি বৎসরে এই নির্ম্মাণকার্য্য সমাধা হয়। এতদর্থে শ্রমজীবী রক্ষা করিতে ৩৮৪০০০০ টাকা ব্যয় হয়। এবম্ভূত কীর্ত্তি এত স্বল্প ব্যয়ে নির্ম্মাণ, শ্রমজীবীর সংখ্যা অতি সুলভ ও আজ্ঞাকারী না হইলে, সমাপন হইতে পারে না। সাহজাঁহার তাজমহল নির্ম্মাণ করিতে, এরূপ কথিত যে, ৭৫০০০০০ টাকা ব্যয় হয়। মিসর দেশীয় কার্ণাক নগরস্থ প্রাচীন দেব-মন্দিরের ন্যায় আশ্চর্য্য কাণ্ডও বহুশ্রম-সুলভতা ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে না। উহা কিরূপ আশ্চর্য্য কাণ্ড তাহা বর্ণনাতীত। ইহার আয়তন এবং আকৃতি বিস্ময়কর। ইহার একটিমাত্র হল অর্থাৎ দালানের স্তম্ভাবলী দেখিয়া, বিখ্যাত ভ্রমণকারী সাম্পলিওন বিস্ময়সহকারে এরূপ উক্তি করিয়াছিলেন.—"The imaginaton which in Europe rises far above our porticoes, sinks abashed at the foot of the 140 Columns of the hypostyle hall of Kernak" অর্থাৎ যে কল্পনা-শক্তি ইউরোপীয় সুমহান্ অলিন্দস্তম্ভাবলীকেও অতিক্রম করিয়া উর্দ্ধোত্থিত হইয়া থাকে,কার্ণাকনগরস্থ দেবদালানে ১৪০ স্তম্ভাবলীর আকৃতি দৃষ্টে সে কল্পনাও লজ্জাবসন্ন মুখে বিনত হইয়া যায়। ফলতঃ মিসরের শ্রমজীবীরা কিরূপ

দুর্দ্দশাগ্রস্ত ছিল, যদি এ দূরতর সময়েও বহুবিপ্লবে রূপান্তর প্রাপ্ত তাহাদের বংশধরদের দ্বারা কিছুমাত্র প্রতীত হইবার সম্ভব থাকে, তবে মিসরীয় ফেলাদের অবস্থা বারেক পর্য্যালোচনা করিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে। মিসরের সভ্যতা, ধনবত্তা, কীর্ত্তি এবং সামান্য শ্রেণীদিগের দুরবস্থা, যেরূপ যেরূপ কারণ হইতে উপস্থিত হইয়াছিল; ব্যাবিলন সাম্রাজ্যেও তদ্রূপ তদ্রূপ কারণের অস্তিত্ব থাকায়, তদ্রূপ তদ্রূপ ফল ফলিয়াছিল। বাইবেল গ্রন্থোক্ত ব্যাবিলনের ধনবত্তা, সামান্য শ্রেণীর উপর অত্যাচার, ব্যাবিলনপতির ঐশ্বর্য্য, মিডদেশীয়া অমিতা নাম্নী ব্যাবিলন রাজমহিষীর সন্তোষার্থে মনোহর অট্টালিকা এবং গগনোদ্যান প্রভৃতি তাহার পরিচয়স্থল।

ভারতবর্ষের প্রকৃতি বহুবিধ বিভিন্নাকারের ও বিভিন্ন স্বভাবের বটে, কিন্তু যে বিষয়টি লইয়া এস্থানে আলোচনা করা যাইতেছে, কেবল তৎসম্বন্ধে,সমগ্র ধরিতে গেলে, মিসর যে শ্রেণীতে, ভারতকেও সেই শ্রেণীতে গণনা করা যায়। ইহাও উত্তপ্ত ও সজল, এবং অধিকন্তু ইহা অন্যান্য দেশাপেক্ষা অধিকতর উর্ব্বরতা-গুণ-সম্পন্ন। আহারীয় দ্রব্যের অভাব নাই; এজন্য অতি অল্পদিনে ধনসঞ্চয়, নিম্নশ্রেণীর অবস্থা পূর্ব্বকথিত নিয়মানুসারে আরও নিম্নতর, এবং উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ধনবৈষম্যও বিপুলভাবে জন্মিয়াছিল। আর্য্যেরা আপন অভীষ্ট পরিপূরণার্থে, আপনাদের স্বদলস্থ নিম্নশ্রেণী ব্যতীত, আরও একদল দাসবৎ লোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহারা ভারতের আদিম অধিবাসী, আর্য্যঅস্ত্রতেজে পদানতভাবে বশ্যতায় আসিয়া দাসপদে নিয়োজিত হইয়াছিল। সুতরাং নানারূপে আর্য্যেরা অপার শ্রম নিয়োজন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এজন্য ইহাদের সভ্যতাও অতিশীঘ্র সমুদিত হয়। যাহাহউক, ইহার মধ্যেও একটু সৌভাগ্য এই যে, তুল্যরূপ কারণ থাকিতেও নিম্নশ্রেণী মিসরীয় নিম্নশ্রেণীর ন্যায় নিপীড়িত হয় নাই; দ্বিতীয় পীরামিড্ বা গগনোদ্যানের অনস্তিত্বই তাহার সাক্ষ্যস্থল। এই সময়ে সমস্ত জগৎ পশুবৎ লোক দ্বারা অধিবেশিত থাকায়, বহিঃশত্রু হইতে একে নির্ভাবনাবান, তাহার উপর আবার এরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট দেশের রীতি অনুসারে আর্য্যসন্তানেরা সজল গ্রীষ্মপ্রধান দেশবাসীদিগের

স্বভাবসুলভ অলসভাব প্রাপ্ত এবং অবসরপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন সত্য ; কিন্তু তথাপি এমন অবস্থায় মানবের যে পরিমাণে বিলাসরত, এবং তজ্জনিত ব্যাবিলনের গগনোদ্যান প্রভৃতির ন্যায় অদ্ভুত বিলাসবস্তুর যেরূপ উদ্ভাবন হওয়া সম্ভব, এ সকল হইতে পায় নাই। তাহার কারণ আছে। চিন্তা-উত্তেজক বাহ্যজগৎ পরিবৃত আর্য্যদিগের চিত্ত পারলৌকিক বিষয়ে অধিক পরিমাণে সমাহিত থাকায়, অবসরকাল এবং চিন্তাশক্তি কেবল বিলাসভোগে ও বিলাসপোষক বস্তু উদ্ভাবনে ব্যয়িত না হইয়া, মনস্তত্ত্ব বা তথাবিধ আনুষঙ্গিক বিষয়েও সম বা তদধিক পরিমাণে ব্যয়িত হইয়াছিল। এই নিমিত্ত প্রথম হইতেই ভারতের সভ্যতায় বিলাসজনিত শিল্পকার্য্যাদি সহ পাশাপাশি ভাবে, সমতাযুক্ত হইয়া বা তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি এবং বিজ্ঞানাদি একত্রে উদ্ভাবিত ও অল্পদিনেই পুষ্টতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। অতএব মিসরীয়েরা যথায় পীরামিড লাভ করে, আর্য্যেরা তথা বিজ্ঞান মনস্তত্ত্বাদি লাভ করিয়া ছিলেন। নিম্নশ্রেণীর প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধেও প্রভেদ এই, ভারতীয়েরা যথায় কেবল হেয়জ্ঞান করিতেন ও দাসকার্য্য মাত্র করাইয়া লইয়া ক্ষান্ত হইতেন, মিসরীয়েরা তথায় পীরামিড তৈয়ার করাইয়া লইতেন। যাহা হউক, এক্ষণে এই সহসা উদিত সভ্যতার বিষয় আলোচনার পূর্ব্বে, অগ্রে একবার গ্রীকদিগের প্রকৃতিভেদে সভ্যতার উদয় বিষয়ে আলোচনা কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্য।

বাহ্যপ্রকৃতি সম্বন্ধে, ভারত যদ্রূপ বহুমূর্ত্তিবিশিষ্ট, গ্রীকদিগের অধিবাসিত ভূখণ্ড তদপেক্ষা যদিও বহুলাংশে ন্যূন, কিন্তু সঙ্কীর্ণ স্থান মধ্যে তাহাদের সন্নিবেশ বশতঃ পরিমাণ অতিরিক্ত গাঢ়তা পূর্ণ, এবং বৈচিত্র্যের আধিক্যরূপে, প্রতীয়মান হয়। ইহার উৎপন্ন ফলও তদ্রূপ হওয়ার কথা। যাহা হউক এই সামান্য আয়তনের মধ্যে ইহার ভাববৈচিত্র্য এত অধিক যে, তাহার তুলনায়, দূরবিক্ষিপ্ততা ও আয়ত্তাতীত ভাব হেতু ভারতীয় বৈচিত্র্যও যেন কেমন মলিন বোধ হয়, যদিও বস্তুতঃ তাহা নহে, বরং অপার আধিক্যশালী। এই ক্ষুদ্র সীমান্তবর্ত্তী ভূভাগ ক্রমান্বয়ে পর্ব্বত, নদী, সমতলক্ষেত্র, উপত্যকা, অধিত্যকা প্রভৃতিতে বিভাজিত হইয়া

বহুতর ভিন্ন ভিন্ন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশমালায় বিভক্ত হইয়াছে। এই সকল প্রদেশের প্রত্যেকে এত ক্ষুদ্র যে, ইহাদের পরিমাণফল কয়েক বর্গক্রোশের অধিক হইবে না। বোধ হয় আমাদের এক একটি পরগণাও স্থানবিশেষে তাহাদের অপেক্ষা বৃহৎ হইবে। এই সকল প্রদেশের মধ্যে উত্তরে থেসালি ও এপিরুস, উভয়ে পিন্দুস নামক পর্ব্বতশ্রেণী দ্বারা বিভক্ত। থেসালি প্রায় চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতমধ্যে আবদ্ধ সমতল ক্ষেত্র, মধ্যস্থলে একটি নদী প্রবাহিত, ভূমি উর্ব্বরা। এপিরুস উত্তর পূর্ব্ব ও দক্ষিণে এবং মধ্যদেশে পর্ব্বতশ্রেণী দ্বারা আকৃষ্ট, ভূমিতল বন্ধুর এবং অনুর্ব্বরা। এতদুভয় দেশের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতশ্রেণী ক্রমাগত দক্ষিণ পূর্ব্বমুখে প্রধাবিত হইয়া মধ্যগ্রীসকে দ্বিভাগে বিভক্ত করিতেছে, উহার পশ্চিমভাগে ইটোলিয়া ও তৎপশ্চিমে আকার্নানিয়া এবং লিউকেডিয়া নামক প্রদেশদ্বয়। ইহাদের মধ্য দিয়া আকিলৌস নামক গ্রীসদেশীয় সর্ব্বপ্রধান স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইয়া করিন্থ সাগরাভিমুখে গমন করিতেছে। এ উভয় দেশ পর্ব্বত ও বনময়, এবং সভ্যতা বিস্তারের পক্ষে সম অনুকূল না থাকায়, বহুকাল পর্য্যন্ত ইহা দস্যুবর্গের দ্বারা অধিবেশিত ছিল।

এই মধ্যদেশের পূর্ব্বভাগ গ্রীকবিদ্যাবুদ্ধি ও বীরত্বের আকরস্থল। যে পর্ব্বতমালা ইহাকে দ্বিভাগে বিভক্ত করিতেছে, তাহা পূর্ব্বদিকে সমুদ্র হইতে অদূরবর্ত্তীভাবে প্রধাবিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং থেসালি হইতে পূর্ব্ব-মধ্যদেশে আসিতে হইলে, ঐ পথের এক পার্শ্বে অত্যুচ্চ পর্ব্বত ও অপর পার্শ্বে সমুদ্র। এই পথ দিয়া আসিতে হইলেই বিখ্যাত গিরিসঙ্কট থার্ম্মপলি অতিক্রম করিতে হয়। পূর্ব্বভাগের পূর্ব্ব উপকূল চাপিয়া লোক্রিসা নামক প্রদেশ। লোক্রিসের পশ্চিমে ডোরিস এবং ফোকিস নামক প্রদেশদ্বয়। ফোকিস প্রদেশের মধ্য দিয়া পার্ণাসুস নামক পর্ব্বতশ্রেণী পশ্চিম মুখে প্রধাবিত। ইহারই উপরে গীতিবিষয়িণী অধিনায়িকা দেবীগণের অবস্থান; এবং পর্ব্বতের পাদদেশে ডেল্‌ফিনগর ও তথায় বিখ্যাত ভবিষ্যৎ জ্ঞাপক আপলো দেবের মন্দির। ফোকিসের পূর্ব্বে ও লোক্রিসের দক্ষিণে বিওতিয়া নামক প্রদেশ। ইহা প্রায় চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতমালায় আবদ্ধ এবং জলনির্গমনের পথশূন্য।

এনিমিত্ত, ভূমি সর্ব্বদা সলিলসিক্ত থাকায় তাহা উর্ব্বরতা গুণবিশিষ্ট, এবং তাহা হইতে নানাবিধ শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে; বায়ু সর্ব্বদা সজল ও কুজ্ঝটিকাময়। বিওতিয়ার পূর্ব্বদক্ষিণে আটিকা প্রদেশ। এতদুভয় প্রদেশের মধ্যভাগে পর্ব্বতশ্রেণী। আটিকার পূর্ব্ব দক্ষিণ ও উত্তরে সমুদ্র; উত্তর সমুদ্রে সংলগ্নভাবে ইউরিয়া নামক দ্বীপ। আটিকা প্রদেশের বায়ু শুষ্ক। ভূমি নির্জ্জল, কোন প্রকার শস্য উৎপন্ন হয় না, কিন্তু বিবিধ প্রকার ফলের উৎপাদন পক্ষে উপযোগী। আটিকার পশ্চিমে মিগারিস। মিগারিসের দক্ষিণে করিন্থিয়া, পর্ব্বতময় বন্ধুর ও অতি সংকীর্ণ। উত্তর দেশ হইতে দক্ষিণ দেশে যাইতে হইলে করিন্থ দেশস্থ যোজক দিয়া যাইতে হয়; কিন্তু এই পথে পর্ব্বতের বাধা এত অধিক যে স্থলপথ অপেক্ষা দক্ষিণ দেশে যাইতে জলপথই অধিক সুগম।

উত্তরদেশ অপেক্ষা দক্ষিণ দেশ নদীবিরল ও পর্ব্বতময়। ইহার উত্তরে আর্গোলিয়া, এই আর্গোলিয়া প্রদেশ আবার বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজত্বে বিভক্ত। এই সামান্য স্থানের মধ্যেই আবার প্রকৃতি-বৈচিত্র এত যে, কোথাও কলম্বা কমলা প্রভৃতি লেবু পর্য্যন্ত উৎপন্ন হয়, আবার কোথাও কিছুই উৎপন্ন হয় না। ইহার উত্তর পশ্চিমে আকৈয়া। মধ্যভাগে আর্কেডিয়া, প্রায় চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতমালা প্রাকারের ন্যায় বেষ্টন করিয়া অন্যান্য দেশ হইতে উহাকে ছেদসম্বন্ধ করিতেছে। দক্ষিণে মেসিনিয়া ও লাকোনিয়া নামক প্রদেশদ্বয়। এতদুভয় দেশ যদিও পর্ব্বতময়, কিন্তু অনুর্ব্বরা নহে। মেসিনিয়া প্রদেশে খর্জ্জুর প্রভৃতি ফল এবং বিবিধ শস্যাদি জন্মিয়া থাকে। লাকোনিকা প্রদেশেই সুবিখ্যাত স্পার্টা নগরী, ইউরোতস নামক নদীর তটে অবস্থিত ছিল। আর্কেডিয়ার পশ্চিমে ইলিয়া নামক প্রদেশ। এই প্রদেশের মধ্যে বিখ্যাত অলিম্পিয়া ক্ষেত্রের অবস্থান।

৮। গ্রীসদেশের এই প্রকৃতিবৈচিত্রে লক্ষিত হইবে যে, এই ক্ষুদ্রায়তন দেশের মধ্যে প্রদেশভেদে কতই স্বভাব-বিভিন্নতা। কোন প্রদেশ হয় ত একেবারে প্রায় চতুর্দ্দিকে সমুদ্রবেষ্টিত; আবার তদ্বিপরীতে কোন কোন স্থান নিরবচ্ছিন্ন পর্ব্বতমালায় আবদ্ধ, বহির্ভাগের আর সমস্ত স্থান হইতে

সম্বন্ধ-বিচ্ছিন্ন, বহুদূর অতিক্রম না করিলে সমুদ্রের মুখ দেখিবারকো নাই। গ্রীসের প্রত্যেক প্রদেশ, যেন স্বভাব কর্তৃক বিভাজিত হইয়া, প্রত্যেকের আত্মস্বাতন্ত্র্য সহ নির্জ্জনে অবস্থান করিতেছে। ইহাদের মধ্যে পরস্পরের যেরূপ আকৃতিভেদ, গুণভেদও তদনুরূপ। কোন প্রদেশ একেবারে উর্ব্বরতা গুণবিশিষ্ট, শস্য-প্রচুর, ফল-রস-জলে পরিপূর্ণ। আবার কোন প্রদেশ একেবারে সে সকল বিষয়ে বঞ্চিত, জীবন ধারণের সমস্ত পদার্থের জন্যই তাহার অধিবাসীদিগকে অপরের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকিতে হয়। কোথাও নিবিড় বনভূমি, কোথাও কর্করপূর্ণ সমতল ক্ষেত্র, কোথাও বা অবিরল শস্যচূড় সকল বাতাসে দুলিয়া ক্রীড়া করিয়া থাকে; আবার সর্ব্বত্রই উপলখণ্ডবর্দ্ধিত গিরিশ্রেণী এই সকলকে পরস্পরের মধ্যে বিভক্ত করিয়া রাখিতেছে। এই পর্ব্বতশ্রেণী এবং বহুমূর্ত্তিবিশিষ্ট ক্ষেত্রসমূহ অতিক্রম করিয়া গতায়াত করিতে হয় বলিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ দেশের মধ্যে বা দূর গতায়াতের পক্ষে স্থলপথ দারুণ কষ্টকর; সুতরাং জলপথ অতিশয় সুগম।

স্থলভাগ ছাড়িয়া জলভাগের প্রতি নেত্রপাত কর। পূর্ব্ব ও দক্ষিণস্থ সমুদ্র দেখ ধীর, মৃদু, মন্থরগতি। গ্রীসের অভ্যন্তরে প্রায় সর্ব্বত্রই ইহা এতদূর প্রবেশ করিয়াছে যে, গ্রীস বহুপ্রদেশে বিভক্ত হইলেও কেবল আর্কেডিয়া ভিন্ন, আর সকল প্রদেশেরই সমুদ্রতটে একটি না একটি বন্দর স্থাপিত থাকায় সমুদ্রে গমনাগমন পক্ষে তাহাদের সুবিধার অভাব হইত না। এই সমুদ্রের সর্ব্বত্র দ্বীপশ্রেণীতে এরূপ আকৃষ্ট যে, তাহার অন্য সমুদ্রের অস্থিচর্ম্ম অবশেষ। ঐ সকল দ্বীপ অধিকাংশ পর্ব্বতময়, আবার কোনটি অতি উর্ব্বরা, কোনটি বা মধ্যম-প্রকৃতি, কিন্তু সকলেই রম্যদর্শন ও বাসযোগ্য। ঐ সকল দ্বীপ আয়তনে বৃহৎ নহে, আকৃতিতে ক্ষুদ্র, এবং পরস্পর পরস্পরের এত সন্নিকটে অবস্থান করে যে, একটিতে উত্তীর্ণ হইয়া, তাহা দেখিতে দেখিতে আর একটিতে উত্তীর্ণ হইতে পারা যায়। এইরূপে ইউরোপখণ্ডে গ্রীস হইতে নির্গত হইয়া স্বচ্ছন্দে আসিয়াখণ্ডে উপনীত হইতে পারা যায়। পুনশ্চ এই গতায়াতের সুবিধাকল্পে, অতি অনুকূল

বাণিজ্যবায়ু, হেলাসপণ্ট হইতে ক্রীট দ্বীপ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া থাকে। গ্রীসের পূর্ব্ব উপকূলের অনুকূল মূর্ত্তি বশতঃ, তথায় জাহাজ ও নানাবিধ পোত রক্ষার্থে সুন্দর সুন্দর বন্দর সকল সংযুক্ত। পশ্চিম সমুদ্রও দ্বীপাবলী-সংযুক্ত, কিন্তু পূর্ব্বসমুদ্রের ন্যায় নহে। পূর্ব্বসমুদ্র অপেক্ষা উহা আয়তনে বৃহৎ, স্বভাবও অপেক্ষাকৃত উগ্র। উপকূলভাগ পূর্ব্ব উপকূলের লক্ষণ অনুকূল নহে। ইহা উচ্চ এবং দুরারোহ পাহাড়ে আবৃত; সমস্ত উপকূলভাগ ভ্রমণ করিলে কদাচ একটি সুন্দর বন্দর পাওয়া যায়।

এক্ষণে গ্রীসের পার্শ্বস্থ দেশসমূহের প্রতি নিরীক্ষণ কর। এই মৃদু সমুদ্র অতিক্রম করিলে, একদিকে সুসভ্য ও বিক্রমশালী মিসর, এবং উত্তর আফ্রিকার উপকূলস্থ বলসম্পন্ন কার্থেজ প্রভৃতি অন্যান্য স্থান; অন্য দিকে সমুদ্রপ্রিয় ফিনিসীয় এবং আসিয়াস্থ অন্যান্য ধন, সৌভাগ্য ও বলসম্পন্ন প্রদেশ-নিচয়। অপর পার্শ্বে নবপরাক্রম-বিস্ফুরিত শিশু ইতালী। গ্রীসের অধিবাসীদিগের পক্ষে যেরূপ সমুদ্র গতায়াতের সুবিধা, এই সকল প্রতিবেশী দেশসমূহেরও তদ্রূপ। এবং গ্রীসে যে যে কারণে মনুষ্যকে মনুষ্যপদবীতে স্থাপন করিতে পারে, এ সকল দেশেও, বিষয়বিশেষের বৈচিত্র্য-সাধক কারণ বিশেষের ক্ষীণতা বা পুষ্টতার প্রতি লক্ষ্য না করিলে, সেই সেই কারণের নিতান্ত ন্যূনতা ছিল না।

ফরাসিস বিজ্ঞপ্রবর নাকি এরূপ কহিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে যে কোন দেশের মানচিত্র প্রদান করিলে, এবং তদ্দেশীয় উৎপন্ন দ্রব্যজাত ও পদার্থনিচয় কীর্ত্তন করিলে, তিনি বলিয়া দিতে পারেন যে, সেই দেশবাসীরা কিরূপ প্রকৃতির লোক হইয়া কিরূপ কার্য্যফল প্রসব করিবে, এবং মানবীয় ইতিহাসের কোন্ পর্য্যায়ে অবস্থান এবং কিরূপ গণনায় আসিবে। এ কথা যদি সত্য সত্য সম্ভব হয়, বাস্তারাম বলিতে পার যে, গ্রীসের ন্যায় প্রকৃতিবিশিষ্ট দেশের অধিবাসীবর্গ কিরূপ অবস্থা সম্পন্ন হইবে?

প্রথমতঃ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে এরূপ স্বভাব বিশিষ্ট দেশের প্রদেশসমূহ, পরস্পর পরস্পর সম্বন্ধে এরূপ বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিতি করে যে, যেন কাহারও সঙ্গে কাহার সংস্রব নাই এবং সকলেই স্ব স্ব প্রধান

ও স্বতন্ত্র। প্রদেশদ্বয়ের মধ্যে দুর্গম ব্যবধানের অভাবে, উভয় প্রাদেশিক অধিবাসীদিগের মধ্যে গতায়াত সুগম, এবং তাহা হইতে স্বতঃ-উৎপন্ন ঘনিষ্ঠতা সূত্রে, উভয়ে যেমন একসূত্রে বদ্ধ এবং একপ্রকৃতি-বিশিষ্ট ও একধর্ম্মযুক্ত হইয়া, একজাতিত্বে পরিগণিত হয়; এখানে, প্রদেশপরম্পরার ব্যবধানদুর্গমতা হেতু, এক প্রদেশের অধিবাসীদিগের সহ অপর প্রদেশের অধিবাসীদিগের তদ্রূপ গতায়াতের সুগমতা এবং তাহা হইতে উৎপন্ন ঘনিষ্ঠতা এতদুভয়ের অভাব নিবন্ধন, তেমন না হইয়া, প্রত্যেক প্রদেশ প্রথমকাল হইতেই স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন পূর্ব্বক স্থাপিত ও বর্দ্ধিত হয়। পার্শ্ববর্ত্তী অপরাপর প্রদেশ-সমূহ, যেন ভিন্ন সীমা বিশিষ্ট ভিন্ন দেশরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। প্রাদেশিক এইরূপ স্বাতন্ত্র্য হইতে, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ভাবও এবং তদুৎপন্ন অহঙ্কার বোধ প্রকৃষ্টরূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। বলা বহুল্য যে, এতদ্রূপ কারণোৎপন্ন অহঙ্কারবোধ ভাবী পার্থিব-গৌরবের ভিত্তি স্বরূপ।

দ্বিতীয়তঃ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, গ্রীসের ন্যায় প্রকৃতিবিশিষ্ট দেশের মধ্যে ভূমির উর্ব্বরতা গুণ সর্ব্বত্র সমান নহে। কোন স্থানে আবশ্যকাধিক জীবনোপায় বস্তু সমূহ উৎপাদিত হইয়া থাকে, আবার কোথাও বহুশ্রমেও যৎকিঞ্চিৎ পাওয়া দুষ্কর। অতএব কালে লোকবৃদ্ধি সহ লক্ষিত হইবে যে, কোন কোন প্রদেশ বহুপরিবারবৃদ্ধি সত্ত্বেও আহার-প্রাচুর্য্যে অত্যন্ত সচ্ছলতাযুক্ত। আবার কোন কোন দেশকে হয়ত তদভাবে এককালে উপবাসে প্রাণত্যাগ করিতে হয়। এমন অবস্থায় স্ব স্ব দেশজাত যে কোন বস্তু, যাহা অপরের নিকট লোভনীয়, তদ্দ্বারা বিনিময় ও ব্যবসায়ের প্রবর্ত্তন ব্যতীত, সকলের সমভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। এজন্য অন্যান্য দেশের সহ তুলনায় এখানে; প্রত্যেক প্রদেশ অধিবেশিত হওয়ার অপেক্ষাকৃত অল্প কাল পরেই, পরস্পরের মধ্যে বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়। প্রদেশসমূহ পরস্পরের মধ্যে যেরূপ স্বতন্ত্র, তাহাতে এই বাণিজ্যসূত্রে, দূরদর্শিতা, বিজ্ঞতা এবং লোকচরিত্র-নির্ণয় সম্বন্ধে বিদেশবাণিজ্যের যে সকল আনুষঙ্গিক ফল, সেই সকল ফললাভও

হইয়া থাকে। ক্রমে লোকবহুলতায় যখন বাণিজ্যের আধিক্য হয়, তখন এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশ যাইতে দুর্গম স্থলপথের ক্লেশ বিশেষরূপে অনুভূত হইতে থাকে; সেই অনুভবশক্তির তাড়না হইতে প্রতিকার স্বরূপ জলপথে গমনাগমনের প্রবর্ত্তনা হয়, এবং এই প্রবর্ত্তনের ক্রম-পুষ্টতায় তদ্রূপ গমনাগমনের যান প্রকরণাদি সম্বন্ধে ক্রমে অথচ শীঘ্র শীঘ্র উৎকর্ষ সাধিত হইতে থাকে। এরূপ ক্রমাগত গতায়াত ও সংস্রবে পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা উপস্থিত হইবায়, সকল প্রদেশের অধিবাসীরা অন্তরে অন্তরে স্বতন্ত্রতাযুক্ত থাকিলেও, বাহ্যিকে ক্রমে একজাতিত্বের আকার ধারণ করে। বিশেষতঃ রীতি নীতি পথে বিভিন্ন ও কূট শিক্ষাশূন্য এরূপ প্রাদেশিকদিগের মধ্যে, একের রীতি নীতি অপর দ্বারা রূপান্তরিত, একের ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি অপরের দ্বারা গৃহীত, সহজে এবং বিনা যত্নে আপনা হইতে হইয়া থাকে। যাহা হউক, তাহা হইলেও, বহুকাল ধরিয়া অবলম্বিত যে মানবীয় মনের স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তা, তাহা তদ্দ্বারা অপলোপ হইতে পায় না; প্রত্যুত তদ্দ্বারা স্বাতন্ত্র্য ভাবের মলভাগ পরিত্যক্ত হইবায়,তাহা মার্জ্জিত হইয়াই থাকে। এজন্য বাহ্যিকে একজাতিত্বভাব দৃষ্ট হইলেও ভিতরে ভিতরে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয়ভাব বিরাজ করিতে থাকে।

বাণিজ্য দ্বারা এবম্ভূত আহার স্বচ্ছলতা সাধিত হইলে, তৎপরিমাণ অনুসারে ক্রমে লোকবৃদ্ধি হইয়া, দেশের মধ্যে যখন স্থানসঙ্কীর্ণতা উপস্থিত হয়,তখন কিয়দংশের দেশত্যাগ পূর্ব্বক দেশান্তরে উপনিবেশ স্থাপন ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই। এরূপ উপনিবেশ স্থাপন পক্ষে ঘন-সন্নিকটস্থ ঘন-সন্নিবিষ্ট দ্বীপাবলী এবং অপরাপর ভূখণ্ড যেরূপ অগ্রে মনোনীত হওয়ার সম্ভব সেরূপ অন্য স্থান নহে। এজন্য ক্রমে সেই সকল স্থান উপনিবেশিত হলে তদ্রূপ উপনিবেশ সমূহের বিস্তার সাধন, এবং তজ্জন্য আবার নূতন নূতন স্থান সকল মনোনীত করণ হইয়া থাকে। এবং ইহা হইতে ক্রমে সামুদ্রিক বাণিজ্যের বিস্তার, এবং তজ্জনিত ধনসঞ্চয় ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয়। যে সমুদ্র-যাত্রার সুযোগে এই দেশ শ্রীবৃদ্ধিযুক্ত হইবার কথা, ইহার প্রতিবেশিবর্গেরও তদ্রূপ সুবিধা; সুতরাং তাহাদেরও ইহাদের সঙ্গে একই সময়ে ধনসঞ্চয় ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন হওয়ার সম্ভব। অথবা যদি তৎপক্ষে কোন

প্রতিবেশীর ন্যূনতা হয়, অথচ সে নানা কারণে পূর্ণতার স্বাদ জ্ঞাত হইয়াছে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে অপরের ক্ষতিকরণ ভিন্ন আকাঙ্ক্ষার আশু পূরণের উপায়ান্তর নাই; তাহার পর, আপনার হীনতা দর্শনে অপরের অপরিমিত ধন দ্বারা আত্মপরিপোষণ করার প্রবৃত্তি, পার্থিব-সুখ-বিমোহিত মানবের মনে স্বতঃই উৎপন্ন হইয়া থাকে; পুনশ্চ তদ্রূপ হীনতা না থাকিলেও, মানবের মনে ঐ প্রবৃত্তির ক্রীড়া লক্ষিত হওয়ার অসম্ভাব নাই; অতএব তদ্রূপ প্রতিবেশীবর্গের নিকট হইতে সর্ব্বদা আক্রমণের সম্ভাবনা। এমন অবস্থায় প্রত্যেক প্রদেশ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বী হইলেও, এবং আপনাদের পরস্পরের মধ্যে যে কোন সূত্রে বিবাদ বিসম্বাদের সম্ভাবনা থাকিলেও, বাহ্য শত্রুর পক্ষে প্রতিযোগিতায় এক এক প্রদেশ স্বতন্ত্রভাবে অসমর্থ হেতু, সকলে সংমিলিত হইয়া একযোগ হওয়া কর্ত্তব্য। এই একতা ক্ষণিক নহে, সর্ব্বদা আবশ্যক, সুতরাং তৎসাধন একমাত্র কথায় পাঠরূপে এ চলচিত্ত-সময়ে সুসম্পন্ন হয় না। অতএব একতাবন্ধনোপযোগী বস্তুর আবশ্যক, এ নিমিত্ত কোনরূপ পর্ব্বোপলক্ষে জাতীয় সংমিলনের প্রয়োজন হয়। তথাপি প্রতিবেশী ও প্রতিদ্বন্দ্বীগণের বহ্বায়তন হেতু, ইহারা প্রতিযোগিতার উদ্দেশে একতা সত্ত্বেও সংখ্যাতে সামান্য গণনায় আইসে। কিন্তু প্রতিবেশীরা যেরূপ পার্থিব-সুখসর্ব্বস্বতা হেতু দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী, ইহারাও তদ্রূপ পার্থিব-সুখসর্ব্বস্বতা হেতু আত্মধন রক্ষণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এমন স্থলে সংখ্যায় যেমন সামান্য, তেমনি সংখ্যার অভাব পরিপূরণার্থে একমাত্র বীরকার্য্যে পারদর্শিতা এবং বীরত্বে খ্যাতিলাভ ভিন্ন অন্য উপায় নাই। বাহিরের শৈত্যগুণে অন্তরস্থ তাপ যেমন ঘনীভূত হইয়া থাকে, তেমনি যত বৈদেশিক প্রতিবেশিরা ইহাদের উপর শত্রুতাচরণ করিবে, এবং তন্নিমিত্ত ইহারা যত বিদেশীয়দিগের উপর বিতৃষ্ণা-যুক্ত হইবে, ততই ইহাদের আত্মস্বত্বের উপর মমতা এবং স্বদেশরক্ষণে বীরত্ব প্রতিভাবিত হইতে থাকিবে। মানবচিত্ত অনেক সময়ে বিস্মৃতিযুক্ত হয়; আপন ভাব, স্বভাব ও প্রবৃত্তি, সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিয়া জড়বৎ থাকে; কিন্তু বিষয় বিশেষ অনুসারে কবিত্ব দ্বারা সেই ভাব, স্বভাব ও

প্রবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া দিলে ও সম্মুখে আদর্শ ধরিলে সে জড়তা তিরোহিত হইয়া, মানব সতেজ ও উৎসাহিত হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। এবম্ভূত দেশমধ্যে বীরকীর্ত্তি ও স্বদেশ-প্রিয়তা মনোমধ্যে উদয় করার যত আবশ্যক, তত অন্য বিষয়ের নহে। যে দেশের যেরূপ মতি গতি, তাহাদের হইতে প্রকৃতি সেইরূপ বস্তুই উৎপাদন করাইয়া থাকেন; সুতরাং সাহিত্য কাব্যাদি অভূতপূর্ব্ব মনুষ্য-মুখ-প্রচারিত দেববাক্য হইলেও, এখানে তাহা দেশের উপযোগিতা অনুসারে বীরকীর্ত্তি ও স্বদেশ-হিতৈষিতার জীবিতভাবে পরিপূর্ণ হইবে। এবং এবম্ভূত দেশেই কেবল ইতিহাসের মূল্য অবধারিত ও তাহার উৎপত্তি সাধিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বগত বীরপুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপে বিমোহিত হইয়া, চিরনেত্রপথে আদর্শরূপে তাহাকে স্থাপিত করণের আকাঙ্ক্ষায় ভাস্কর্য্যেরও উৎপত্তি ও তাহার উৎকর্ষ সুসাধিত হয়।

বাহ্যজগৎ ইহাদিগের নিকট সামান্য বেশে প্রতীয়মান হওয়ায়, এবং প্রাকৃতিক অদ্ভুত কার্য্যকলাপের সঙ্কীর্ণতা হেতু, ইহাদের চিত্ত পারলৌকিক তত্ত্বে তাদৃশ আকর্ষিত হওয়ার সম্ভব নাই। এ নিমিত্ত ইহাদের পরলোক বিভীষিকা পূর্ণ, বা দেবতত্ত্ব নিতান্ত অমানুষিক হইবার নহে। এতদুভয়েরই ইহাদের নিকট দেব-মানবীয়, উভয় ভাবের সামঞ্জস্য-সাধক আকৃতি ধারণ করা সম্ভব। পরলোক ভীষণ হইতে ভীষণতর নহে; এবং দেবতারাও অভাবনীয়, অচিন্তনীয়, বিকট সাজ, বিকট কাজ বা বিকটমূর্ত্তি বিশিষ্ট নহে। সকলেই মানবের ন্যায় মানবীয় ক্রীড়াযুক্ত;—তাহার সহিত মানবের সহানুভূতি জন্মিতে পারে এতদ্রূপ। পরলোক সামান্য বিভীষিকাযুক্ত বলিয়া, মানবচিত্তকে তাহা হইতে উদ্ধারকল্পে বিষম আকুলতাযুক্ত হইয়া, ধর্ম্ম বিষয়ে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর এরূপ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া হাবু ডুবু খাইতে হয় না। সুতরাং সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর তত্ত্বের উদ্ভাবনের অভাবে, সাধারণ দেবতত্ত্বেই মানবচিত্ত সতত সন্তোষযুক্ত এবং তাহাতে ভয়বিরহিত। তৎপক্ষে ভয় বিস্ময়ের অভাব এত যে, মানব দেবতা হইতেও আত্ম-স্বাতন্ত্র্য রক্ষণে অপরিমিত-যত্নশীল।

মানবচিত্ত পার্থিব বিষয়ে এরূপ সংলগ্ন হওয়াতে, তদ্বিষয়ক যে কোন বিষয়ে সম্যক হস্তক্ষেপে শিথিল-প্রযত্ন হয় নাই। সুতরাং সকল বিষয়ের পরিরক্ষক রাজনীতিতে যে ইহারা সম্যক হস্তক্ষেপ করিবে, তাহাতে বিচিত্রতা কি? স্বতন্ত্রতা-প্রিয়তায়, প্রত্যেক প্রদেশে এক এক রাজ্য, আবার কোন স্থানে এক প্রদেশের মধ্যেই চারি পাঁচটি বিভিন্ন রাজ্য। এতদ্রূপ ক্ষুদ্র রাজত্বের মধ্যে, রাজা স্বল্পকাল মধ্যে সর্ব্বসমক্ষে পরিচিত, এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শিত হওয়াতে, আত্মদেবত্ব রক্ষণে সমর্থ হয়েন না। রাজনীতির বিস্তারস্থান অল্পায়তন হওয়ায়, প্রজামাত্রেই তাহা আয়ত্ত করিয়া, তাহাদের দোষ গুণের বিচারে প্রবৃত্ত, এবং আবশ্যক হইলে তাহার প্রতিকার করণে সহজে উদ্যত হয়। এ নিমিত্ত এখানে সর্ব্বদা রাজবিপ্লব, এবং প্রজাবিদ্রোহ হওয়ার সম্ভব। শাসন-প্রণালী এই কারণে কখন বা রাজতন্ত্র, কখন বা তাহা ঘুচিয়া সাধারণতন্ত্র, আবার কখন বা সম্ভ্রান্ততন্ত্র, ইত্যাদিরূপে যখন যাহা লোকচিত্তে বলবতী, তখন তাহা প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কখন বা দেশ আত্মকলহজাত রক্তধারায় স্নাত হয়, কখন বা আবার রাজ-প্রজা সংমিলনে দেশমধ্যে সুখের তরঙ্গ প্রবাহিত হইতে থাকে। এরূপ স্থানে প্রজামাত্রেই অল্পবিস্তর রাজনীতি-বিশারদ, তন্মর্ম্মজ্ঞ এবং তাহাতে সম্পূর্ণরূপে আস্থাযুক্ত হইয়া, আপনাপন কার্য্য-কলাপ পরিশোধিত করিয়া থাকে।

গ্রীকদিগের অবস্থা অবিকল এইরূপ। ইহার প্রত্যেক প্রদেশ এক এক বিভিন্ন দেশ স্বরূপ, এবং প্রত্যেক প্রদেশের অধিবাসী এক এক বিভিন্ন জাতি স্বরূপ। কেহ কাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত নহে। ভারতীয়-দিগের অবস্থা তদ্রূপ নহে। আর্য্যেরা যে সময়ে সপ্তসিন্ধুতটমাত্র স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং যথা হইতে তাঁহাদের ভাবী অভ্যুদয়ের সূত্রপাত হয়, সেই স্থান এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ, যাহা কালে বংশ-বিস্তারে ক্রমোপনিবেশিত হইয়াছিল, তাহা সর্ব্বত্রই প্রায় এক-প্রকৃতি-যুক্ত হওয়ায়, গ্রীসের ন্যায় স্বাতন্ত্র্যযুক্ত প্রদেশবিভাগজনিত ফল ফলিতে পায় নাই। উপনিবেশিত স্থানসমূহ সর্ব্বত্রই গতায়াত-সুগম, এবং ঘনিষ্ঠতাযুক্ত। এই ঘনিষ্ঠতা আবার দস্যুবর্গের ভয়ে আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত

হইয়াছিল। ভারতে আর্য্যেরা যেরূপ আদিম অধিবাসী দৈত্যবর্গের দ্বারা উত্ত্যক্ত হইয়াছিলেন, গ্রীসেও তদ্রূপ প্রতিদ্বন্দ্বী দৈত্যবর্গ না ছিল এমন নহে। কিন্তু গ্রীস যেমন সঙ্কীর্ণায়তন, তাহারাও তেমনি সঙ্কীর্ণসংখ্যক, সুতরাং গ্রীকেরা অতি অল্প শ্রমেই তাহাদের সমগ্র বল চূর্ণ করিয়া পদাবনত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ভারতীয় দৈত্যেরা, সংখ্যায় সমুদ্র-তীরবর্ত্তী বালুকারাশির ন্যায় অপরিমিত, এবং অপার ও অভেদ্য স্থান ব্যাপিয়া বিচরণ করিয়া ফিরিতেছে। আর্য্যেরা কিয়দংশের বল চূর্ণ করিয়া পদাবনত করিয়াছিলেন বটে, তথাপি অবশিষ্ট এত ছিল যে, তাহাদের ভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিতে হইত। এই আত্মরক্ষার প্রয়োজন হেতু যিনি যেখানে অবস্থিতি করুন না কেন, সকলকেই অখণ্ডিত একতাসূত্রে আবদ্ধ থাকিতে হইত। এই সূত্র আমূলত পরিচালিত বলিয়া হিন্দুসন্তানমাত্রেই, কি ভিতরে কি বাহিরে, সর্ব্বত্রই সর্ব্বপ্রকারে প্রথমকালে এক জাতি ছিলেন। গ্রীকেরা তদ্বিপরীতে প্রথমকাল হইতেই প্রদেশভেদে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতিস্বরূপ হইয়াছিল। আবার গ্রীকেরা যখন একজাতিস্বরূপ আকার ধারণ করিল, তখনও চির-প্রবুদ্ধ স্বাতন্ত্র্যভাব তাহাদের অন্তরে অন্তরে বিরাজ করিতে লাগিল। কালে ভারতীয়েরা বংশবাহুল্যে, যদিও বিভিন্ন প্রদেশ অধিবেশন ও বিভিন্ন রাজ্যস্থাপন পূর্ব্বক যেন স্বতন্ত্রতা অবলম্বন পূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন, তথাপি চির-প্রবুদ্ধ একতাভাব তাঁহাদের হৃদয় হইতে অপলোপ হইল না। একতা সর্ব্বকালেই ও সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বাগ্রে প্রার্থনীয়; কিন্তু তাহার অভ্যন্তরে যদি স্বাবলম্বনরূপী ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের সামঞ্জস্য না থাকে, তবে সে একতা বড় একটা কার্য্যকরী হয় না। উহা মেষপালের একতা; একটা মেষ যদি কোন স্থানে খেয়াল বশে একটা লাফ দিল, আর গুলিও অমনি সেইরূপ লাফ দিতে লাগিল। ইহাকে অন্ধ একতা বলে। আবশ্যক সজ্ঞান একতার। গ্রীকদিগের যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য-ভাব ভাবী গৌরবের সোপান স্বরূপ, ভারতীয়েরা সে স্বাতন্ত্র্যভাব প্রাপ্ত হইলেন না; এবং অহঙ্কার বোধেও অতি হীনতা প্রাপ্ত হইলেন,—যেহেতু একত্ববোধের প্রথম বাধকতা বাহ্যজগতের নিকট আত্মখর্ব্বতা জ্ঞান;

দ্বিতীয়তঃ নিরন্তর বাহ্যশক্রভয়ে, স্বাতন্ত্র্যভাবের ও তদুৎপন্ন ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের অভাব। একতাব আবশ্যক প্রধানতঃ বাহ্যশক্রর বিপক্ষে এবং স্বাধীনতা-রক্ষণে। সেই একতার আবশ্যক-উপযোগী কার্য্যকাল সর্ব্ব-সময় নহে; সুতরাং একতাসাধক যদি আর সমস্ত কার্য্যকর গুণের অভাব না থাকে, তবে প্রদেশপরম্পবায় মিত্রবাজ্যরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হইলেই একতাব উদ্দেশ্য সফল হইতে পাবে। গ্রীকেবা তাহাই করিত। অতএব হিন্দু ও গ্রীকচরিত্রে একতা এবং স্বাতন্ত্র্যবিষয়িনী কথিত ভাবদ্বয় সম্বন্ধে ইষ্টানিষ্টের বিষয় বিবেচনা করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, অন্তরস্থ একতাব অভাব গ্রীকদিগেব মধ্যে তত অনিষ্ট উৎপাদন করিতে পারে নাই; বত ভারতীয়দেব মধ্যে লৌকিক মহত্ত্বের ভিত্তিস্বরূপ ব্যক্তি-গত স্বাতন্ত্র্যের অভাব ও অহঙ্কার-বোধের ক্ষীণতা অনিষ্ট উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছে। প্রকৃতঃ গ্রীকদিগের পক্ষে এখানে ক্ষতি অপেক্ষা লাভের ভাগই অধিক।

গ্রীসেব ভূমি, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, উর্ব্বরতাগুণে সর্ব্বত্র সমান নহে। কোন স্থানে আবশ্যকীয় জীবনোপায় বস্তুসমূহ অপরিমিতভাবে উৎপন্ন হয়, কোথাও বা একেবারে নগণ্য। যে সকল ভূমিখণ্ড উর্ব্বরতা-গুণ-বিশিষ্ট, তাহা যদি ভারতবর্ষীয় ভূখণ্ডের তুলনায় আনা যায়, তাহা হইলে গ্রীসের উর্ব্বরতাগুণকে অনুর্ব্বরতার মধ্যে গণ্য করিতে হয়। এজন্য ভূমির উর্ব্বরতাগুণ উপলব্ধ করিতে, গ্রীকদিগকে বহু বুদ্ধি ও বহুশ্রমব্যয় এবং বহুকাল অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। এই বহুবুদ্ধি ও বহুপরিশ্রম ব্যয়হেতু, এতদুভয়পক্ষে কারণশূন্য ভারতীয়দের অপেক্ষা, গ্রীকদিগের সাংসারিক বিষয়ে উদ্ভাবনী শক্তি ও শ্রমসহিষ্ণুতা, এতদ্‌গুণদ্বয় দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু বহুকাল তদর্থে অতিবাহিত করিবার ফলে, ভারতীয়দের অপেক্ষা গ্রীকদিগের অবসর, তদুৎপন্ন চিন্তা, তজ্জাত উদ্ভাবনী শক্তি এবং তজ্জনিত সভ্যতা, বহুকাল পরে উদিত ও বর্দ্ধিত হয়। সে যাহা হউক, ভূমির এই নিকৃষ্ট উর্ব্বরতা হইতে ফললাভের উপযুক্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায় এবং তজ্জনিত যে দর্শন ও দৃঢ়তা, তাহা লাভ হইলেও, দেখা যাইতেছে যে, তথাপি দেশমধ্যে সমস্ত প্রাদেশিকগণকে, যদি কেবল আপনাপন

প্রাদেশিক উৎপাদিকা শক্তির উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে অনেককে অনাহারে থাকিতে হইবে। পুনশ্চ শীতপ্রধান দেশের আহারও গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ন্যায় সামান্য নহে; একে ভূমি উৎপাদিকা-শক্তিতে এমত হীন, তাহতে আবার আহারীয় যাহা আবশ্যক তাহা গুরুতর ও শ্রমসাধ্য। এমন অবস্থায় স্ব স্ব দেশজাত লোভনীয় যে কোন বস্তুর সহ পরস্পর বিনিময় ও বাণিজ্য ব্যতীত, একের আহার-বিষয়ক অভাব; অপরের তদতিরিক্ত অপরাপর আবশ্যকীয় বস্তুর অভাব, এতদুভয় অভাব নিবারণ না হওয়ায়, সকলের সমভাবে জিবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। এই নিমিত্ত, মানবীয় ভাবে ক্ষুৎপিপাসা আকাঙ্ক্ষা অনুরূপ নিবারণ-বাঞ্ছার প্রথম উদ্রেকে,—সভ্যতাসূর্য্যের উদয় কালেই বলিতে হইবে,—গ্রীকেরা প্রদেশপরম্পরায় বিনিময় ও বাণিজ্য করিতে বাধ্য হইয়াছিল; এবং এই সকল প্রদেশ পরস্পরের মধ্যে আদিমকালে সম্বন্ধবিচ্ছিন্ন থাকায়, এই বাণিজ্য তৎকালে বিদেশবাণিজ্যের আকার ধারণ করিয়াছিল। পরন্তু ইহাতে বলিতে হইবে যে, বিদেশবাণিজ্য হইতে আত্মোন্নতিকল্পে যে যে ফললাভ হইবার কথা, এই সূত্রে গ্রীকেরা সেই ফল কিয়ৎপরিমাণে লাভ করিতে সমর্থ হয়। এস্থলে যদি ভারতীয়দের সহ তুলনা করা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, সেরূপ কারণের অভাবে, প্রথম অবস্থায় ভারতীয়দের কোনরূপ বহির্বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইতে হয় নাই। যখন কালসহকারে বিলাসের বৃদ্ধি হইয়াছিল, তখনই প্রদেশপরম্পরায় বাণিজ্যের সূত্রপাত ও শ্রীবৃদ্ধি হয়। এ বাণিজ্য প্রধানতঃ বিলাসবস্তুর খাতিরে, সুতরাং তজ্জন্য আগ্রহ-গাঢ়তা আহারীয়-বস্তু-বাণিজ্য অপেক্ষা ন্যূন। আবার এখানে প্রদেশসমূহ পরস্পরের মধ্যে যেরূপ ঘনিষ্ঠতা-যুক্ত, তাহাতে এবম্ভূত বাণিজ্য কখনই বৈদেশিক বাণিজ্যের আকার ধারণ করিতে পারে নাই। ভারতীয়েরা কখনও স্বদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া বাণিজ্য করিতেন কি না, তাহা এখানে আলোচ্য নহে; কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, প্রথমকালে কখনই নহে। পরবর্ত্তী সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিদেশের দ্রব্য ভারতে আনীত, এবং ভারতের দ্রব্য বিদেশে নীত হইতেছে। কিন্তু ইহার মূলানুসন্ধান করিলে প্রতীত

হইবে যে, এরূপ বিনিময় ভারতীয়েরা স্বয়ং সর্ব্বদা বড় একটা বিদেশে গমনাগমনের দ্বারা সম্পন্ন করিতেন না। বিদেশীয়েরাই প্রায় তাহাদের দেশে আগমন পূর্ব্বক সমাধা করিয়া যাইত।

যে অভাবসূত্রে গ্রীকদিগের প্রথম বাণিজ্যের উদ্ভব, সেই সূত্র তাড়নায় মূল হইতেই সেই বাণিজ্যের বিস্তৃত আকার ধারণ করিবার কথা; এবং লোক বৃদ্ধি সহকারে যে তাহা আরও বিস্তার প্রাপ্ত হইবে, তাহা এক প্রকার অবশ্যম্ভাবী। এই বাণিজ্য নিত্য ব্যাপার স্বরূপ, সুতরাং গ্রীসের ন্যায় দুর্গম স্থলপথ দিয়া ইহা নিত্য সমাধা করা ক্রমে অতিশয় কষ্টকর হইয়া উঠে, তেমনি আবার অন্যদিকে সুগম সমুদ্র সর্ব্বদা প্রলোভিত করিতে থাকে। একদিকে ক্লেশ অন্যদিকে সুবিধা যেখানে বর্ত্তমান সেখানে মানবচিত্তের উদ্ভাবনী শক্তি সুবিধাকে আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত উপায় উদ্ভাবনে তেজস্বিনী হইয়া থাকে। কাজেই বাণিজ্য-প্রবর্ত্তনার অল্প কাল পরেই গ্রীকদিগের মধ্যে সমুদ্র গমনাগমনের আরম্ভ হয়। এই নিমিত্ত, প্রাচীনকালের অতি দূরতর সময়েই আমরা দেখিতে পাই যে, গ্রীকেরা সমুদ্র গমনাগমন পক্ষে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে। হিন্দু-দিগের প্রাচীনতম গ্রন্থাবলীতে যদিও সমুদ্রযাত্রার দুই একটি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি তাহা কে গ্রীকদিগের ন্যায় পুষ্টতা-সম্পন্ন তাহা কখনই নহে। গ্রীকেরাই যে অতি প্রাচীন কাল হইতে সমুদ্র-যাত্রার পক্ষে একেবারে অতিশয় দূরদর্শিতা লাভ করিয়াছিল, তাহা নহে। তবে আপেক্ষিক ভাবে 'অতিশয়' শব্দ প্রয়োগ হইতে পারে বটে। হোমারের সময়ে দেখা যায় যে, জাহাজের আকৃতি সামান্য ছিল; এবং সন্নিকটস্থ দ্বীপ ও উপকূলভাগে মাত্র যাতায়াত করিত; কৃষ্ণসাগরের পার্শ্বস্থ স্থানসমূহ পরিজ্ঞাত ছিল না, এবং মিসর কেবল জনশ্রুতিতে পরিজ্ঞাত ছিল। কিন্তু যে কোন বিষয়েরই নিয়ত ব্যবহারে, তাহার উৎকর্ষ সাধিত হয়; গ্রীসে তন্নিমিত্ত অচিরকাল মধ্যেই সমুদ্র-যাত্রার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল; আর ভারতে সেই নিয়ত ব্যবহারের কারণাভাবে, তাহাদের যে কিছু সমুদ্র যাত্রার প্রবর্ত্তনা ছিল, তাহা অতি হীনভাবেই বর্ত্তমান ছিল, এবং কালে তাহার অতি অল্পই উৎকর্ষ সাধিত

হয়। আবার লক্ষিত হইবে যে সামুদ্রিক বাণিজ্যে কেবল গ্রীকেরাই যে আত্মদেশ মধ্যে আপনাপনি লিপ্ত থাকিত এরূপ নহে; ইহাদের প্রতিবেশী ফিনিসীয় ও কার্থেজবাসী প্রভৃতি জাতিরাও অতি প্রাচীন-কাল হইতে সমুদ্রযাত্রায় প্রবৃত্ত হওয়ায়, গ্রীসে আসিয়া সর্ব্বদা বাণিজ্যাদি করিত। ইহাদের সহিত গ্রীকের পোত-চালনের কৌশল ও বাণিজ্যতত্ত্ব পরস্পর পরস্পরের মধ্যে বিনিময়ে, গ্রীকেরা তৎ তৎ পক্ষে উৎকৃষ্ট কৌশল সকল অধিক প্রকারে শিক্ষা করিবার সুবিধা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সূত্রে ব্যাবহারিক কারণের কার্য্যও অপরিমিত পরিমাণে হইতে পায়। অস্ত্র-চালন ও পার্থিব-চতুরতার শিক্ষাও এ সূত্রে নিতান্ত অল্প হয় নাই; কারণ ইয়ো, মিডিয়া প্রভৃতি স্ত্রীহরণবৃত্তান্ত ও তদানুষঙ্গিক ঘটনাবলী তৎপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ভারতের আদিমকালে দেশমধ্যে এরূপ বৈদেশিক গমনাগমন একেবারে ছিল না বলিতে হইবে।

ক্রমে লোকবৃদ্ধি সহকারে দেশমধ্যে স্থান সঙ্কীর্ণ হইলে, ভারতীয়েরা যেমন ব্রহ্মর্ষি হইতে ব্রহ্মাবর্ত্ত, ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে মধ্যদেশ, ক্রমে সমগ্র উত্তরদেশ, পরে দক্ষিণাবর্ত্তও জনস্থান স্থাপন পূর্ব্বক উপনিবেশিত করিয়াছিলেন; গ্রীকেরাও তদ্রূপ দেশমধ্যে স্থান-সঙ্কীর্ণ হইলে, ক্রমে ক্রমে সন্নিকটস্থ দ্বীপাবলী, তাহাতেও সঙ্কুলান না হইলে, আসিয়া মাইনর প্রভৃতি দূরতর স্থানে উপনিবেশ স্থাপনে বাধ্য হয়েন। গ্রীকেরা যখন এইরূপ ছড়াইয়া বিভিন্ন দেশগত হইলেন, এবং প্রতিবেশিবর্গ যখন প্রবল হইয়া পরধনলোভে আত্মোন্নতি করিবার অভিপ্রায়ে ইহাদের উপর শত্রুতাসাধন করিতে লাগিল, তখন সাধারণ শত্রুর প্রতিযোগিতায় ইহাদিগকে একতা-সূত্রে আবদ্ধ হইতে হইল। এইরূপ জাতীয় একতা বন্ধনের নিমিত্তই অলিম্পিক, ইস্থমিয়ান প্রভৃতি পর্ব্বের সৃষ্টি। এইরূপ পর্ব্বসময়ে, অন্ততঃ পর্ব্বাহ কয়েক দিনের জন্য আত্মকলহ ও আত্মশত্রুতাকে চাপা দিতে হইত। শত্রুর অপেক্ষা ইহারা অল্পসংখ্যক হওয়ায়, সামর্থ্যে তাহাদের প্রতি উপযুক্ত প্রতিযোগিতায় পারকতার নিমিত্ত, ঐ ঐ পর্ব্বসময়ে শরীর-পরিচালক ও বলবিধায়ক ক্রীড়া কৌতুকের অভিনয় হইত; এবং অলিম্পিক ক্ষেত্রে শক্তি-ক্রীড়ায় জেতা যে, সে সহস্র রাজ্যখণ্ডের জেতা

অপেক্ষাও সম্মানিত হইত, কবি তাহার যশ গাহিত, তাহার পিতা মাতা এরূপ সন্তানের জনক জননী বলিয়া আপনাকে ধন্য মানিত, যে প্রদেশে তাহার বাস সে প্রদেশ আপনাকে পবিত্র জ্ঞান করিত ও জেতার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কালিন পথে এবং পুরপ্রবেশে দেবসম্মান তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিত। ফলতঃ উক্ত 'প্রতিযোগিতায় পারকতার' নিমিত্ত সর্ব্বত্রই বলের অর্চ্চনা, সর্ব্বত্রই সামাজিক নিয়মাবলীর মধ্যে বল-প্রতিপোষক নিয়মাবলীর প্রাধান্য। উহারই নিমিত্ত স্পার্টানগরে লাইকার্গসের অদ্ভুত নিয়মাবলীর উদ্ভাবন হয়; সেই নিয়মাবলী দৈহিক বল-বাহুল্য উৎপাদনের অনুরোধে. প্রাকৃতিক বৃত্তিনিচয়কেও ধ্বংস করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই ;—তাহার প্রভাবে জননী সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়াছে, পুরুষ আপন স্ত্রীকে আত্ম-অপেক্ষা বলিষ্ঠ-পুরুষের সহবাস করিতে অক্লিষ্টমনে উপদেশ দিয়াছে। এই বলের উত্তেজন সাধন হেতু, হোমারের চিরনূতনত্বময় কাব্য; এবং ইহারই পরিপোষকরূপে টির্টিয়স প্রভৃতি কবিগণের গীতি কাব্যের উৎপত্তি। ইহার তুলনায় ভারতীয় কাব্য পর্য্যালোচন কর; যদিও কোন স্থানে বীররস ক্ষণিক উদ্ভাসিত হয়, কিন্তু পরক্ষণেই তাহা করুণরসের ও বৈরাগ্যভাবের অসীম-স্রোতে কোথায় যে ভাসিয়া যায়, তাহার আর ঠিকানা পাওয়া যায় না। আবার দেখ, গ্রীসে এই বলের প্রভাবে এবং বহিঃশত্রুর উত্তেজনায় বর্দ্ধিত স্বদেশপ্রিয়তার মোহিনী শক্তির মোহে, সালামিস, থার্ম্মপলি প্রভৃতি তীর্থ-নিচয়, গ্রীকদিগের বীরকীর্ত্তি ও স্বদেশপ্রিয়তার চিরসাক্ষ্য ও তদুদ্দীপক-রূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। আর ভারতে? কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্র হইয়াও উহা পুণ্যক্ষেত্র, তপঃ-সাধনের জন্য নির্দ্দিষ্ট ভূমি; যুদ্ধস্থলে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বীরশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় ধনুঃশর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবানের মুখে যোগবিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন! সে যাহা হউক, আক্ষেপের বিষয় এই যে গ্রীকেরা এরূপ সুন্দর বল ও সাহস প্রাপ্ত হইয়া, বহু সময়ে তাহা স্বজাতীয় রক্ত-পাতে অপব্যয়িত করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। ভারতীয়েরা তৎপরিবর্ত্তে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃভাবে সুখসংমিলনে বাস করিয়া, পরস্পর পরস্পরের হিতকামনায় রত হইয়া, মনের সুখে, পরলোকের আশায় আশ্বস্ত রহিয়া,

স্বচ্ছন্দভাবে জীবনাতিবাহিত করিতেন। ইঁহাদের মধ্যেও যে আত্ম-কলহ ছিল না এরূপ নহে। নতুবা কুরুপাণ্ডবাদির যুদ্ধ কল্পনা কোথা হইতে আসিল। কিন্তু যাহা ছিল, তাহা গ্রীকদিগের আত্মকলহের সঙ্গে তুলনা করিতে গেলে নগণ্যের মধ্যে পড়িয়া যায়। ভারতীয়দের এই আত্মকলহ-বিরলতা আভ্যন্তরিক একতার ফল। গ্রীকদিগের মধ্যে ঘন ঘন যে আত্মকলহ এবং তাহাতে যে বলবীর্য্য ব্যয়িত হইত, প্রদেশপরম্পরায় অন্তরে অন্তরে স্বাতন্ত্র্যভাব, অহঙ্কারপূর্ণ বলদীপ্ত অনলস শরীর ও মন, এবং ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য সে সকলের মূলীভূত কারণ।

অতঃপর বর্দ্ধিত জাতীয় প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন ফলের বিষয় আলোচ্য।

ইতি দ্বিতীয় প্রস্তাব।

তৃতীয় প্রস্তাব।

ধর্ম্মবিদ্যা।

আমি এক্ষণে উভয় জাতির ধর্ম্মতত্ত্বের বিষয় আলোচনা করিতে চলিয়াছি, কিন্তু সম্মুখেই উভয় জাতীয় কি দুরন্ত পার্থক্য সমুপস্থিত! হিন্দুদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ গণনার অতিরিক্ত; কি পৌরুষেয় কি অপৌরুষেয়, উভয়বিধ যেকোন প্রকারের ধর্ম্মগ্রন্থে জাহাজ বোঝাই করিতে পারা যায়। আর গ্রীকদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ?—পৌরুষেয়, বা অপৌরুষেয় ধারাবাহিক কিছুই দেখিতে পাই না; অধিকন্তু অপৌরুষেয় কাহাকে বলে, গ্রীকদিগের বুদ্ধিতেও কখন তাহা আইসে নাই। ইহা দ্বারাই একরূপ উপলব্ধি হইতে পারিবে যে, পারলৌকিক ধর্ম্মের উপর কোন্ জাতির কতদূর আস্থা, কে কি পরিমাণে তাহার প্রতি আগ্রহবান, অথবা কে কতদূর তাহার অনুসরণ করিয়াছিল। গ্রীকদিগের ধর্ম্মতত্ত্ব মানবমুখনিসৃত,—কবির মুখে, লোকের মুখে, ও তদতিরিক্তে আপন মনে। এ তিনেরও কিছু এবং কেহ নির্দ্দিষ্ট নাই; যখন যেমন কবি, যখন যেমন লোক

এবং যখন যেমন মন, ইহাদিগের ধর্ম্মতত্ত্বও তখন তেমন। হিন্দুদিগের দেবাদি নির্দ্দেশ বেদাদি (অপৌরুষেয়, সুতরাং স্বয়ং ঈশ্বরসৃষ্ট এবং অনাদি) গ্রন্থ হইতে; আর গ্রীকদিগের দেবাদি নির্দ্দেশ? কখন কখন রাজ্য-পরিচালক সভার অনুজ্ঞা হইতেও হইতে পারিত।[1] এমন স্থলে ইহা বলিলে নিতান্ত হাস্যের কারণ হয় না যে, গ্রীক দেবতা একরূপ আমাদের দেশীয় চাটু বা অর্থসুলভ রায় বাহাদুর,রাজা বাহাদুর বিশেষ,—এক গবর্ণমেণ্ট গেজেটে বিজ্ঞাপনী প্রকাশ হইলেই, অমনি যে কেহ রায় বাহাদুর, রাজাবাহাদুরীতে স্থাপিত হইলেন। এই সুবিধার কল্যাণে আলেক্‌জণ্ডার জুপিটার-আমনের পুত্র হইয়াছিলেন; মিলিতুস কৃত সক্রেতিসের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উপস্থিত হয়, তাহার মধ্যে প্রধান নালিশ এই যে, আথেন্স নগরী যে সকল দেবতাকে গ্রহণ করিয়া থাকে, সক্রেতিস তাহাদিগের প্রতি বিশ্বাসশূন্য। এই কারণ হইতে রোম নগরেও রোম্যুলস, নিউমা প্রভৃতি জীবন অন্তে দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েন। হিন্দুদিগের মধ্যে যে সেরূপ মানুষ দেবতা হওয়ার কিছু অভাব আছে, তাহা নহে; কিন্তু এখানকার কারণ ও প্রকরণ স্বতন্ত্র। যাহারা দেবতা হইয়াছিল, তাহারা দেববৎগুণযুক্ত মানুষ; তাহাদের জীবন অন্তে

১। থিবা নগরে মিলানিপুস্ এবং আর্গস নগরে আদ্রাস্তস্ লোকসমিতি হইতে দেবত্ব প্রাপ্তে দেবপূজা পাইতেন। সিকীওন-পতি ক্লিস্থিনিস্ আদ্রাস্তসের প্রতি শত্রুতা বশতঃ তাহার দেবত্ব লোপ করিতে চেষ্টা পান; কিন্তু যখন তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, তখন মিলানিপুসের মূর্ত্তিকে সিকীওনে লইয়া গিয়া আদ্রাস্তসের মূর্ত্তির পার্শ্বে স্থাপন করেন—এই মতলবে যে মিলানিপুস ও আদ্রাস্তসের জীবনকালে যখন বড় শত্রুতা ছিল, তখন সিকীওনে মিলানিপুসের আদর দেখিয়া; আদ্রাস্তস্ বিরক্তিতে আপনিই সিকীওন ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন। দেখ একবার, লোকসমিতি ও লোকের এ সম্বন্ধে ভ্রান্ত বুদ্ধি কতদূর! থিবা নগরে, ইটিওক্লিস ও পলীনিকস্, এই ভ্রাতৃদ্বয়ও দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। কাষ্টর এবং পলক স্পার্টা নগরে দেবত্ব প্রাপ্ত হয়। প্লেটো (*Redub.* 16—21) হোমারাদির বর্ণিত দেবচরিত্র দূষিত বলিয়া, নূতন দেব ও দেবচরিত্র নির্ম্মাণার্থে আইন প্রচলিত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রীসীয় দেববর্গের অনেক মিসর, থ্রেস, ফ্রাইজিয়া, লিডীয়া প্রভৃতি দেশ হইতেও গৃহিত হয় (*Grote's Greece.* Vol. I. 32—33.)

কালক্রমে দোষাবলীর লোপ এবং গুণাবলী ঘনীভূত হইয়া আসিলে, লোকচিত্ত স্বতঃ-ভক্তি-প্রবর্ত্তিত হইয়া অজ্ঞাত ও অতর্কিত ভাবে তাহাদিগকে দেবমধ্যে গণনা করিয়াছিল। অতএব উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই, চিরন্তন দেবতার দল বাদে, মানুষকে যখন দেবতার পদে উঠান হইত, গ্রীকেরা অনেক স্থলে তাহা জ্ঞানতঃ উঠাইত; আর হিন্দুরা অজ্ঞানতঃ উঠাইতেন। যদি তদ্রূপ উঠানয় কোন দোষ থাকে, তবে সে দোষের দোষী, দোষ কৃত হইলেও, অজ্ঞানতঃ হেতু, হিন্দুদিগকে করিতে পারা যায় না।

হিন্দুদিগের ধর্ম্মতত্ত্বের উৎপত্তিও সেই মানবমুখে বটে, কিন্তু ঋষির মুখে; কিছু কিছু কবির মুখেও আছে বটে, কিন্তু সাধারণ লোকের মুখে বা আপন মনে নহে; তৎপরিবর্ত্তে অসংখ্য ধর্ম্মগ্রন্থ, সকল বিষয়ই গ্রন্থবদ্ধ, সুতরাং গ্রীকের ন্যায় অস্থিরতার অভাব,—ইহা মানবীয় শ্রদ্ধাশক্তির পক্ষে প্রায় সীমাতীত পূর্ণ গভীরতার চিহ্ন। পুনশ্চ গ্রন্থাদি যে আবার, মনুষ্য প্রণীত বলিয়া, তাহাতে বিশ্বাসের কোথাও ন্যূনতা থাকিবে, তাহা নহে। প্রথমতঃ গ্রন্থাদি কাহার প্রণীত কেহ জানে না, অধিকাংশই বহুজনের রচনা হইতে সংগৃহিত; দ্বিতীয়তঃ যাহারা আবার রচনা করিয়াছে তাহারা রচনা করিয়া নিজেই ভাবিয়াছে যে তাহা ঈশ্বরবাক্য, তাহাদের মুখ দিয়া কেবল প্রচারিত হইল এই মাত্র সম্বন্ধ। নৈতিক বা আধ্যাত্মিক জীবন, আধিভৌতিক জীবন সহ সংমিলনেই কার্য্য করিয়া থাকে। এই সংমিলনে আধিক্য যাহার, কার্য্যে তাহারই প্রাধান্য প্রতিফলিত হয়। এখানেও সেইই কারণ হইতে এতদুভয় জাতি মধ্যে ধর্ম্মতত্ত্ববিষয়ে কথিত বিষয়-বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। হিন্দুজীবনে আধ্যাত্মিক জীবনের প্রাধান্য, এবং গ্রীক জীবন আধিভৌতিক জীবনের পরিচায়ক স্বরূপ বলিয়া জানিও গ্রীকদিগের ঋষি ও বেদগাহক ইত্যাদি স্থলীয় যাহারা, হিন্দু হয়ত তাহাদের কথা শুনিয়া হাসিয়াই আকুল হইবে এবং হাসিয়াও ছিল; দূরতম কালে, ঐতিহাসিক সংসারে, ইতিহাসের টুকরা খণ্ডে সে হাসির কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।—বাহ্মারাম, হিন্দু ঋষিবর্গের সহ আলেকজাণ্ডার এবং তাহার সহচরবর্গের সদালাপের কথা বারেক স্মরণ করিও।

মানবের মনুষ্যত্ব প্রধানতঃ নীতি হইতে। পৃথিবীর স্থিতিতে সূর্য্যের আবর্ত্তন দৃষ্টির ন্যায়, বাহ্য দৃশ্য ধরিয়া দেখিতে গেলে (বাহ্য দৃশ্য ধরিয়াই এখানে দেখা যাউক), এই নীতির সঞ্চারে আধ্যাত্মিক জীবনের সঞ্চার, এবং এই নীতির পরিবর্দ্ধনে আধ্যাত্মিক জীবনের পরিবর্দ্ধন। আধ্যাত্মিক জীবনের পরিবর্দ্ধনেই মনুষ্যত্বের উপস্থিতি হইয়া থাকে। পশু এবং মানব, এতদুভয়ের সমভোগ্য সাধারণ আধিভৌতিক জীবনের উপর অধিকন্ত ভাবে, এই আধ্যাত্মিক জীবনের উপস্থাপন হেতুই, আধিভৌতিক জীবনভোগী পশু হইতে, মানবীয় জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব। মানবজীবনের একমাত্র সুমহান্ এবং মুখ্য উদ্দেশ্য যে কর্ম্ম, এই নীতিই তাহার প্রবর্ত্তক এবং নিয়ামক। নীতির উৎপত্তি ধর্ম্ম হইতে। এই পৃথিবীতলে যে যে স্থলেই মনুষ্য বলিয়া জীবের সঞ্চার আছে, তথায়ই এই ধর্ম্ম, যে কোন আকারে হউক, ইহার অস্তিত্ব দেখিতে পাইবে। দক্ষিণআফ্রিকার আদি বহুতর পরিব্রাজক কহিয়া থাকে, তাহারা এই জগতে আবিপোণ আদি এমন অনেক জাতি দেখিয়াছে যে যাহাদের কোনরূপ ধর্ম্মতত্ত্ব নাই। সে কথা শুনিও না। তাহারা যে ধর্ম্মতত্ত্বের অভাব দেখিয়া সেরূপ রটনা করিয়া থাকে, তাহা সেই তাহাদিগের আপন আপন ধারণার বিষয়ীভূত ধর্ম্মের। নতুবা, আমি যতদূর জ্ঞাত আছি, আজি পর্য্যন্ত এমন কথা কেহ আসিয়া শুনাইতে পারে নাই যে, যথায় মানবজীবনে কোন না কোন প্রকার লোকাতীত শক্তির প্রতি বিশ্বাস এবং নির্ভরতার অভাব দৃষ্ট হয়। তবে একথা সত্য বটে যে, বিভিন্ন ব্যক্তি এবং বিভিন্ন জাতিবিশেষে, পালনীয় ধর্ম্মের আকার প্রকার, হীনতা বা উৎকর্ষভাব, গভীরতা বা প্রশস্ততা, ইত্যাদি বহুতর প্রভেদ লক্ষিত হয়। কিন্তু সেই ধর্ম্ম যে প্রকারেরই হউক তাহা, তৎ তৎ ব্যক্তি এবং জাতির জ্ঞান জীবন, জীবনের উদ্দেশ্যভূত পালনীয় কর্ম্ম এবং সেই কর্ম্মক্ষমতা, জীবনের সুখ দুঃখ এবং শুভাশুভ বোধ, ইত্যাদির পরিচালকতা পক্ষে প্রচুর; এবং সেই সেই বিষয়ও আবার সেই ধর্ম্মবোধের পরিমাণ অনুসারেই সংগঠিত হয়। তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে তোমার গির্জা এবং মন্দির ও তোমার উপযুক্ত শুভাশুভের কল্যাণে

তুমি যেমন জীবিত রহিয়াছ; তাহারা কখন তদ্রূপ জীবিত থাকিতে পারিত না। পাপে মৃত্যু, ধর্ম্মে জীবন। পুনশ্চ তোমরা ভাবিতেছ তাহাদের জ্ঞানধর্ম্মাদি যেমনই হউক তাহা অবশ্যই অপূর্ণ, কারণ, দেখা যাইতেছে তাহারা বড় কষ্টে আছে, তুমি এরূপ ভাবিতেছ বটে কিন্তু তাহারা তাহা ভাবে না। ঈশ্বর তাঁহার ছোট বড় সকল কর্ম্মকারকেই, স্ব স্ব ক্ষুদ্র বা বৃহৎ জ্ঞান ও অনুভব শক্তির সীমান্তমধ্যে, চিত্তপ্রবোধক এবং জীবনের অবলম্বন স্বরূপ অনুরূপতৃপ্তির বিধান করিয়া দিয়াছেন।

বাঞ্ছারাম, তুমি বলিবে কত কত জাতি চুরী করিতেছে, মানুষ মারিতেছে, মানুষ খাইতেছে, এবং ধর্ম্ম লইয়াও কাটাকাটি করিতেছে, অথচ তাহারা সেরূপ করাকে অধর্ম্ম ভাবে না; তবে সে সকল কোন্ মঙ্গলকর ঈশ্বরদত্ত ধর্ম্মের ফল? তাহাই হউক, মানুষ মারুক, খাউক, কাটাকাটি করুক, তাহাতে কিছু আইসে যায় না। অজ্ঞদিগের আদর্শ সীমায় উঠা পর্য্যন্ত, তাহাদের মানুষমারা, মানুষ খাওয়া প্রভৃতি যে সকল অসৎ-দৃষ্ট কার্য্য, প্রকৃতি তাঁহার উৎপত্তি ক্ষয়াদি বিধায়ক শক্তি দ্বারা স্বয়ং তাহার নিরাকরণ করিয়া থাকেন। ধারণার অনধীন কার্য্যে মানব হিতাহিত-বুদ্ধিশক্তিশূন্য; অধীন কার্য্যেই পাপ পুণ্যের সঞ্চার হইয়া থাকে। যাহাহউক, অজ্ঞদিগের পক্ষে আপাততঃ যে পর্য্যন্ত হইলে তাহাদিগকে জীবিত রাখিয়া কর্ম্মসংসারের যে কর্ম্মটুকু তাহাদের দ্বারা লওয়ার আবশ্যক, তাহার পরিমাণ অনুরূপ সে পর্য্যন্ত ধর্ম্মবুদ্ধি ঈশ্বর তাহাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। তাহার অতিরিক্ত যে সকল কার্য্য, সময়ে তাহার নিমিত্ত উন্নত ধর্ম্মবুদ্ধি ও সময়ে তাহার নিরাকরণ হইবে। ফলাফলের যথায় সীমা নাই, গতি যথায় অনন্ত, তখন তাহার নিরাকরণ জন্য এত চিন্তা কি? গতি ঊর্দ্ধমুখে; অপকর্ম্ম সকল প্রায়শ্চিত্ত সহ ক্রমে বিলীন হইয়া যায়। পুনশ্চ, আবার যদি সকলেরই শেষ এইখানে হইত, তাহা হইলেও না হয় একদিন তোমার কথা শুনিতাম ও তোমার কথা লইয়া ভাবিতাম। কিন্তু তাহা নহে। বাঞ্ছারাম, এক্ষণে তোমার সম্বন্ধে এই বলি যে অন্যের কিরূপ ধর্ম্মাধর্ম্মের ধারণা তাহা লইয়া তোমার কার্য্য নহে; তুমি তোমার মনীষাশক্তির ঊর্দ্ধতম চালনে বা অন্যের প্রদর্শনে

আপনার মনে কতদূর ধারণা করিতে পারিয়া থাক, তাহা লইয়া কার্য্য। সেই ধারণা মত সাত্ত্বিক ভাবে কার্য্য করিও, প্রচুর হইবে। অসভ্যদিগের একটি বড় গুণ, তাহা তোমাতে কিন্তু বড় একটা দেখিতে পাই না,—ভালর হউক মন্দর হউক, অসাত্ত্বিক ভাব কাহাকে বলে, তাহা তাহারা জানে না। যাহা করে, তাহাই পূর্ণচিত্তে ও প্রাণপণে। তুমি পার না? হিতাহিত বোধের আধিক্য হেতু 'বাঁশবনে ডোম কাণা,' হইয়া গিয়াছে।

পুনশ্চ, কাষ্ঠে অগ্নিসংগ্রহ সুপ্ত ভাবে সর্ব্বদাই আছে। কাষ্ঠের প্রকৃতিভেদে,যে যে কাষ্ঠ যে পরিমাণে সূর্য্যতাপ অগ্নিরূপে সংগ্রহ করিতে পারে, সে সেই পরিমাণে দহ্যগুণবিশিষ্ট। সংঘর্ষ বা অগ্নিস্ফুলিঙ্গযোগে সেই অগ্নি জাগরিত বা উদ্দীপিত হয়। সকল কাষ্ঠেই সমানভাবে উদ্দীপিত হয় না, কোথাও ধোঁয়া, কোথাও ধীরে, কোথাও এক বারে উদ্দীপিত হয়; আবার কোথাও বায়ুমণ্ডলের প্রতিকূলতায় ও আকাশের সংস্রবে উদ্দীপিত অগ্নিও নির্ব্বাপিত হইয়া অঙ্গারমাত্র-অবশিষ্ট হইয়া থাকে। মানবে ধর্ম্মপদার্থ তদ্রূপ,বিভিন্ন জাতি,ব্যক্তি বা শ্রেণীভেদে বিভিন্ন পরিমাণে নিহিত। আত্মচিন্তা প্রভাবে বা উপদেশ সহযোগে, পাত্র অনুসারে অনুরূপ উদ্দীপিত হইয়া অনুরূপ তেজধারণে কার্য্যকরী হয়; আবার অনেক স্থলে উদ্দীপিত হইয়াও প্রতিকূল কারণযোগে নির্ব্বাপিত হইয়া অঙ্গার-অবশিষ্ট হইয়া থাকে,—ইহারাই এ জগতে নাস্তিকরূপী। সর্ব্বদেব-ঋত্বিক অগ্নিদেব মূর্ত্তিমান প্রকটিত না হইলেও, কাষ্ঠ অব্যবহারে যায় না। সুধু কাষ্ঠের নানারূপ ব্যবহার এবং প্রয়োজনীয়তা যখন আছে (এবং বলা বাহুল্য যে সেই প্রয়োজনীয়তা যদিও অন্য রকমে দেখা যাইতেছে, তথাপি তাহা দাহ্যপদার্থ বিশেষের অস্তিত্ব-জনিত গুণভাবান্তর হইতেই উৎপন্ন), তখন অপ্রকটিত-ধর্ম্ম অসভ্য জাতির প্রয়োজনীয়তা না থাকিবে কেন,এবং কেমন করিয়াই বা বলিবে যে সে একেবারে ধর্ম্মপদার্থের অস্তিত্ব-পরিশূন্য! কিন্তু এক কথা আছে বাপ্পারাম, কাষ্ঠ এবং অঙ্গার এ উভয়ের প্রয়োজনীয়তার তারতম্য অনেক! তবে কখন কখন তেঁতুল কাঠের অঙ্গার আর ভেরেণ্ডা কাঠে প্রয়োজন আধিক্যের কিছু কিছু ইতর বিশেষ দেখা যায় বটে,কিন্তু সে কেবল অপকৃষ্টের শ্রেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠের অপকৃষ্ট

এই সম্বন্ধে। মহ্যগুণ প্রধানা করিয়া এই কাষ্ঠের উপমা কেবল উপমা স্বরূপ বলিলাম না; বিশ্বের রীতি ও নিয়ম যেরূপ তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিলাম।

ফলতঃ 'অমুক ব্যক্তি বা জাতি ধর্ম্মহীন' কি অশ্রদ্ধেয়, শুনিবার কি অযোগ্য কথা! পুনর্ব্বার বলিতেছি, মনুষ্যজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য কর্ম্ম, কর্ম্মের মূল নীতি, নীতির মূল ধর্ম্ম; অথবা সহজ কথায়, কর্ম্মের মূল ধর্ম্ম; যথায় ধর্ম্ম নাই, তথায় কর্ম্মও নাই, কর্ম্ম না থাকিলে মনুষ্য-জীবন উদ্দেশ্য-শূন্য, উদ্দেশ্যশূন্য বস্তু এ জগতে তিষ্ঠে না, তখনই তাহার লয় হইয়া থাকে। এ জগতে প্রকৃত নাস্তিক নাই, হাজারও পণ্ডিত হাজার-বার একথা বলিয়া গিয়াছেন; আমি হাজারের উপর আর একবার বলিব, এ জগতে নাস্তিক নাই। যাহাদিগকে সচরাচর নাস্তিক বলা যায়, তাহা-দের আপন বুদ্ধিবিপাকে, ও লোকে তাহাদের প্রতি সেই বুদ্ধিবিপাক হেতু নাস্তিকার্থ-বোধক শব্দ প্রয়োগ করে বলিয়া, তাহারা নাস্তিক নামে বিখ্যাত হইয়া থাকে।

তোমার চার্ব্বাক দর্শন, কোম্‌তে দর্শন, সৌখীন আসবাবের মধ্যে জানিও, সময়কালে কিন্তু সেই সময়ের অতীত পুরুষ যিনি ও সময় যাঁহাতে নিরন্তকুহক হইয়া থাকে তাঁহার আশ্রয় ভিন্ন গত্যন্তর নাই। এজগতে যে কেহই হাজার নাস্তিক বা কুকর্ম্মশীল হউক, যতক্ষণ দেখিবে সে জীবিত রহিয়া চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে, ততক্ষণ জানিও, সে দেখিতে পাউক বা না পাউক, অথবা তুমিই দেখিতে পাও বা না পাও, ধর্ম্ম তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই। সে দগ্ধ অঙ্গার, অঙ্গারেও অগ্নি কিছু কিছু সুপ্তভাবে থাকেন। তবে কথা এই, সেরূপ ধর্ম্মে বা সেরূপ কর্ম্মে জীবনের উদ্দেশ্য সফল বলিতে পারা যায় না। সমুদ্র ছেঁচিবার জন্য যাহাকে শক্তি প্রদান করা হইয়াছে, সে যদি গোষ্পদ ছেঁচিয়া পর্য্যাপ্ত জ্ঞান করে, তাহাকে লোকতঃ অলোকতঃ কোন রকমেই শক্তির সার্থকতা বলা যায় না। অসভ্য মানব যে, সে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধির অভাবে সামান্য বুদ্ধি প্রাণপণে পরিচালিত করিয়াও, তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়।

ধর্ম্মবুদ্ধি মানবের আভ্যন্তরীণ পদার্থ, বহির্জগতের সহিত সংস্রবে রূপ প্রাপ্ত হয়। বহির্জগৎ যখন অন্তর্জগৎ সহ আসিয়া একমিল এবং একাঙ্গ হইয়া যায়, তখনই এই রূপের সঞ্চার হইয়া থাকে। এই রূপের প্রতি-প্রসবেই কর্ম্ম। রূপের পরিমাণ ও স্বভাব প্রকৃতি আদি বিষয়, কথিত উভয় জগতের মিলনের পরিমাণ ও প্রকার অনুসারে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। যতক্ষণ না অন্তর্জগৎ বহির্জগতের সহিত মিলিত হইবে, ততক্ষণ অন্তর্জগৎ বা আত্মীক জীবন দৃষ্টি-শূন্য। এই মিলনের প্রথম সংঘটনে চক্ষু-উন্মিলিত হয়, এবং ভাবী গুরুতর মিলনের জন্য বহির্জগৎস্থ বিষয় সংগ্রহার্থে দৃষ্টি প্রসারিত হইতে থাকে। এই প্রসারিত দৃষ্টি-দৃষ্ট বিষয় যত সংগৃহিত হইতে থাকে, ততই অন্তর্জগৎ বিস্ফারিত সুতরাং ততই ধর্ম্মবোধের কলেবর বৃদ্ধি হয়, এবং সেই কলেবর বৃদ্ধি হইতে আবার অনুরূপ কর্ম্মের উৎপাদন হইয়া থাকে। অথবা উপমায় বলিতে গেলে, কর্ম্ম ফল পুষ্পপূর্ণ বৃক্ষ, ধর্ম্ম তাহার স্কন্ধ, অন্ত-র্জগৎ মূল, বহির্জগৎ পরিপোষক রসাদি। পদার্থ এক, কেবল স্থান গুণ ক্রিয়া প্রকরণ আদি অনুসারে, পর্য্যায় বা শ্রেণীভেদে বিভিন্নরূপ লক্ষিত হইয়া থাকে। কথিত দৃষ্টি-সঞ্চালনকে সাধারণতঃ দূরদর্শন বলে; সেই দৃষ্টি আরও গুরুতর হইলে তাহা কবিত্ব, এবং গুরুতম হইলে ঋষিত্ব; ঋষির মুখেই ধর্ম্ম প্রচার হইয়া থাকে। এই সকলের আবার যাহারা গুণ বিশ্লেষণ বুঝাইয়া দেয় তাহারা তত্বজ্ঞ বা তত্ত্ববিৎ। সাধারণ দৃষ্টি যাহাদের সম্পত্তি, তাহারা দূরদর্শী; যাহারা তাহাদের সেই দূরদর্শন কার্য্যে পরিণত করিয়া থাকে, তাহারা সাধারণ কথায় "কাজের লোক।" গুরুতর দর্শক যাহারা তাহারা কবি; তাহাদের উদ্ভাবিত বিষয় যাহারা কার্য্যে পরিণত করিয়া থাকে তাহারা জ্ঞানী। গুরুতম দর্শক যাহারা তাহারা ঋষি; এবং যাহারা সেই ঋষিবাক্য কার্য্যে পরিণত করিয়া থাকে, তাহারা ধার্ম্মিক। কিন্তু হতভাগ্য তাহারা, যাহারা দৃষ্টিশূন্য, এবং বহির্জগৎকে অন্তর্জগতের সহিত না মিলাইয়া, বা তাহাদের মিলন অনুভব করিতে না পারিয়া, বহির্জগৎকে বাহিরেই রাখিয়া বাহিরে বাহিরে তাহাকে ক্রিড়াপদার্থের ন্যায় ব্যবহার

করিয়া থাকে। দৃষ্টিশূন্য অন্ধের ন্যায় অপার আয়োজন পদার্থের মধ্যে দ্বন্দ্ব-ঘূর্ণিত হইয়া উন্মাদবৎ ফিরিতে থাকে, প্রতিকূল ঘাত প্রতিঘাতে মুহ্যমান হইয়া অধঃপাতের পথে অগ্রসর হয়। তাহাদের যে কোন কার্য্য অন্তঃস্থল হইতে উৎপন্ন হয় না, হস্ত হইতে উৎপন্ন হয় মাত্র; সুতরাং অসাত্ত্বিক এবং মিথ্যা, তাহা কর্ম্ম নহে, কর্ম্ম মরীচিকামাত্র। যেমন উৎপন্ন হইতেছে, এবং উৎপন্ন হয়ও অনেক, তেমনি আবার চিহ্নমাত্রশূন্য হইয়া বিলীন হইতেছে; এবং বিলীন হইবার কালে উন্মাদকে আরও উন্মাদিত করিয়া যাইতেছে। উহা প্রলয়-প্রতিরূপ। আমাদিগের আধুনিক জাতীয় জীবনের বহুলাংশে এই দশা,—এই প্রলয় প্রতিরূপের অনুসরণ হইতেছে। এখানে ধর্ম্ম কর্ম্ম, সাহিত্য, সভ্যতা, যে কিছু বিষয় সমস্তই আসবাবের ন্যায়, আভ্যন্তরীণ কিছুই এপর্য্যন্ত হয় নাই: সকলই শোভা বা অলঙ্কারস্থনীয়, সকৃৎ জ্যোতির্বিভাসিত আত্মভূ ও আপ্ত পদার্থ নহে।

ধর্ম্মই কর্ম্মমূল হইলেও, সকল ধর্ম্মও এক নহে, সকল কর্ম্মও এক নহে। নানা প্রকৃতিবিশিষ্ট অন্তর্জগৎ নানারূপবিশিষ্ট বহির্জগৎ; যখন যে প্রকৃতি যেরূপ রূপের সহ সংমিলিত হয়, তখন প্রসারিত দৃষ্টিও তদভিগামিনী হইয়া থাকে। অনুরূপ দৃষ্টি হইতে অনুরূপ ধর্ম্মের উৎপত্তি; এবং অনুরূপ ধর্ম্ম হইতে অনুরূপ কর্ম্মের উৎপত্তি হয়। যাবতীয় বিষয়ের ন্যায় ইহারও আবার, উক্ত কারণেরই কার্য্যকারিত্বের ইতর বিশেষ, ন্যূনাধিক্য বা দেশ কাল পাত্র অনুসারে, অসংখ্য শ্রেণী এবং পর্য্যায় ও উত্তম অধমাদি ভেদ হয়। যে দৃষ্টি ইহলৌকিক বিষয়ে প্রসারিত, তদুৎপন্ন ধর্ম্মকে লৌকিক ধর্ম্ম বলে; যাহা পারলৌকিক বিষয়ে প্রসারিত, তাহাকে পারলৌকিক ধর্ম্ম বলে। এই উভয়বিধ ধর্ম্মই লোকমনে তিষ্ঠিয়া থাকে; কিন্তু তখনই তাহারা পূর্ণ সৌন্দর্য্যের কারণ হয়, এবং তখনই তাহাকে পূর্ণধর্ম্ম বলা যায়, যখন সমভাবে সামঞ্জস্য সংমিলিত হইয়া তাহারা চিত্তমধ্যে অবস্থান করিয়া থাকে। কিন্তু তাহা এপর্য্যন্ত কখনই সম্পূর্ণ ভাবে পৃথিবীতে ঘটিয়া উঠে নাই, এবং পৃথিবীও তাহার জন্য আজি পর্য্যন্ত প্রস্তুত হয় নাই। পৃথিবীতে এখনও একতর প্রাধান্যযুক্ত ধর্ম্মের

প্রাধান্য, হয় লৌকিক নয় পারলৌকিক। প্রাচীন যুগের ভারতীয় ধর্ম্ম অতিপারলৌকিক, গ্রীকধর্ম্ম অতিলৌকিক, । বর্ত্তমানযুগে, খৃষ্টীয়ধর্ম্ম শুদ্ধ পারলৌকি এবং মহম্মদীয় ধর্ম্ম শুদ্ধ লৌকিক ; ইহার পর এমন একদিনও আবার আসিতেছে,যেদিন এই লৌকিক ও পারলৌকিক উভয়ই আসিয়া একতায় মিলিত হইয়া, লৌকিক ও পারলৌকিক প্রভেদশূন্য হইবে। সেই দিনের পর হইতেই জগতে নূতন স্বর্গ ও নূতন পৃথিবী বিরাজ করিতে থাকিবে ; স্বর্গ ও পৃথিবীর উভয় সংমিলনে, স্বর্গপ্রিয়গণ স্বচ্ছন্দে উভয়লোকে বিচরণ করিয়া ফিরিবে। ইহা মানবীয় আত্মিক উন্নতির চরম পুরস্কার বলিলে বলা যায়। কিন্তু এখনও সে দিন দূরে।

আত্মিক উন্নতি যখন যাহার যেরূপ, তাহাকে তাহার সেই অবস্থার উপযুক্ত যাহা, তাহার অতিরিক্তে চাপাচাপি করিয়া যে প্রকারেরই ধর্ম্মে তাহাকে দীক্ষিত করা যাউক না কেন, সে তখনই তাহা আপন প্রকৃতি জ্ঞানের সমতায় আনিয়া তবে ক্ষান্ত হইবে। ইহার সুন্দর দৃষ্টান্ত মুসলমান ও খৃষ্টানগণ। যিশুখৃষ্ট ও মহম্মদ উভয়ই ধর্ম্মপ্রচারক ; কিন্তু এক জন বিনীত আর একজন উদ্ধত ; অথবা অন্য কথায় একজনের প্রচার কার্য্য পারলৌকিক বা আত্মিক ভাবে, আর একজনের প্রচারকার্য্য লৌকিক বা ভৌতিক ভাবে। ইহলোক-সুখ-প্রার্থী মুসলমানেরা স্বধর্ম্মে অটল। কিন্তু আধুনিক খৃষ্টশিষ্যেরাও অনুরূপসুখপ্রার্থী, অথচ খৃষ্টধর্ম্ম তাহাদের উপর চাপান সুতরাং খৃষ্টান হইয়াও ইহারা খৃষ্টান নহে ;— ক্লোবিসের ন্যায় খৃষ্টান,স্বদল বলে খৃষ্টের আত্মবলির সময় উপস্থিত থাকিলে খৃষ্টের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতেন। খৃষ্টের শিক্ষা আত্মবলি, কিন্তু খৃষ্টশিষ্যেরা বুঝে পরবলি ; ধর্ম্ম ঘাড়ে চাপাইয়া দিলেও, অসুবিধা দেখিয়া ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের নাম ভিন্ন আর আর কিছু গ্রহণ করিল না। খৃষ্টানদিগের মধ্যে অনেকস্থলে বিষয় বিশেষে ধর্ম্মের আবরণ দিয়া না হয় এমন কার্য্যই নাই। যিশুখৃষ্ট যদি ধর্ম্মপ্রাণ ভারতে জন্মিতেন, তাহা হইলে বোধ করি তাঁহার প্রকৃত সম্মান রক্ষা হইত।

সে যাহা হউক, আমরা কথায় কথায় মূল প্রস্তাব পরিত্যাগ করিয়া অতর্কিত ভাবে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি ; কার্য্যটা বোধ হয় ভাল

হয় নাই। অতঃপর যে কোন ব্যক্তি হউক্ বা জাতিই হউক—এখানে আমাদের জাতি লইয়াই কথা, অতএব যে কোন জাতিই হউক—তাহার এ জগতে প্রকৃতি কি, উদ্দেশ্য কি, কার্য্যই বা কি ও তৎ তৎ বিষয় তাহাদের হাতে কতদূর অনুসৃত,সম্পাদিত এবং সফলতা প্রাপ্ত হইয়াছে এই সকলের আলোচনা; গূঢ় অথচ দর্শন সমক্ষে সর্ব্ববিকাশক তাহাদের এইসকলের মূল অনুসন্ধান, এবং তাহাতে প্রবেশাধিকার লাভ; এই সকলে বাঞ্ছা থাকিলে, সর্ব্বাগ্রে সেই জাতির ধর্ম্মজীবন এবং ধর্ম্মতত্ত্ব পর্য্যবেক্ষণ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আমরাও তাহাই করিতে যথাযথ চেষ্টা পাইব; আমরাও দেখিতে চেষ্টা করিব এতদুভয়ের মধ্যে কর্ম্মজীবন ও ধর্ম্মতত্ত্ব কিরূপের।

ভারতে ভারতীয় মানবচিত্ত ভারতের অদ্ভুত প্রকৃতিদর্শনে,বিস্ময়াভিভূত হইয়া ক্রমে মনস্তত্ত্ব এবং পারলৌকিক চিন্তায় এরূপ সমাহিত হইয়া আসিল যে,পর পর অদৃশ্য ভেদ করাই মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। গ্রীকচিত্তে তাহা নহে। প্রকৃতিবক্ষে যথায় যথায় হিন্দুর হস্ত বিস্ময়-আকুঞ্চিত, গ্রীকহস্ত তথায় তথায় প্রভূত বলদীপ্ত; সুতরাং সে তাহার নিজ স্বয়ং স্বামিত্বই বুঝে ভাল। গ্রীকের নিকট পরলোক বা লোকাতীত শক্তি থাকুক বা না থাকুক, তাহাতে তাহার বড় একটা অধিক যায় আসে না; কিন্তু স্বীয় শক্তিসাধ্য আত্ম ঐশ্বর্য্য এবং সুখ,ইহার স্বচ্ছন্দ সম্ভোগে ইহ জীবন কাটাইতে পারিলেই জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করা হইল। গ্রীকদিগের কর্ম্ম প্রবাহ যাহা,তাহার মূলস্থানকে এই আধিভৌতিক বুদ্ধি সামান্য উত্তেজিত করে নাই। বলা বাহুল্য যে ভারতীয় জীবন ঠিক ইহার বিপরীত। ভারতচিত্ত উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম, চতুর্দ্দিকেই,যে কোন দিকে নেত্র নিপতিত,তথায়ই যাবতীয় প্রাকৃতিক কার্য্যমাত্রে একমাত্র অদৃষ্টহস্তকে বলবান দেখিতে পাইতেন। প্রকৃতি সর্ব্বত্রেই তাহার ভীষণ শক্তি প্রবাহে পদে পদে মনুষ্য হস্তকে বিমুখ,বিতাড়িত এবং ভগ্ন-উদ্যম করিয়া দিতেছে। উর্দ্ধ মুখে তাকাইতে গেলে এই ফল; এদিকে নিম্ন-মুখে তাকাইতে গেলে ঘৃণিত দাসবর্গ; এবং নিম্নমুখে যে কিছু আশ্রয়ের অভিলাষ, তাহা এই ঘৃণিত দাসবর্গের ঘৃণিত জীবন দৃষ্টে তিরোহিত

হইতেছে। সুতরাং কোন দিকেই স্থান না পাইয়া, ভগ্নোদ্যম, ভগ্নশক্তি মানব, ভয়বিস্ময়ে আপ্লুতচিত্ত ও আত্মলুপ্ত হইয়া, অদৃষ্টহস্তে দোদুল্যমান হইতে লাগিলেন। "আমি কে" "কোথা হইতে আসিয়াছি," "কেন এ সংসারে স্থিতি"—"আমার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য কি"—"কোথায় যাইব"—"এ বাহ্যজগতের সহিত আমার সম্বন্ধ কি"—এবং "কাহার আজ্ঞায় এই বাহ্যজগৎ পরিচালিত হইতেছে", মানবচিত্ত এই সকল প্রশ্ন আপনাকে আপনি জিজ্ঞাসা করিতে করিতে, নিগূঢ়ভাবে আত্মচিন্তায় নিমগ্ন হইয়া গেল। চিন্তারও সীমা নাই; আত্ম-লোপেরও সীমা নাই; তথাপি চিত্তের শান্তি কোথায়? চতুর্দ্দিকে, যে দিকে তাকাই, কেবল একমাত্র স্বচ্ছন্দতিমিররাশি দিগ্বলয়কে বিনষ্ট করিয়া, বিকটবেশে যুগপৎ হৃদয়কে আকম্পিত ও আকুলিত করিয়া তুলিতেছে। তাহার উপর—তাহার উপর—তাহার উপর, তথাপি কোথাও ইহার সীমা দেখিতে পাই না। আশা নিরাশা সমপ্রায় তরঙ্গপতিতবৎ কূলশূন্য কালতরঙ্গে কেবল হাবুডুবু খাইয়া হাহাকারমাত্র সার, সে হাবুডুবু হাহাকারের ঘটা দেখিতে চাও কি? ঐ দেখ এক জন প্রাচীন, কিন্তু তখনও নবাগত, বৈদিক ঋষি, কিরূপ ঘোরতরঙ্গে পতিত হইয়া, কিরূপ হাবুডুবু খাইতে খাইতে কি ঘোর অস্ফুট চীৎকার করিতেছে! সে চীৎকারের ধ্বনি এরূপ দিগন্ত-বিশ্রুত যে তাহার শব্দ এত দূরেও, এ নানা আবর্ত্তময়ী কালতরঙ্গ ভেদ করিয়াও আমাদের কর্ণগত হওয়ার পক্ষে কিছুমাত্র ত্রুটি হইতেছে না;—"সেই আদিতে সৎ, অসৎ, রজো বা ব্যোম, ইহার কিছুরই অস্তিত্ব ছিলনা। বলিতে পার এ সকল কিসের দ্বারা আবরিত ছিল,—বা কাহার অভ্যন্তরেই বা এসকলের বীজ নিহিত ছিল? যাহাতে আবরিত ছিল, তাহা কি জল?—না "গহনম্ গভীরম্"? তখন হয়ত মৃত্যু বা অমৃতত্ব ছিল না, রাত্রি বা দিবার প্রভেদ ছিল না, কেবল একমাত্র, যাহার অন্যতর বা ঊর্দ্ধে কেহ নাই, যিনি আপনাতেই নির্ভর করিয়া শ্বাসক্রীড়া নিরত, কেবল একমাত্র তিনিই বর্ত্তমান ছিলেন। অগ্রে কেবল অন্ধকার গূঢ়তম অন্ধকারে আবৃত, এবং সর্ব্বত্র "অপ্রকেতম্ সলিলম্" দ্বারা পরিব্যাপ্ত

ছিল। এবং সেই এক মাত্র, যিনি তুচ্ছের দ্বারা আবরিত ছিলেন, তপোদ্বারা পুষ্কতাযুক্ত হইলেন। মনের প্রাথমিক বীজস্বরূপ কাম সর্ব্বাগ্রে তাহাহইতে উৎপন্ন, এবং কাম হইতে রেতঃ উৎপন্ন হইল। সদসতের সংযোগরজ্জুস্বরূপ ইহার অবস্থিতি, কবিগণ আপনাপন অন্তঃকরণে বুদ্ধি দ্বারা অনুভব করিয়াছিলেন। যে রশ্মি জগৎ-ব্যাপ্ত হইয়া বিস্তৃত,তাহা কি অধঃ না উপরে অবস্থিত ছিল? রেতঃ, মহিমা, এবং স্বধা কি নিম্নে ও মহাশক্তি উর্দ্ধে ছিল? এই সৃষ্টি কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, কে ইহার সৃষ্টি করিল, কে জানে?—কে কহিতে পারে? দেবতারা কি পারেন? তাঁহারাত এই সৃষ্টির পরে জন্মিয়াছেন, অতএব তাঁহারাই বা কেমন করিয়া কহিবেন? অতএব কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব? কে বলিবে? যাহারা সৃষ্টির পরে জন্মিয়াছে, তাহাদের ত জানিবার সম্ভব নাই। যিনি এই বিশ্বের অধ্যক্ষ, যিনি স্বর্গে অবস্থান করিতেছেন, তিনি কি এ তত্ত্ব জানেন? হয়ত তিনি এ তত্ত্ব জানিতে পারেন, অথবা হয়ত তিনিও ইহা জানেন না।" ২

পিঞ্জরবদ্ধ মানবচিত্ত পিঞ্জরমুক্ত হইবার নিমিত্ত উন্মত্তবৎ ছট্‌ফট্‌ করিতেছে,—পিঞ্জরের দ্বার বদ্ধ। বিনষ্ট-দিক-অন্ধকারে ভ্রান্ত পথিক নিদর্শনী আলোক-দর্শন লালসায় এদিক ওদিক ধাবিত হইয়া কুশকাঁটায় রক্তারক্তি হইতেছে,—কোথাও নিদর্শনী আলোকের চিহ্ন মাত্র নাই। আর্য্য ঋষি যখন এই ঘোর চিন্তাতরঙ্গে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছেন, তখন গ্রীক চিত্তের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া দেখ। হিন্দুচিত্ত যখন প্রকৃতি-করুণায় স্বচ্ছন্দে আহার-লালসাকে অতিক্রম করিয়া, জীবনের তদূর্দ্ধ অবলম্বনের অনুসন্ধানে অচিন্তনীয়কে ভেদ করিতে উদ্যত হইয়াছে, গ্রীকচিত্ত হয়ত তখনও আহারলালসাকেই মুখ্য অবলম্বন করিয়া, তাহার অনুসরণ করিতেছে। সকল কর্ম্ম ফেলিয়া, আগে একটি ঘর, একটি স্ত্রীলোক এবং একটি হাল গরু করিবে; স্ত্রীলোকটি যেন ক্রীতা,বিবাহিতা না হয়, এবং গবাদিচারণে পটু হয়। "যে কিছু যন্ত্রাদির আবশ্যক তাহা ঘরে সংগ্রহ করিয়া রাখিও,নতুবা অন্যের কাছে চাহিতে গেলে যদি সে না

২। ঋঃ বেঃ ১০মঃ। ১২৯ সূঃ।

দেয়; তবে তাহার অভাবে সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইবায়, সমস্ত শ্রম বিফল হইয়া যাইতে পারে।" অথবা, "গৃহ যাহাতে আহারীয় বস্তুতে পূর্ণ থাকে, এরূপ শ্রমে সন্তোষ লাভ করিতে শিখ। শ্রমেই লোকে ধন ধান্য পূর্ণ ও স্বচ্ছলতাযুক্ত হইয়া থাকে। এরূপ শ্রমেই লোকে দেব মানবের প্রিয় পাত্র হয়।" যে হেসিওদ আপন ভ্রাতাকে, এবং ভ্রাতার উপলক্ষে সমস্ত গ্রীক বর্গকে এরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন,৩ তাঁহার সৃষ্টি ও দেবতত্ত্ব হয়ত তখনও ভবিষ্যতের দূরতম গর্ভে নিহিত ছিল।

প্রকৃতি যেখানে যতই ক্ষীণবেশে থাকুক, মানবচিত্তে পারলৌকিক ভাবের আবির্ভাব করিবেই করিবে; প্রভেদ কেবল আকর্ষণী শক্তির গুরুত্ব, বা লঘুত্ব ও প্রকরণাদিভেদে, বিভীষিকা বা বিস্ময়াদি ঔপসর্গিক বিষয়ের ন্যূনেতর ভাব এবং তজ্জনিত ধারণা ও বিশ্বাসের বৈচিত্রতা মাত্র। অতএব গ্রীকচিত্ত যখন দেখিল যে পারলৌকিক ভাব-আবির্ভাবের হাত হইতে আর কোন রকমে ছাড়াইবার যো নাই, তখন যাহা হউক তাহার একটা উপায় আবশ্যক; নতুবা চিত্ত প্রবোধ মানিতেছে না। ভাল! তাহাই হইবে। ইহারা আদত কাজের লোক, হাতে হাতে ফল চাহি,— হাতে হাতে নিরাকরণ চাহি, নতুবা বাতাসে দড়ি বাঁধিয়া কি হইবে; অতএব অদৃষ্ট বিষয়ের জন্য অধিক হাবুডুবু খাইবার প্রয়োজন নাই। সুতরাং যে 'গহনম্ গভীরম্' লইয়া হিন্দুসন্তানকে এত হাবুডুবু খাইতে দেখিয়া আসিলে, গ্রীক সন্তান এক নিশ্বাসে তাহার নিরাকরণ করিয়া ফেলিল। প্রকৃতিপ্রতি দৃষ্টিমাত্রেই স্থির হইল "গহনম্ গভীরম্" (chaos) হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইল। কিন্তু কেন হইল, কে করিল? "গহনম্ গভীরম্" বা কি? তাহা বৈদিক ঋষি বসিয়া ভাবুন, আমার ভাবিবার আবশ্যক নাই; কেন হইল, কে করিল, তাহাতে আমার আবশ্যক কি? যেই করুক, যে কারণেই হউক, উহা হইয়াছে; উহা আছে, এবং আমি আছি,— উহা আমার সকল রকমের অভাব পূরণ করিতেছে, ইহাই যথেষ্ট; আর অধিকে আমার কি আবশ্যক? চিত্তের এ নিষ্পত্তি; শেষ নিষ্পত্তি; ইহার উপর তর্ক খাটে না। অতএব গ্রীকচিত্ত অম্লানমুখে তাহার উপর

৩। Hesiod, Works and Days 309-312, 407-409.

ঢাল চাপা দিয়া, আহার করিতে করিতে সৃষ্টি প্রক্রিয়া নিরূপণ করিলেন। পৃথিবী হইতে উরেণস্ অর্থাৎ তারকামণ্ডল বেষ্টিত আকাশের উৎপত্তি হইল। অনন্তর পৃথিবী এবং আকাশ এতদুভয়ের মধ্যে প্রণয় সংস্থাপন হইলে, উরেণসের অর্থাৎ আকাশের ঔরসে এবং পৃথিবীর গর্ভে দ্বাদশ তিতান, কিক্লোপিসত্রয় ইত্যাদির জন্ম হইল। ইত্যাদি ইত্যাদি।৪

ক্রমে বহুদেবের উৎপত্তি হইল। কিন্তু ইহাদের সকলেই তাৎকালিকী মানব চিত্তায়ত্ত সুখের জন্য লালায়িত; সুতরাং পরস্পর মানবীয় হিংসা, দ্বেষ, হত্যা, পিতৃহত্যা প্রভৃতি দ্বারা স্ব স্ব বিভবে স্থাপিত হইলেন;—অথবা অন্য কথায় কল্পনামার্গে আর একদল উচ্চশক্তি ও উচ্চবিভব-শালী গ্রীকের উপস্থিতি হইল। যাহা হউক ইহারা উচ্চ এবং দেবতা. সুতরাং ইহাদিগকে মান্য করিতে হইবে; কিন্তু মান্যের প্রতিদান চাহি, নতুবা ওসকল আমা হইতে হইবে না। অতএব গ্রীক দেবতা কখনও ভূমি চসিয়া চাস করিতে লাগিলেন; কখনও বা মদ চোয়ানের সাহায্য করেন; কখন বা ভাল অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তুত; আবার কখন বা রণস্থলে যাইয়া, বীরগণের সাহায্যে যুদ্ধ পর্য্যন্ত করিতে লাগিলেন। দেবতাই হউন আর যিনিই হউন, বিনা খাটুনিতে খাইবার সাধ্য নাই। 'খরিদ-বিক্রয়' বিজ্ঞান হাতে হাতে। গ্রীকদিগের দেবতা হওয়াও দায়! প্রকৃতি হারি মানিলেন, তাঁহার পারলৌকিক ভাব লৌকিকে আসিয়া পরিণত হইল!

এক্ষণে ভারতচিত্তের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর। দারুণ ঘূর্ণবায়ুতে ঘোর তিমিরে পথভ্রষ্ট পথিকের ন্যায় আকুল হইয়া ঘুরিতেছেন। কি দুরন্ত ঘূর্ণন! কিন্তু ঘূর্ণবায়ু বা ঘোর তিমির, ইহার কেহই স্থায়ী নহে। কালে সকলই তিরোহিত হইয়া থাকে। ক্রমে ঘূর্ণবায়ুর সাম্য হইল,

---

৪। এই প্রবন্ধের অন্তভাগে পরিশিষ্টরূপে গ্রীক পুরাণের সারসংগ্রহ করিয়া, গ্রীক দেবদেবীর একটী যথাযথ বৃত্তান্ত দেওয়া গেল। বঙ্গীয় পাঠকদিগের অনেকেই সে বিষয় জ্ঞাত না থাকায়, এখানে তাহাদের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ যথাসাধ্য পরিহার করা গেল।

প্রচণ্ড বায়ু ধীরে ধীরে নামিয়া সুখস্পর্শ শীতল বায়ুতে পরিণত হইল; ঘোর অন্ধকার ক্রমে ক্ষীণ অন্ধকারে আসিল, পূর্ব্বদিক্ ফরসা ফরসা বোধ হইতে লাগিল; আরও ফরসা—আরও ফরসা, ক্রমে বস্তুনিকর নয়নপথে আসিল। পূর্ব্ব অশান্তির অপলোপে মন রমণীয়তায় পরিপূরিত হইবার, সমগ্র দৃশ্যের যখন যে খণ্ড নয়নকে আকৃষ্ট করিতেছে, তাহাই যেন অভিনব নূতন সৃষ্টি বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।—আর্য্য ঋষি এখন পথ পাইয়া, প্রতি প্রাকৃতিক শক্তিতে দেবতা বিশেষের অবস্থান ও কর্ত্তৃত্ব দেখিতে পাইলেন। তথাপি এ বহুদেবকল্পনা গ্রীকদিগের অপেক্ষা উচ্চতর হইলেও, মনের শান্তি কিন্তু পূর্ণভাবে উদয় করিতে পারিল না। আর্য্য ঋষি আবার সর্ব্বশান্তি-বিধায়কের অনুসন্ধানে চলিলেন। এদিকে ফরসার উপর আরও ফরসা হইতে হইতে সূর্য্য আসিয়া উদয় হইল, দিক সকল হাসিতে লাগিল; ভ্রান্ত পথিক এখন তৃপ্ত-শ্রান্তি, দেখিতে পাইল যে যথার্থ আলোক প্রাপ্ত হইলাম। দৃশ্যের প্রতি পুনঃদৃষ্টি করিয়া তখন হৃদ্বোধ হইল যে, আমার মানসিক আগ্রহে যাহাদিগকে নূতন সৃষ্টি বলিয়া ভাবিয়াছিলাম, তাহারা বস্তুতঃ নূতন সৃষ্টি নহে,—উহা এক মহাসৃষ্টিরই অংশ মাত্র। আর্য্য ঋষিও তাঁহার বোধসূর্য্যের উদয়ে দেখিতে পাইলেন;——

"সুপর্ণস্বরূপ যে দেব ঋষিগণদ্বারা বহুবিধরূপে কল্পিত হইয়া স্তুত হইয়াছেন, তিনি একমাত্র।" ৫

অথবা,

" যে একমাত্র দেব স্বর্গ এবং পৃথিবীর সৃষ্টি করণ-কালীন বাহু এবং পক্ষ সঞ্চালন করিয়াছিলেন, তিনি বিশ্বচক্ষু, বিশ্বমুখ, বিশ্ববাহু, এবং বিশ্বপদ।" ৬

বৈদিক দেবতাবর্গের মধ্যেও যে বাপ ভাই খুড়া জেঠা শালি শালাজ প্রভৃতি সম্পর্ক পাতান নাই, এমন নহে; বরং প্রভূত পরিমাণেই আছে।

৫। ঋঃ বেঃ। ১০ মঃ। ১১৪সূঃ। পুনশ্চ "একস্য আত্মনোঽন্যে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি। নিরুক্ত ৭।৪।

৬। ঋঃ বেঃ। ১০ মঃ। ৮১ সূ।

কিন্তু তাহা প্রায় সমস্তই রূপক উক্তির স্বরূপে; এবং এই নিমিত্তই, সেই সকল সম্পর্ক নিরূপণ, প্রতি সূক্তেই প্রায় নূতন নূতন দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে। গ্রীকদিগের মূল দেববর্গ সম্বন্ধে সুন্দর সুগ্রথিত ধারাবাহিক যে বংশাবলী, যেই তাহা কীর্ত্তন করিতে যাউক, কীর্ত্তনে বড় রূপান্তর দেখিতে পাওয়া যায় না। ইলিয়দ প্রভৃতি গ্রন্থের সহ যে কিছু একটু আধটু রূপান্তর দৃষ্ট হয়, তাহা গণনায় অতি সামান্য। জাতিদ্বয়ের দেববংশাবলীর কথিত অস্থিরতা এবং স্থিরতার কারণ, ঔর্দ্ধদেশিক বিষয়ে হিন্দুচিত্তের অশান্তি, গ্রীকচিত্তের অপেক্ষাকৃত শান্তি; অথবা হিন্দুচিত্তের অস্থিরতা, গ্রীকচিত্তের অপেক্ষাকৃত স্থিরতা। হিন্দুচিত্ত আত্মিক ক্ষুধাক্ষিপ্ত; গ্রীকচিত্ত উদর ক্ষুধাক্ষিপ্ত; হিন্দুচিত্ত উদরক্ষুধাকে অতিক্রম করিয়া আত্মিক ক্ষুধা নিবারণ করিতে অচিন্তনীয়তে হস্ত প্রসারণ করিয়াছে, গ্রীক চিত্ত উদর ক্ষুধা নিবারণ করিতে চিন্তনীয়কেই ক্ষুধা শান্তিকর দেখিয়া তাহাকেই অবলম্বন করিতে চলিয়াছে। অচিন্তনীয়কে আয়ত্ত সহজ নহে; কিন্তু চিন্তনীয় আয়ত্ত সহজে হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই একে অস্থিরতা, অপরে স্থিরতা। কিন্তু এ স্থিরতা অপেক্ষা এ অস্থিরতা উচ্চ; কারণ হিন্দুর ধর্ম্ম যাহা, উহার আর দোষাদোষ যাহাই হউক, উহার মূল নিহিত হইয়াছে সেই সর্ব্বমূলে যাহা "সুপর্ণম্ বিপ্রাঃ কবয়ো বচোভির্ একম্ সন্তম্ বহুধা কল্পয়ন্তি।" আর গ্রীকের ধর্ম্মতত্ত্ব বা দেববংশের মূল নিহিত "গহনম্ গভীরম্" বা মহাপ্রলয় মধ্যে। উপযুক্তই হইয়াছে! আলোক এবং অন্ধকার, দুই বিপরীত দিক হইতে, সম্মিলিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে চলিয়াছে। এ উভয়েতেই দৃষ্টিশক্তি এখনও অস্ফুট,—অতি আলোক বা অতি অন্ধকার, উভয়তেই দৃষ্টিশক্তি অস্ফুট হইয়া থাকে। আলোক, অন্ধকারের সম্মিলন হইলেই নয়নরঞ্জক বর্ণের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

গ্রীকদেবরাজ্যের ঊর্দ্ধতম দেবতা জিউস, "দেবতাবর্গের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং মহাবিক্রমশালী, দূরদর্শী, শাসনাধিপতি, ঘটনাসকলের ঘটক, এবং সুখশায়িনী থেমিসের সহ সর্ব্বদা ন্যায়আলোচনারত।" ৭ ইনি সর্ব্বশাসক

৭। Hom: Hyms—Zeus.

বটে, কিন্তু অনেকে আবার ইহাঁর শাসন একেবারেই উপেক্ষা করিয়া থাকে। ঐ শুন, একজন কিক্লোপিস্ ইউলিসিস্কে কি বলিতেছে," ওহে পথিক, তুমি দেখিতেছি উন্মাদ হইয়াছ, নতুবা নিশ্চয় তুমি নিতান্ত দূরদেশ হইতে এখানে আসিয়াছ; তাহা না হইলে দেবতাদিগকে ভয় বা তাহাদের সংস্রব পরিহার করিবার জন্য আমাদিগকে কখনও এরূপ উপদেশ দিতে না। জানিও, কিক্লোপিসেরা বজ্রধারী জিউস, বা যে কোন দেবতা হউক, কাহাকেই গ্রাহ্য করে না; কারণ আমরা তাহাদিগের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ।" ৮ শুদ্ধ কিক্লোপিস নহে, পৌরাণিক ইন্দ্রশত্রুর ন্যায় জিউসের শ্রেষ্ঠতা-নাশক শত্রু অনেকই দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ জিউস পৃথিবীস্থ সাহ বাদসাহের প্রতিরূপ;—একপাল গৃহিণী, তথাপি স্ত্রীলোকের অনুসন্ধানে ক্ষিপ্ত; রোষতোষের আধার; শত্রুমিত্র উভয়ে পরিবেষ্টিত; পিতাকে নরকে নিক্ষেপিয়া, ভ্রাতৃবিনাশিয়া, ভগ্নী-বিবাহ করিয়া, গ্যানি মীডকে লইয়া, ঐশ্বর্য্যেশ্বর দেবরাজ, এবং শত্রুগণ হইতে উর্দ্ধশির, এই পর্য্যন্ত; নতুবা, "আগ্রেবে দমগ্র আসীদেক এব" নহেন। বর্ব্বর জাতিকে বিদূরিত করিয়া গ্রীক যেমন আত্মজ্ঞানে ঐশ্বর্য্যবান্ ও শ্রেষ্ঠ, এবং আত্ম ও অনুচরবর্গের বিবেচনায় যেরূপ তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার; দেবতার মধ্যে ও শত্রুকুলের মধ্যে জিউস দেবরাজও তেমনি। হিন্দুর "একম্ সন্তম্" ছাড়িয়া, ইন্দ্রের প্রতি দৃষ্টি করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে "সেই বলই ইহাঁর প্রদীপ্ত বল, যদ্দ্বারা তিনি স্বর্গ ও পৃথিবী উভয়কেই চর্ম্মের ন্যায় আবরিত করিয়া পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন।"৯ তবে পৌরাণিক ইন্দ্রের সঙ্গে জিউসের অনেক সাদৃশ্য মিলে বটে, কিন্তু মিলিলে কি হইবে, পৌরাণিক ইন্দ্রের উৎপত্তির কারণ স্বতন্ত্র এবং সাদৃশ্যও কেবল বাহ্য সাদৃশ্য মাত্র। মোটের উপর প্রধান মিল এই যে উভয়ই দেবরাজ। ভাষাবিদ্‌বর্গের মতে ইহারা উভয়েই একার্থ-বোধক।

বোধ করি বলিবার আবশ্যক করে না, যে এই দেবতত্ত্ব সমালোচনা

৮। ODYSSEY IX.

৯। সাঃ বেঃ ২অঃ ২প. ৭।১।

করিতে, হিন্দুর বৈদিক কাল ও গ্রীকের আর্কিউসের সময় পর্য্যন্ত সমগ্র পূর্ব্বগত কাল, এতৎ কালের মধ্যে আবদ্ধ রাখা গিয়াছে। অর্কিউস্ যে সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, যদি সে সময়ের হিন্দু দেববংশাবলী আলোচনা করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে বৈদিক দেববংশ হইতে অপার রূপান্তরপ্রাপ্ত রূপে দৃষ্ট হয়। গ্রীকদিগের কিন্তু হোমারের সময়ে যাহা, অর্কিউসের সময়েও অল্প ইতর বিশেষে সেই একই দেববংশাবলী দৃষ্ট হইয়া থাকে। উপরে যে হিন্দুচিত্তের অশান্তি ও অস্থিরতা এবং গ্রীকচিত্তের অপেক্ষাকৃত শান্তি ও স্থিরতার কথা উল্লেখ করিয়াছি, ইহার দ্বারাও তাহা বহুলাংশে প্রমাণিত হইতেছে।

এক্ষণে দেখা যাউক পারলৌকিক বিদ্যার মধ্যে উভয়ের পরলোক-বোধ কতদূর। ত্বষ্টৃদুহিতা শরণ্যু এবং বিবস্বানের পুত্র যম সর্ব্বপ্রথমে মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরলোকের প্রভুত্ব অধিকার করিয়াছেন। তিনি পাপের দণ্ডদাতা; পিতৃলোকের অধিপতি। পুণ্যবান যাহারা তাহাদের যমের অনুচরবর্গের সঙ্গে কোন সংস্রব নাই, অগ্নিদেব স্বয়ং তাহাদিগকে যথাযোগ্য লোকে নীত করিয়া থাকেন; এবং তথায় তাহারা অপার সুখ ভোগ করিয়া থাকেন। এখানে পাপ পুণ্য ভেদে দুরন্ত বৈষম্য লক্ষিত হইতেছে; কিন্তু যতদূর দেখিয়াছি, গ্রীক ধর্ম্মে সে বৈষম্য দৃষ্ট হয় না। প্লুটো প্রোসারপিনিকে বলিতেছেন তুমি এখানে আসিলে, যাবতীয় জীব, যাহারা জীবিত ও এখনও অবনীতলে বিচরণ করিতেছে, তত্তাবতের স্বামিনী হইবে। যে কেহ কোনরূপ ক্ষতি-কারক, যাহারা তোমাকে পূজোপহারে সন্তুষ্ট করিয়া না থাকে, এখানে নিরন্তর তাহাদের দণ্ডবিধান করা যাইবে।"[১০] এখানে আর উত্তম অধমের প্রভেদ রাখা হয় নাই। ফলতঃ দেবীপ্রসূত একিলিস এবং মহাজ্ঞানী প্রভৃতি হইতে অঘোর পাপী পর্য্যন্ত সকলকেই একস্থানে সন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।[১১] পুনশ্চ ইউলিসিসের মাতৃআত্মা ইউলিসিস্‌কে বলিতেছে, "মৃত্যু অন্তে সকল ব্যক্তিরই এই দুর্দ্দশা।

১০। Hom; Hym:—Ceres

১১। Odys: XI.

জীবন গত হইবামাত্র অগ্নিতেজে শিরাসকল অস্থি-মাংস-শূন্য হয়, কিন্তু আত্মা স্বপ্নবৎ পলাইয়া প্রস্থান করিয়া থাকে।"১২

কিন্তু এ পরলোক যে বড় সুখের তাহা বোধ হয় না, আগামেম্নেনের আত্মা ইউলিসিসের নিকট পরিচয় দিতেছে, "মৃত্যুর নাম আর আমার সাক্ষাতে করিও না। মৃত্যুলোকের উপর রাজত্ব অপেক্ষা, পৃথিবীতে যে নিতান্ত দরিদ্র তাহার দাসত্ব করিয়া খাওয়াও পরম সুখের বলিয়া জানিবে।"১৩ ফলত প্লুটোর (যমরাজের) রাজ্যের নিরানন্দ ভাবের কথাই সর্ব্বত্র উল্লিখিত; আনন্দভাবের কথা কোথাও উক্ত নাই। দুষ্ট ব্যক্তির বিচারের কথা উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু পুণ্যবানের পুরস্কারের কথা কোথাও দেখিতে পাই না। ফলত গ্রীকদিগের মধ্যে পরলোক সম্বন্ধীয় পাপপুণ্যবিষয়ক জ্ঞান নিতান্তই বাষ্পাচ্ছন্ন, সামান্য এবং অগণনীয়; এবং পরলোকের প্রকৃতি কিরূপ তাহারও সম্পূর্ণ অস্থিরতা। ধূমাকার, সমস্তই অস্পষ্ট।

হিন্দুর পরলোক সেরূপ নহে, এ পরলোকের সংসারচিত্র অপূর্ব্ব, পরিষ্কার, পরিচ্ছিন্ন ও সম্পূর্ণ; যথার্থই পরলোক প্রতিরূপ। তথায় তুলাদণ্ড নিতান্ত অনবহেলনীয় রূপে বর্ত্তমান; পুণ্য পাপের সর্ব্বদা সত্য পরিমাণ হইয়া থাকে। সৎ বা অসৎ স্ব স্ব কর্ম্ম অনুসারে সুখ বা দুঃখের ভাগী হইয়া থাকে। স্বয়ং নারায়ণ নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে অনুজ্ঞা করিলেও, সে তুলাদণ্ডের ব্যতিক্রম নাই। কৃষ্ণ উপদেশ করিলেন, যুধিষ্ঠির কৌশল খাটাইলেন, সত্যকে চোক ঠারিয়া ফাঁকি দিবার জন্য বলিলেন, "অশ্বত্থামা হত ইতি গজ", কিন্তু তথাপি তাঁহার নরক দর্শন হইতে নিবৃত্তি হইল না। গ্রীকের সৎ-অসৎ বোধ ইহলোক সম্পর্কে উদ্ভূত। আর হিন্দুর সৎ-অসৎ বোধ পরলোক সম্পর্কে উদ্ভূত। হিন্দু বুঝিয়াছিলেন জীবন অনন্ত, বস্তু মাত্র অনন্ত, সুতরাং সেই অনন্তে আশা নির্ভর না করিলে সে অনন্ত জীবনের পরিমাণ রক্ষা হইবে কি করিয়া? গ্রীকও যে অনন্তের অস্তিত্ব-দৃষ্টি করিতে

১২। Odyssey XI

১৩। Odyssey. XI

না পারিয়াছিলেন এমন নহে, কিন্তু অন্ধতমসাবৃত চক্ষে; এবং এই জন্যই তাহার পরলোক এরূপ কুজ্ঝটিকাময়, ও আশাও এতটা অন্তমধ্যে আবদ্ধ। যাহার যেমন আশা, তাহার সফলকারী নীতিও তদ্রূপ হইয়া থাকে।

এক্ষণে আশাপূরক প্রার্থনা কাহার কেমন তাহা দেখিয়া, আশার পরিমাণ করা যাউক। হিন্দু সন্তানের প্রথম এবং প্রধান প্রার্থনা "হে অগ্নি তুমি আমাদিগকে দর্শন দিবার জন্য প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছ, অতএব প্রার্থনা তুমি আমাদিগকে রক্ষা, এবং স্বর্গাদিবাস যাহাতে হইতে পারে, তাহা সম্পাদন করিয়া দেও।"১৪ অথবা "এই জীবনরূপ সেতু উত্তীর্ণ হইলে রাত্রি-দিবা-প্রবর্তক নিয়মাতীত পরপারে জরা, মৃত্যু, শোক, সুকৃত বা দুষ্কৃত ইহার কিছুই নাই। এখানে সকলে আসিলে পাপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়। অথবা এই সেতু উত্তীর্ণ হইলে যে অন্ধ সে অনন্ধ হয়, যে ক্লেশাদিতে বিদ্ধ সে অবিদ্ধ হয়। এখানে রাত্রি দিবা প্রভেদ নাই, রাত্রি প্রতিভায় দিবসের ন্যায় সমতাযুক্ত। ইহাই নিত্যজ্যোতি-বিভাসিত ব্রহ্মলোক।"১৫ এরূপ সদসদের শাস্তা ও পুরুষকর্তা পরলোকের প্রতি বিশ্বাস ও তদুপযুক্ত হইবার প্রার্থনা, সক্রেতিসের ওদিকে বোধ করি গ্রীকজীবনে কোথাও দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা নাই। পরলোক যে আছে, এবং পরলোকেও যে অস্তিত্ব লোপ হয় না, সক্রেতিস নানা কাণ্ড করিয়াও, তদ্বিষয়ে অল্পবুদ্ধি ক্রিটোকে পরিচ্ছিন্নরূপে বুঝাইয়া উঠিতে পারেন নাই।১৬ সক্রেতিসের পূর্ব্বে কেবল থেলিসে ঐশ্বরিক বিষয়ে কিঞ্চিৎ উন্নত বুদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পরলোকের মহত্ত্ব সম্বন্ধে এখনও পূর্ণ আশার সঞ্চার হয় নাই। তাঁহার উক্তি—

"ঈশ্বর সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন, যেহেতু তিনি জন্মরহিত।"
"পৃথিবী সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, যেহেতু ইহা ঈশ্বরের সৃষ্টি।"
"দেশ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, যেহেতু ইহা সমস্ত পদার্থকে ধারণ করিতেছে।"

১৪। সাঃ বেঃ ১।১।১০।

১৫। ছান্দোগ্য উপনিষদ ৮।৪।১-২।

১৬। Plato—Phaedo 148.

"বুদ্ধি সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী, যেহেতু ইহা সর্ব্বভেদী ও সর্ব্বত্রই গতায়তশীল।"

"প্রয়োজন সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্দমনীয, যেহেতু ইহা আর সকলকেই দমন করিয়া থাকে।"

"কাল সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মদর্শী, যেহেতু ইহার নিকট সকল ফাঁকিই বাহির হইয়া পড়ে।"

অতি সুন্দর। থেলিস বলিতেন জীবন মৃত্যুতে কিছুই প্রভেদ নাই; তাহাতে জনেক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "তবে তুমি না মর কেন?" উত্তর "যেহেতু জীবন মৃত্যুতে কোন প্রভেদ নাই।"১৭ থেলিসের গ্রন্থাবলী দুষ্প্রাপ্য। থেলিস গ্রীকদেশীয বিখ্যাত সপ্ত বিজ্ঞের আদি বিজ্ঞ।

থেলিসের সময় অতিক্রম করিয়া, হোমারিক স্তোত্র সমূহের প্রতি অবলোকন কর। এই স্তোত্রসমূহ বৈদিক সময়ের মন্ত্র প্রকরণাদি স্থলীয়, কিন্তু এই সকল তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলে পরলোক বা পাপপুণ্য সম্বন্ধে কোনই উল্লেখ পাইবার সম্ভাবনা নাই। এই সকল স্তোত্রের মধ্যে প্রার্থনা অনেক আছে, কিন্তু তাহা সমস্তই কোন না কোন পার্থিব বিষয়ের জন্য।১৮ হিন্দুদিগেরও যে সেরূপ প্রার্থনার ভাগ কিছু অল্প তাহা নহে, কিন্তু প্রভেদ এই প্রার্থনা কেবল তাহাতে আবদ্ধ নহে; প্রার্থনার প্রায় অনেকই ইহলোক অতিক্রম করিয়া প্রসারিত। এই একজন গ্রীক বিজ্ঞের আশা ভরসা এবং জীবনের প্রার্থনীয় বিষয়ের কথা শুন;—

"মনুষ্যসন্তানের মধ্যে এমন কেহই নাই যে, একবার মৃত্তিকা দ্বারা আবরিত এবং প্রোসারপিনির বাসভবন যমপুরিতে উত্তীর্ণ হইলে, আর সে আনন্দ ভোগে সমর্থ হয; যেহেতু গীতবাদ্যও তখন আর তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না, এবং সোমদেবের মধুরস মদিরাও আর তাহার রসনাকে পরিতৃপ্ত করিতে আইসে না। এই সকল দেখিয়া

১৭। Diog Laert.—Thales c. XI

১৮। Homeric Hymns, VI Aris, IX Athae, XI Ceres, XIV Æsculap, XVI Herm, XX Posied, XXI Zeus, XXIV Dion, XXVII Hest and Herm. XVIII Earth, ইত্যাদি।

শুনিয়া আমার আন্তরিক বাসনা এই যে, যে পর্য্যন্ত জীবন থাকে তাহা যেন নিঃশঙ্ক ভাবে ও মনের আনন্দে অতিবাহিত করিয়া যাই।

"যাহারা মৃত ব্যক্তির প্রতি খেদ করে, কিন্তু গতপ্রায় যৌবনের প্রতি একবারও সাশ্রুনয়নে তাকাইয়া দেখে না, তাহারা কি বালকবৎ মূঢ়।

"অন্তঃকরণ, তুমি আশ্বস্ত হও এবং আনন্দে কালাতিপাত করিতে শিখ, যেহেতু মৃত্যু আসিলেই এই মৃত্তিকাবৎ তোমাকে চৈতন্যশূন্য হইতে হইবে।

"যাবতীয় দেবতা অপেক্ষা অর্থই সুন্দর এবং আনন্দদায়ক; হে অর্থ, তোমার অনুগ্রহ হইলে, আমি অধম হইয়াও উচ্চ মনুষ্য পদবী লাভে সমর্থ হই।

"লেটোনা পুত্র ফিবস আপলো এবং দেবরাজ জিউসের নিকট আমার একান্ত প্রার্থনা যে, তাঁহাদের অনুগ্রহে আমি পার্থিব আপৎ হইতে তফাত থাকিয়া যৌবনসুলভ সুখ এবং অর্থ প্রাচুর্য্য এই জীবন অতিবাহিত করিতে সমর্থ হই।" ১৯

গ্রীকদিগের জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধীয় উন্নত বুদ্ধি প্রায় সর্ব্বত্রেই এরূপ, ইহাকে অতিক্রম করিতে প্রায় কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। এই অংশ থিওগনিস হইতে উদ্ধৃত; এবং বলা বাহুল্য যে এই থিওগনিস একজন পরম দেবভক্ত, মহাজ্ঞানী, এবং প্রাচীন গ্রীকের জ্ঞানপথের একজন প্রধান নেতা। অতঃপর এই সকল দেখিয়া কি বোধ হয়?—নির্ব্বাক, নিরানন্দময়, স্নেহশূন্য দেবসংসার, শূন্য, শ্রদ্ধা-রহিত, মরুকান্তার সদৃশ মনুষ্য হৃদয়, অন্ধতমসাচ্ছন্ন পরলোক, উন্মত্ত মাতুলবৎ সংসারপ্রিয়তা, এবং ঊর্দ্ধদেশিক বন্ধনছিন্নে বিনতশির ধূলিমুখে পতমান। অথবা, রূপক বাক্যে, গ্রীকেরা ঊর্দ্ধমুখে অবলম্বনের অভাবে ধূলি-লুণ্ঠিত লতিকা সদৃশ, ক্ষীণতেজ, কুঞ্চিতপত্র, মড়ুঞ্চে হইয়া গিয়াছে; লাভের মধ্যে ফল কষাটীয় বা কণ্টকময়ী হউক, কিন্তু লোকের প্রাপ্য আসিতেছে। আর হিন্দুর সেই লতিকা মহাতেজে ঊর্দ্ধ অবলম্বনে

১৯। Theog. Maxims

উঠিয়াছে, কিন্তু মধ্য (বা সাম্য) পথে বিস্তার প্রাপ্ত হওনার্থ আশ্রয়ের অভাবে ক্রমাগত উঠিয়া শেষে তাপদগ্ধ হইয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছে; তাল তেজের ফল ফলিবে এরূপ ফুল মাত্র দেখিয়াছিলাম, কিন্তু ফল না ফলিতেই তাহা শুকাইয়া উঠিতে আরম্ভ হইয়াছে। ফল লোকের প্রাপ্যে ফলিল না।

পরিদৃশ্যমান যাবতীয় কার্য্যের কল্পনা-মূর্ত্তি অগ্রোদ্ভবা। এই কল্পনা-মূর্ত্তি কার্য্যমাত্রের আত্মিক মূর্ত্তি বা কারণ-শরীর স্বরূপ। মনুষ্যকৃত এমন কোন কার্য্য নাই, যাহা বস্তুতঃ তাহার তদ্রূপ কারণ-শরীরের বাহ্য প্রচার নহে। সম্মুখে ঐ যে বাড়িটী রহিয়াছে, আগে উহার ঐরূপ মূর্ত্তি, ঐরূপ আয়তন, ঐরূপ সমস্ত, প্রস্তুতকারকের মনোমধ্যে উদিত এবং নির্ম্মিত হইয়াছে, তবে তাহা পরে ভৌতিক উপকরণ যোগে প্রকাশমান হইয়া এই বাড়ির আকার ধারণ করিয়াছে। যদি তাহা মনোমধ্যে তদ্রূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্নরূপে উদিত ও নির্ম্মিত না হইত, তাহা হইলে বাড়ীটীর আকারও তদ্রূপ অনির্ম্মিত বা ক্ষুণ্ণ নির্ম্মিত থাকিত। প্রতি পরিদৃশ্যমান কার্য্য মানসিক ধারণার অবিকল প্রতিবিম্ব স্বরূপ। ফলকথা, বাক্য, ইন্দ্রিয়, ভূতরাশি বা যে কোন উপকরণ সংযোগে প্রকাশমান হউক, মনুষ্যকৃত এমন কোন কার্য্যই হইতে পারে না, যাহা কারণ-শরীরের প্রতিবিম্ব নহে বা কারণশরীর যাহার অগ্রে উদ্ভব হয় নাই। বস্তুমাত্রের এই কারণশরীরাংশকে অনন্বিত (abstract) রূপ, এবং তাহার বাহ্য প্রচার বা ভৌতিক বা পরিদৃশ্যমান শরীরাংশকে অনুষ্ঠিত (practical) রূপ শব্দে কহা যাউক। এই অনন্বিত রূপ, প্রচার-উপযোগী পুষ্টতা প্রাপ্ত হইলে, তখন তাহা পুষ্ট অনুষ্ঠিত রূপে প্রকাশমান হয়। ছন্ন অনন্বিতরূপে ছন্ন অনুষ্ঠিতরূপ, আবার বিকৃত অনন্বিতরূপ বিকৃতিতেই বিলীন হইয়া গিয়া থাকে। অনন্বিতরূপ ও অনুষ্ঠিতরূপ এতদুভয়ের পূর্ণতায়, যখন কোন কৃত বস্তু অর্থাৎ কার্য্য তাহার যথাসম্ভব সমগ্রত পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তখন তাহার যে পূর্ণাভাস তাহা অপর উদ্দেশ্যবিশেষ পূরণার্থে বা আবার নবকার্য্য বিশেষের উৎপাদনার্থে, সমগ্রত বা অংশত, নব অনন্বিতরূপাংশ অর্থাৎ নব কারণ-শরীর

বিশেষের আয়োজন ও উপকরণ পদার্থরূপে পরিণত হয়। এইরূপ হওয়ার ফলেই সৃষ্টি এবং সৃষ্টিস্থ তাবৎ অগ্রসর হইতে, এবং ভূত ও ভবিষ্যতে আলম্বিত সম্বন্ধ যুক্ত নবরূপ বা নবকার্য্য প্রসবিতে, সক্ষম হইতেছে। আমাদিগের কার্য্যের ন্যায়, আমাদিগের অধিষ্ঠানভূতা এই অবনী এবং বিশ্বমণ্ডল এবং আমরাও, সেইরূপ অপর এক এবং আমাদের সকলেরই অতীত, মহাকারণশরীরের বাহ্য-প্রচার মাত্র। আমরাও আবার অনুষ্ঠিত-রূপে যখন যথাসম্ভব পূর্ণতা প্রাপ্ত হইব তখন, সেই মহাকারণ-শরীর যে মহাচিত্তের আত্ম পদার্থ সেই মহাচিত্তপ্রাণ মহাপুরুষের অপর উদ্দেশ্য-বিশেষ পরিপূরণার্থে, আমাদিগকেও কথিত মত পুনর্ব্বার অনন্বিতরূপাংশে পরিণত হইতে হইবে। আমি বলিয়াছি, মনুষ্য মহাশক্তি রাশি মধ্যে স্ফাটিকত্ব প্রাপ্ত শক্তিখণ্ড মাত্র। শক্তিরাশির সমস্ত গুণাগুণই উহাতে অবস্থিতি করিতেছে। এ নিমিত্ত আমরা, প্রত্যক্ষ হউক অপ্রত্যক্ষ হউক, নিজসাধ্যের অতীতে হউক বা সাধ্যায়ত্তে হউক, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সমস্ত ব্যাপারেই, মহাকারণ শরীরময়ী সেই শক্তিরাজ্যেরই যথাসম্ভব অভিনয় করিয়া থাকি; এবং এই নিমিত্তই আমাদিগের যাবতীয় সাত্বিক কার্য্য প্রকারান্তরে প্রকৃতির অনুকরণ ব্যতীত আর কিছুই দাঁড়ায় না। সুতরাং, একে অপরের বা পরস্পর পরস্পরের তত্ব-নিরূপক হইয়া থাকে। বাপ্পারাম, ভয় নাই, প্রকৃতির অনুকরণ করা বলায় তোমার বীরত্ব লোপ করিতেছি না; তুমি এখনও প্রকৃতির অনুকরণ বা তাহার শিক্ষার অতীতে কার্য্য করণে সক্ষম। বস্তু মাত্রের যে কারণ-শরীরের অবশ্যম্ভাবিতা এবং তদুৎ-পাদক কর্ত্তার যে অপরিহার্য্য অস্তিত্ব, প্রকৃতি ও তোমার নিজ কৃত কার্য্য-সমূহও যাহা নিরন্তর ঘোষণা করিতেছে, তুমি যখন তাহা প্রকৃতির পরি-চালক পুরুষের পক্ষে অস্বীকার করিয়া থাক, তখনই তোমার নূতন সৃষ্টির সঞ্চার—শয়তানির উৎপত্তি হয়। সে যাহা হউক, যেমন আভাসিত হইল, বাড়ীটী ভাঙ্গিলেও তাহার কারণ-শরীর লোপ হয় না। অনন্ত মানবীয় মনীষাস্রোতে তাহা সংমিলিত হইয়া উত্তরোত্তর নবকার্য্য উৎপাদনে প্রধাবিত হয়; কিন্তু বাপ্পারাম, তুমি অর্থাৎ তোমার শয়তানি ভাঙ্গিলে তোমার ঐখানেই নিবৃত্তি! তোমার ও তোমার নূতন সৃষ্টির একরূপ

নূতন ফল না হইলে মানায় কোথায়? শয়তানি মিথ্যাসৃষ্টি, এবং মিথ্যা যাহা তাহা নিজ সাক্ষ্যতেই অস্তিত্বশূন্য।

অতএব কার্য্যমাত্রেরই কারণ-শরীর পূর্ব্বগামী বা পূর্ব্বোদ্ভবা। এই মনুষ্য-জীবনের পরিদৃশ্যমান বিকাশ ধরিতে গেলে, উহা বিধাতৃনিয়োজিত কার্য্যসমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই কার্য্যসমষ্টি যে কারণ-শরীর সমষ্টির বাহ্যপ্রচার স্বরূপ, তাহাই মনুষ্যের প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মতত্ত্ব। এই ধর্ম্মতত্ত্বই, উপরে এক স্থানে বলিয়া আসিয়াছি যে, বাহ্যজগৎ সহিত মানবপ্রকৃতির সংস্রব সংঘটনে গুরুতম দৃষ্টি প্রসারণ ফলে উদ্ভূত হইয়া থাকে। ইহার পারলৌকিক দিকে যে দেবতত্ত্ব, এবং লৌকিক দিকে যে যাগযজ্ঞ ও পূজা প্রকরণাদি, তাহা ধর্ম্মভাবের তৎতৎ দিকস্থ কেবল সংক্ষিপ্ত বা সঙ্কেত লিপি মাত্র। সঙ্কেত বস্তু যে প্রকারের, তাহার সম্প্রসারণ-বস্তুও তদ্রূপ হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, ধর্ম্মতত্ত্ব মনুষ্যের আত্মিক জীবনের সম্পত্তি, এবং কার্য্যসমূহ ভৌতিক বা সাংসারিক জীবনের সম্পত্তি। পরস্পর উভয়কে উভয় অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করে। অতএব যে মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধি যেমন, তাহার কার্য্যসমূহও সেইরূপ হইয়া থাকে। পুনশ্চ, মূল ব্যতীত কোন বস্তুর উৎপত্তি বৃদ্ধি বা স্থিতি হয় না; সুতরাং ধর্ম্মতত্ত্বও মূলশূন্য হইতে পারে না; অতএব এই ধর্ম্মতত্ত্ব যে পরিমাণে ও যেরূপ ধারণাযোগে মূলরূপী ঈশ্বরে সংলগ্ন, যে পরিমাণে সর্ব্বালোক-উৎসের আলোকে আলোকিত, তাহা সেই পরিমাণে দৃষ্টি সংযুক্ত; সুপরিমাণে হইলে, সম্মুখে বহুদূর দৃষ্টি প্রসারিত হইবায়, দীর্ঘগতি প্রাপ্ত হয়। পুনশ্চ যে পরিমাণে উহা সংলগ্ন-বিচ্যুত, সেই পরিমাণে দৃষ্টিশূন্য, ভ্রমসংযুক্ত এবং মিথ্যার আবরিত; সুতরাং অল্প গতিতেই বিকৃতি ও বিলোপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনেক বিগ্রহের বিশ্বাস, ঊর্দ্ধদেশিক শক্তিকে আশ্রয় না করিলেও মনুষ্য-সমাজ স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে। পারিত বটে, যদি মানব হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ও পশুবৎ কুগমনীয়া-যুক্ত হইত। কিন্তু মানুষ হইয়া ও কথা বলিলে শুনিব না। ঐশ্বরিক সত্তার অবলম্বন ভিন্ন কোন বস্তু সৃষ্ট হইতে বা তিষ্ঠিতে পারে না। মিথ্যায় সৃষ্টি করিতে বা রক্ষিতে পারে না; মিথ্যায় কেবল পণ্ড বা বিকৃত বা তমসাবৃত করিয়া থাকে মাত্র। সেরূপ বিশ্বাস বিনোদক সমাজতত্ত্ব যে

তথাপি ক্ষণমাত্র তিষ্ঠিয়া থাকে, তাহাও সেই মিথ্যাদ্বারা বিকৃতকৃত সত্তারই অবলম্বনে, নিজ শক্তিতে নহে। অতএব ঐশ্বরিক সত্তার অপেক্ষা না রাখিয়া যে সে সমাজতত্ত্ব নির্ম্মিত হইয়া তিষ্ঠিতেছে ইহা যথার্থ নহে; সত্তা মিথ্যা আবরণে বিকৃত বা তমসাবৃত হইয়া এখানে দৃষ্টিগোচর সুস্পষ্ট রূপে হইতেছে না, ইহাই যথার্থ। এজন্য এরূপ সমাজতত্ত্বের ভাবী ফলও সর্ব্বদা এরূপ বিকৃত-মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া থাকি। বাস্থাবাম, ফবাসিরাজ-বিপ্লবে রুসোর সর্ব্বজন-সুখপ্রদ হিতবাদশাস্ত্র, টালিরাণ্ডের সখের খৃষ্ট-য়ানী, বোমের বর্ষাদি বিভাগ, সমেটের নাস্তিকতা, জ্ঞানদেবীর অভিনয়-কারিণী ফাণ্ডেলনাম্নী বেশ্যাপূজাদি, স্বাধীনত্বের ছড়াছড়ি, বোবস্পেয়াবের Etre Supreme একে এ'ক সমস্তইত অভিনয় হইয়া গিয়াছে; তবে আবার সে কথা ফিরিয়া কেন?

এক্ষণে গ্রীক এবং হিন্দুর জীবনকাব্য অভিনয়ের কাবণ-শরীর কি, তাহার কিয়দংশ যথাসম্ভব আলোচনা করিয়া আসিলাম। উহা কি, তাহা সংক্ষেপত বলিতে গেলে, গ্রীকের, যেমন উপরে বলিয়া আসিয়াছি, নির্ব্বাক, নিরানন্দময়, স্নেহশূন্য দেবসংসার, শূন্য, শ্রদ্ধারহিত, মরুকান্তার-সদৃশ মনুষ্যহৃদয়; অন্ধতমসাচ্ছন্ন পরলোক; উন্মত্ত বাতুলবৎ সংসার-প্রিয়তা, এবং ঊর্দ্ধ'দশিক বন্ধনছিন্নে বিনতশির ধূলিমুখে পতমান। এই নিমিত্ত দেবসকাশে গ্রীকের প্রার্থনা এত হেয় এবং কেবল পার্থিব সুখ-লাভের হেতু, পরলোকের প্রতি আস্থাশূন্য ও তাহাতে দৃষ্টিপাত না করাই ইহাদের উদ্দেশ্য। মনুষ্যের প্রকৃতি যাহা, এবং সে জবাবদিহি করিতে যতটা প্রস্তুত, তাহা তাহার আকাঙ্ক্ষা এবং প্রার্থনাতেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। হিন্দুর ভাব গ্রীকের বিপরীত। তথায় দেবসংসার অচিন্তনীয়, বিরাটবেশ, গূঢ় গুহ্যময়ী, স্নেহপূর্ণ অথচ ভীতির আধার, এবং হস্তে সদসদের তুলাদণ্ড দোদুল্যমান, শ্রদ্ধার আধার, করুণার আধার, মমতা-পূর্ণ,—গাঢ়তায় সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত; পরলোক পরিচ্ছিন্ন দিবামানে আলো-কিত, লোকে স্বচ্ছন্দে দেখিতে পাইতেছে যে তথাকার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি। ঊর্দ্ধদেশিক অচিন্তনীয় আয়তনের সমতা করিবার আয়াসে, সমস্ত শক্তি তাহাতেই পর্য্যবসিত হওয়ায়; এবং ঊর্দ্ধদেশ প্রতি দৃঢ় আকর্ষণ

হেতু, মানব সংসারপ্রিয়তাশূন্য; এবং তৎসহ উপযুক্ত সংশ্রব পরিশূন্যো, অযথা উৰ্দ্ধমুখে ধাবমান। এই জন্যই ইহার প্রার্থনা মধ্যে পারলৌকিক শুভ কামনাই অধিক; এই জন্যই হিন্দুসন্তানের নিকট "ধর্ম্মাৎ পরতরং নহি"; এবং এই জন্যই আজি পর্য্যন্ত, হিন্দুসন্তান সকল সাত্ত্বিক ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত হইলেও, সাবেক দাঁড়ার খাতিরে চিঠি পর্য্যন্ত লিখিতে সর্ব্বাগ্রে "শ্রীদুর্গা" লিখিয়া থাকেন। এখনও হিন্দুসন্তানের মধ্যে যাহা কিছু নৈতিক ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও ঐ "শ্রীদুর্গার" ন্যায় কেবল সাবেক দাঁড়ার খাতিরে।

গ্রীকের ধর্ম্মতত্ত্বে পারলৌকিক মুখে চূড়ান্ত সঙ্কেত পদার্থ জিউস্,—পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতির অনিষ্ট সাধনে ইহার ঐশ্বর্য্য অধিকার; গ্রীকের গূঢ় জীবনও তাহাই। হিন্দুর চূড়ান্ত সঙ্কেত পদার্থ "সুপর্ণম্ বিপ্রাঃ কবয়ো বচোভিঃ একম্ সন্তম্ বহুধা কল্পয়ন্তি" হিন্দুর গূঢ় জীবনও তাহাই। গ্রীকের যাগযজ্ঞাদি,—পশ্বাদি ছেদন করিয়া, প্রমিথিওসের কল্যাণে দেবতা-দিগকে কেবল মাত্র তাহার হাড়গোড় দিয়া, মাংসাদি মধুসংযোগে নিজের পেট ভরিয়া আহার। আর হিন্দুর যাগ যজ্ঞাদি,—দেবতাদিগকে সকল দিয়া, নিজে উপবাস। উভয়ের সাংসারিক জীবনও তাহাই। প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব মাত্রের দুইদিক, এক লৌকিক, অপর পারলৌকিক। গ্রীকের ধর্ম্মতত্ত্ব, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লৌকিক ভাবে অযথা লিপ্ত, সুতরাং ভ্রমবিকৃত ঐশ্বরিক সত্ত্বা ইহাদের অবলম্বন; আর হিন্দুর ধর্ম্মতত্ত্ব পারলৌকিকভাবে অযথা লিপ্ত, এজন্য উহাও ঐশ্বরিক লৌকিক বিষয়িণী আজ্ঞা অবহেলায় বা সম্যক পালন না করায় ভ্রমসংযুক্ত। কিন্তু গ্রীকের বিকার আর এ বিকারে প্রভেদ আছে;—অধমের দোষ এবং উন্নতের দোষে যে প্রভেদ, এখানেও সেই প্রভেদ। দোষের পরিমাণ অনুসারে অধঃপাতের পরিমাণ, একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এখানেও তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে;—গ্রীক সভ্যতা এবং জাতীয় জীবন হিন্দুর তুলনে কতক্ষণ স্থায়ী তাহা দেখিয়া যাইও, অনুভব করিতে পারিবে।

অযথা পরিমাণে সংসারনীতি যথায় জীবন কার্য্য অভিনয়ের মূল, তথাকার কার্য্য প্রবাহের বন্দোবস্ত স্বতন্ত্র; এবং অযথা পরিমাণে

পারলৌকিক নীতি যথায় জীবনকার্য্য অভিনয়ের মূল, তথাকার কার্য্য প্রবাহের বন্দোবস্তও স্বতন্ত্র। সাংসারিক নীতির ফল এবং ভোগ প্রত্যক্ষ, এবং উহার মুখ্য উদ্দেশ্য সংসার সুখের প্রাপ্তি; তদ্রূপ পারলৌকিক নীতির ফল এবং ভোগ অপ্রত্যক্ষ, এবং তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য অদৃষ্ট, অনিশ্চিত, অপরিচিত পারলৌকিক সুখের প্রাপ্তি। একে নিশ্চয়তা, অপরে অনিশ্চয়তা। লোকে আদিষ্ট উপায়কে তখনই দৃঢ় অবলম্বন করিয়া থাকে, যখন ফল অনিশ্চিত ও অনুমানসিদ্ধ বা তথাবিধ। কিন্তু নিশ্চিত প্রত্যক্ষ ফলের জন্য সেরূপ দৃঢ় অবলম্বনের আবশ্যক হয় না; একমাত্র ফলেরই প্রতি দৃষ্টি থাকে, এবং উহা যে কোন উপায়ে প্রাপ্ত হইব ইহাই ধারণা হয়। এই 'যে কোন' উপায় হইতে, প্রায় বিকৃতি এবং বিকৃতি হইতে গুরুতর বিকৃতির উপস্থিতি হয়; শেষে পেনালকোড আসিয়া বেদাদির স্থানাধিকার করে। উচ্চ কোন তত্ত্ব হইলেও, তাহাও এখানে সেই পেনালকোডের অন্তর্ভুক্ত হইয়া বিকৃত হইয়া যায়। গ্রীকভূমেও তাহাই হইয়াছিল; সেখানে এই দেবতত্ত্ব শেষে বিকৃতির অবলম্বন দণ্ডস্বরূপে পরিণত হইয়া আসিয়াছিল।

ডিওনিসুস্ দেবের উদ্দেশে ডিওনিসীয়া বলিয়া যে পর্ব্ব হইত, তাহার বিবরণ যদি বারেক পাঠ করিয়া দেখ, তাহাহইলে গ্রীকদিগের বিভৎস রুচি ও বিভৎস কার্য্যের অনেকটা পরিচয় পাইতে পারিবে। ঐ পর্ব্বাহ বহুদিন ব্যাপিয়া থাকিত, এবং উহাতে দৃশ্যঅভিনয়, কুস্তি, নানাবিধ খেলা, এবং মদের হাট বাজার বসিত। ঢাক ঢোল সিঙ্গা বাঁশি প্রভৃতি বাদ্যের ধূমে গগন নিনাদিত; উপাসক অর্থাৎ গ্রীকসাধারণ, স্ত্রী পুরুষ একত্রে, নানাবিধ বিকৃত মূর্ত্তিধারণে সং সাজিয়া, দিবারাত্র মদিরাপানে উন্মত্তবৎ ঘূর্ণিত হইয়া ও লোক মাতাইয়া ফিরিত; কখন বা উচ্চৈঃস্বরে দেবতার নাম ধ্বনিত করিতে করিতে উন্মাদবৎ পর্ব্বত বা অরণ্য প্রান্তে ছুটিত। দর্শকেরাও তাহাতে সমানে যোগ দিতে ক্রুটি করিত না। ইহার পরে, এই ঘূর্ণাতরঙ্গমধ্যে না হইত এমন কুকার্য্য নাই, না হইত এমন ঘৃণিত কার্য্য নাই, এবং না হইত এমন অশ্লীল কার্য্যই নাই; এবং এই সকল যাহা হইত, তাহা আবার

দিগ্বিক্‌ শূন্যে পাত্রাপাত্র জ্ঞানবর্জ্জিত ভাবে। ইহা কেবল সামান্য শ্রেণীস্থ লোকেরাই যে করিত তাহা ভাবিও না, আথেন্স নগরীর শ্রেষ্ঠতম বংশের পুত্র কন্যারাও সচ্ছন্দে এবং অপ্রতিবন্ধকে তাহাতে সহস্র সহস্রে সংযোজিত হইত।২০ অতঃপর আর তাহার বর্ণনা অনাবশ্যক। ধর্ম্মের নাম করিয়া এমন কদাচার অতি অল্প স্থানেই আচরিত হইয়া থাকে।

ফলতঃ এই সকল পর্ব্বাহ এমনই কদর্য্য মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়া আসিয়াছিল যে, শেষে লোকবর্গ মাত্রেরই ইহা অপার ঘৃণার বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল। ডিওগীনিস্‌ একবার অনেক কর্ত্তৃক বারম্বার ইলুসীয় পর্ব্বাহভুক্ত হইবার জন্য অনুরুদ্ধ হয়েন। ইলুসীয় সাধকদিগের বিশ্বাস এই যে যে তাহাদের শ্রেণীভুক্ত না হইবে, সে দেহান্তে উচ্চলোকে যাইতে পারিবে না (এতদিনে গ্রীকভূমে পারলৌকিক উচ্চাধম লোক বিষয়িণী বোধ পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে।)। এই অনুরোধের পর ডিওগীনিসের উত্তর,—"কেন হে বাপু, ভাবিয়াছ কি যে, যে সকল অপদার্থ ওঁছাটে অংশ যাহারা এই ঘৃণিত পর্ব্বভুক্ত হইয়াছে, তাহারাই কেবল ভাল স্থানে যাইবে, আর ইগিসিলাউস্‌ ও এপিমিনণ্ডাসের ন্যায় লোক ইহারা সকলে কাদায় পড়িয়া মাটি খাইবে?" এই উক্তি, পর্ব্বাহের প্রকৃতি এবং তৎপ্রতি বক্তার ভক্তি, উভয়ই এককালে প্রকাশ করিতেছে। এই পর্ব্বাহের গূঢ় গুহ্য প্রকাশ করিলে, লোকে জাতিচ্যুত ও সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইত।২১ পুনশ্চ আরিষ্টফানিসের দেবভক্তির প্রতি বারেক দৃষ্টি কর। তাঁহার প্লুটুস্‌ নামক নাটকে বর্ণিত হইয়াছে যে, লোকে আর বলি ও পূজোপহার না দেওয়ায়, পুরোহিতেরা পৌরহিত্য পরিত্যাগ করিলে, দেববর্গ ক্ষুধায় আকুল হইয়া শেষে মনুষ্যলোকে আসিয়া মজুর বেহারা, পাহারাওয়ালা ইত্যাদির কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া উদর ঠাণ্ডা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পুনশ্চ ঐ গ্রন্থকারের আর একখানি নাট্যগ্রন্থে২২ বর্ণিত

২০। প্লেটো এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, ডিওনসীয়া পর্ব্বসময়ে তিনি দেখিয়াছেন, যে সমস্ত আথেন্স নগরী একেবারে মদোন্মত্ত হইয়া ফিরিতেছে।—Lib i. de. Leg.

২১। Hor Od 2 III.

২২। Aristo. Buda.

হইয়াছে যে, পক্ষিকুল মধ্য আকাশে একটী নগর নির্ম্মাণ করিয়া, তথায় অবস্থান পূর্ব্বক, মনুষ্যলোক হইতে দেবলোকে যে কিছু পূজোপহার প্রেরিত হইত, মধ্য পথে তাহা হরণ করিতে লাগিল। দেবদল তদভাবে ক্ষুধায় আকুল ও অস্থি-চর্ম্ম-শেষ, শেষে নিরুপায় হইয়া পক্ষীদিগের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন মানসে হিরাক্লিশ প্রভৃতি দেবতাত্রয়কে দূত করিয়া পাঠাইলেন। দরবার-গৃহের পরিবর্ত্তে পক্ষীদিগের রন্ধনশালায় দেবদূত গৃহীত হইল। এই রন্ধনগৃহে আহারীয় দ্রব্য, ক্ষুধার্ত্ত দেবদূতগণের ভাব ভঙ্গী আদি বর্ণনা অতি হাস্য-উদ্দীপক ও দেববর্গের হেয়ত্ব-সাধক। শেষে দেবদল পক্ষিরাজের বহু খোষামোদে এবং অধিকন্তু তাহাকে বাসিলীয়া সুন্দরী দানে, সন্ধিস্থাপন পূর্ব্বক নির্ব্বিঘ্ন হইলেন। অরিষ্টফানিসের এই সকল তীব্র ব্যাঙ্গোক্তির মূল কারণ, গ্রীকদিগের ধর্ম্মতত্ত্ব ও তদনুষ্ঠানের বিকৃত ও বিভৎস ভাব লোকের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওন জন্য। ফলতঃ ধর্ম্মের নাম করিয়া গ্রীসে নানাবিধ কদর্য্য কাণ্ড সকল অবাধে হইয়া যাইত। আধুনিক হিন্দু যে ইহার তুলনায় কিছু কম হইবেন তাহা নহে, বরং কিছু উপরেই যাইবেন বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু এখানে আধুনিক হিন্দু লইয়া কথা নহে। যে সিংহ-বংশে তিনি শৃগাল জন্মিয়া মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন, এখানে সেই সিংহ-বংশেরই কথা কহা যাইতেছে; ও তাঁহারই সহিত বক্তব্য বিষয় তুলনীয়।

এই সকল দেবপর্ব্বাহের বিভৎস ব্যাপারাদির মধ্যেও আর একটী বিষয় স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা গ্রীকচরিত্র বিষয়ে উজ্জ্বল পরিচায়ক স্বরূপ। ধর্ম্মের অনন্বিত তত্ত্ব পক্ষের সঙ্কেত লিপির কার্য্য যেমন ঐরূপ বিভৎস ব্যাপারে অবসান হইতে দেখা গেল, অনুষ্ঠিত তত্ত্ব পক্ষে কিন্তু সেরূপ নহে; জাতীয়ত্বের সহিত যথায় সম্বন্ধ, তথায়—এই বিভৎস পর্ব্বাহ স্থলেই গ্রীস আবার বীরত্ব, বীর-মনুষ্যত্ব, এবং জাতীয় একতার আধার-ভূমি। ইহার মধ্যেও বলের অর্চ্চনাই প্রধান। কিকিরো একস্থানে বলিয়াছেন যে ওলিম্পিয়ার কুস্তি প্রভৃতিতে জেতা যে, সে গ্রীকদিগের নিকট এতই সম্মানিত হইত যে রোমনগরীতে রনজয়ী বীরপুরুষের গৌরবও তাহায় নিকট মলীন হইয়া যাইত।"[২৩] করেস

২৩। Cec. Pro Flacco. num. XXXI.

উঁহার আরও উন্নত সম্মান জ্ঞাপন করিয়াছেন; তিনি লিখিয়াছেন যে তদ্রূপ জেতা মনুষ্যলোকের অতীত বলিয়া গণিত হইত, এবং লোকে তাহাকে মনুষ্য নহে, দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিত।২৪ বলা বাহুল্য যে ইহারই ফলে মারাথন, থার্ম্মপিলি প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্রের উৎপত্তি।

হিন্দুদিগের শাস্ত্রগ্রন্থ, পর্ব্বাহ, যাগযজ্ঞ, পূজা প্রকরণাদি অগাধ সমুদ্র বিশেষ; অতএব কোন্ স্থান হইতে কি তুলিয়া গ্রীকদিগের সহিত তুলনা করিয়া দেখাইব। তবে ধর্ম্মের ফল স্বরূপ নৈতিক জীবন কিরূপ তাহা দৃষ্টি করিলে, তৎতৎ বিষয় বহুলাংশে উপলব্ধি হইতে পারে। অতএব তাহাই একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। আমরা হিন্দু-সন্তান, হয়ত নিরপেক্ষ ভাবে হিন্দুর কথা নাও বলিতে পারি, অতএব তাহা একজন প্রাচীন দর্শক গ্রীকের দ্বারাই উক্ত হউক। এই গ্রীক কেবল বাহ্যদর্শী মাত্র, সমাজের অন্তস্তলের নিগূঢ় কথা কিছুই তাহার জানিবার সম্ভবও নহে এবং জানিতও না, সুতরাং তৎসম্বন্ধে যাহা কিছু উক্ত তাহা ভ্রমপূর্ণ। অতএব সেই সকল কথা, যাহার উপর সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া কেবল বাহ্য দৃশ্যেরই চিত্র মাত্র কথঞ্চিৎ এখানে গ্রহণ করা গেল। ২৫

"ভারতীয়েরা মৃত ব্যক্তির স্মরণার্থে কোন কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করে না। তাহারা বলিয়া থাকে যে, তাহাদের জীবনকালের মধ্যে কৃত সৎকার্য্য যাহা, এবং তাহারই যে গুণগান, তাহাই তাহাদের পক্ষে উৎকৃষ্ট কীর্ত্তিস্তম্ভ।

"ভারতীয়েরা আহার বিহারে সর্ব্বদাই পরিমিতজীবী,—বিশেষতঃ যখন সেনানিবাসের মধ্যে থাকিতে হয়। বিশৃঙ্খল জনতাকে ইহারা সর্ব্বদাই ঘৃণা করে, এনিমিত্ত ইহাদের সর্ব্ববিষয়েই সুশৃঙ্খলা পরিদীপ্যমান। চৌর্য্যাদি দুষ্ক্রিয়া কদাচ ঘটিয়া থাকে। চন্দ্রগুপ্তের শিবিরে অন্যূন ৪০০০০০ লোক থাকিত; কিন্তু এত লোক সমাবেশ সত্ত্বেও কোন দিনেরই অপহৃত দ্রব্যের মূল্য কখনও দুইশত ড্রাম, অর্থাৎ ৮১।০ টাকার ঊর্দ্ধে

২৪। Hor Od. I & II

২৫। Megas. Frag. XXVI & XXVII et seq.

উঠে নাই।" এইখানে দর্শক আশ্চর্য্য হইতেছেন যে, "যে জাতির মধ্যে লিখিত নিয়মাদির অভাব, এবং লিখনপ্রণালী যাহাদের নিকট এখনও অপরিজ্ঞাত, সে জাতি কেমন করিয়া এতটা শান্তি রক্ষা করিয়া থাকে।" দর্শক কখন লিখনপ্রণালীর অস্তিত্ব দেখিতে পায়েন নাই।* সে যাহা হউক, পুনশ্চঃ—

"ভারতীয়েরা পরম সুখে বাস করিয়া থাকে; স্বভাবে পরিমিতজীবী, এবং ব্যবহারে আড়ম্বরশূন্য ও সুরুচির। কেবল যজ্ঞাদির সময় ভিন্ন কখনও সুরাপান করে না।" যজ্ঞের সময় সুরাপান, বোধ করি, দর্শক সোমরসপানে দৃষ্ট করিয়া থাকিবেন। "যবের পরিবর্ত্তে তণ্ডুল হইতে একরূপ পানীয় প্রস্তুত করিয়া, তাহা ইহারা ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাদিগের আহারীয় তণ্ডুলপাক অন্ন। ইহাদের আইন ও চুক্তি প্রভৃতি যে নিতান্ত আড়ম্বরশূন্য, তাহা ইহারই দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে তাহারা কদাচ বিচারালয়ের স্মরণ লইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে চুক্তিভঙ্গ বা বিশ্বাসঘাতকাদি সম্বন্ধে কোন মকর্দ্দমা হয় না অথবা ইহারা সাক্ষ্য মোহরাদিরও আবশ্যক রাখে না। ইহারা যখন যাহার নিকট কিছু গচ্ছিত করিবে তাহা পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই করিয়া থাকে। ইহাদিগের গৃহ সম্পত্তি আদি অরক্ষিত ভাবে পড়িয়া থাকে, অথচ কোন বস্তু অপহৃত হয় না। এই সকলের দ্বারা দৃষ্ট হইতেছে যে ইহারা সদ্বুদ্ধিশালী এবং সৎপ্রকৃতিস্থ।" এই স্থানে বিজ্ঞ

* মিগাস্থিনিস যে স্থানে লিখন প্রণালীর অভাবের কথা বলিতেছেন, সে স্থানের অর্থ স্পষ্ট নহে। উহা সমস্ত হিন্দুজাতি সম্বন্ধে বলিতেছেন কি কেবল চন্দ্রগুপ্তের শিবিরস্থ লোকদিগের সম্বন্ধে বলিতেছেন, তাহার ঠিক নিরূপণ করা যায় না। তখন ভারতের উচ্চ গৌরব ও উচ্চ সভ্যতার সময়, অতএব তখন যে লিখন প্রণালীর অস্তিত্ব ছিল না, একথা সমগ্র জাতি সম্বন্ধে প্রয়োগ করা নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এবং প্রয়োগকারী যে নিতান্ত অনভিজ্ঞ তাহারই পরিচায়ক। কিন্তু যতদূর দেখা যাইতেছে, তাহাতে মিগাস্থিনিস্‌কে ততদূর অনভিজ্ঞ দর্শক বলিয়া কখনই বলিতে পারা যায় না। অতএব অনুমান হয়, ঐ কথা কেবল চন্দ্রগুপ্তের শিবিরস্থ লোকদিগের সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রবন্ধ ভাগে কিন্তু যে অর্থ সহজে উপলব্ধি হয়, তাহাই গৃহীত হইল।

ডিওগীনিসের গ্রীক আদালত দর্শনান্তে যে উক্তি তাহা স্মরণ করিবে—"উভয় পক্ষের উকিলী শুনিয়া ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, একব্যক্তি কথিত দ্রব্যটি চুরী করিয়াছে, আর অপর ব্যক্তির তাহা চুরী যায় নাই।"২৬

পুনশ্চ মিগাস্থিনিস্ কহিতেছেন, "ইহারা সত্য এবং সততার সম পরিমাণে সম্মান করিয়া থাকে। এজন্য ইহাদের মধ্যে কেবল বয়োবৃদ্ধ নহে, জ্ঞানবৃদ্ধ হইলেই তবে সম্মান প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" মিগাস্থিনিসের আর এক অদ্ভুত কথা শুন,—"স্ত্রীলোকের সতীত্ব আয়াসসাধ্যে রক্ষা না করিলে, তাহারা দুশ্চারিণী হইয়া থাকে"; একথা মিগাস্থিনিসের বোধ করি অবরোধ-প্রথা দৃষ্টে। যেমন বলিয়াছি, সমাজের অন্তস্তলে যে দর্শকের দৃষ্টি ছিল না ইহা তাহারই পরিচায়ক। বিশেষতঃ যে দেশের স্ত্রীলোক গ্রীকপর্ব্বাদির অংশভাগিনী, যথায় নিরবচ্ছিন্ন উলঙ্গ পুরুষবর্গের ক্রীড়া কৌতুক স্ত্রীগণ স্বচ্ছন্দে এবং অকাতরে দাঁড়াইয়া দেখিত; এবং যে দেশের মধ্যে স্পার্টাভূমে, যথায় যুবতী কামিনীগণ স্বচ্ছন্দ-অঙ্গসঞ্চালনের নিমিত্ত গোপনীয় অংশ অবস্ত্রাবৃতে অগোপন করিয়া রাখিত, সে দেশের এক জন দর্শক, ভারতীয় সঙ্কীর্ণ স্ত্রীস্বাধীনতা দেখিয়া, ওরূপ কথা না বলিবে ত বলিবে কে?

ভারতীয়ের ধর্ম্মবুদ্ধি সম্বন্ধে, ঐ মিগাসথিনিস্ বলিতেছেন।২৭ "ইহাদিগের আলোচ্য বিষয়ের অধিকাংশই মৃত্যু সম্বন্ধে, ইহারা এই জীবনকে গর্ভবাসের ন্যায় বিবেচনা করিয়া থাকে; গর্ভবাসের পূর্ণতা অন্তে মৃত্যুই প্রকৃত জন্ম, এবং তথা হইতেই যথার্থ ও সুখময়ী জীবনের আরম্ভ। এজন্য ইহারা মৃত্যুর নিমিত্ত প্রস্তুত হইবার জন্য নানাবিধ ব্রত নিয়মাদির আচরণ করিয়া থাকে। মনুষ্যভাগের যাহা কিছু সুখ দুঃখ, তাহারা ইহার কিছুই গণনায় আনে না, এবং তাহাকে নিরর্থক মায়া ক্রীড়া স্বরূপ বিবেচনা করিয়া থাকে। যদি তাহা মায়াক্রীড়া না হইয়া সত্য ও সৎপদার্থ হইত, তবে একই বস্তু এক ব্যক্তির

২৬। Diog. Laert. VI Diog.

২৭। Megas. Frag XII.

নিকট সুখ ও অপরের নিকট দুঃখদায়ক; অথবা একই বস্তু সময়ভেদে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্নরূপ চিত্ত উদ্দীপনার কারণ স্বরূপ হইবে কি জন্য।" গ্রীক বিজ্ঞদিগের মনে এরূপ কথা বোধ করি আপনা হইতে কোন দিন স্বপ্নেও প্রবেশ করে নাই।

পুনশ্চ, একদা মাসিডনিয়ার অধিপতি আলেকজাণ্ডার, ব্রাহ্মণবিজ্ঞ দেখিবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হইয়া, আচার্য্যপদবীর দণ্ড (Dandamis) নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে নিকটে আনিবার জন্য, গ্রীকবিজ্ঞ অনেসিক্রেটিস্‌কে ব্রাহ্মণমণ্ডলীতে প্রেরণ করেন। দণ্ডাচার্য্য পর্ণশয্যায় শায়িত, এমন সময়ে অনেসিক্রেটস্ যাইয়া তাঁহাকে আলেক্‌জাণ্ডারের অনুজ্ঞা এরূপে জ্ঞাপন করিলেন। "হে ব্রাহ্মণাচার্য্য, আপনার মঙ্গল হউক, দেবরাজ জিউসের পুত্র রাজাধিরাজ ও সর্ব্বজনস্বামী মহারাজ আলেক্‌জাণ্ডার আপনাকে একবার তাঁহার সকাশে উপস্থিত হইবার জন্য অনুজ্ঞা করিয়াছেন। আপনি সেই অনুজ্ঞা পালন করিলে অপার পারিতোষিক দানে তিনি আপনাকে সন্তুষ্ট করিবেন। কিন্তু যদি অবহেলা করেন, তাহা হইলে আপনার মস্তকচ্ছেদন হইবে।" দণ্ডাচার্য্য উঠিবার পাত্র নহেন; সেই সুখ শয়নে সমান শায়িত থাকিয়া ও অনুজ্ঞার প্রতি কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কহিলেন,—'ঈশ্বর যিনি, তিনিই সর্ব্বোপরি এবং সর্ব্বেশ্বর রাজা, এবং দেখ তাঁহা হইতে কখনও দুষ্ট অভিসন্ধির উৎপাদন হয় না। তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা,—এই আলোকের, এই শান্তির, এই জীবকুলের, এই জলের, এই মনুষ্য দেহ এবং এই মনুষ্য আত্মার; আবার ইহারা যখন মৃত্যু হস্তে পড়িয়া বন্ধনশূন্যে স্বাধীনত্ব লাভ করে, তিনিই আবার তাহাদিগকে নির্ব্বিকার প্রসন্ন মুখে পুনর্গ্রহণ করিয়া শান্তিদান করিয়া থাকেন। তিনি কোন যুদ্ধেরও প্রবর্ত্তনা করেন না বা হত্যারও প্রশ্রয় দিয়া থাকেন না; সেই একমাত্র মঙ্গলময় দেবই আমার স্বামী, এবং তাঁহারই নিকট আমি বিনতশির হইয়া থাকি। কিন্তু তোমার আলেক্‌জাণ্ডার ঈশ্বর নহেন, তাহাকেও একদিন মরিতে হইবে। বিশেষ যে ব্যক্তি এখনও তীব্রবহা নদীর তীর পর্য্যন্ত যাইতে সমর্থ হয় নাই; অথবা যে এখনও বিশ্বরাজ্যের সিংহাসন অধিকার করিয়া তাহার উপর আরূঢ়

হইতে পারে নাই, সে কেমন করিয়া সর্ব্বজন-স্বামী হইতে পারে? অথবা আলেক্জাণ্ডার্ এখনও সশরীরে রসাতল গমনে সমর্থ হয় নাই; অথবা সূর্য্য কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া মধ্য আকাশ দিয়া গমন করিয়া থাকেন, তাহাও নিরাকরণ করিতে সমর্থ হয় নাই। যদি তাহার বর্ত্তমান রাজ্যায়তন তাহার দুরাকাঙ্ক্ষার অনুরূপ বিবেচনা না করে, বলিও তাহাকে এই গঙ্গা পার হইয়া ধাবিত হইলে তাহার আকাঙ্ক্ষা পূরণের যথেষ্ট উপকরণ মিলিতে পারিবে। তুমি নিশ্চয়ই জানিও, আলেক্জাণ্ডার্ আমাকে যে সম্মান দানে প্রস্তুত, বা আমাকে যে পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইতেছে, আমার পক্ষে তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। আমি যে দ্রব্যের সমাদর করিয়া থাকি, এবং যাহা আমার কার্য্যে লাগিয়া থাকে, সুতরাং যাহা আমার নিকট মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত, তাহা আমার এই শয্যা ও কুটীর নির্ম্মায়ক পত্রপুঞ্জ, অথবা ঐ লতা যাহা আমার সুরস আহারীয় যোগাইয়া থাকে, অথবা ঐ জল যাহা আমার পানীয় প্রদান করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন অন্য যে সকল আয়াসসাধ্য বস্তু, যাহা অন্যে সংগ্রহ করিয়া থাকে, তাহা তাহাদের পক্ষে পরিণামে কেবল দুঃখ ও বিরক্তির কারণ স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু আমি, যাহারশয্যা এই পর্ণপুঞ্জ এবং রক্ষণীয় বস্তু যাহার কিছুই নাই, আমার নিদ্রা কত সুখের!—যদি আমি বস্ত্রাদি সম্পত্তি সংগ্রহ করিতাম, তাহা হইলে আর এটুকু থাকিত না। সন্তানের প্রতি জননীর ন্যায়, এই অবনী আমার সমস্ত অভাবই পূরণ করিতেছেন। আমি যেখানে ইচ্ছা সেই স্থানেই গমন করিতে পারি, কোন বন্ধনেই আমি বদ্ধ, বা ভারে ভারভূত নহি। যদি আলেক্জাণ্ডার্ আমার মস্তকচ্ছেদ করে, তাহা বলিয়া আত্মাকেও যে ধ্বংস করিতে পারিবে তাহা নহে। আমার মস্তক নির্ব্বাক পড়িয়া রহিবে; কিন্তু আমার আত্মা, এই শরীরকে ছিন্ন বসনের ন্যায়, যে পৃথিবী হইতে উহার উৎপত্তি তথায় পরিত্যাগ করিয়া, স্বচ্ছন্দে তাহার ঈশ্বর-সকাশে আরোহণ করিবে। যে ঈশ্বর আমাদিগকে শরীরী করিয়াছেন; যিনি, আমরা পৃথিবী-পতিত হইলে তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকি কিনা তাহার পরীক্ষার্থে আমাদিগকে পৃথিবীতলে প্রেরণ করিয়াছেন; যিনি আমাদিগের এই জীবন অন্তে আমাদিগের কর্ম্ম

সমূহের বিচার করিবেন, যেহেতু তিনিই সর্ব্বোপরি বিচারক; এবং যাঁহার নিকট পীড়িতের যে আর্ত্তনাদ তাহাই পীড়াদায়কের শাস্তির কারণ স্বরূপ হইয়া থাকে; আমি সেই ঈশ্বর-সকাশে উপনীত হইয়া শান্তিলাভ করিব।”

“অতএব যাও, তোমার অলেক্‌জাণ্ডার্‌কে বল গিয়া, এসকল ভীতি-প্রদর্শন তাহাদেরই প্রতি বিশেষ কার্য্যকরী হইবে, যাহারা মৃত্যুকে ভয় করে, বা যাহারা সুবর্ণ সম্পত্তি আদি লাভের জন্য বাসনাক্ষিপ্ত; ব্রাহ্মণেরা সম্পত্তি চাহে না বা মৃত্যুকেও ভয় করে না। যাও তবে, আলেক্‌জাণ্ডার্‌কে আবার বলিও, ‘তোমার নিকট এমত কিছুই নাই যাহার প্রাপ্তি জন্য দণ্ড লোলুপ, এজন্য সে তোমার নিকট যাইতে অশক্ত; কিন্তু যদি তোমার দণ্ডের নিকট কোন বিষয় প্রার্থনীয় থাকে, তবে তুমি তাহার নিকট স্বচ্ছন্দে যাইতে পার।”[২৮]

এই উত্তরের উপর মিগাস্‌থিনিস্‌ লিখিতেছেন—“আলেক্‌জাণ্ডার্‌ অনেসিক্রেটিসের দ্বারা দণ্ডের নিকট এই উত্তর প্রাপ্তান্তে, দণ্ডকে দেখিবার জন্য অত্যন্তই উৎসুক হইয়াছিলেন।[২৯] এই দণ্ড যদিও বৃদ্ধ এবং নগ্নবেশী, কিন্তু ইনিই কেবল এক মাত্র ব্যক্তি যাঁহার নিকট সর্ব্বজাতি-বিজয়ী জগৎজেতা বীরকেও নিতান্ত পরাস্তভাব স্বীকার করিতে হইয়াছিল।” তথাস্তু। মাতঃ ভারতলক্ষ্মি! এতাদৃক পিতৃপুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়া আমরা কি করিতেছি?—সাহেব বাহবা দিবেন বলিয়া স্বচ্ছন্দে দোষশূন্য মাতৃসন্তানকে ফাঁশিকাষ্ঠে তুলিয়া দিতেছি; সাহেব বাহবা দিবেন বলিয়া স্বচ্ছন্দে মাতৃসন্তানের অপ্রিয় সাধন করিয়া সাহেবের

২৮। Megas Frag. LV.

২৯। কথিত আছে, আলেক্‌জাণ্ডার্‌ দণ্ডাচার্য্যের বৃত্তান্ত শুনিয়া, তাঁহাকে দেখিবার জন্য অরণ্যভ্রমণের ছলে দণ্ডাচার্য্যের তপোবনে আইসেন; কিন্তু তথায় দেখিতে না পাইয়া, অবশেষে তাঁহাকে নিকটে লইয়া যাইবার জন্য অনেসিক্রেটিস্‌কে পাঠান। (Frag. LV.—B.) দণ্ডাচার্য্য আলেক্‌জাণ্ডারের নিকট যাইতে অস্বীকার করিলে, এরূপ উক্ত যে, আলেক্‌জাণ্ডার্‌ স্বয়ং আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। (Frag. LIV). আলেক্‌জাণ্ডারেও কি প্রকৃত মহামনা!

প্রিয়বচন করিতেছি। মাতঃ ভারতলক্ষ্মি! তুমি কি চোখের মাথা খাইয়াছ, না সমুদ্রে জল কমিয়া গিয়াছে, তাই এ দেশ ডুবাইয়া আজিও দহ পড়াইতে পার নাই? কালের প্রভাবে কি দুরন্ত বৈষম্যই ঘটিয়াছে!

অনেকের বিশ্বাস, ভারতের উচ্চ জাতিরা নীচ জাতির প্রতি অতিশয় কঠোর ব্যবহার করিতেন; বিশেষতঃ শূদ্রেরা ক্রীতদাসবৎ থাকিত। তৎসম্বন্ধে মিগাস্থিনিস্ বলিতেছেন,—"ভারতের আর একটি আশ্চর্য্য কথা এই যে, এখানে ভারতীয় মাত্রেই স্বাধীন. ইহার মধ্যে দাসশ্রেণীস্থ কেহ নাই। কেবল এই বিষয়ে ভারতীয় এবং লাকিদিমোনিওদিগের মধ্যে বিষয়ের একতা দেখা যাইতেছে। তথাপি, লাকিদিমোনিওদিগের মধ্যে হেলটদিগকে দাসস্বরূপ বলিলে বলা যায়, এবং হেলটেরা দাসের ন্যায় খাটিয়াও থাকে, কিন্তু ভারতে তাহাও নাই। স্বদেশীয় লোকের কথা দূরে থাকুক, বিদেশীয়দিগেরও কাহাকে ইহারা দাসের ন্যায় ব্যবহার করে না।" ৩০ আমরা এখনও বলি, ভারতে নীচ জাতি দাসের ন্যায় ছিল; কিন্তু যদি অন্য দেশের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তবেই সে দাসত্ব মিগাস্থিনিসের কথিত স্বাধীনত্বে পরিণত হইয়া থাকে। ভারতীয়ের নৈতিক প্রকৃতি হেতু, দেখ, দাসত্বও এখানে কতটা কোমল!—পুনশ্চ, নৈতিক প্রকৃতির ইহা উচ্চ পরিচায়ক।

অতঃপর গ্রীকদিগের ধর্ম্মতত্ত্ব ও তাহার প্রকৃতি আদি সম্বন্ধে একজন ফরাসী ইতিহাসবেত্তার মতামত পাঠ করিয়া দেখ। "ইহাদিগের সমগ্র ধর্ম্মতত্ত্ব, পর্ব্বাহ ও উৎসবাদির স্বভাব ও মতি, যাহার একমাত্র শিক্ষক এবং নেতা কেবল কবিগণ; এবং দেবতাদিগের আত্ম-আদর্শ পর্য্যন্তও,—যাহাদের দুর্দ্দমনীয় কুপ্রবৃত্তি, নিন্দনীয় কীর্ত্তি, এবং নিতান্ত ঘৃণাকর ক্রিয়া সকল, যাহা স্তোত্র বা গাথায় গ্রথিত এবং লোকসমূহের উপাস্য এবং অনুকরণযোগ্য বলিয়া গণনীয় ও গৃহীত হইয়াছে; সে সমস্তেরই মধ্যে এমন কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না যে, যাহা লোকচিত্ত আলোকিত বা উন্নত, জ্ঞানাধার বা নীতিসম্পন্ন করিতে সমর্থ হয়। প্রত্যুত ইহাই বিশিষ্টরূপে লক্ষিত হয় যে তাহাদের গুরুতম দৈবকার্য্য এবং

৩০। Megas Frag XX' I.

নিতান্ত পবিত্র ও গূঢ় গুহ্য প্রকরণ যে সকল, তাহাদের মধ্যেও, কিসে মনুষ্য জ্ঞানসম্পন্ন, নীতিসম্পন্ন, বা এই সাধারণ জীবনক্রিয়া কিরূপে সুভাবে অতিবাহিত করিতে পারা যায়, তৎসম্বন্ধীয় ও তৎপোষক কোন বস্তু থাকা দূরে থাকুক; বরং তৎপরিবর্ত্তে আইনের প্রভুত্ব, প্রথার আধিপত্য, শাসকবর্গের উপস্থিতি, রাজন্যবর্গের সমিতি, এবং পিতৃমাতৃদৃষ্টান্ত পর্য্যন্তও, কিসে এই সমস্ত জাতিকে আমূলতঃ, ধর্ম্মের নামে বা প্রকারান্তরে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া, অপবিত্র এবং দুর্নীতিশীল উপাসনায় রত করিবে,তাহারই শিক্ষা দিয়া আসিয়াছে।" ৩১

এখানে আর একটি বিষয় পরিষ্কার করিয়া বলা উচিত, তাহা এই; হিন্দুর ধর্ম্মতত্ব সম্বন্ধে উদ্ধৃতাংশ সমূহ বেদাদি উচ্চ শাস্ত্র হইত লইলাম কি জন্য, এবং গ্রীকের বেলাই বা গ্রীক কবিগণ প্রভৃতির দোহাই দিলাম কেন?—ইহার উত্তর পূর্ব্বেই দিয়াছি। গ্রীকদিগের মধ্যে বেদাদির ন্যায় প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্রগ্রন্থের অভাব—কবিগণের রচনা ও গাথাদিই কেবল তথায় তৎপদস্থ।

এক্ষণে একবার পূর্ব্বাপর সমালোচনা করিয়া দেখা যাউক। ভারতীয় চিত্ত ক্রমে ক্রমে পারলৌকিক তত্ত্বে এরূপ সমাহিত হইল যে, মানবচিত্ত পর পর অদৃশ্য ভেদ করিতে ক্রমাগত উৎসাহবান হইয়া, মানব জীবনের ক্ষণভঙ্গুরতা ও পরলোকেই সমস্ত নির্ভরতা সিদ্ধান্ত করিয়া, পার্থিব সমস্ত বিষয়ে আস্থাশূন্য, এবং তাহা ক্ষণমাত্রের বস্তু এরূপ বোধ করিয়া, তাহার প্রতি অপেক্ষাকৃত শিথিল-যত্ন হইল। উপাস্য বিশ্বপতি, যিনি সেই বিশ্বব্যাসস্থানের পিতৃদেবতা। গ্রীকদিগেরও উপাস্য ইষ্টদেবতা বটে, কিন্তু কিরূপ দেবতা, তাহা উপাসনার উদ্দেশ্য দ্বারা অবধারণ কর। ভারতীয়দিগের উপাসনার উদ্দেশ্য পারলৌকিক ঐশ্বর্য্যলাভ, এবং প্রাপ্তমঙ্গলের নিমিত্ত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন; গ্রীকদিগের উপাসনার উদ্দেশ্য ইহলৌকিক ঐশ্বর্য্যলাভ। দেবতাকে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের কারণ অভাব; কারণ যাহা আমি পাইয়াছি বা যাহা আমার আছে, তাহা আমারই হক্ প্রাপ্য তাই পাইয়াছি, তাহাতে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সম্বন্ধ কি? এখনও যেমন

৩১। M. Rollin.

যেরূপ উপাসনা করিব, তাহার তেমনি প্রতিদান চাহি। অতএব ভারতীয়দিগের দৈবকার্য্য বিষ্ণুপ্রীতিকামার্থে; আর জমাখরচ-বিজ্ঞানবিৎ গ্রীকদিগের দৈবকার্য্য আত্মপ্রীতিকামার্থে। এ সংসার-ক্ষেত্রে যে চিত্তের অবলম্বনীয় বস্তু যেরূপ, সে চিত্তের এ সংসারউপযোগী কর্ত্তব্যবোধ ও নীতিমার্গও তদ্রূপ হইয়া থাকে। গ্রীকদিগের কর্ত্তব্যবোধ ঐশ্বর্য্যলাভ; ভারতীয়দিগের কর্ত্তব্যবোধ ধর্ম্মলাভ। সুতরাং ভারতীয়দিগের নীতিমার্গ, যে কোন উপায়ে হউক, ধর্ম্মবিধায়ক; গ্রীকদিগের নীতিমার্গ, যে কোন উপায়ে হউক, ঐশ্বর্য্যবিধায়ক। এতৎ কারণে ভারতীয়েরা ধীর, শান্ত, বিনীত, সর্ব্বভূতে সমান দয়াবিশিষ্ট, সর্ব্বজীবের প্রতি নৈতিক হিত সাধনে আগ্রহবান্। আর গ্রীকেরা নৈতিক হিতবিষয়ে উদ্ধত; বীরগর্ব্বে গর্ব্বিত; উপস্থিত কার্য্যসম্পাদক নীতিপ্রিয়; ক্ষমতার পক্ষপাতী—যাহার বল অধিক, সেই অধিকারী, সেই পূজনীয়; হিত ও দয়া আত্মহিতে সমাবিষ্ট।

উপরে যাহা কথিত হইল, তাহার একটি উদাহরণ দেখা যাউক। ভারতীয় এবং গ্রীকেরা যখন আদিতে স্ব স্ব উপনিবেশ-ভূমিতে পদার্পণ করেন, তখন উভয়কেই তত্তৎ দেশজ আদিম অধিবাসীদিগের নিকট বল বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক, তাহাদিগকে পদানত করিয়া, তাহাদিগের বাসস্থান দখল করিতে হইয়াছিল। আদিমগণের উপর উভয়েই আত্মপ্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। ভারতে তাহারা শূদ্র, গ্রীসে তাহারা পিলাস্গী। ভারতীয়দিগের নিকট শূদ্র যেরূপ সম্বন্ধযুক্ত, গ্রীকদিগের নিকট পিলাস্গীও তদ্রূপ। কিন্তু এখন দেখ এই উভয় জাতি, আপন পদাবনত আদিম অধিবাসীদিগের উপর কেমন ব্যবহার করিয়াছিলেন। ভারতীয়দিগের নিকট মানব যতই হীনাবস্থায় থাকুক না কেন, তথাপি প্রত্যেক মানব ঈশ্বরের প্রতিরূপী-স্বরূপ; অতএব কাহাকেও একবারে হেয়ভাব প্রদর্শন করিলে, তাহা ঈশ্বরের প্রতি করা হয়। ভারত-সন্তান তেমন কার্য্যে কখনই সাহসী হইতে পারেন না। সুতরাং শূদ্রেরা সহস্রগুণে অন্ত্যজ হইলেও, তাহারা মানবীয় অধিকার হইতে চ্যুত হইতে পারে না। এজন্য শূদ্রেরা দাস্যবৃত্তি-অবলম্বী হইলেও, তাহারা

সামাজিক স্বাধীনতা হইতে কোন অংশে বঞ্চিত নহে; এবং রাজার দ্বার ভিন্ন, কি আপন প্রভু, কি অপর কেহ, কাহারই নিকট আপন সদসদের জবাবদিহি করিতে হইত না। পুনশ্চ এই শূদ্রেরা দাসত্ব সূত্রে হীনত্ব প্রাপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, বরং পূর্ব্ব পশুভাব হইতে মুক্ত হইয়া মনুষ্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। এক্ষণে পিলাসগীদিগের অবস্থার প্রতি একবার অবলোকন করিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে যে, মানুষ হইয়া, মনুষ্যত্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক, মানুষকে কতদূর পশুভাবে ব্যবহার করিতে পারে। এই পিলাসগীদাসেরা গো মেষাদি আর আর পশু পালের সঙ্গে সমজাতীয় অবস্থার সম্পত্তি বিশেষ। সমাজের সঙ্গে গো মেষাদি পশুপালের যে সম্বন্ধ, ইহাদিগেরও সেই সম্বন্ধ। সুতরাং সামাজিক স্বাধীনতায় ইহারা একেবারে বঞ্চিত। প্রভুই সর্ব্বেসর্ব্বা, রাখিলে রাখিতে পারেন, মারিলে মারিতে পারেন। প্রভুরাও ইহাদের উপর ততোধিক অত্যাচার করিতেন। এবং যখন ইচ্ছা যাহার প্রাণদণ্ড বা প্রাণরক্ষা দ্বারা আপনার রোষ বা তোষ ভাবের জ্ঞাপন করিতেন। সময়ে সময়ে এই হতভাগ্যদিগকে অরণ্যচর পশুর ন্যায় পালে পালে এককালে নিপাত করিবার পক্ষে, উদাহরণ বিরল নহে। এখানে দেখ, ইহলৌকিক ঐশ্বর্য্য-প্রিয়তা-গুণ-জনিত স্বার্থসাধন হেতু মনুষ্যচিত্ত কিরূপ মনুষ্যত্ব পরিত্যাগ করণে সমর্থ। পিলাসগীরা ইহাদের দাস্য, কৃষি, পশুপাল রক্ষা, ইত্যাদি যাবতীয় শ্রমসাধ্য ও সামাজিক বোধে হেয় কার্য্যসমূহ নির্ব্বাহ করিত।

ইতি তৃতীয় প্রস্তাব।

চতুর্থ প্রস্তাব।

তত্ত্ব-বিদ্যা।

১। তত্ত্ববিদ্যার স্বরূপ।

খৃষ্টীয় পুরাণে কথিত আছে যে, সৎ-অসৎ বোধের প্রথমোদয়ে, বিধাতার আদি সৃষ্টি ইডেন-বিহারী আদমকে দিব্যাবস্থা হইতে পতিত হইয়া, সুখদুঃখময় সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। আবার যখন সেই সৎ-অসৎ বোধের পূর্ণতায় অসতের পূর্ণ বিচ্যুতি হেতু, সেই সদসৎ বোধকে বলি দিতে সক্ষম হইয়া, (স্বার্থবলিরূপ) মহাবলিকে আশ্রয় এবং অঙ্গীভূত করিতে পারিবে; তখনই আদমের পুনর্ম্মুক্তি—পুনর্ব্বার সেই দিব্যাবস্থা লাভ। বাইবেল গ্রন্থের এই ঘোষণা কি অপূর্ব্ব, কি অভাবনীয় গূঢ় সত্যপূর্ণ এবং সার্থক! যে জ্ঞান-বিজ্ঞ হিব্রু-ঋষি এই দুর্জ্ঞেয় গূঢ় গুহ্য ভেদ করিয়াও তাঁহার দিব্য দৃষ্টি চালনা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে বহু নমস্কার। বাইবেল গ্রন্থের এই কথা রূপক বা প্রকৃত যে ভাবেই গ্রহণ করা যাউক, ইহা কিন্তু নিশ্চয় এবং প্রত্যক্ষ যে আদি পিতৃদেবের এই পতনোন্নয়ন, অবশ্যম্ভাবী উত্তরাধিকার স্বরূপে, তাঁহার সন্ততিবর্গের জীবনের প্রতি পর্ব্বে এবং প্রতি গ্রন্থিতেই নিরন্তর এবং অক্ষুণ্ণভাবে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। আমাদের, প্রত্যেক মানবের, জ্ঞানজীবনে ইহা নিত্য নিয়মিত ভাবে অভিনীত হইয়া যাইতেছে। আমরা আত্মদোষে জড়প্রায় ক্রীড়নক স্বরূপ হইয়া, তাহা উপলব্ধি করিতে পারি বা না পারি, তথাপি সে অভিনয়ের তিলমাত্র ক্ষান্তি নাই। দুর্ভাগ্যবান সে, যে ইহা প্রত্যক্ষবৎ অনুভব করিয়া তদনুসরণে পদচারণ করিতে অসমর্থ।

পুনশ্চ, "বালকদিগকে আমার নিকটে আসিতে দেও, প্রতিবন্ধকতা করিও না, যেহেতু ঐরূপ প্রকৃতি লইয়াই "স্বর্গরাজ্য নির্ম্মিত"—এতদ্বাক্যে লোকহিতার্থে স্বার্থবলির জীবন্ত মূর্ত্তি যিশুখৃষ্ট স্বীয় শিষ্যদিগের

প্রতি অনুযোগ করিয়াছিলেন। যথার্থই ঐরূপ প্রকৃতি লইয়া স্বর্গরাজ্য নির্ম্মিত। আদমের কথিত আদি অবস্থা ঐরূপ বালকবৎ। শিশু অনন্ত হইতে নবাগত, কুটিল কালের সহিত অপরিচিত এবং তৎপ্রতি লক্ষ্যশূন্য সদসৎ বোধে অনভিজ্ঞ, রাজারও প্রজা নহে, সাধুরও খাতক নহে, পাপপুণ্যের বিচার-বিহীন, নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক, যথার্থতই এবং সর্ব্বতোভাবে ইডেনবিহারী আদমের প্রতিরূপ। শয়তান প্রতিরূপ কাল প্রবর্ত্তনায় শেষে সৎ-অসৎ বোধের উদয়ে, শিশু মানুষ হইয়া সংসার-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিল, এবং শয়তানের সহ নিত্য সংগ্রামে রত হইল। আবার যখন মানুষ সেই সদসৎ বোধকে আয়ত্ত করিয়া, সেই শয়তান প্রলোভনকে উপেক্ষা পূর্ব্বক পুনর্ব্বার বালকত্ব লভিতে, এবং স্বার্থক্ষয়ে মহাবলির অনুকরণ সূচিত করিতে পারিবে; অথবা রূপক বাক্যে, খৃষ্টশিষ্য যখন আত্মিক খৃষ্টের রক্তমাংস উদরস্থ করিতে সক্ষম হইবে, তখনই তাহার পুনর্মুক্তি। ফলতঃ বালক, বালক ঘুচিয়া মানুষ হইলেও, যদি নিত্য রাজ্যের অধিকারী হইতে চাহে, তবে আবার তাহাকে বালক হইতে হইবে। বালক এবং প্রকৃতজ্ঞানী ইহাদিগের মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, প্রভেদ কেবল এই পর্য্যন্ত যে, বয়ঃ-বালক যে সে অজ্ঞান বালক, এবং জ্ঞান-বালক যে সে সজ্ঞান বালক। অসৎকে ভেদ করিয়া সতের উদয় হইয়া থাকে; এবং যে সৎ বিশেষ যে অসৎ বিশেষকে ভেদ করিয়া উদ্ভয় হয়, সেই সৎ সে অসতের নিকট একবারে অনন্তকালের নিমিত্ত স্পর্শের অতীত হইয়া উঠে। আমাদিগের এই সংসারক্ষেত্রে সৎ-অসৎ সহ কর্ম্ম-সংগ্রামে লাভের অঙ্ক কেবল শেষ বালকত্বে সেই সজ্ঞানতা টুকু। এই সজ্ঞানতার অনেক গুণ। অজ্ঞান বালক কাল-প্রবর্ত্তনায় সহসা বিচলিত হইয়াছিল, কিন্তু সজ্ঞান বালক অনন্তকালের নিমিত্ত অটুট। অজ্ঞান বালক বিশ্ব প্রতি বিচারশূন্য; সজ্ঞান বালক বিশ্ব প্রতি পূর্ণ বিচারদক্ষ অথচ তাহাতে শয়তানি বিকার ও বিকম্পন শূন্য, অসৎ প্রতিরূপে বোধশূন্য খৃষ্টীয় দিব্য দূতের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সে দিব্য দূতেরও পতন আছে, কিন্তু ইহাদের আর পতন নাই। শয়তান আর প্রলোভনে ইহাদিগের মধ্য হইতে স্বদল পুষ্টীকরণে অসমর্থ।

অজ্ঞান হইতে সজ্ঞান বালকত্বে উপস্থিতি হইলেই, খৃষ্টীয়রূপকে নষ্ট ইডেনের পুনরুদ্ধার হইয়া থাকে; এবং এবার সে ইডেন হইতে শয়তান বিধ্বস্ত, বিদূরিত এবং চূর্ণশির। তারতম্যবিশিষ্ট হইলেও, এ উভয় বালকত্বই দিব্যাবস্থাসম্পন্ন সুতরাং সুখের। কিন্তু কি ভয়াবহ, ক্লেশকর এবং দুঃখসঙ্কুল এতদুভয়ের মধ্যসাময়িক অবস্থা। এক বালিকত্ব লোপে, অপর বালকত্বে উপনীত হওয়া পর্য্যন্ত, মানবের ইহা প্রকৃতই ইডেনচ্যুত পতিতকাল, ইহাই প্রকৃত স্বার্থপূর্ণ সংসারী এবং মনুষ্য অবস্থা। প্রতি বিষয়ের জন্য এখন আর ঈশ্বরের উপর অকপট নির্ভর বা তজ্জনিত শান্তি নাই; অথবা ঈশ্বরও, বলিতে গেলে, এখন আর তাহাদিগের প্রতি পদ চালনে পূর্ব্বের ন্যায় তত্ত্বাবধারণ করেন না। শয়তানকে প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে সম্মুখীন দেখিয়া;* এবং রক্ষণীয় বস্তু হইতে অরক্ষণীয় বস্তু রক্ষণে প্রতারিত হইয়া; আত্ম-রক্ষণের প্রবৃত্তি-সূত্রের বিকারে, মানব এখন সতত ঘোর স্বার্থবান, স্বারত্ত শক্তিতে স্ফীত, নিয়ত সংগ্রামরত, স্বয়ং সর্ব্বস্ব, আত্মবল-দীপ্ত, আত্মবুদ্ধিতে বৃহস্পতি, তর্কবুদ্ধিতে বিশারদ; অথবা এক কথায়, হীনপক্ষ-বোধ-বিক্ষুব্ধ ও স্বপক্ষ-সহায়তায় সন্দিহান সম্মুখ যোদ্ধার যে কিছু দোষ গুণ তদ্দ্বারা পরিচালিত। সংগ্রামে বিধ্বস্ত ও শ্রমক্লিষ্টতায় সৎ এখন শত্রুরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে; কেবল শত্রু নহে, কখন কখন তাহাকে ছদ্মসপক্ষ ও ঘরের শত্রু ভাবিয়া, রাগে বিরক্তিতে বিপক্ষ অসৎকে বন্ধু বলিয়া শান্তির নিমিত্ত তাহার শরণাপন্ন হয় ও ক্ষণিক শান্তির প্রলোভনে হয়ত তাহারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। মানবের এই মধ্য সময়—এই পতনদশাটিই বুদ্ধিমানের কাল, জ্যেষ্ঠত্ব বিস্তারের সময়, বিদ্যার জাহাজগিরি, তর্করঙ্গের ছড়াছড়ী; মানব এখন স্বীয় তেজে উন্মাদ যণ্ডের ন্যায় মদবিক্ষিপ্ত। কিন্তু এই সময়ে, এই ঘূর্ণাবর্ত্ত মধ্যেই, আবার ভাবি শুভাশুভের বীজ বপন হইয়া থাকে।

মানবের এই ত্রিবিধ বিভিন্ন অবস্থার অবলম্বন পদার্থও ত্রিবিধ। অজ্ঞান বালকের অবলম্বন ঈশ্বরসত্তা প্রকৃতি দেবী স্বয়ং; মধ্যাবস্থার অবলম্বন বুদ্ধি; সজ্ঞান বালক বা চূড়ান্ত অবস্থার অবলম্বন শ্রদ্ধা।

ইহার পরে শয়তান যখন বিদূরিত হইবায়, বিভিন্ন অর্থের অভাবে স্বার্থকে বলি দিবার সময় আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখনই আবার স্বার্থ ক্ষয় দ্বারা মহাবলির আশ্রয় হেতু, ঈশ্বরসত্ত্বা পুনর্ব্বার অবলম্বন স্থল হওয়ায়, মানবের পুনর্মুক্তি—খৃষ্টীয় নষ্ট ইডেনের পুনরুদ্ধার। বুদ্ধির বিষয়ীভূত বিদ্যা যাহা, সৎ-অসৎ বোধের নিরাকরণ যথায় উদ্দেশ্য, তাহাকে তত্ত্ব-বিদ্যা কহা যায়। শ্রদ্ধার বিষয়ীভূত যাহা তাহা ধর্ম্মবিদ্যা। তত্ত্ববিদ্যার বিষয় এক্ষণে আলোচ্য।

তত্ত্ববিদ্যা সাধারণ দূরদর্শন ফলে উৎপন্ন। ধর্ম্মবিদ্যা যেমন অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ লইয়া অন্তর্দৃষ্টি ও বহির্দৃষ্টি উভয়বিধ দৃষ্টিযোগে কার্য্য করিযা থাকে, তত্ত্ববিদ্যাব স্বভাব সেরূপ নহে: একমাত্র বহির্দৃষ্টি প্রধানতঃ ইহার উপায়। এই জন্য তত্ত্ববিদ্যা এতটা হৃদয়শূন্য, এবং এই জন্যই. লোকে চৈতন্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করিবে তাহাও কবুল, তথাপি, তত্ত্ববিদ্যা যতই উচ্চ পর্য্যায়েব হউক না কেন, প্রাণ মন বিক্রয় করিয়া কেহ তাহাব শিষ্যত্ব স্বীকাব করিতে চাহে না। ফলতঃ ধর্ম্মবিদ্যা যতই নিম্ন পর্য্যায়েব হউক, যদি সাত্ত্বিক হয়, তবে তাহা সর্ব্বদাই কোন না কোন মানব সমক্ষে গ্রহণীয় এবং ভক্তিব বিষয় হয়, কিন্তু তত্ত্ববিদ্যাব পক্ষে সেরূপ নহে। উহা যতই শ্রেষ্ঠোৎকর্ষ যুক্ত হউক না কেন, কেবল আদবণীয ও পবামর্শদাতৃস্থলীয় মাত্র হইয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া ভাবিও না যে, তত্ত্ববিদ্যা (যদি তাহা সাত্ত্বিক এবং সুপ্রকৃতি যুক্ত হয়) সংসারে অতি সামান্য কার্য্য করিয়াই নিরস্ত হইয়া থাকে; তাহা নহে। তত্ত্ববিদ্যা হইতেই ধর্ম্মবিদ্যা দৃঢ়ীকৃত হয়,—ইহাব দ্বারা এখন বুঝিতে পারিবে যে তত্ত্ববিদ্যার প্রয়োজনীয়তা কি গুরুতর।

তত্ত্ববিদ্যা মানবীয় জ্ঞান জিবনের অনেক এবং অতি সুমহৎ কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া থাকে। প্রধানতঃ অনুকূল প্রতিকূল উভয়বিধ বিপাকেব নিরসন দ্বারা, ভাবী ধর্ম্মবিদ্যাকে সর্ব্বতোমুখে স্থাপন ও তাহার নির্ম্মলতা সাধন পক্ষে সাক্ষাৎ হেতু স্বরূপ হয়, এবং গুরুতম দূরদর্শন চালনার জন্য পূর্ব্বোপার্জ্জিত জ্ঞানকে সহজ-আয়ত্ত হেতু সূত্রবদ্ধ করিয়া সোপান নির্ম্মাণ করা তাহাও ইহার কার্য্য। পদার্থনিকরে রাসায়নিক ক্রিয়া যেমন বিবিধ

পূর্ণ পদার্থের বিকৃতি সাধন করিয়া, তাহাদের পরিপাচন পূর্ব্বক পদার্থান্তর উৎপাদনের উপায় করিয়া দেয়, তত্ত্ববিদ্যাও সেইরূপ জ্ঞানসংসারে রাসায়নিক ক্রিয়ার কার্য্য করিয়া থাকে। এই রসায়নকালে যেরূপ যেরূপ তত্ত্ব-উপকরণের অভাব বা অনভাব হয়, তত্ত্ববিদ্যাও তদনুরূপ আকার ধারণ করিয়া থাকে। এই আকার প্রভেদ হইতেই, আস্তিক তত্ত্ব-বিদ্যা, নাস্তিক তত্ত্ববিদ্যা, আবার তাহার মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন মত পরি-পোষক তত্ত্ববিদ্যা, ইত্যাদি পৃথকত্বের উৎপত্তি হয়। রসায়নের ন্যায় তত্ত্ব-বিদ্যারও অবস্থা দ্বিবিধ, এক মসলাস্থলীয় পূর্ণ পদার্থ সকলের পূর্ণত্বভাব লোপের পূর্ণতা সাধন, অপর ভাবী উদ্দেশ্য পদার্থের পূর্ণত্বভাবের অবয়ব নির্ম্মায়ণ। প্রথম অবস্থার অবলম্বনীয় তত্ত্ববিষয়িণী শাস্ত্রবিদ্যা প্রধানতঃ তর্কদর্শনাদি; দ্বিতীয় অবস্থার শাস্ত্রবিদ্যা আত্মজ্ঞান ও মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি। এই নিমিত্ত আমরা দেখিতে পাইয়া থাকি যে, যে কোন বিষয়ের অবস্থা বিশেষের পতন সময়ে, সাধারণতঃ দর্শনবুদ্ধির উদয় ও তৎশ্রেণীর এবং তদ্বিষয়িণী তর্ক দর্শনাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার সহযোগে ধ্বংস-কার্য্যের শেষ হইয়া আসিলে, তখন তৎস্থানে আত্মজ্ঞান ও মনস্তত্ত্বাদি অসিয়া নির্ম্মাণের কার্য্য আরম্ভ করিয়া থাকে; তদনন্তর সেই নির্ম্মাণের পূর্ণতা সাধন ধর্ম্মবিদ্যায়। বোধ করি, এই নিমিত্ত, লোকে শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে হইলে ধর্ম্মবিদ্যারই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া থাকে; তত্ত্ববিদ্যার কেবল আনুগত্য মাত্রেই পরি-সমাপ্তি। কিন্তু তত্ত্ববিদ্যার এই আনুগত্য, বিজ্ঞ আনুগত্য পর্য্যন্ত আবশ্যক; তদন্যতরে দূষ্য।

তত্ত্ববিদ্যা ধর্ম্মবিদ্যার তুলনায় যতই হেয় হউক, কিন্তু এ সংসারে সে মনুষ্যকে দুর্ভাগ্য বা অল্পভাগ্য বলিতে হইবে, যাহার ভাগ্যে তত্ত্ববিদ্যারূপী দ্বার না হইয়া ধর্ম্মবিদ্যায় অধিকারী হইতে হয়। তত্ত্ববিদ্যারূপী দ্বার না হইয়া ধর্ম্মবিদ্যায় যে অধিকার, তাহা কখনই দৃঢ় বা অটল বা সর্ব্বা-বয়ব যুক্ত হয় না; এবং তাহা না হইলে উদ্দেশ্যেরও পূর্ণতা পক্ষে সুতরাং ত্রুটি রহিয়া যায়; এবং অল্প আঘাতেই সহসা বিচলিত হইয়া পড়ে। মানব সংসার-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবামাত্র, যে সৎ অসৎ জালে জড়িত এবং দারুণ সন্দিগ্ধ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইতে একমাত্র তত্ত্ব-

বিদ্যার সহায়তা ভিন্ন, সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। কিন্তু একথা সকলে বুঝে না, এবং ইহাও বুঝে না যে মানব আত্ম-প্রকৃতির উন্নতি ব্যতীত উন্নতভাব গ্রহণে অপটু। অনেকেই শুষ্ক নীতি শিখাইয়া উদ্দেশ্য সাধিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত;—ধর্ম্মশূন্য, কর্ম্মশূন্য, কর্ত্তব্য-জ্ঞানশূন্য যে 'নীতি' তাহা নব্য বাঙ্গালির মূলশূন্য স্থূলপণ্ডিতী নীতি; এবং এরূপ নীতিজ্ঞের ধর্ম্মও তদ্রূপ, কর্ম্মও তদ্রূপ। জুয়াচুরি কর, অপ-হরণ কর, আহ্নিক করিও বা গঙ্গায় নাহিও পাপ কাটিবে; লোকের সর্ব্বনাশ কর, ঘর জ্বালাইয়া দেও, কিন্তু সেই অর্থে পূজা করিও বা ব্রাহ্মণকে দান দিও, তোমার মুক্তি হইবে। ইহা কি নীতি না ধর্ম্ম? বহুকালের গতাসু নীতি ও ধর্ম্মতত্ত্বের বহু পুরাতন ও পরিত্যক্ত জীর্ণশবের ইহা প্রাগল্ভ প্রকটন মাত্র। উহা অনীতি এবং অধর্ম্ম।

ফলতঃ তত্ত্বাদি সহযোগে প্রকৃতির উন্নয়ন ব্যতীত, নীতি বা ধর্ম্মতত্ত্বাদির শিক্ষা এবং প্রয়োগ, অবিকল গ্যালবানিক ব্যাটারী অর্থাৎ তাড়িত প্রবাহের বেগ সংযোগে সঞ্চালন-শক্তি উৎপাদন করার ন্যায়; উভয়ই অফলপ্রদ বা উর্দ্ধসংখ্যায় ক্ষণিক ও মাত্রামাত্র ফলপ্রদ। "চুরি করিও না" এ নীতি একাল ধরিয়া সকলেইত ঘোষণা করিয়া আসিতেছে, তথাপি লোকে কেন চুরি করে, কেনই বা নিত্য জেলখানা পরিপূর্ণ হয়, কেনই বা লোকে চুরি করার আজি পর্য্যন্ত বিরত হইতে শিখিল না? তাহার কারণ, বাঞ্ছারাম? তাহার কারণ আছে,—শিক্ষার সঙ্গে প্রকৃতির উন্নয়ন অভাব, সুতরাং সে নীতি চিত্তস্থ বা কণ্ঠস্থ থাকিলেও, হৃদয়স্থ হইতে পারে নাই; এবং হৃদয়স্থ না হইলে প্রকৃত ফলও কখন ফলে না। এরূপ শুষ্কনীতিবাদী এক্ষণকার বাঞ্ছারাম-সম্প্রদায়ভুক্ত প্রায় সকলেই, বলা বাহুল্য যে তাঁহারা কোন সাত্ত্বিক তত্ত্ববিদ্যা বা কোন বিদ্যারই প্রকৃত ধার ধারেন না। কেহ বা পড়াপাখী, মিল্ বা কোম্‌তের বুলি বলিতে শিখিয়াছেন,—নিজের বুলি নাই; কেহবা তত্ত্ববিদ্যার অপেক্ষা না রাখিয়াই অভিনব ধর্ম্মবিদ্যার প্রচণ্ড অধিকারী,—অন্ততঃ মুখে। ইহার উপর অনুকরণপ্রিয়তাই সর্ব্বত্রে; কাপট্য অঙ্গভূষণ,—কপটে স্বার্থ সাধিব অথচ বলিব উহা ঈশ্বরাদিষ্ট; বাহ্যদৃশ্যই সর্ব্বস্ব। ভ্রান্ত বোধবিমূঢ়!

তোমার আবার ধর্ম, ধর্মের তুমি কি ধার ধার? পেনাল কোড তোমার বেদ, স্বার্থ তোমার গয়া গঙ্গা, 'পাঁচ জন' তোমার গুরু, বাহ্যদৃশ্য তোমার অলঙ্কার। তত্ত্ববিদ্যার প্রকৃত ছাত্রদিগের ধর্ম সেরূপ নহে। সহসা কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না, এবং একবার প্রবৃত্ত হইলেও আর তাহা পরিত্যাগ করে না। কাপট্য স্বার্থসাধন ও বাহ্যদৃশ্য এখানে স্থান পায় না; অনুকরণ-প্রিয়তা এবং আত্মনষ্ট সর্ব্বত্রেই পরিহার্য্য হইয়া থাকে। বৎস তই বাঙ্গালায়, অনুকরণপ্রিয়তা ও আত্মনষ্ট সর্ব্বদাই পরিহার করিবে। যে কেহ যত বড়ই শ্রেষ্ঠ জগদ্‌গুরু হউক না কেন, তাহার অন্ধশিষ্য হওয়া উদ্দেশ্য নহে; তাহার প্রোক্ষিপ্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যোগে তোমার স্বনিহিত অগ্নিরাশিকে উদ্দীপিত করিয়া লওয়াই উদ্দেশ্য,—শিক্ষক মাত্রেরই সঙ্গে এই সম্বন্ধ, তদরিক্তে অন্য সম্বন্ধ নাই। প্রকৃত উচ্চের নিকট প্রকৃত অধমের বিনত ভাব এবং প্রকৃত উচ্চের দ্বারা পরিচালিত হওন, একথা উহা হইতে স্বতন্ত্র। প্রকৃত অধমের তদ্রূপ বিনত এবং পরিচালিত হওন তাহার পক্ষে ভূষণ স্বরূপ; অথবা ভূষণ কেবল নয়, তাহা কর্ত্তব্য স্বরূপ বলিয়া জানিও। এতৎ সম্বন্ধে এই কর্ত্তব্যবুদ্ধি হইতেই সমাজ নির্ম্মাণ হইয়া থাকে, তদ্ভিন্ন দ্বিতীয় পন্থা নাই।

তত্ত্ববিদ্যার অনপেক্ষশীল আরও এক প্রকৃতির লোক ঈশ্বর এ জগতে সৃষ্টি করিয়া থাকেন। যেমন কতকগুলি লোক দেখা যায় যে, সহস্র সুশিক্ষা ও সহস্র সুনীতি চাপান সত্ত্বেও সুপ্রকৃতি হয় না; তেমনি আর কতক-গুলি লোক আছে যে, সহস্র কুশিক্ষা ও কুদৃষ্টান্ত সত্ত্বেও যাহাদের সুপ্রকৃতি বিকৃতি প্রাপ্ত হয় না। ইহারা যথার্থই দিব্য-প্রকৃতি, এবং ইংরাজিতে এরূপ প্রকৃতিকেই angel (দিব্য দূত) বলিয়া আদর করিয়া থাকে। প্রাথমিক বালকত্বের দিব্য ভাব আজীবন পর্য্যন্ত ইহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া থাকে, সুতরাং এরূপ প্রকৃতি তত্ত্ববিদ্যার অপেক্ষা না রাখিয়া, একেবারেই ধর্ম্মবিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে এবং করিতেও উপযুক্ত। পুনশ্চ, তত্ত্বশিক্ষা শুনিলেই ভাবিও না যে, সকলকেই যেন ঘট পট মত্ত পত্ত আদি জ্ঞান শিখিতে হইবে। শিক্ষা যাহা, তাহা যে কোন বিষয়েরই হউক, দেশকাল পাত্র অনুসারে ক্ষমতা ও পরিমাণ

অনুরূপ হওয়া উচিত। বাপুরাম, এ হিসাবে ভাবিয়া দেখ দেখি, প্রকৃত শিক্ষকের কার্য্য কত কঠিন?

তত্ত্ববিদ্যা আর কিছু বিশেষ করিয়া শিখাউক বা নাই শিখাউক, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে প্রকৃতির উন্নয়ন এরূপ করিয়া দেয় যে,একবার তাহার নীতিমার্গে উঠিতে পারিলে; আর কথনও মানবের অপকর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে না। কিন্তু তত্ত্ববিদ্যাও কখন কখন আবার বিকৃত ফল প্রসব করিয়া থাকে, তাহার কারণ যদি সে তত্ত্ববিদ্যায় সাত্বিক বুদ্ধির অভাব হয়; অথবা তত্ত্ববিদ্যায় যদি কেবল প্রতিপক্ষ অংশের অনুসরণ করিয়া সপক্ষ অংশের সংস্রব ছাড়িয়া যায়; অথবা উভয়েরই অনুসরণ করিয়াও, যদি তাহাদের উভয়েরই প্রকৃত উদ্দেশ্যে দৃষ্টিশূন্য হয়। অতএব, সাবধান, সর্ব্বদা যেন সদর্পে অথচ বিজ্ঞতার সহিত পদ সঞ্চরণ করিও।

মানবজীবনের অবলম্বন এবং উদ্দেশ্য দ্বিবিধ, ধর্ম্ম এবং কর্ম্ম। ধর্ম্ম-ভাগ মানবীয় আধ্যাত্মিক গুণপ্রধান, এবং কর্ম্মভাগ আধিভৌতিক গুণ-প্রধান। কর্ম্ম ধর্ম্মের পরিদৃশ্যমান মূর্ত্তি প্রচারণা মাত্র। অদৃষ্ট সংসারে যে অনুজ্ঞা ঘোষিত হইতেছে, কর্ম্ম দৃষ্ট সংসারে তাহার পালন ফলস্বরূপা। ধর্ম্ম সেই অনুজ্ঞা এবং পালন ফলের মধ্যস্থানাধিকারী; সুতরাং মনুষ্যের ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা একমাত্র ধর্ম্মই সংযোজিত করিয়া রাখিয়াছে ও রাখিতেছে; এবং উহারই সহযোগে মনুষ্য ইহ-লোক হইতে পরলোক, এবং পরলোক হইতে ইহলোক, এতদুভয়ের মধ্যে আত্মিক ভাবে গতায়াত করিয়া থাকে; এবং উহাই তৎপক্ষে একমাত্র সোপান স্বরূপ। এতদুভয়ের সৎ-অসৎবোধ লইয়া মানবীয় তত্ত্ববিদ্যার কার্য্য ও পূর্ণতা। সুতরাং তত্ত্ববিদ্যাকেও দুই অংশে বিভাগ করা যাইতে পারে। ধর্ম্মের বিষয় যে তত্ত্ববিদ্যার বিষয়ীভূত তাহাকে জ্ঞানতত্ত্ব; এবং কর্ম্মের বিষয় যে তত্ত্ববিদ্যার বিষয়ীভূত, তাহাকে সামাজিক তত্ত্ব বলা যাউক। এক্ষণে আমরা ঐরূপ নামানুসারে বিষয় বিভাগে নিম্নে আলোচনা করিব।

পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে তত্ত্ববিদ্যার অবলম্বনীয় শাস্ত্র প্রথমতঃ তর্ক-দর্শন, দ্বিতীয়তঃ জ্ঞান ও মনতত্ত্বাদি। প্রথমটির কার্য্য স্থায়ী অথচ কালে

সারশূন্য বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা এই দুয়ের প্রতিকূল চিত্র দেখাইয়া তাহাদের অপলোপে অশান্তি সমুদ্রে নিক্ষেপণ; দ্বিতীয়টির কার্য্য সেই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার চিরচিত্র মলনির্মুক্ত করিয়া, শান্তিকরীরূপে মনুষ্য-হৃদয়ের সহ তাহার দৃঢ় সংযোজন। একের ফলে, মানব দারুণ তরঙ্গে পতিত হইয়া প্রকৃত কার্য্যকরণের অস্থির বা দূষিত হস্ত হইয়া থাকে; অপরের ফলে, মনুষ্য স্বচ্ছন্দ সৌরকর-বিহসিত কূলভাগে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া সানন্দ মনে কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। প্রথমটীর আতিশয্যেই নাস্তিকতা উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রকৃতি-বহুল মানবকুলের অধ্যয়নভেদে, সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বসময়ে, তত্ত্ববিদ্যা আর এক প্রকার দ্বিবিধ বিভাগে বিভাজিত হইয়া থাকে, তাহা আস্তিকতা ও নাস্তিকতা। সামাজিক তত্ত্ব সর্ব্বদাই আনুষ্ঠানিক হওয়ায়, নাস্তিকতা তথায় বড় তাল পাইয়া উঠে না; কিন্তু জ্ঞানতত্ত্বে ইহার দৌরাত্ম্য কম নহে। অতএব আমাদিগকেও বাধ্য হইয়া জ্ঞানিতত্ত্বকে আস্তিকতা ও নাস্তিকতা ভেদে আলোচনা করিতে হইতেছে।

হিন্দুর তত্ত্বসংসারে মাধবাচার্য্যের সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে যতগুলি দর্শন ও মনস্তত্ত্বের বিষয় আলোচিত হইয়াছে, এবং উপনিষদ্ প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রীয় জ্ঞানকাণ্ডের যে সকল তত্ত্বগ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহার প্রায় সকলই আস্তি-কতায় পরিপূর্ণ। কেবল একমাত্র চার্ব্বাককেই পূর্ণভাবে নাস্তিক মধ্যে গণনা করা যায়। অনেকে সাংখ্যকে নিরীশ্বর সাংখ্য বলিয়া নাস্তিক তত্ত্বগ্রন্থ মধ্যে গণনা করিয়া থাকেন; কিন্তু বস্তুতঃ দেখিতে গেলে সাংখ্যকে নাস্তিক-তত্ত্ব বলা যায় না, তবে উহা যে জটিল আস্তিকতা তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার্য্য।

গ্রীকদিগের মধ্যে এই নাস্তিকতা ও আস্তিকতা ভাগ করিয়া লইতে যাওয়া একটু কঠিন। সে যাহা হউক, যদি কেবল লোকাতীত শক্তিতে বিশ্বাস থাকিলেই আস্তিকতা এবং তাহার বিপরীতে নাস্তিকতা বলা যায়; তবে গ্রীকদিগের আস্তিক তত্ত্বের উৎপত্তি থেলিস্ হইতে, যদিও তাহা নিতান্ত অস্ফুটভাবে বটে। নাস্তিক তত্ত্বের অতি প্রারম্ভিকভাবে আরম্ভ আরিষ্টিপস্ হইতে, এবং এপিকুরসের সময়ে আসিয়া তাহার চূড়ান্ত প্রাপ্তি হইয়াছে।

২। তত্ত্ববিদ্যায় আস্তিকতা।

হিন্দুর জ্ঞানতত্ত্বে সর্ব্বদাই এবং সর্ব্বস্থানেই প্রায় এই একমাত্র অক্ষুণ্ণ উদ্দেশ্য, 'ত্রিবিধ দুঃখস্যাত্যন্ত নিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থঃ।' গ্রীকতত্ত্বের উদ্দেশ্য,—'প্রকৃতিনিয়ম অনুযায়ী জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হওয়াই পরম পুরুষার্থ; এই সক্ষমতা নীতিমার্গ অনুসরণে সাধিত হয়, যেহেতু তাহা তদ্রূপ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহই প্রবর্ত্তনা করিয়া থাকে।১ ইহাই প্রায় সমস্ত গ্রীক তত্ত্ববিদ্‌বর্গের ধারণা।২ হিন্দু নিরন্তর বুঝাইতেছেন এবং বুঝিতেছেন যে, এই সংসার যে প্রকারেই সুখের করিতে চাও, তাহা হইতে দুঃখের একেবারে নিবৃত্তি কখনই হইবে না; অতএব যে কোন উপায়ে হউক, পুনর্জ্জন্ম রহিত হইয়া এই পৃথিবীর সহ অনন্তকালের জন্য সংস্রবশূন্য হইতে পারিলেই পরম পুরুষার্থ। গ্রীক বলিতেছেন, তাহা

১। জিনোর উক্তি।

২। ক্রীসিপুসের বিশ্বাস, সাধারণ মানবধর্ম্ম যাহার অনুমোদন করিয়া থাকে, তাহার অনুসরণ করাই পরম পুরুষার্থ; যেহেতু ঐ মানব ধর্ম্ম যখন দেবসত্ত্বা বিশ্বনীতির অংশ কলা স্বরূপ, তখন উহাই তদ্রূপ জ্ঞানে অনুসরণীয়। ডিওগিনীসের উক্তি, প্রতি ব্যক্তির স্ব স্ব ভাব অনুযায়ী যথার্থ জ্ঞানানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে পরম পুরুষার্থ। আর্কিমিডিসের জ্ঞানে যথাযোগ্য কর্ত্তব্যাদি সাধন করাই পুরুষার্থ। ক্লিয়ান্থিস্‌ কহেন, বিশ্বনীতির অনুসরণই পুরুষার্থ,তজ্জন্য ব্যক্তিগত স্বভাবের প্রতি কিছুমাত্র অপেক্ষা রাখে না; মানবীয় সামঞ্জস্য সম্পন্ন চিত্তের একতা তাঁহার বিশ্বাসে ধর্ম্ম এবং এই ধর্ম্ম অন্য ফলের প্রত্যাশা না রাখিয়া ধর্ম্মেরই খাতিরে অনুসরণীয়, যেহেতু তাহা হইলে স্বচ্ছন্দে জীবনাতিবাহন সতঃই উৎপন্ন হইয়া থাকে। পিথাগোরীয়দিগের মতে নির্ম্মলভাবে জীবনাতিবাহন এবং দেবতায় প্রিয়কার্য্য সাধন করা কর্ত্তব্য, যেহেতু তাহা হইলে জন্মান্তরে শ্রেষ্ঠ জন্মের প্রাপ্তি হয়। জিনোর শিষ্যবর্গের মধ্যে পুরুষার্থ অর্থে আর একটি বিষয় বুঝাইত, অর্থাৎ দুঃখ ক্লেশ সুখাদিতে পূর্ণ অনাস্থাভাব। কিন্তু শিষ্যবর্গ যে সেই শিক্ষা সর্ব্বদা কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহা বড় বোধ হয় না। ডিওনিস্যাস (Dionysius the Deserter)তাহার চক্ষের পীড়া জনিত ক্লেশ বিস্মরণ হইতে না পারিয়া, শেষে গুরুর শিক্ষা তাহাকে হাওয়ায় উড়াইতে হইয়াছিল। সেই হইতে সুখানুসরণই পুরুষার্থ বলিয়া তাঁহার দ্বারা ঘোষিত হইত;—মানব যে পর্য্যন্ত ভুক্ত ভোগী না হয়, সে পর্য্যন্ত কতমতেই না প্রলাপ রটনা করিয়া থাকে!

নহে, স্বভাব সহ আত্ম-প্রকৃতির সামঞ্জস্য দ্বারা সদ্ভাবে ইহ সংসারকে অতিবাহিত করিতে সক্ষম হওয়াই পরম পুরুষার্থ। অতএব হিন্দুর উদ্দেশ্য-ফল পর সংসারে, গ্রীকের সেই স্থলে তাহা ইহ সংসারে। কেবল প্লেটোতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তত্ত্ববিদ্যা এবং তদনুসরণের ফল প্রধানতঃ পর সংসার সহ সম্বন্ধবান। ফলতঃ পরিষ্কার ভাবে একমাত্র প্লেটোতেই এই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও উচ্চ উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়।

অনন্তর উভয় জাতির জ্ঞানতত্ত্বের বিষয়ীভূত ও নিরূপিত পদার্থের আলোচনা করা যাউক। এই সৃষ্টি কোথা হইতে উৎপন্ন, আমরা তথায় কোথা হইতে আসিয়াছি, আমাদের তাহার সঙ্গে সংস্রব কতদূর, কি করিতে আসিয়াছি এবং শেষগতি কোথায়, ইত্যাদি তত্ত্ব যেরূপ সেরূপ ধারণার আয়ত্তাধীন হয়, তাহাদের কর্ম্ম প্রতিরূপ মানব জীবনও তদ্রূপ প্রকৃতির হইয়া থাকে। অতএব অগ্রে তদ্রূপ ধারণা কোন্ জাতির মধ্যে তত্ত্ববিদ্যার প্রভাবে কিরূপ আকার ধারণ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছিল, তত্ত্ববিদ্যার লব্ধফল স্বরূপ তাহা, যথাযথ নিরূপণ করা যাউক।

সর্ব্বাঙ্গ-সৌষ্ঠব ভাবের প্রতি দেখিতে গেলে, প্লেটোর পূর্ব্বগত যাবতীয় গ্রীকতত্ত্ববিদ্‌বর্গের মধ্যে, প্লেটোর নিরূপিত তত্ত্বই সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন; অতএব তাহারই সারভাগ এখানে মূল স্থানে গ্রহণ করা যাইতেছে। প্লেটোর সারাংশ মূল স্থানে গ্রহণের আরও উদ্দেশ্য এই যে, যাবতীয় গ্রীকতত্ত্ববিদ্যার মধ্যে প্লেটোর তত্ত্বই হিন্দুতত্ত্ববিদ্যার সহ বহু পরিমাণে সমধর্ম্মী। অপরাপর তত্ত্ববিদের মতামত যাহা, তাহা তাহার সহ পার্শ্ববর্ত্তী ভাবে সন্নিবেশিত হইবে।

প্লেটোর মতে এই বিশ্ব দ্বৈত উপায় সংযোগে সৃষ্ট,—একটী নিত্যভাব (ever-existent); অপরটি জননভাব (in a state of generation) অর্থাৎ কোন পদার্থ বিশেষের এখনও অস্তিত্ব হয় নাই কিন্তু হইয়া আসিতেছে, এবম্ভূত হওন অবস্থা। নিত্যভাব, হ্রাস বৃদ্ধি ক্ষয় রহিত এবং একই রূপে নিত্য। জননভাব তদ্বিপরীতে পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং হ্রাস বৃদ্ধি

ক্ষয়ের অধীন এবং অনিত্য। প্রথমটির অনুভব করণ যুক্তিসংযুক্ত জ্ঞান দ্বারা হইয়া থাকে; দ্বিতীয়টীর অনুভব করণ কেবল সহজ জ্ঞান সংযুক্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হয়, যেহেতু উহা জন্মমৃত্যু-বিশিষ্ট এবং অবস্তু। যুক্তি-সংযুক্ত জ্ঞান যাহা তাহা নিত্য বস্তুর ধারণা ও তাহারই পরিচর্য্যা করিয়া থাকে; এই নিত্য বস্তুর ধারণা চিত্তে স্থায়ী জ্ঞানরূপে অধিরূঢ় হইয়া, কর্ম্মপদার্থের আদর্শ প্রদান করে। জননভাব যাহা তাহা মুহূর্ত্তে পরিবর্ত্তন হইয়া মুহূর্ত্তে নূতন রূপ ধারণ করিতেছে; ইহার এই অস্থায়ী ও অনিত্য ভাব হেতু, জ্ঞান তাহাকে স্বীয় আয়ত্তাধিকারে আনিতে চাহে না, যেহেতু জ্ঞান দূরে দৃষ্টি ও স্থায়ী পদার্থকে আশ্রয় করিতে ভাল বাসে, অথবা তাহাই তাহার একমাত্র সম্বল। এ নিমিত্ত জননভাব, তাহার সমধর্ম্মী একমাত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভূত হয়। জননভাব কথিত আদর্শকে অবলম্বন করিয়া কর্ম্মপদার্থের উৎপাদনক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকে। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, যে কোন বিষয়ের যে টুকুর তত্ত্ব মনের মধ্যে যুক্তি জ্ঞানাদি যোগে অনন্বিত ভাবে স্থিরীকৃত ও ধারণা করিতে পারা যায়, প্লেটো তাহাকেই নিত্য ভাব, এবং যে অংশটুকু ইন্দ্রিয়সাধ্যাদি জ্ঞানযোগ ভিন্ন উপলব্ধি এবং অনুষ্ঠিত হয় না, তাহাকে জননভাব বলিয়া কহিতেছেন। জননভাব মুহুঃপরিবর্ত্তনশীলতা হেতু নিত্য জ্ঞানের বিষয়ীভূত না হওয়ায়, ও ক্ষয়াদির অধীন হেতু, প্লেটো উহাকে অবস্তু বা মিথ্যাবস্তু স্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্লেটোর এই অবস্তু জননভাব, হিন্দুবৈদান্তিকের মায়াবাদের মধ্যে অবিদ্যার সঙ্গে সম প্রকৃতির, উভয়ই মিথ্যাদৃষ্টি এবং উভয়ই ধ্বংসের অধীন। নিত্য এবং জননভাব, এতদুভয়ের মধ্যে, প্রথমটীর সত্ত্বা পূর্ণত্ব; দ্বিতীয়টীর সত্ত্বা বিকার।

পুনশ্চ যে কোন পদার্থ জন্মবিশিষ্ট তাহা অবশ্যই কোন কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, যেহেতু কারণ ব্যতীত তদ্রূপ উৎপত্তি অসিদ্ধ। কারণ ব্যতীত কার্য্যের উৎপত্তি অসিদ্ধ, ইহা প্লেটো বহুদর্শন হইতে স্বতঃসিদ্ধ স্বরূপ ধরিয়া লইয়াছেন। এই বিশ্ব জন্মবিশিষ্ট, যেহেতু ইহা ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত; অতএব এই জনিতরূপী কার্য্যস্বরূপা

বিশ্বের কারণরূপ একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন।৩ আরও দেখা যাইতেছে যে, যদি কোন কারিগর কোন বস্তু নির্ম্মাণ করিতে নিত্যভাবের অনুকরণে নির্ম্মাণ করে, তাহা হইলে অবশ্যই আদর্শ স্বরূপ নিত্যভাবের সত্তা প্রতিভাসে তাহা সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু কোন জন্মবিশিষ্ট ও ক্ষয়াদির অধীন অনিত্য বস্তুর অনুকরণে তদ্রূপ হয় না। অসতের অনুকরণে অসৎই উৎপন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু সতের অনুকরণে অসৎও সতের আকার ধারণ করে। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে এই বিশ্ব নিরুপম-সৌন্দর্য্যশালী।

অতঃপর প্লেটো ঈশ্বর সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, এই বিশ্বের যিনি পিতা এবং সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি এবং তাঁহার কার্য্যকলাপ কিরূপ, তাহার আবিষ্করণ নিঃসন্দেহই অতিশয় কঠিন, এবং যদি বা আবিষ্কার করিতে পারা যায়, তথাপি সাধারণ মানবীয় সকাশে তাহার সুপ্রকাশ করণ একেবারেই অসাধ্য। অতএব কার্য্য দৃষ্টে কারণের উপলব্ধি হইতে যে ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান জন্মে, তাহাই সাধারণতঃ অবলম্বনীয়। এই কার্য্য-কারণবোধরূপী দৃষ্টিযোগে ইহা উপলব্ধি হইতেছে যে, যখন এই বিশ্ব সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সৌন্দর্য্যশালী এবং পূর্ণদীপ্রাণ, তখন তাহার সৃষ্টি কর্ত্তা অবশ্যই দ্বেষাদিবহিত ও সত্ত্বের আধার। এখানে দৃষ্ট হইবে যে

৩। জিনোর সাম্প্রদায়িক কথা বলনা করিয়া থাকেন যে ঈশ্বর একটি অবিনাশী জীব স্বরূপ, কিন্তু মনুষ্যের ন্যায় আকার বিশিষ্ট নাহেন। তিনি জ্ঞান ও আনন্দময় এবং অসৎের অতীত, এই পৃথিবীতে যাহা আছে ও যাহা হইতেছে ও হইবে, তিনি তাহার তত্ত্বজ্ঞ। তিনি এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা, এবং সর্ব্বস্থানে তাঁহার সত্তা পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, এবং ঐ সত্তাই স্থান বিশেষে পৃথক পৃথক দেবদেবীরূপে কল্পিত ও পূজিত হইয়া থাকে, যথা দেমিতুর ক্ষিতিরূপে, পোষিদন রসরূপে, এথিনা সূক্ষ্ম বায়ু বা ইথার রূপে, হেফিস্তিওস অগ্নিরূপ ইত্যাদি। ইহা বহুরূপ কল্পনা মাত্র, নতুবা দেবতা যিনি তিনি এক। ইহার সহ আমাদিগের বৈদিক গাথা একবার মিলাইয়া দেখ—"সুপর্ণম বিপ্রাঃ কবয়োবচভিঃ একম্ সন্তম্ বহুধা কল্পয়ন্তি।" ঋঃ বেঃ ১০।১১৪। স্থানান্তরে জিনো কহিয়াছেন যে এই বিশ্বই ঐশ্বরিক মহাসত্তা, উহাই ঈশ্বর। আরিষ্টটলও অশরীরী একেশ্বরবাদী, তিনি বলেন ঈশ্বর স্বয়ং নিশ্চল, কিন্তু তাঁহার নিয়মচক্র সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত, এবং তাহাই যাবতীয় বিষয়কে পরিচালিত করিয়া ফিরিতেছে।

কার্য্য দৃষ্টে প্লেটো কারণের ভাব উপলব্ধি করিয়া লইলেন। সৃষ্টিকর্ত্তা যখন সৎ এবং সৃষ্টি যখন সৌন্দর্য্যময়ী, তখন অবশ্যই সেই সৃষ্টি নিত্য-ভাবের অনুকরণে জননভাবের সমাবেশ দ্বারা নির্ম্মিত। এই নিত্যভাব সর্ব্বতোময়, পূর্ণভাবে ঈশ্বরেই নিত্য এবং স্বতঃস্থিত। সৃষ্টি কথিত উভয় ভাবের সমাবেশে নির্ম্মিত বলিয়া, এতদুভয় ভাবেরই ধর্ম্মবিশিষ্ট হইয়াছে।

এই নিত্য ভাবের স্বরূপকেই প্লেটোর সুবিখ্যাত আইডিয়া (idea) বলিয়া থাকে। ইহার ঠিক বাঙ্গালা প্রতিশব্দ পাওয়া কঠিন, অতএব আমরা আইডিয়া শব্দই ব্যবহার করিব। এই আইডিয়া প্রাচীন হিন্দু-তত্ত্ববিদ্‌বর্গবিশেষের কারণ শরীরের সহ বহুলাংশে সাদৃশ্যযুক্ত; এবং সাঙ্খ্যদর্শনস্থ প্রকৃতির উপরে আরোপিত পুরুষের সত্ত্বা সহ অনেক মিলে। যে কোন পদার্থ উৎপন্ন হইতেছে, তাহা উৎপাদকের চিত্তস্থিত আই-ডিয়ার দৃশ্যমান প্রচারণা মাত্র। উৎপন্ন বস্তুর পরিবর্ত্তন ক্ষয়াদি আছে, কিন্তু আইডিয়ার পরিবর্ত্তনাদি নাই; এজন্য কোন বস্তুর যথার্থ স্বরূপ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, বুদ্ধিযোগে সেই একমাত্র আইডিয়ার ভাব জ্ঞানাদি নিরূপণ দ্বারা সংসাধিত হইতে পারে। মনুষ্য যে কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারা বস্তু প্রতিভাস গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকে তাহা নহে; জ্ঞান ও বুদ্ধি দ্বারা সেই প্রতিভাসকে অবলম্বন করিয়া, অথচ তাহার অতীতে, সেই বস্তুর মূল সত্ত্বা এবং স্বভাব নিরাকরণেও সমর্থ। এই নিরাকরণ শক্তি চালনা হইতে আইডিয়ার উপলব্ধি হয়। প্লেটোর মতে এই আইডিয়া বস্তু মাত্রেরই যাথার্থ্য নিরূপণে একমাত্র উপায়। যে আইডিয়া স্বয়ং সিদ্ধ হইতে না পারিয়া অপরে গিয়া পতিত হয়, বা কোন উচ্চস্থ আইডিয়ার সংলগ্নে সংস্থাপিত না থাকিতে পারে, প্লেটো তাহাকে কাল্পনিক আইডিয়া বলিয়া গিয়াছেন; সুতরাং তাহা সত্যের পরিমাণ স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে না। বিকৃত কার্য্য মাত্রে কাল্পনিক আইডিয়ার ফল।

প্লেটোর পূর্ব্বে গ্রীসীয় তত্ত্ববিদ্‌দিগের মধ্যে তত্ত্বাবধারণের এরূপ রীতি ছিল যে, কতকগুলি বিষয় স্বতঃসিদ্ধরূপে গ্রহণ করিয়া, তাহার অবলম্বনে কারণ নিরূপণ দ্বারা কার্য্যের স্বরূপ নিরূপণ করা হইত; অর্থাৎ সাধারণতঃ বলিতে গেলে কারণ হইতে কার্য্যের নিরূপণ-প্রথা। প্লেটো সেই

রীতির পরিবর্ত্তন করিয়া, তাহা হইতে স্বতন্ত্র রীতি অবলম্বন করেন; অর্থাৎ কার্য্য দৃষ্টে আইডিয়ার উপলব্ধি, আইডিয়া হইতে কারণের উপলব্ধি, অথবা সাধারণতঃ কার্য্যদৃষ্টে কারণের নিরূপণ এবং সেই কারণ দ্বারা কার্য্যের সৎভাব স্থাপন। পুনশ্চ, প্লেটোর পূর্ব্বে কুতর্কবাদীরা (Sophists) তাবৎ প্রচলিত বিষয়কে সৎ বলিয়া ধরিয়া লইত, যতক্ষণ না তাহা অসৎ বলিয়া প্রমাণিত হয়; প্লেটো ও প্লেটোর গুরু সক্রেটিসের নিকট তদ্বিপরীতে প্রচলিত বিষয় গুলি অসৎ বলিয়া বিবেচিত হইত, যতক্ষণ না তাহা সৎ বলিয়া প্রমাণিত হয়। প্লেটোর বস্তু মাত্রেরই আইডিয়া আছে; এই আইডিয়াসমূহ পর পর নত উন্নত পর্য্যায়ক্রমে গ্রথিত, সংযোষিত ও সমাবেশে মহাসমষ্টিযুক্ত হইয়া, শেষে ঐশ্বরিক মহাসত্তায় গিয়া নিবেশিত হইয়াছে। অতএব মানবের সেই ঐশ্বরিক সত্তার উপলব্ধি এবং তাহার অনুভবসুখে সামর্থ্য লাভ করিতে হইলে, পর পর পর্য্যায়ক্রমে সেই একমাত্র আইডিয়া জ্ঞানের অনুসরণে সংসিদ্ধ হইতে পারে। জর্ম্মান পণ্ডিত রিটার (Ritter) প্লেটোর আইডিয়া সম্বন্ধে একস্থানে এরূপ অভিমতি ব্যক্ত করিয়াছেন, "প্লেটো এই দৃশ্যমান জগতের অস্তিত্ব বিষয়ের নিরাকরণ করিতে গিয়া দিগ্বিদিক্শূন্যভাবে একমাত্র আইডিয়া দ্বারাই সেই নিরাকরণের পূর্ণ সংসাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এহেতু অদৃশ্য হইতে এই জগতকে দৃশ্যক্ষেত্রে আনয়নের জন্য তাঁহার যে সেই চেষ্টা, তাহাতে বহুপরিমাণেই অস্ফুট ও অপূর্ণ ভাব রহিয়া গিয়াছে।" বাপ্পারাম, তজ্জন্য আমাদিগের বিশেষ পরিতাপ করিবার আবশ্যকতা নাই,—কেবল শুষ্ক তর্ক ছড়াছড়ীতে এইরূপই ঘটিয়া থাকে!

অনন্তর সৃষ্টি সম্বন্ধে প্লেটো বলেন, যে সকল স্থূল পদার্থ, যাহারা নিয়ম-শূন্য-ভাবে ঘূর্ণবিঘূর্ণিত হইয়া ফিরিতেছিল, ঈশ্বর তাহাদিগের সেই ঘূর্ণন নিবারণ করিয়া এবং তাহাদিগকে নিয়মের বশবর্ত্তিতায় আনিয়া, এই বিশ্বের রচনা করিলেন। স্থূল পদার্থগুলি পরমাণুস্থলীয়, ইহারা যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের আধার এবং জননীস্বরূপ; সকল আইডিয়ার সমষ্টি মহা-আইডিয়ারূপ ঐশ্বরিক সত্তা তাহাতে জনকের ন্যায়। মৃত্তিকা অগ্নি

বায়ু এবং জল এই ভূতচতুষ্টয়ের সমাবেশে সৃষ্টির প্রকটন হইল। অগ্নি হইতে দর্শনীয়ত্ব এবং মৃত্তিকা হইতে স্পর্শনীয়ত্ব গুণের উৎপত্তি। নিত্য এবং জননভাবের প্রভাবে ভূতরাশির সংযোজনে যে রাশি (Number) সমষ্টির সৃষ্টি হইল, ঈশ্বর তাহা সমভাগে বিভাজন পূর্ব্বক, + এইরূপে দুই ভাগ করিয়া, তাহাদের আনমনে দুইটী চক্রের উৎপত্তি করিলেন। এই দুই চক্র দুই বিপরীত দিকে আবর্ত্তনশীল হইতে লাগিল। যে চক্র বহির্ভাগে আবর্ত্তনশীল, তাহা নিত্যভাবের প্রতিরূপ, এবং যে চক্র অন্তর্ভাগে আবর্ত্তনশীল তাহা পার্থক্য বা পরিবর্ত্তনীয়তার প্রতিরূপ। বহিশ্চক্র দক্ষিণে আবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে, অন্তশ্চক্র বিপরীত ভাবে বামদিকে আবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে, বহিশ্চক্র অখণ্ডিত ভাবে রহিল, কিন্তু অন্তশ্চক্র বহু বিভাগে বিভাজিত করা হইল। উহা হইতে বৈচিত্র্য এবং একতা একত্র সমাবেশ করা হইল। এই চক্রদ্বয়ের স্ব স্ব গুণাদি পদার্থ সহ পরস্পরের সংমিলন বা অসংমিলন হইতে পদার্থাদির সৎ অসৎভাব প্রকটিত হইয়া থাকে।[৪] বুদ্ধিশালিত্ব অপেক্ষা অর্থাৎ যাহাতে বুদ্ধিশালিত্ব আছে তাহার অপেক্ষা, কোন পদার্থই বিনা চৈতন্য (Intelligence) সৌন্দর্য্যশালী হইতে পারে না, এবং কোন চৈতন্যই আবার আত্মার অনস্তিত্বে সম্ভব নহে। কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং সৎ, সুতরাং তিনি সতেরই সৃষ্টি করিয়া থাকেন। অতএব

৪। Plato Tim. 10-12 এই স্থান দৃষ্টে অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন যে, প্লেটোর এতদুক্তয় চক্রের স্থূল তাৎপর্য্য ফল এরূপ যে, এই সংসারে কিছুরই উন্নতি অবনতি নাই; আমরা যাহা তদ্রূপ বলিয়া দেখি তাহা ক্ষণিক বৈচিত্র্য, নতুবা একই বিষয় বার বার ঘুরিয়া ফিরিয়া যাইতেছে আসিতেছে মাত্র। প্রাচীন কালের মানবীয় বা যে কোন ইতিহাস শুনিতেছ, এখন আবার যাহা দেখিতেছ, ইহাই আবার ফিরিয়া পর পর আসিবে যাইবে। সুতরাং এমতে জাতীয় উন্নতি ও অবনতি প্রভৃতিও কেবল ভ্রম মাত্র। পৌরাণিক কল্পমন্বন্তরাদির কল্পনাও এইরূপ, এক সৃষ্টির পুনঃ পুনঃ আগতি এবং বিরতি শিক্ষা দিয়া থাকে। সে যাহা হউক প্লেটোর উদ্দেশ্য যে ঠিক তাহা, এরূপ বোধ হয় না। একই পথে পুনঃপুনঃ চক্র চালনা করিলে যে একই ধূলা উড়াইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই; বিশেষতঃ বলা হইতেছে যে নিত্য বিভিন্নতাই অন্তশ্চক্রের ধর্ম্ম।

সেই সত্তার বশবর্ত্তী হইয়া, তাঁহার সৃষ্টি সৌন্দর্য্যময়ী করিবার নিমিত্ত, সেই সৃষ্টিকে আত্মাবিশিষ্টা এবং তাহাকে মহাবুদ্ধি ও জ্ঞানশালিত্বের অধিকারিণী করিলেন। এই সৃষ্টি নিত্য এবং জননভাব উভয়ের মূর্ত্তিমান রূপ-প্রকটন স্বরূপ, এ নিমিত্ত ইহা স্থূল জ্ঞান এবং সূক্ষ্ম জ্ঞান উভয়েরই নির্দ্দেশক স্বরূপ হইল। ইহারও আত্মিক অংশ অপরাপর আত্মাবানের ন্যায় কেবল বুদ্ধি দ্বারা, এবং স্থূল বা জনিত অংশ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূতের বিষয়ীভূত হয়। সৃষ্টি আত্মাযুক্ত হওয়ায়, ইহা বহুজীব-সমাকুল ও সর্ব্বজীব জননী মহাজীবের স্বরূপ, অথবা সর্ব্ব দেব দেবী প্রভৃতি সকলের শ্রেষ্ঠ মহাদেবী। ইহার আত্মা ঠিক মধ্যস্থলে স্থাপিত; তথা হইতে ইহার সত্ত্বা এবং কর্ত্তৃত্ব সৃষ্টিচক্রের দূরতম প্রান্ত পর্য্যন্ত অর্থাৎ সূর্য্যচন্দ্র নক্ষত্ররাজি ছাড়াইয়াও সর্ব্বদিকে সমপরিমাণে বিস্তৃত রহিয়াছে। আত্মা অন্তঃসীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত অথচ আপনাতে আপনি আবর্ত্তনশীল, এবং এই আবর্ত্তনশীলতা হইতে সৃষ্টি চিরকালের নিমিত্ত জীবাধার হইল। ঈশ্বর এই সৃষ্টি স্বেচ্ছা এবং নিয়তি অনুসারে রচনা করিয়াছেন।

পীথাগোরীয় সাম্প্রদায়িক তত্ত্ববিদেরাও পৃথিবী অর্থাৎ সৃষ্টিকে জীবস্বরূপে কল্পনা,এবং ইহাতে বুদ্ধিশক্তির অস্তিত্ব ও আরোপ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে আদিতে একাণু বা একমাত্র একত্বের (Monad) অস্তিত্ব ছিল। একত্ব হইতে দ্বৈত্ব (Duad), দ্বৈত্ব হইতে সংখ্যা (Number), এবং সংখ্যা হইতে রেখা (Lines) ইত্যাদি ইত্যাদি উন্নতি পরম্পরায় এই সৃষ্টি এতাদৃক প্রকাশমান হইল। কথিত আছে যে গ্রীকতত্ত্ববিদ্দিগের মধ্যে অনাক্ষগোরাই (Anaxagoras) সর্ব্বপ্রথমে ভূতে চৈতন্যের কল্পনা করেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল এই যে, যাবতীয় পদার্থ আদিতে যদৃচ্ছা ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল, শেষে চৈতন্য উদয় হইলে, তাহাদিগেকে নিয়মানুবর্ত্তিতায় আনিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন। ক্রসীপুস (Chrysippus), আপলোডরুস (Appolodorus), পোষিদানিউস প্রভৃতি তত্ত্ববিদ্দিগের ধারণা এই যে জড়জগৎ জড় নহে, ইহা গুণ জ্ঞান চৈতন্যাদি সম্পন্ন মহাজীব, এবং মানবীয় আত্মা বা চৈতন্য কেবল সেই মহাচৈতন্যের খণ্ডমাত্র। জিনোর শিষ্যবর্গেরা কহিয়া থাকে যে

আদিতে সক্ষম (Active) এবং অক্ষম (Passive) এই দ্বিবিধ শক্তির অস্তিত্ব ছিল। অক্ষম শক্তি ভূত ও সক্ষম শক্তি চৈতন্য। তাঁহাদের বিশ্বাসে এই চৈতন্যই ঈশ্বর। সক্ষম শক্তি অক্ষম শক্তিতে সংযোগ হওয়াতেই সৃষ্টির প্রচার হয়। সক্ষম শক্তি নিত্য, দেহশূন্য এবং অবিনাশী; কিন্তু অক্ষম শক্তির ধ্বংস আছে। এই অক্ষম ও সক্ষম শক্তির আদি, অস্তিত্ব ও সংযোগ, বহুলাংশে সাঙ্খ্যের মতের অনুরূপ। জিনোর শিষ্যদিগের মতে সৃষ্টি ধ্বংসের অধীন।

অতঃপর প্লেটো কালের সৃষ্টি কল্পনা করিতেছেন। ঈশ্বর সৃষ্টি রূপী মহাজীবের জ্ঞান ও চৈতন্য প্রভা দৃষ্টে, আনন্দবশে উহাকে নিত্য স্বরূপা করিয়া তুলিলেন। কিন্তু এরূপ নিত্যস্বরূপা প্রকৃতি তাহার নিত্যস্বরূপতা হেতু, স্বয়ং রজোগুণাদির পক্ষে অনুপযোগী বিধায়, চলৎ-নিত্য প্রতিরূপ কালের সৃষ্টি করিলেন। এইকালের গতিবশে উৎপত্তি, বৃদ্ধি, ক্ষয়াদির সঞ্চার হইয়া থাকে। অতঃপর কালের পরিমাপক রূপে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদির সৃষ্টি হইল। ইহাদ্বারা রাত্রি দিবা, মাস, সংবৎসর আদি কাল বিভাগের প্রবর্ত্তনা হইল। প্লেটো কহেন, সৃষ্টি এবং কাল উভয়েই অনন্ত কাল স্থায়ী। কালের ভূত এবং ভবিষ্যৎ ভাব, অর্থাৎ 'হইয়াছে' এবং 'হইবে', ইহা সৃষ্টির জননভাবেতে আরোপ এবং তাহারই অস্তিত্ব এবং স্বভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। 'হইয়াছে' বা 'হইবে' ইহা দ্বারা বৃদ্ধি ক্ষয়াদি অভিমুখে পরিবর্ত্তনশীলতা যাহা তাহাই বিজ্ঞাপ্ত হয়। নিত্য ভাব এবং নিত্যবস্তু সম্বন্ধে এরূপ নহে; তৎপক্ষে এক মাত্র বর্ত্তমান কাল অর্থাৎ 'আছে' এরূপ কাল বোধক ক্রিয়াপদ প্রযুক্ত হইবে। বর্ত্তমান কেবল একই এবং অপরিবর্ত্তিতরূপী নিত্য ভাবকে বুঝাইয়া থাকে। জননভাবোৎপন্ন পদার্থে যদিও আমরা 'আছে' শব্দ প্রয়োগ করি বটে, কিন্তু তাহা সাধারণ বোধার্থে; নতুবা তৎপক্ষে কেবল 'হইয়াছে'; 'হইতেছে' (in state of being) 'হইবে' ইহাই প্রয়োগ হইতে পারে। সৃষ্টি নিত্য স্বরূপা হইলেও তাহাতে কালের এই ত্রিবিধ ভাব, অর্থাৎ 'হইয়াছে' 'হইতেছে' এবং 'হইবে' আরোপ হওয়ায় তাহার প্রভাবে, ও সেই প্রভাব

হইতে উত্তেজিত অনন্ত ভাবের স্বভাব হইতে উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও ক্ষয়াদি গুণ যুক্ত স্থূল পদার্থের প্রকটন হইয়া থাকে। জিনো কহেন, কাল পৃথিবীর গতির ব্যবধান মাত্র। উহার ভূত এবং ভবিষ্যৎ ভাগ অসীম; বর্ত্তমান ভাগ সসীম।

প্লেটো কহিতেছেন, স্রষ্টা এক্ষণে বিভিন্ন আইডিয়াপ্রাণ বিভিন্ন গুণ ও রাশি অনুসারে বিভিন্ন জীবসৃষ্টির বাসনা করিয়া, ক্রমান্বয়ে প্রথমতঃ দেবাদি দিব্য প্রাণিগণ, তৎপরে পক্ষবিশিষ্ট গগনচরগণ, তৃতীয়ে জলচর এবং চতুর্থে স্থলচরের উৎপত্তি সাধন করিলেন। সর্ব্বপ্রথমে অগ্নি হইতে দেব নক্ষত্রাদির সৃষ্টি হয়; ইহারা কেবল ঈশ্বরের ইচ্ছা হইতেই অমরত্বলাভে চরিতার্থ হইয়াছিল। অতঃপর প্লেটো দেববংশাবলীর যথা-যথ উৎপত্তি এবং সম্বন্ধ কথন ও নিরূপণ করিয়াছেন।৫ ঈশ্বর দেববংশ সৃষ্টি করণান্তে, অপরাপর জীব সৃষ্টির ভার দেবতাদিগের উপর দিয়া, স্বয়ং স্বাভাবিকী বিশ্রাম সুখানুভবে রত হইলেন। দেবতারা প্রথমে মনুষ্য নরের সৃষ্টি করিলেন, নর হইতে নারী এবং ক্রমান্বয়ে ইতর পশুবর্গের উদ্ভব হইল। এখানে দৃষ্ট হইবে যে প্লেটো, ঈশ্বরের নিম্নে ও তদাজ্ঞাবাহী আর একদল মধ্যবর্ত্তী সৃষ্টিকর্ত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছেন। ইহারা গ্রীকদিগের পৌরাণিক দেবতা। প্লেটো বিশ্বাসে কি লোকভয়ে এরূপ করিয়াছেন তাহা বলিতে পারি না।

অনাক্সগোরা বলিতেন যে, যাবতীয় জীবসৃষ্টি তাপ শৈত্য ও পার্থিব পদার্থের সংমিলনে উৎপন্ন হইয়াছে।৬ আর্কিলাউস (Archelous) বলিতেন তাপ এবং শৈত্য এই দুই সকল উৎপন্ন বস্তুর আদি। জল তাপের দ্বারা দ্রব হইয়া পুনর্ব্বার গুণ বিকার বিশেষের দ্বারা অগ্নির সহ সংস্রবে

৫। গ্রীসে কেবল কীর্ত্তিত দেববংশস্থগণ দেবতা নহেন। লোকসম্মিতি ইচ্ছা করিলেও যাহাকে তাহাকে দেবতা করিতে পারিতেন। ধর্ম্মবিদ্যা প্রস্তাবে দ্রষ্টব্য।

৬। অনাক্সগোরার সৃষ্টি সম্বন্ধে বহুবিধ অদ্ভুত মত ছিল। তাঁহার বিশ্বাস বর্ণাদি বস্তু যেরূপ বহু পদার্থের একত্র সমাবেশ ভিন্ন কিছুই নহে, পৃথিবীও সেইরূপ। সূর্য্য ইহার মতে একটি বৃহৎ তপ্ত লৌহপিণ্ড। চন্দ্র জীবগণের বাসস্থানের উপযুক্ত, তথায় লোকের গৃহাদি আছে এবং চন্দ্রের উপরি ভাগ পর্ব্বত অধিত্যকাদি বিশিষ্ট, ইত্যাদি।

ঘনীভূত হওয়াতে, এই পৃথিবীর উৎপত্তি। আবার যখন তরলিত হয়, তখনই বায়ুর সঞ্চার হইয়া থাকে। পৃথিবী বায়ুদ্বারা পরিবেষ্টিত এবং বিক্ষুব্ধ; বায়ু আবার অগ্নিদ্বারা বিক্ষুব্ধ হইয়া থাকে। তাপযুক্ত মৃত্তিকা অপরাপর ভূতাদি সংযোগে পুষ্টতা প্রাপ্ত হইয়া, মনুষ্য প্রভৃতি যাবতীয় জীবাদির উৎপত্তি সাধন করিয়াছে।

প্লেটো কহিতেছেন, মানবও বিশ্বরূপী মহাজীবের ন্যায় আত্মা ও শরীর উভয় বিশিষ্ট হইল। শরীর ধ্বংস শক্তির অধীন কিন্তু আত্মা অবিনাশী। শরীর সর্ব্বদা বহুরোগাদির আধার কিন্তু আত্মা কেবল উন্মাদাদি বুদ্ধিবিকারের বশীভূত। মানবীয় যাবতীয় অসৎবুদ্ধি সেই আত্মিক রোগ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে;—অসতের এই মূলের অতিরেকে, অসৎ উৎপাদন পক্ষে প্লেটো মানবীয় স্বেচ্ছা শক্তির অস্তিত্ব বা কার্য্য স্বীকার করেন না। প্লেটো বলেন যে ইচ্ছা করিয়া কেহ অসৎ হয় না বা অসৎ কার্য্য করে না; কুশিক্ষা, বুদ্ধিবিকার, মাদকতা, ইত্যাদি আত্মিক রোগ হইতে অসৎবুদ্ধি ও অসৎকার্য্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহার চিকিৎসা আছে; তত্ত্বানুশীলন, ধর্ম্মে মতি ইত্যাদি ইহার চিকিৎসা। প্লেটো দ্বিবিধ আত্মার কল্পনা করিয়া থাকেন, এক আধ্যাত্মিক গুণবিশিষ্ট, ইহা যাবতীয় জ্ঞানের আধার। অপর আধিভৌতিক গুণবিশিষ্ট; ইহা দ্বারা মনুষ্য সুখ দুঃখ, ভয়, ক্রোধ, দ্বেষাদির উৎপাদক ও সেই সমস্তের ফলভাগী হইয়া থাকে। প্রথমোক্ত আত্মার অবস্থান মস্তকে। দ্বিতীয় আত্মা আবার দ্বিভাগে বিভক্ত; যে ভাগ ক্ষুধা তৃষ্ণাদির অধীন তাহা হৃদয়ে, এবং যে ভাগ রাগ দ্বেষাদির অধীন তাহা মস্তকের নিম্ন ভাগে। হিন্দুতত্ত্ব-বিদের আত্মাও তিন স্থানে তিন ভাবে অবস্থিত, যথা বৈশ্বানর ভাবে দক্ষিণ নেত্রে, তৈজস ভাবে মনোমধ্যে, এবং প্রাজ্ঞাভাবে অন্তর আকাশে। বৈশ্বানর ভাবে জীবাত্মা উনবিংশ ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট হইয়া স্থূল বস্তু ভোগ করিয়া থাকেন; তৈজস ভাবে ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট পুরে থাকিয়া সূক্ষ্ম বস্তু ভোগ এবং প্রাজ্ঞাভাবে সুষুপ্তাবস্থায় পরমানন্দ ভোগ করিয়া থাকেন। অতঃপর প্লেটোর আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক গুণশালী দ্বিবিধ আত্মা, দ্বিবিধ কারণের অবলম্বন দ্বারা কার্য্যের উৎপাদন

করিয়া থাকে। এক দিব্য বা নিত্য (Divine) কারণ, অপর অন্য বা নৈমিত্তিক (Necessary) কারণ। দিব্য কারণ আয়ত্ত করাই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য (এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পরে বলা যাইবে)। প্লেটো কহেন, দিব্য কারণ একবারে আয়ত্ত করা মনুষ্যের সাধ্য নহে বটে, কিন্তু তথাপি মানব সর্ব্বদাই সেইদিকে চেষ্টাবান হইবে। অপর অন্য কারণ; ইহার অনুসরণ মনুষ্যের দিব্য কারণকে অনুধাবন করিবার উপায় স্বরূপ, এনিমিত্ত মনুষ্য সর্ব্বদা তাহার অনুসরণ করিবে। নিত্য কারণকে আদর্শ করিয়া এই অন্য কারণের দ্বারাই সমস্ত পরিচালিত হইতেছে, এবং ইহা এরূপ দুর্দ্দমনীয় যে পিটাকস্ (Pittacus) কহেন যে স্বয়ং দেবতারাও ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারেন না।

পীথাগোরীয় সম্প্রদায়িকদিগের মতে আত্মা এক,কিন্তু ত্রিবিধ মূর্ত্তিতে শরীরের ত্রিবিধ স্থানে বিরাজ করিয়া থাকেন। আপ্তবুদ্ধি ও জ্ঞানরূপে মস্তিষ্কে, এবং চিত্তরূপে হৃদয়ে। আপ্তবুদ্ধি ও চিত্তরূপ পশ্বাদিতেও বিরাজমান আছে, কিন্তু জ্ঞানরূপ নাই, ইহা কেবল মনুষ্যতেই প্রদত্ত হইয়াছে। আত্মার প্রথম দুইরূপ ধ্বংস শক্তির অধীন, কিন্তু জ্ঞানরূপী যাহা তাহা অবিনাশী। কোন কোন পীথাগোরীয় ভিন্ন, অতি প্রাচীন-কালীয় গ্রীকেরা আত্মার অবিনাশিত্ব বড় একটা বুঝিত না; তাহারা ভাবিত শরীর ধ্বংসে বায়ু বা ধূমের ন্যায় আত্মাও তদ্দণ্ডে, বা (কাহারও কাহারও বিশ্বাসে) কিছু কাল নিম্ন দেশে বাসান্তে, ধ্বংস এবং বিলীন হইয়া থাকে।৭ কেহ কেহ বলিয়া থাকে যে আত্মার অবিনাশিত্ব সর্ব্ব-প্রথমে থেলিসের (Thales) দ্বারা সাব্যস্ত হয়, এবং তিনি জড় অজড় সমস্ত পদার্থেই আত্মার কল্পনা করিতেন। অবিনাশিত্ব পক্ষে জ্ঞান, সক্রেটীসের সময় হইতেই প্রকৃষ্টরূপে স্থাপিত এবং গৃহীত হইতে আরম্ভ হয়। প্লেটো আত্মাকে কেবল অবিনাশী বলেন নাই, তিনি আরও বলিয়াছেন যে উহা অসৃষ্ট পদার্থ, এবং অসৃষ্ট বলিয়াই উহা অবিনাশী।৮

প্লেটো হিন্দুদিগের ন্যায় পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করিয়া, নর হইতে কিরূপে

৭। Phaedo, 29.

৮। Phaedrus, 51.

নারী এবং পর পর অপরাপর ইতরপ্রাণীর এই পৃথিবীতে সৃষ্টি হইল তাহা বলিতেছেন। যে সকল নর ইহ জন্মে অসৎ এবং অনর্থক প্রমোদসুখে রত হইয়া কাল কাটাইয়া থাকে, তাহারাই পর জন্মে স্ত্রীলোক হইয়া জন্মে। যে সকল স্ত্রী এবং পুরুষ, যদিও নিরীহভাবে হউক, কিন্তু অনর্থক ভাবে, জীবনাতিবাহিত করিয়া থাকে; এবং যাহারা নির্ব্বোধের ন্যায় মনে করিয়া থাকে যে দিব্যবিষয় সমস্তও নেত্রগোচর করণ সুসাধ্য, তাহারা পরজন্মে বায়ুবিহারী পক্ষিযোনী প্রাপ্ত হয়। যাহারা তত্ত্বজ্ঞান রহিত হইয়া জীবনাতিবাহিত করিয়াছে, তাহারা পশুযোনী প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পুনশ্চ যাহারা অজ্ঞানতায় পূর্ণ হইয়া নির্ব্বোধের ন্যায় জীবন কাটাইয়া থাকে, তাহারা পরজন্মে মৎস্যযোনী প্রাপ্ত হয়। ইত্যাদি, ইত্যাদি। প্লেটোর পূর্ব্বে পীথাগোরীয় তত্ত্ববিদেরা পুনর্জ্জন্মতত্ত্ব বিশ্বাস করিতেন। ৯ সক্রেটিসের বিশ্বাস ছিল যে, আত্মার আর পুনর্জ্জন্ম নাই; কারণ, তাঁহার বাসনা যে মৃত্যুর পরেও তিনি পরলোকে গিয়া পার্থিব জীবনকালীনের ন্যায়, জ্ঞানমূঢ়দিগকে বিধ্বস্ত করিয়া তাহাদিগকে সুজ্ঞান প্রদান করেন। ১০

এক্ষণে মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য কি, তৎসম্বন্ধে প্লেটো কহেন যে, আচারের পবিত্রতা দ্বারা, দেবতার ন্যায় পবিত্র জীবন সংসাধন করাই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য। ঐ পবিত্রতা যদিও অপরাপর বস্তুর সাপেক্ষ বিহীন হইয়া স্বয়ংই সুখের আধার হইতে পারে; তথাপি সেই পবিত্রতা

৯। পীথাগোরীয় সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক পীথাগোরাস সম্বন্ধে এরূপ কিম্বদন্তি আছে যে, পোবিদন্ দেবের নিকট দিব্য স্মৃতি প্রাপ্ত হইয়া, কোন জন্মে কি ছিলেন, তাহা পীথাগোরাস এরূপে প্রকাশ করিতেন;—তিনি বহু পূর্ব্বকালে পোবিদনের পুত্ররূপে ইমলিদিস্ নামে প্রাদুর্ভূত হয়েন। তাহার কিছু কাল পরে ইউফর্ব স নাম লইয়া জন্মান্তর প্রাপ্ত হয়েন; এবং ট্রয় যুদ্ধের যোদ্ধা মানিলসের দ্বারা আঘাতিত হইয়াছিলেন। তৎপরে হার্মেটিমস্ নাম প্রাপ্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। তৎপরে ডিলস্ নগরে, পিরস নামে একজন মৎস্যজীবী হয়েন। এই জন্মের পরেই, দুইশত সাত বৎসর পরলোকে বাসান্তে, পীথাগোরাস রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১০। Apology of Socrates 22.

লাভের জন্য উপকরণ এবং উপায় স্বরূপ অর্থ, বল, আভিজাত্য, এবং যশাদি সাংসারিক বস্তুর প্রয়োজন। প্লেটো স্থানান্তরে বলিয়াছেন ১১ যে, উচ্চতত্ত্ব যাহা কিছু কেবল আত্মার সহযোগেই লাভ হইতে পারে; শরীর তাহার প্রতিকূলতা করিয়া থাকে, যেহেতু উহাই, দ্বন্দ্ব, কলহ, হিংসা প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকলের মূলাধার। যথায় ঐ সকল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি জড়িত, তথায় কখনই সর্ব্বসিদ্ধির প্রত্যাশা করা যায় না; এজন্য তিনি বলেন যে, মনুষ্য কেবল মৃত্যুর পরেই প্রকৃত উচ্চতত্ত্বলাভে সক্ষম হয়। ইহজীবনেও তাহাতে বহুলাংশে কৃতকার্য্য হইতে পারা যায়, কিন্তু যদি শরীরকে কেবল আবশ্যক মত রক্ষা ভিন্ন, তাহার সঙ্গে আর কোন সংস্রবে বা তজ্জনিত কোন নিকৃষ্ট বৃত্তিতে মিলিত না হইয়া, তত্ত্বের অনুধাবন করা হয়। এই স্থান দৃষ্টে যেন এরূপ অনুমিত না হয় যে, প্লেটো হিন্দুযোগী বা সন্ন্যাসীর ন্যায় কোন জীবন কল্পনা করিতেছেন; তাহা নহে। তদ্রূপ যোগ বা সন্ন্যাসযুক্ত যে জীবন হইতে পারে, ইহা কখন তাঁহাদের ধারণাতেও প্রবেশ করে নাই। প্লেটো পুনশ্চ কহেন, ধন, বল, আভিজাত্যাদি না থাকিলেও যে জ্ঞানী ব্যক্তির সুখী হইবার পক্ষে বিশেষ কিছু প্রতিবন্ধকতা হয়, এমন নহে; যেহেতু যদি তিনি সামাজিক ও রাজনৈতিক নিয়মাদি লঙ্ঘন না করেন, এবং যখন তাঁহার বিবাহ করণ ও সমাজ ও রাজনীতি ইত্যাদিতে হস্তক্ষেপণের সম্পূর্ণ অধিকার আছে, তখন তাঁহার সুখী হইবার পক্ষে বিশেষ বাধকতা কিছুই থাকিতে পারে না।

জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনাক্সগোরা বারেক জিজ্ঞাসিত হইয়া কহিয়াছিলেন যে, সূর্য্য চন্দ্র আকাশাদির বিষয় চিন্তনই তাঁহার মনুষ্য জীবন ধারণের উদ্দেশ্য ১২। তিনি ধনীর সন্তান হইয়াও, তত্ত্বানুসন্ধানের খাতিরে সামাজিক সুখাদি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তজ্জন্য একবার কোন ব্যক্তি তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিল, "তুমি স্বদেশের প্রতি নিতান্তই মায়াশূন্য।" তাহাতে তিনি উত্তর করেন, "দূর মূর্খ, আমাদের প্রতি

১১। Phaedo 29—31.

১২। Diog. Laert. Anaxagoras VI.

আমার স্নেহ অপরিসীম;" এই বলিয়া আত্মদেশ নির্দ্দেশ হেতু আকাশের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। একদা এক মূঢ় ব্যক্তি, বিদেশে মৃত্যুশয্যায় শুইতে হইল বলিয়া, বহুতর খেদ প্রকাশ করায়, বিরক্তিপূর্ণ বিদ্রূপে অনাক্সগোরা তাহাকে এরূপ বুঝাইয়াছিলেন, "এত ভাবনা কি জন্য বাপু! নরকের রাস্তা সকল স্থান হইতেই সমান দূর।" থেলিসও একজন নির্লিপ্ত সংসারী ছিলেন। ইঁহার সম্বন্ধে এরূপ কথিত আছে যে, যৌবনে ইহার জননী বিবাহ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি উত্তর করেন—"এখনও বিবাহের সময় হয় নাই।" আবার যৌবন অতিবাহিত হইয়া গেলে, পুনর্ব্বার অনুরোধ করায় উত্তর করেন—"বিবাহের সময় অতীত হইয়া গিয়াছে।" সুতরাং এ জীবনে আর বিবাহ করা হইল না!

গ্রীসীয় প্রায় যাবতীয় তত্ত্ববিদ্‌দিগের মতে মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য, তত্ত্ববিদ্যা অনুশীলন দ্বারা জ্ঞান লাভে জ্ঞানী হওয়া। জ্ঞানীর পক্ষে পিটাকসের উপদেশ—"পরিমিত আচারী হইয়া পুণ্যচেতা হইবে; এবং সত্য, শ্রদ্ধা, চতুরতা, সামাজিকতা এবং শ্রমশালিত্ব লাভ করিবে।" আরিষ্টটলের মতে আত্মিক পবিত্রতা সাধন পূর্ব্বক, জ্ঞানচর্চ্চার দ্বারা সুখী হওয়াই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য। সুখী কেবল ত্রিবিধ সতের সাধনে হইতে পারে। প্রথমতঃ আত্মিক সৎ, যথা জ্ঞানাদি; দ্বিতীয়তঃ দৈহিক সৎ, যথা স্বাস্থ্য, বল, সৌন্দর্য্যাদি; তৃতীয়তঃ বাহ্যিক সৎ, যথা আভিজাত্য, যশ, ধনাদি, মানব এই ত্রিবিধ সতের আশ্রয় ভিন্ন কেবল একমাত্র আত্মিক সতের সহায়ে সুখী হইতে পারে না। আরিষ্টটল বলেন, জ্ঞানী হইলেই যে সাধারণ মানবীয় বৃত্তি সমস্তকে অতিক্রম করিতে পারা যায় এমন নহে; তবে অজ্ঞানী হইতে পৃথকত্ব কেবল এইমাত্র যে জ্ঞানীরা সেই সকল বৃত্তি পরিমিত রূপে চালনা করিয়া থাকেন।

জিনোর সাম্প্রদায়িকেরা জ্ঞানীর এরূপ বর্ণনা করিয়া থাকেন।—"যাহারা জ্ঞানী তাহারা সর্ব্বদা দেবতার প্রতি ভক্তি সংযুক্ত, এবং কখনই দেবতার অপ্রিয় কার্য্য সাধন করে না; এবং তাহাদের জীবনও পবিত্রতায়

সেইরূপ ভাবে পরিণত করিয়া থাকে। তাহারা সরল, সর্ব্বদা সৎপথাবলম্বী, কাপট্য-বিহীন ও যে কোন বিষয়ে আড়ম্বর ও মৌখিকতাশূন্য; তাহারা কখনই কর্ত্তব্যের বিপরীতাচরণ করে না, অথবা নির্ব্বোধের ন্যায় যদৃচ্ছা যে কোন কার্য্যে লিপ্ত হয় না। তাহারা মদিরা পান করে বটে, কিন্তু কখনও তাহাতে মত্ততা প্রাপ্ত হয় না। স্বভাবে ইহারা নির্দ্দোষ, প্রমোদে পরাঙ্মুখ, এবং কখনই সুখ দুঃখের দোলায় দোদুল্যমান হইয়া তাহাতে মুহ্যমান হয় না। জ্ঞানীরা পিতা মাতার প্রতি ভক্তি, সমাজের হিত-সাধন ইত্যাদি, দেবনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য বোধে সর্ব্বদাই তাহার আচরণ করিয়া থাকে। কথিত আছে, গ্রীকদের কর্ত্তব্য শব্দের অর্থ ব্যক্তিকরণ ও তাঁহার প্রথম প্রচার জিনো হইতে প্রবর্ত্তিত হয়।১৩

প্লেটো প্রভৃতির পুনর্জ্জন্ম তত্ত্বে মানব কর্ম্মফলে উচ্চ নীচ যোনী প্রাপ্ত হওয়ায়, স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, পরলোক পর্য্যন্ত প্রসারিণী পাপে গ্রীকতত্ত্ববিদ্‌দিগের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাস ছিল, এবং কর্ম্মানুসারে মানব স্বর্গ নরকের ভাগী হইত। পীথাগোরীয় সাম্প্রদায়িকেরা কহিতেন যে, পোষিদন দেব মৃত ব্যক্তিবর্গের আত্মার সংগ্রাহক, পরিরক্ষক এবং পরিচালক; তিনিই যাহার যেরূপ কর্ম্ম, তদনুসারে তাহাকে স্বর্গে বা নরকে নীত করিতেন। প্লেটো তাঁহার ফিড্রুসে১৪ রথী এবং অশ্বের রূপকে আত্মার অধঃ বা ঊর্দ্ধলোকে গমন বা পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ অতি সুন্দর রূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। পুনশ্চ তাঁহার ফিডোশে সক্রেটিসের মুখ দিয়া বলাইতেছেন যে, এই পৃথিবীতেই স্বর্গ এবং নরক, উভয়ই অবস্থিতি করিয়া থাকে। পৃথিবীর উচ্চস্থান সমস্ত স্বর্গপর্য্যায়, মধ্যস্থান নরনিবাস, নিম্নস্থান হইতে নরকবাসের আরম্ভ। তথায় মানবগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে নীত হইয়া, পাপ বা পুণ্যের ফলভোগান্তে, শত বা সহস্রাদি বর্ষ পরে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। যাহারা পাপী, তাহারা আগে পাপের ফল ভোগ করিয়া, পরে তাহাদের পুণ্যের ফল ভোগ করিয়া

১৩। Diog. Laert. Zeno 62. জিনোর জন্ম আনুমানিক ৩৪০ খৃঃ পূঃ; মৃত্যু ২৬৩ খৃঃ পূঃ।

১৪। Phaedrus 58—62.

থাকে; এবং যাহারা পুণ্যবান, তাহারা একেবারেই শ্রেষ্ঠলোকে গমন করিয়া পুণ্যের ফল ভোগ করে। পুনশ্চ যাহাদের পাপের ভরা পরিপূর্ণ, তাহাদের আর নরক হইতে নিবৃত্তি নাই।

গ্রীকদিগের তত্ত্ববিদ্যার বিষয় যথাযথ বিবৃত করিলাম। হিন্দুদিগের তত্ত্ববিদ্যার ঐরূপ সার সঙ্কলন আর পুনর্ব্বার না করিয়া, তদর্থে পাঠক-বর্গকে আমার প্রণীত বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত নামক গ্রন্থে ব্রাহ্মণ-বর্গে ব্রহ্মবিদ্যায় জ্ঞান কাণ্ড পরিচ্ছেদের উপর বরাত দিতে বাধ্য হইলাম।* বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত গ্রন্থে তত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধে যে সার সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহা প্রায় সমস্তই শ্রৌতগ্রন্থ অর্থাৎ প্রাচীন উপনিষদ্ প্রভৃতি হইতে; দর্শন শাস্ত্রাদি হইতে নহে। ভারতে দর্শনপ্রাণ তত্ত্ববিদ্যাও বহুশ্রেণীর। গ্রীকদিগের মধ্যেও দর্শনবিদ্যার কিছুমাত্র কমি নাহি, কিন্তু তাহা কেবল ধর্ম্মবিদ্যা ও মোক্ষাদি জ্ঞান লইয়া পর্য্যবসিত নহে; রাজনীতি, ব্যবহার, অর্থ ইত্যাদি নানাবিষয়ে নিয়োজিত হইয়া নানারূপ ধারণ করিয়াছে। ভারতে দর্শনবিদ্যার ভাব সেরূপ নহে। উহা যত শ্রেণীর ও যত বিভিন্ন ব্যক্তি হইতেই উৎপন্ন হউক না কেন, উহারা সকলেই মোক্ষাভিলাষী হইয়া পারলৌকিক তত্ত্ব লইয়া তদালোচনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। সকলেরই উদ্দেশ্য,—ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি মুক্তি। সকলেরই উদ্দেশ্য এক, এবং উদ্দেশ্যপূরণের উপায়ও এক; কেবল সে উপায় কিরূপে আয়ত্ত হইতে পারে, তাহাই বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন বুদ্ধিযোগে অনুশীলিত হইতে যাওয়ায়, দর্শন বিদ্যার যে কিছু শ্রেণী-বিভিন্নতা ঘটিয়াছে। পুনশ্চ সকল দর্শনই মূল প্রস্থানস্থলে অগ্রে কোন না কোন শ্রৌততত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া বা তাহার দোহাই দিয়া, তবে অগ্রসর হইয়াছে। এমন স্থলে সকল দর্শন বিদ্যাই একরূপ সমপ্রকৃতি হইবার কথা। সকলেই উদ্দেশ্য একমাত্র চিন্তিয়া যাত্রা করিয়াছে, শেষে সেই উদ্দেশ্যের দেখা পাইয়া বা না পাইয়া, বা নানা কারণে, নানা মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। ফলতঃ কেবল দার্শনিক তত্ত্ববিদ্যা কেন, পুরাণাদি সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র বিদ্যাই সেই একমাত্র উদ্দেশ্যকে অবলম্বন করিয়া

* এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় পরিশিষ্ট দেখ।

প্রধাবিত ও তাহার উপরে গঠিত, তবে যে কিছু বিভিন্নতা তৎতৎ শাস্ত্রে বা গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, তাহা কেবল রূপান্তর বা বিকৃতি সাধন মাত্র, নতুবা অন্তরভাগে একতত্ত্ব সত্ত্বা সর্ব্বত্রই পরিচালিত হইয়া রহিয়াছে। সর্ব্বত্রই যোগী হও, মায়াশূন্য হও, সংসার পরিত্যাগ কর, তবেই পুরুষার্থ, তবেই মুক্তি।

ভারতে দর্শনপ্রাণ তত্ত্ববিদ্যার মধ্যে ষড়্‌দর্শনই প্রধান। তন্মধ্যে বেদান্ত দর্শন সম্পূর্ণই শ্রৌতধর্ম্মের আশ্রয়ে এবং অবলম্বনে নির্ম্মিত; এজন্য শ্রুতির সহযোগে একমাত্র এই দর্শনই ধর্ম্মার্থে দত্তজীবন ব্যক্তি-বর্গের দ্বারা গৃহীত ও অনুসৃত হইয়া থাকে।১৬ অপরাপর দর্শনগুলি সম্বন্ধে সেরূপ নহে। তাহাদের সাধনপ্রণালী বা লব্ধফল শ্রুতি হইতে কিয়দংশে বা বহুলাংশে রূপান্তরযুক্ত থাকায়, ধর্ম্মগ্রন্থ স্বরূপে প্রায়ই অধীত হয় না। প্রায়ই বিদ্যাগ্রন্থ স্বরূপে অধীত, এবং শিক্ষা সমষ্টির মধ্যে কেবল শিক্ষার অঙ্গ বিশেষরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। এই সকল গ্রন্থ ভক্তিপূর্ব্বক ও অধীত না হয় এমন নহে, কিন্তু সে ভক্তি সম্পূর্ণই সাম্প্রদায়িক। অতএব সাধারণ ও সমগ্র দৃষ্টিতে ধরিতে গেলে, প্রকৃত ধর্ম্মবিষয়িণী তত্ত্ববিদ্যা সম্বন্ধে, দার্শনিক তত্ত্ব অতি সামান্যই গণনায় আসিয়া থাকে। কেবল শ্রৌততত্ত্ব ও তদবলম্বী বেদান্ত প্রধানতঃ তত্ত্ব বিদ্যাস্থলে গৃহীত হয়।

এক্ষণে গ্রীক এবং হিন্দু এ উভয় জাতির তত্ত্ববিদ্যা তুলনা করিলে, স্পষ্টতই দেখিতে পাওয়া যায় যে, গ্রীক তত্ত্ববিদ্যার মুখ্য উদ্দেশ্য জ্ঞানকে সুমার্জ্জিত করিয়া ইহজীবন যাহাতে সুখ স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হইতে পারে, তাহারই উপায় সাধন করা। পরজীবন বা পারলৌকিক তত্ত্ব

১৬। ভারতীয় তত্ত্বসংসারে বেদান্তদর্শন যতটা প্রভুত্ব করিয়াছে, সাংখ্যের প্রভুত্ব যে তাহা অপেক্ষা কিছু কম তাহা নহে। কিন্তু বেদান্তদর্শনের প্রভুত্ব যেমন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে, সাংখ্যের প্রভুত্ব সেরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে। উহাতে নাস্তিকতা ভাবের কতকটা আভাস হেতু প্রকাশিতরূপে কখনও গৃহীত হয় নাই বটে, কিন্তু উহার তত্ত্বপ্রকরণ হিন্দুশাস্ত্র ও ধর্ম্মের হাড়ে হাড়ে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। আধুনিক হিন্দুজাতি ও তাহার পৌত্তলিকতার প্রায় অধিকাংশ সাংখ্যতত্ত্বের রূপক। আধুনিক হিন্দুধর্ম্ম সংসারে, সাংখ্যের প্রকৃতি ও পুরুষের প্রভুত্ব যত বেশী এত আর কাহারও নহে।

নিরূপণ বা মানবজীবনের নিগূঢ় অর্থানুসন্ধানের প্রতি সেরূপ লক্ষ্য নাই, অথবা তাহাতে পার্শ্বদৃষ্টিমাত্র লক্ষিত হইয়া থাকে। গ্রীকতত্ত্ব-বিদ্যা প্রকৃত প্রস্তাবে ইহলৌকিক সুখানুসন্ধানতত্ত্ব। তদন্যতর বিষয়ের আলোচনায় অনেক গ্রীকতত্ত্ববিৎই হস্তক্ষেপ করিয়াছেন সন্দেহ নাই; কিন্তু সে সকল, ইহলৌকিক স্বচ্ছন্দতার সান্নিধ্যে, কেবল যান আসবাবের স্বরূপ আলোচিত ও অনুশীলিত হইয়াছে, মুখ্যভাবে প্রায়ই নহে। বাঞ্ছারাম, পূর্ব্বাপর হইতে, লৌকিক পারলৌকিক, আধি-ভৌতিক আধ্যাত্মিক, ইত্যাদি শব্দ ও অর্থের উপর বড়ই ঝোঁক দিয়া যাইতেছি। বোধ করি, পুনরুক্তি বলিয়া বিরক্ত হইতেছ; কিন্তু পুনরুক্তি নহে। তদুভয়ের মূলমন্ত্রও অভিনয়ে মানবজীবনের বহির্দৃশ্য। অতএব সেই মানবজীবন প্রকৃতরূপে কিছুমাত্র বুঝিবার আবশ্যক হইলে, তদুভয়ের উপর তদ্রূপ ঝোঁকের একান্ত প্রয়োজন।

হিন্দুর তত্ত্ববিদ্যা ইহার বিপরীত। গ্রীকতত্ত্ব যেমন পার্থিব স্বচ্ছন্দতার মোহে উচ্চ লোকের সহ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ শূন্যতা হেতু, লৌকিক ও সামাজিক বিষয় লইয়া আকুলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল; হিন্দুতত্ত্ব সেইরূপ অদৃষ্টশক্তির প্রতি ভীতিহেতু ইহলোকের সহ সংস্রবচ্ছেদে অপার্থিব বিষয় লইয়া আকুলতা প্রাপ্ত হয়। যথায় রামানুজস্বামী নিরূপণ করিতে-ছেন যে পদার্থ তিন প্রকার, চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর; সুতরাং দ্বৈত আত্মিক শক্তির বিদ্যমানতা; শঙ্করাচার্য্য তথায় বেদান্তভাষ্যে প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছেন "আমিই শিব," আমিই শিব," এবং প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন দেখাইতেছেন "স এবেশ্বরো'হম্।" কণাদের মতে জীবাত্মার গুণ, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, যত্ন, দ্বেষ, চিন্তা, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই কয়টি আছে। পরমাত্মায়ও এই গুণগুলি নিহিত, কেবল সুখ, দুঃখ, দ্বেষ, চিন্তা, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই কয়টী নাই। ইহাঁর মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা স্বতন্ত্র। সাংখ্যকে দ্বৈতবাদী বলে, কিন্তু তাহা জীবাত্মা ও পরমাত্মার পৃথকত্ব দর্শাইয়া নহে; পুরুষ ও প্রধানের স্বাতন্ত্র্য ও সমসাময়িকতা ও সমস্থায়িত্ব লইয়া।

জীবাত্মা দ্বৈতবাদীর হউন বা অদ্বৈতবাদীর হউন, এখন তাঁহার অবস্থা, কর্ত্তব্য ও পরিণাম কি? কণাদ বলেন জীবাত্মা সুখ দুঃখের

অধীন; এবং সুখ ও দুঃখ আবার ধর্ম্ম বা অধর্ম্মফলে উৎপত্তি হয়। ধর্ম্ম ইহার মতে তীর্থাদি ভ্রমণ ও যাগাদিকরণ, অধর্ম্ম অবৈধ কর্ম্মানুষ্ঠানে জন্মে, কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা ক্ষয় হয়। ধর্ম্মের ফল স্বর্গ, অধর্ম্মের ফল নরক। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, বা বৈধ ও অবৈধ কর্ম্ম কাহাকে বলে, তৎস্থলে পাতঞ্জল দর্শন শিক্ষা দেন, বেদ অনুরূপ যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্ম বৈধ; তদ্বিপরীত নিষিদ্ধ কর্ম্ম অবৈধ। সাংসারিক প্রবৃত্তি যাহা তাহা অস্মিতা হইতে উৎপন্ন হয়, এবং এই অস্মিতা অজ্ঞানের ফল। অতএব যাহা কিছু কর্ম্ম বৈধ বলিয়া আদিষ্ট হইল, তাহাও কিরূপে করিতে হইবে?—কর্ম্মফলের আশা পরিত্যাগ করিয়া; যে কর্ম্মফল ঈশ্বরে অর্পিত করিয়া সম্পন্ন না হয়, তাহা কুক্কুর উচ্ছিষ্ট পায়সাদির ন্যায়। এ ভাল কথা! বস্তুতই লোকে কর্ত্তব্যবুদ্ধির সাধন এরূপে না করিলে সে কর্ত্তব্যবুদ্ধি বৃথা; কিন্তু সে কর্ত্তব্যবুদ্ধি যদি লোকহিত, সমাজহিত, সংসারের হিতসাধনে হয়, তাহা হইলেই সুখের বিষয়, অন্ততঃ আমাদের বুদ্ধিতে সুখের বিষয় হয়। ইহাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধির ধারণা যদিও অতি শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ইহাদের সম্পাদ্য কর্ত্তব্য সেরূপ নহে। সে কর্ত্তব্য কি? পতঞ্জলি বলিতেছেন, কর্ম্মের মধ্যে কেবল নিত্যনৈমিত্তিক ও চিত্তশুদ্ধিকর যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান শ্রেষ্ঠ। এই যোগাঙ্গ অষ্টবিধ, যথা যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। পুনশ্চ পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শন কি বলেন দেখ;—এ জগতে সৎ ও ঈশ্বরের প্রিয়কর কার্য্য তিন প্রকার, অঙ্কন অর্থাৎ গায়ে হরিনামের ছাপের ন্যায় বিষ্ণুনারায়ণের সঙ্খচক্রাদি চিহ্ন ধারণ; নামকরণ অর্থাৎ নিজ পুত্রপৌত্রাদির নারায়ণ-বোধক নামের দ্বারা নামকরণ করিবে, যাহাতে সেই উপলক্ষে দেবনাম সর্ব্বদা মুখে উচ্চারিত হয়; তৃতীয় ভজন। ভজন তিন প্রকার, কায়িক বাচিক ও মানসিক। কায়িক ভজন আবার ত্রিবিধ, দান, পরিত্রাণ ও পরিরক্ষণ; বাচিক চারি প্রকার, সত্য, হিত, প্রিয় ও স্বাধ্যায়; মানসিক ভজনও তিন প্রকার, দয়া, স্পৃহা ও শ্রদ্ধা।

যে সাধারণ হিতচিন্তায় গ্রীক আত্ম বা আত্মপুত্রে বলি দিতে প্রবৃত্ত, এবং গ্রীকের মনীষাশক্তি যে সাংসারিক স্বচ্ছন্দতার চিন্তায় পর্য্যবসিত

হইয়াছে ; উপরে যেরূপ প্রদর্শিত হইল, হিন্দু প্রকৃতিতে তাহার নাম গন্ধও নাই বলিলে হয়। হিন্দুরও ব্রত হিতব্রত এবং কার্য্য সাত্ত্বিক ; কিন্তু সে হিত আত্মহিতে এবং সে সাত্ত্বিক কার্য্যবুদ্ধি পরলোক চিন্তায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। গ্রীকের পরের হিত সাধন করিতে গিয়া আত্মহিত; হিন্দুর আত্মহিত করিতে গিয়া পরের হিত; মোক্ষপথে হিন্দু ঘোর স্বার্থবান। এই উভয় জাতীয় স্বার্থ এবং নিঃস্বার্থ ভাব কেবল প্রকারান্তর সামাজিক হিত সম্বন্ধে প্রযুক্ত; কিন্তু নৈতিক হিত লইয়া যথায় কথা, তথায় আবার ঠিক ইহার বিপরীত, তথায় হিন্দু নিঃস্বার্থ হিতকারী এবং গ্রীক ঘোর স্বার্থবান্। সামাজিক হিত বিষয়ে, হিন্দু মোক্ষার্থে পথ বাহন কালীন, নিজের জীবনরক্ষার চেষ্টা হইতে যে কিছু সামাজিক হিত করিয়াছেন। আর গ্রীক, সাধারণ বা স্বশ্রেণির সুখ বর্দ্ধন না করিলে নিজের সুখ বর্দ্ধিত বা স্থায়ী হয় না বলিয়া ; অথবা বহু বিষয়ে অমূর্ত্তের স্থানে, সুখ কেবল জনসমষ্টিসাধ্য হওয়ায়, কাজেই সামাজিকতায় লিপ্ত হইয়াছেন। এই সকল কারণে, হিন্দু মূলে স্বার্থপর না হইলেও, সাধারণ স্বার্থের প্রতি অনাস্থাভাব হেতু স্বার্থপরের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকেন ; আর গ্রীক মূলে স্বার্থবান্ হইলেও, কার্য্যে, সামাজিকতা পক্ষে নিঃস্বার্থবানের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকেন। যাহা হউক, উপরে কথিত হিন্দুর তথাবিধ হিতব্রত ও সাত্ত্বিক কার্য্যের অতিরিক্ত যাহা কিছু, তাহা হিন্দুর বিশ্বাস অবিদ্যা. মায়া বা অজ্ঞানের ফল। শৈবদর্শনমতে ভোগ সাধন, কলা, কাল, নিয়তি, বিদ্যা, রোগ, প্রকৃতি ও গুণ ইত্যাদি তত্ত্বের বশীভূত জীব যাহারা, তাহারা অপকপাশদ্বয় শ্রেণিবিশিষ্ট ; ইহাদিগকে শাস্তিস্বরূপ মহেশ্বর সংসার-কূপে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন।

হিন্দুতত্ত্বের শেষ নিরূপণ, "ত্রৈগুণ্য বিষয়ো বেদাঃ নিস্ত্রৈগুণ্যবভার্জ্জুন" কর্ম্মমাত্রের এক বারে ধ্বংস কর। বেদান্ত আদি যাবতীয় দর্শনেরই ঐ শিক্ষা। কণাদ ঋষিরও ঐ কথা; কিন্তু বলেন শ্রুতি পুরাণাদি দ্বারা আগে কর্ম্ম সাধনান্তে আত্মার স্বরূপ ও গুণাদি পরিজ্ঞাত হওনান্তর ; নিদিধ্যাসান দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ ব্যতীত, মুক্তির সম্ভাবনা নাই। একা কণাদ নহে, অনেক তত্ত্ববিৎই এইরূপে কর্ম্মকাণ্ডের

অবশ্যপালনীয় ভাব জ্ঞাপন করিয়া থাকেন; কিন্তু বস্তুতঃ সে কর্ম্মকাণ্ড কি তাহা দেখিতে গেলে, তাহা প্রায়ই একপিণ্ড আতপ চাউলের অন্ন আপনার উদরে এবং আর এক পিণ্ড দেবোদ্দেশে দানের অতিরিক্ত আর কিছুই নহে। এতদতিরিক্তে যাহা কিছু করা যায়,তাহা অবশ্য বলিতে হইবে যে তত্ত্ববিদ্যার সঙ্গে একরূপ লাঠালাঠি করিয়া করা হয়। লোকসংসারে এমন অবসন্নকরী তত্ত্ববিদ্যা আর কোথাও নাই! পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন শিক্ষা দিয়া থাকেন যে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটী পুরুষার্থ। কিন্তু ইহার মধ্যে মোক্ষই নিত্য, আর তিনটী অস্থায়ী; অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির প্রধানতঃ প্রধান পুরুষার্থ মোক্ষলাভে যত্ন করাই উচিত। উৎসন্ন-মুখ ভারতে, ফলেও তাহা দাঁড়াইয়াছে; অথবা তাহারই ফলে ভারত উৎসন্ন মুখ হইয়াছে। হিন্দু ধর্ম্মের আদি শিক্ষক যাঁহারা যাঁহারা, কেবল ভারতে নবাগত হইয়া ছিলেন মাত্র, তাঁহাদের শিক্ষা এরূপ ছিল না; তাঁহাদের শিক্ষা ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এ সকলই সমভাবে সঞ্চয় ও সকলেরই সদ্ব্যবহার করিতে শিখ। কিন্তু যে যে লৌকিক ও প্রাকৃতিক কারণ সমূহের সমাবেশে ভারতের হিন্দু চরিত্র গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে সে সামঞ্জস্য-সাধক সুশিক্ষা বহুদিন অনুসৃত হইবার কথা নহে। যে ভীতিতে মানবচিত্ত ভারতীয় প্রকৃতিমূর্ত্তি দর্শনে প্রথমে আকুলিত হইয়া ছিল, সেই ভীতিই কালে মোক্ষের আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হইয়া মানবকে একমাত্র মোক্ষপ্রয়াসী করিয়াছিল। ধর্ম্ম অর্থ কামে এখন জলাঞ্জলি,ঘরে বাহিরে সকল স্থানে এক মাত্র মোক্ষই এখন প্রয়াসপদার্থ। হিন্দুসন্তান কেবল মনের সাধে মোক্ষের চিন্তা করিয়াছেন; এবং পদে পদে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে ধর্ম্ম অর্থ কাম ছায়াবাজী, কিছু নহে— কিছু নহে। উহাতে লিপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, সংস্রব পর্য্যন্ত থাকিলে আর মোক্ষের প্রত্যাশা করিতে পারিবে না। অতএব হিন্দুসন্তান কায়মনে একমাত্র মোক্ষেরই কেবল আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন। এই আলোচনা করিতে গিয়া, ইহলোকেত তাঁহার দুর্দ্দশার পরিসীমা নাই; ঈশ্বর করুন, পরলোকেও যেন তাঁহার সেরূপ দুর্দ্দশা না হয়। এত আগ্রহের মোক্ষচেষ্টা যেন কিঞ্চিৎ ফলবান্ হয়!

গ্রীকতত্ত্ববিদ্যা লৌকিক বিষয়প্রাণা ও আধিভৌতিক গুণপ্রধানা; হিন্দুর তত্ত্ববিদ্যা তদ্বিপরীতে অলৌকিক বিষয়প্রাণা ও আধ্যাত্মিক গুণ-প্রধানা। হিন্দুতত্ত্ব ভৌতিক প্রমাণাদিকে একবারেই পরিত্যাগ করিয়া 'কেবল মানসিক, এবং বৈজ্ঞানিক ভৌতিক প্রমাণাদির অভাবে কাল্পনিক প্রমাণ আদির দ্বারা নিজপথের অনুসরণ করিয়াছেন। ভৌতিক প্রমাণাদি কেন পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিতে পারি না, বোধ হয় সে বিষয়ে বিশেষ সংলিপ্তভাব ও দৃষ্টির অভাবই কারণ। গ্রীকতত্ত্বের ধর্ম্ম তাহা নহে, নতুবা ক্ষেত্রতত্ত্ব বা রেখাগণিত লইয়া কে কবে সৃষ্টি প্রকরণ হইতে ঈশ্বর নিরূপণ পর্য্যন্ত করিতে অগ্রসর হইয়া থাকে। পুনশ্চ, গ্রীক-তত্ত্ববিৎ তত্ত্বপথে যতই ধাবিত হউন, শেষে আসিয়া জাতীয় ধর্ম্ম কর্ম্মে প্রায়ই বিশ্রাম লাভ করিতেন; সুতরাং গ্রীক শ্রদ্ধাশক্তির সঙ্কীর্ণ ও অস্থির ভাব হইলেও, শ্রদ্ধেয় বিষয় সর্ব্বসাধারণের দ্বারা প্রায় সমান গৃহীত হইবায়, সুস্থিরভাবের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। হিন্দুশ্রদ্ধাশক্তি স্থির এবং পূর্ণ-গভীরতা সত্ত্বেও, তদভাবে অন্য প্রকার ফলের উৎপাদন করিয়াছিল। হিন্দু তত্ত্বপথে, জ্ঞান অজ্ঞান, অর্থ, লোকব্যবহার, লোকনীতি, কিছুরই প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, ও তাহাদের প্রতি আস্থা না করিয়া এবং তাহা-দিগকে স্বীয় অনুসৃত বিষয়ের উপকরণ স্বরূপে গ্রহণ না করিয়া, একেবারে দিগ্বিদিকশূন্য হইয়া ধাবিত হইয়াছেন। সম্মুখে শাস্ত্রীয় দেববংশাবলীতে বাধা পড়িল, তাহাদিগকে লঙ্ঘন করিলে শাস্ত্র লঙ্ঘন করিতে হয়; হিন্দুতত্ত্ববিৎ তাহাতেও প্রস্তুত। অবলীলাক্রমে চলিত শাস্ত্রবন্ধনকে ছেদ করিয়া, দেববংশকে অতিক্রম পূর্ব্বক নিরাকার নিষ্কাম ঈশ্বর ও দ্বৈত অদ্বৈত মতাদিতে আসিয়া উপনীত হইলেন। ইহাতে পূর্ব্বস্থ লোকরুচি, লোকপ্রবৃত্তি, এবং লোকের ধারণাশক্তির অপেক্ষা অল্পই রাখা হইল। লোকে অবাক হইল এবং তাহা বুঝিতে ও তাহা আয়ত্ত করিতে পারিল না; সুতরাং সেই সকল তথাবিধভাবে কখনই সাধারণ লোকবর্গের মধ্যে গৃহীত ও অনুসৃত হইল না। অথচ লোকে, সেই সকল দৃষ্টে, মোটের উপর এইটুক্ বুঝিল যে তাহাদের নিজ অনুসৃত অর্থকামাদি অকিঞ্চিৎ-কর, এবং তাহাদের বিস্ময়-আপ্লুত বিশ্বাসে এই তত্ত্ববিদেরা মহাজন;

তাহার পর " মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ " হইয়া দাঁড়াইল। সুতরাং ইহারাও, দেখা দেখি, লৌকিক বিদ্যা ও অর্থাদিতে আস্থাশূন্য হইয়া, তত্ত্ববিৎদিগের প্রদর্শিত উচ্চপথ বাহনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল, অথচ সে পথ ধারণার অতীত হেতু দুরগম্য ; কাজেই তাহার বিকৃতি সাধন পূর্ব্বক আত্মসমতায় আনিয়া, অভীপ্সিত লাভ হইল বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল। ইহাতে ফল এই দাঁড়াইল, নিশ্চিত বিষয় যাহা, তাহা হস্তচ্যুত হইল ; অনিশ্চিত বিষয়ত লাভ হইলই না, অধিকন্তু অনিশ্চিতের অনিশ্চিত—কেবল তাহার বিকার মাত্র হাতে আসিয়া সম্বল হইল। কোন বিষয় একেবারে না পাওয়া যায় সে ভাল, কিন্তু তাহার বিকার ভাব কখনই ভাল নহে। না থাকাতে তত দোষ নাই, যত কদর্য্যভাবে থাকায় দোষ আছে। অতএব জন কয়েক প্রকৃত তত্ত্বশীলকে বাদ দিলে, সাধারণ লোকের পক্ষে তত্ত্ববিদ্যার কল্যাণে তুকুল গেল বলিতে হইবে। এ নিমিত্ত কার্য্যতঃ হিন্দু চরিত্র অনিশ্চয়, অস্থিরপদ ; যে কোন বিষয়ে আসক্তি ও দার্ঢ্যতা-শূন্য। হিন্দুসন্তান যদি বা কখনও বহু আড়ম্বরে ও বহু আসক্তিতে কোন কার্য্য বা কার্য্যচিন্তায় রত হইলেন, এমন সময়ে সহসা মনে উঠিল,—'মরিতে হইবে', অমনি সকল বন্ধন ঢিলা হইয়া পড়িল, সকল আসক্তি অবসন্ন হইয়া আসিল ; ইহাই হিন্দুচরিত্রে নিত্য দৃশ্য। কি শোচনীয় দৃশ্য ! কি আশ্চর্য্য, এমন রত্ন প্রসবিনী ভারত, তথাপি ইহাতে এমন হিন্দুতত্ত্ববিৎ আজিও জন্মায় নাই যে, যে শিক্ষা দিতে পারে যে, ইহজীবনের যে কোন প্রকারের কার্য্যই হউক না কেন, সাত্ত্বিকভাবে সম্পাদিত হইলে, তাহা পরম পুরুষার্থের অংশ কলারূপে সহায়তা করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে শ্রীকচরিত্র ইহার অন্যতর ; নিম্ন পদবীর বটে কিন্তু কার্য্যতঃ নিশ্চিত।

তত্ত্ববিদ্যার ফলে হিন্দুদিগের আর একটি মহৎ অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে ; ইহা হিন্দুদিগকে ঘোর অদৃষ্টবাদী করিয়া তুলিয়াছে। একে হিন্দুর ঘরে বাহিরে মায়াবাদ, তাহার উপরে আবার এই অদৃষ্টবাদ ; একে মায়াবাদে রক্ষা নাই, তাহার উপরে আবার এই অদৃষ্টবাদের চাপাচাপি। মায়াবাদও অদৃষ্টবাদের ন্যায় এই তত্ত্ববিদ্যারই ফল। ঋষির কুটীরে

রাজার মন্দিরে, কৃষকের ক্ষেত্রে, বা রাখালের মাঠে, যেখানে যাইবে, সেইখানেই দেখিবে মায়াবাদ ও অদৃষ্টবাদ তত্ত্ব সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে; সবাই কহিতেছে এ সংসার কেবল মায়ার কাণ্ড; সবাই বলিতেছে, আমার সুখ দুঃখ, কর্ম্ম অকর্ম্ম, কর্ম্মণ্য অকর্ম্মণ্যভাব, সকলই অদৃষ্টবশে ঘটিতেছে; তাহার উপর আমার শক্তি কি, যাহা করাইতেছে আমি কেবল তাহাই করিয়া যাইতেছি।—'ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।' এমন অবসন্নকারী বিশ্বাস আর এ জগতে হইতে পারে না; এবং ইহা ফলে যতদূর মানবকে অকর্ম্মণ্য করিতে সক্ষম, বোধ করি তেমন আর এ জগতে কিছুই নাই। ইহা কথায় বলিয়া আর কি করিব; নিত্য নিত্য, প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতিজনে, প্রতিবেশিবর্গের মধ্যে ইহার ফল যাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছি, তাহার উপর আর বর্ণনার অপেক্ষা রাখে কোথায়? তাহা যদি নিত্য ঘটনা না হইত, তাহা হইলে বস্তুতই তাহার প্রতি 'হৃদয়-বিদারক' ও 'রোমহর্ষক' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করা অসার্থক হইত না। আমার নিজ প্রতিবেশিবর্গের মধ্যে এই অদৃষ্টবাদের চিত্র আরও ভয়ঙ্কর। অনাহারে, অনুচিত ক্রিয়ায়, ইহারা ও ইহাদের আশ্রিত পরিবারবর্গেরা নিত্য ক্লেশে, নিত্য ধ্বংস-মুখে অগ্রসর হইতেছে; ইহারা স্বচ্ছন্দে দেখিতেছে এবং কি দেখিতেছে তাহাও বুঝিতেছে, তথাপি তাহার প্রতিবিধানের নিমিত্ত কিছুমাত্র যত্নগ্রহণ করিতেছে না। শৃগাল কুকুরের জীবন অতিবাহিত করিবে তাহাও শ্রেয়ঃ, তথাপি উপায়ের জন্য ঘরের বাহির হইবে না; আরও আশ্চর্য্য, উপায় হাতে তুলিয়া দিলেও তাহা গ্রহণ করিতে চাহে না! এক অদৃষ্ট দেখাইয়া, উপায় অনুপায়, সুখ দুঃখ, আশা নিরাশা, সকলেরই নিবৃত্তি সাধন করিয়া থাকে। বলিতে কি, দেখিয়া শুনিয়া, উপায়ের অযাচিত সংগ্রাহক এবং দাতা যিনি, তাঁহাকে অপ্রতিভ হইয়া অধোমুখে ফিরিয়াআসিতে হয়। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! মনুষ্যবুদ্ধি জ্ঞানের আধার হইয়াও এতটা আত্মসংহারক হীনাবস্থায় নামিতে পারে! ঘনিষ্ঠতা প্রযুক্ত আমি যতটুকু স্থানের অন্তস্থল পর্য্যন্ত দর্শনে এরূপ চিত্র দেখিয়া খেদান্বিত হইতেছি; বোধ করি প্রতি দর্শকই দৃষ্টিচালনা করিলে, সর্ব্বত্রই এইরূপ

চিত্র তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইবার অসদ্ভাব হইবে না। নিশ্চয়ই বাঞ্ছারাম, ভারত অধঃপতনের শেষ সীমায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে! এখন হইতে কি তবে এ চিত্রের পরিবর্ত্তনের আশা করা যাইতে পারে না?

ভারতের প্রাচীন ধর্ম্মবিদ্যায় এরূপ মায়াবাদ বা অদৃষ্টবাদ, ইহার কিছুই পরিজ্ঞাত ছিল না; অন্ততঃ এরূপ স্পষ্টভাবে কখনই নহে। উপনিষদকর্ত্তাদিগের দ্বারা ইহার প্রথম সৃষ্টি, এবং দর্শনকর্ত্তাগণের দ্বারা ইহা স্থাপিত। পরবর্ত্তী ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ, যথা পুরাণাদি,* সেই দার্শনিক তত্ত্বসমূহের রূপক লইয়া প্রায় অধিকাংশ গ্রথিত। এক্ষণে সমাজমধ্যে এই পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের আধিপত্যই সর্ব্বেসর্ব্বা, সুতরাং জ্ঞানী হইতে অজ্ঞানী সর্ব্বত্রই মায়াবাদ এবং অদৃষ্টবাদের ঢেউ না খেলিবে কেন? ইহাদের শিক্ষা কি ভয়ঙ্কর দেখ, একে মায়ার শিক্ষা—এ সংসারে সমস্তই অনিত্য এবং অকিঞ্চিৎকর; তাহার উপর আবার অদৃষ্টে শিক্ষা দিতেছে, যে কোন অমঙ্গলের বেগ ফিরাইতে যাওয়া বৃথা চেষ্টা, যাহা হইবার তাহা অবশ্যই হইবে। যে দিনে এরূপ তত্ত্বের ভারতে প্রথম উদ্ভাবন, সেই দিন হইতেই ভারত উৎসন্নমুখ। উহারই জন্য প্রধানতঃ ভারত উৎসন্ন গিয়াছে, এবং এখনও যাইতেছে। এখনও কি সময় হয় নাই, বিধাতঃ, এখনও কি কাহাকে পাঠাইবে না, যে এই বেগ ফিরাইয়া অধঃপাতিত ভারতকে পুনর্ব্বার উর্দ্ধমুখ করাইতে সমর্থ হয়?

অদৃষ্টবাদে আছে কি? আইস বাঞ্ছারাম, আমরা এই সুযোগে স্ব স্ব জ্ঞানযোগ মত একটু তাহা দেখিয়া লই। আমি একবার একজন ঘোর অদৃষ্টবাদীকে দেখিয়াছিলাম। আমি তাহার অদৃষ্ট পড়িয়া বলিলাম, তোমার অদৃষ্টে লেখা আছে যে আমি তোমাকে এই উচ্চতট হইতে গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিব, আইস তবে তোমাকে ফেলিয়া দিই; তাহাতে সে সম্মত হইল না। কেবল ইহা নহে, অপর বিষয়েও অদৃষ্ট পাঠে, অদৃষ্টবাদী আপন অদৃষ্ট দেখিতে পায় না; কেবল সে দেখিতে পায় যখন কোন মহৎ বা যে কোন কার্য্য সে করিতে পারে না বা করিবে না। অতএব অদৃষ্টবাদিদের যে কিছু গোল আছে, তাহা ইহাদ্বারা আপনিই প্রতিপন্ন হইতেছে।

* প্রাচীন তত্ত্ববিদ্দিগের নিকট মায়াবাদ ও অদৃষ্টবাদ এতদুভয়ের

অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। আধুনিক তত্ত্ববিদেরা এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ কিছু কিছু করিয়া থাকেন বটে এবং মায়াবাদকে আর বড় একটা আমলে আসিতে দেন না। কিন্তু সাধারণ লোকে সেই প্রাচীন মোহ ছাড়াইতে না পারিয়া, আজিও তাহারই ঘোরে ঘুরিয়া বেড়াইয়া থাকে। অতএব অগ্রে দেখা যাউক, মায়াবাদ কি? হিন্দুমতে মায়াকে অবিদ্যা বা মিথ্যাদৃষ্টি বলিয়া থাকে। কেবল সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষের যে অলীক সংযোগ ভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহা, তদ্ভিন্ন আর সমস্ত শাস্ত্রমতে রূপপরিবর্ত্তনশালিনী এই স্থূল প্রকৃতিই স্বয়ং মায়াস্থানীয়;—ফলে উভয়ের মতই এক, এই পরিদৃশ্যমান স্থূল সৃষ্টিই মায়া তরঙ্গ। প্লেটোর জনন ভাবকেও হিন্দুতত্ত্ববিদের যুক্ত অর্থ অনুসারে বলিতে হইলে, মায়া বলিয়া অভিহিত করিতে হয়। এক্ষণে, আমূলতঃ আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্লেটো এবং হিন্দুতত্ত্ববিদের মায়াবাদ, এই বিশ্বের জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয়, এই ত্রিবিধি গুণ দৃষ্টে সমুৎপন্ন হইয়াছে। জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয়, এই ত্রিবিধি গুণকে একত্র করিয়া, ইহার 'অনিত্য' এই আখ্যা ইহাঁরা প্রদান করিয়াছেন। যে কোন বস্তু অনিত্যভাবের অধীন, তাহাই মায়া। অতএব তাৎপর্য্যার্থ ধরিতে গেলে, বিশ্বের অনিত্য ভাবকেই ইহাঁরা মায়া শব্দে কহিয়া থাকেন। ইহাদের দৃষ্টিতে প্রতিবস্তুই এই হইতেছে, এখনই আবার অস্তিত্ব শূন্য হইয়া বিলীন হইয়া যাইতেছে; অথচ ইহারা বুঝিতেছেন যে আত্মা যাহা তাহা নিত্য পদার্থ। এখন নিত্য পদার্থের নিত্য পদার্থই প্রকৃত অবলম্বন হইতে পারে, অনিত্য পদার্থ কখনও তথায় শোভা পায় না; বিশেষতঃ যাহা ক্ষণে হইতেছে ক্ষণে যাইতেছে তাহার আর মূল্য কি থাকিতে পারে; অন্ততঃ নিত্য পদার্থের নিকট তাহার কিছুই মূল্য থাকিতে পারে না। এমন স্থলে, ইহারা কেন না শিক্ষা দিবেন যে, এই জন্মক্ষয়াদিবিশিষ্ট যাবতীয় স্থূল পদার্থকে অকার্য্যকর জ্ঞানে একবারেই উপেক্ষা করিয়া, এবং সমস্ত অনিত্য পদার্থ প্রয়াসী বৃত্তিসমূহকে বলি দিয়া, একমাত্র নিত্য পদার্থ ঐশ্বরিক সত্বাতেই সমাহিত হওয়া কর্ত্তব্য। আমরাও বলি, তাহা একান্ত কর্ত্তব্য,—যদি তাঁহাদের অনিত্য পদবাচ্য পদার্থ প্রকৃতই অনিত্য পদার্থ হয়। কিন্তু বিশেষ দৃষ্টি করিয়া দিলে দেখিতে

পাওয়া যাইবে যে, তাঁহাদের 'অনিত্য' ইতি আখ্যাত পদার্থ বস্তুত অনিত্য নহে। 'বস্তুত যে অনিত্য নহে' এইটুকুই পূর্ব্বতন তত্ত্ববিদেরা দেখিতে পায়েন নাই বলিয়া, তাঁহাদের এই অদ্ভুত ও সাংসারিক জীবন পক্ষে অকল্যাণকারী মায়া বাদের সৃষ্টি হইয়াছে।

অনিত্য তাহাকেই বলা যায়, যাহার পূর্ব্বতন তত্ত্ববিদ্দিগের নির্দ্দেশিত জন্ম বৃদ্ধি ও ক্ষয় ত আছেই, অধিকন্তু যাহা ক্ষয় হইলে একেবারে অস্তিত্বশূন্য হয় বা যাহার অস্তিত্বকালীন নিক্ষিপ্ত উত্তেজন অথবা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ উত্তর ফল পশ্চাতে কিছুই না থাকে; এবং পূর্ব্বে যাহা গত হইল ও তাহার উত্তরে যাহা আসিতেছে, যদি তাহাদের মধ্যে সসম্বন্ধ ভাব না থাকে; ও পূর্ব্বে গত বিষয়ের দ্বারা যদি উত্তরে আগত বিষয় বিশেষণবিশিষ্ট না হয়। কিন্তু আমরা দেখিতেছি ইহার কিছুই হয় না। তবে যে সাধারণতঃ মানব অন্যরূপ দেখিতে পায়, তাহা কেবল একমাত্র আত্মসম্বন্ধ-প্রভব বস্তু-দর্শনজনিত ভ্রম হইতে।

বাঞ্ছারাম, অগ্রে, তোমার সম্বন্ধে বহিঃ প্রকৃতির অস্তিত্ব অনস্তিত্ব ভাব তুমি পূর্ণ অহঙ্কার বোধের বশ্যতায় কিরূপ উপলব্ধি করিয়া থাক; এবং তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বলিয়াই কেবল সেই জন্য, বাহ্যজগত তোমার নিকট কিরূপ মূর্ত্তিতে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, অগ্রে একবার তাহার আলোচনা করিয়া দেখ। বায়ুভরে কুসুমগন্ধ আসিতেছে, আমি ঘ্রাণ পাইতেছি, অতএব উহারা অস্তি। ঐরূপ রূপ, ঐরূপ রস, ঐরূপ শব্দ, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আমার যদি ঘ্রাণেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয়, ইত্যাদি না থাকিত, তাহা হইলে উহাদের অস্তিত্ব কোথায় রহিত? আমার যদি অন্যোতর বোধশক্তি না থাকিত, তবে তোমার বৃক্ষ, পক্ষ, পশু, পর্ব্বত, সমুদ্র, শিলা, এ সকল কোথায় রহিত? আমি যাই আছি, তাই উহারা আছে। আমি না থাকিলে উহারাও থাকিত না। অহঙ্কারপূর্ণ ও আত্মসম্বন্ধ সূত্রে পদার্থদ্রষ্টা ভ্রান্ত তত্ত্বদর্শী মাত্রেই ঐরূপ ভাবিয়া থাকে, এবং উহারই কল্যাণে নানাবিধ মোহজাল বিস্তার করিয়া আপনা আপনি তাহাতে আবদ্ধ হয়। ভাল, এখন জিজ্ঞাস্য, উহারা যদি ছিল না বা উহারা যদি না থাকিত, তবে তুমি যখন নিঃসহায়,

নিরুপায়; শক্তি-সঞ্চালন-বিমূঢ়, অবিবেক, এইকর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়াছিলে, তখন তোমার অবলম্বন কি হইয়াছিল; এবং যখন যাইবে তখনই বা তোমার অবলম্বন কি হইবে? কার্য্যমাত্রের পক্ষে কারণ যেমন অচ্ছেদ্য বা অপরিহার্য্য, অস্তিত্ব বা উৎপত্তি বা কল্পাদির পক্ষে অবলম্বন পদার্থও সেইরূপ অপরিহার্য্য জানিবে। এই অবলম্বন পদার্থের মধ্যবর্ত্তিতা হেতুই, মানবের স্বাধীনত্ব ভাবের মধ্যেও পরাধীনতার সঞ্চার হইয়া থাকে। অতএব তুমি থাক বা না থাক, উহারা ছিল এবং থাকিবেও। ভাল, তুমিই কেন না ছিলে, বা থাকিবে না? তবে থাকিবে না কি? রূপবৈচিত্র-আত্মক তোমার প্রদত্ত সংজ্ঞা। এই সংজ্ঞাদায়ক শক্তিই, তুমি বাহ্যজগতের অংশ হইলেও, তোমাকে তাহা হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে; উহারই প্রভাবে তুমি সকল হইতে আপনাকে পৃথক বলিয়া ভবিতেছ, উহারই প্রভাবে তুমি বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর যাবতীয় বিষয়ে মানদণ্ড রূপে আপনাকে কল্পনা করিতেছ, এবং যেন সেই সকল প্রাগল্ভ কর্ম্মেরই প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ, সেই সংজ্ঞাদায়ক শক্তিবশেই আবার স্ববুদ্ধি-নিরূপিত সুখ দুঃখাভিঘাতে মুহ্যমান হইতেছ।

এখন একবার তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিয়া দেখ, বহিঃ-প্রকৃতি বা বাহ্যজগৎ বস্তুত কিরূপ দাঁড়াইয়া থাকে। এখন যদি সত্য সত্যই তোমাকে খুন না করিয়া, কেবল তোমার প্রদত্ত সংজ্ঞা এবং সেই সংজ্ঞা প্রদায়ক তোমার বোধানুভব মাত্র হরণ করিয়া, আর সমস্তই তোমার টায় টায় বজায় রাখিয়া, বাহ্যজগতাদির প্রতি অবলোকন ও ধারণা করিবার চেষ্টা করিতে দেওয়া যায়, তবে তাহাতে কিরূপ ফল দাঁড়াইবার সম্ভব? কি বলিব, বলিতে পারিতেছি না; জড়সংজ্ঞায় বলিবার 'বলনই' নাই যেখানে, সেখানে কি বলিব? সত্যকথা! তুমি কি করিয়া বলিবে, তোমার দোষ কি? তোমাকে কিরূপ হইয়া দেখিতে বলিতেছি তাহা অনুভব করিয়াছ?—বাহ্যজগৎ + (তুমি—সংজ্ঞা ও সংজ্ঞাদায়ক বোধানুভব)। পাটিগণিত পড়িয়াছ, তবে এ অঙ্ক না বুঝিবে কেন?

ভাল! তুমি বলিতে না পার, আমি দেখিতেছি। বাহ্যজগৎ

হইতে দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছি। আমি তুমি হইয়া দেখি, বা তুমি আমি হইয়া দেখ, এস্থানে তাহা একই কথা; কেবল এই মাত্র মনে রাখিও, কোথায় দাঁড়াইয়া এবং কিরূপ সম্বন্ধবিচ্ছিন্ন হইয়া দেখিতেছ। এখন দেখ, বাহ্যজগৎ হইতে সংজ্ঞা এবং তৎপ্রদায়ক বোধানুভব উঠাইয়া লইলে রহিল কি? নামশূন্য অপার রূপরাশিমাত্র। এবং যেমন দেখিয়া আসিলে, তুমিও, কেবল তোমার বোধানুভব বাদে, সেই অপার রূপরাশির অপৃথক অংশ। বৃক্ষ, লতা, পর্ব্বত, সমুদ্র, শিলা এবং তোমার তুমিত্ব বাদে তুমি, সেই মহান্ রূপরাশির অঙ্গবৈচিত্র বিশেষ। রূপরাশি বৈচিত্রময়ী, সচঞ্চল, পরিবর্ত্তনশীল। ঐ যে পর্ব্বতসানু, ঐ যে বনভূমির গর্ভ দেশ, উহাতে কত নূতন সৃষ্টির সূত্রপাত, কাহারও অঙ্কুর, কাহারও প্রাদুর্ভাব, কাহারও বিলয়, এবং তাহাতে আবার অপরের আবির্ভাবের সূত্রপাত কতই হইতেছে, তাহা তুমি যদিও দেখিতে পাইতেছ না, তথাপি তাহা হইতেছে। তিল তিল করিয়া হইতেছে, অদৃশ্য ভাবে হইতেছে; যখন দৃশ্য হইবে, তখন যদি দেখিবার জন্য কোন চক্ষু থাকে, সে দেখিতে পাইবে যে সে কার্য্য কি অদ্ভুত, কি অপূর্ব্ব। যদি যুগারম্ভে, এবং যুগের অন্তে, তোমারও দেখিবার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে তুমিও দেখিতে পাইতে যে রূপ-বৈচিত্রের কি দারুণ তরঙ্গ কাল-মূল হইতে কাল-অন্ত মুখে ছুটিয়া চলিয়াছে।

কাল এবং শক্তি সংমিলনে রূপের প্রচার। জলবাষ্পে সৌরকর সংযোগে মেঘহৃদয়ে ইন্দ্রধনুর সঞ্চার দেখিয়াছ, এরূপ রূপরাশির সঞ্চারও অবিকল তদ্রূপ না হউক, সেই রকমের বটে। ফলতঃ রূপ বস্তু-বিশেষের বাহ্য প্রচার মাত্র, স্বয়ং বস্তু নহে। অতএব রূপরাশিকে অতিক্রম করিয়া চল, যে বস্তুর উহা বাহ্য প্রচার তাহার অনুসন্ধান কর। কই, দেখিতে পাইলে?—কাল এবং শক্তির সংমিলন ভাব। সংমিলনও সম্পূর্ণ বস্তু নহে, সাহচর্য্যে উহা বস্তু। অতএব উহাও অতিক্রম করিয়া আইস, দেখ এখন কি আছে,—কাল এবং শক্তি! তাহাই। এখন বুঝিলে, যাহাকে তুমি বাহ্যজগৎ বলিয়া থাক, তাহা রূপ-প্রচার;

যাহাকে প্রকৃতি বলিয়া থাক তাহা শক্তি; যাহাকে আশ্রয় বলিয়া থাক, তাহা কাল; যাহাকে আধার বলিয়া থাক, তাহা দেশ; যাহাকে কর্ম্ম বা রূপ-বৈচিত্র সংঘটন বলিয়া থাক, তাহা কাল সংমিলনে শক্তির গতি মাত্র। এই কাল ও শক্তি সাংখ্যকারের হাতে পড়িয়া পুরুষ ও প্রধান; এবং তন্ত্রকারের হাতে পড়িয়া মহাকাল ও মহাকালীরূপে পরিণত হইয়াছে। সাংখ্যকারের নীরস পুরুষ ও প্রধান হইতে বঙ্গগৃহে কালীমূর্ত্তিটি বড় সুন্দর দেখি, ও দেখিতে বড় ভাল বাসি। আর্য্য-ঋষি অনেক দেখিয়া, অনেক ভাবিয়া, কোথাও স্থির ভাবে বসিতে স্থান না পাইয়া, বহুভ্রমবিব্রত হইয়া, অবশেষে এই কাল ও কালীকে অবলম্বন করিয়া কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অমল-রজতশ্বেত সহাস্য-আস্য স্থিরনিশ্চল প্রশান্ত মূর্ত্তি মহাকাল, পদতলে সর্ব্বাঙ্গীণভাবে নিপতিত। উপরে উপরতা, নৃত্য-সচঞ্চল, মেঘবরণা, বরাভয়-খর্পর-মুণ্ডহস্তা, এবং "শবানাং কর্ণসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চিং হসন্মুখীং, ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীং" রূপে মহাশক্তিরূপা শ্যামা বিরাজিত। ঊর্দ্ধকেশা, উন্মত্তা, উন্মাদিনী, বেগভরে আমূলজগৎ কম্পিত, —স্বর্গে সূর্য্য, পাতালে নাগরাজ! কিন্তু স্থিরবক্ষ সহাস্য-আস্য সেই মহাদেব কেমন স্থিরভাবে নিপতিত রহিয়াছেন। যেদিকে দেখ, সর্ব্বত্রই সেই মহাকালময় জগৎ সংসার; সর্ব্বত্রই বক্ষ সমানভাবে পাতিয়া রহিয়াছেন। সুতরাং, এ অঘোর নৃত্যে নর্ত্তকীর পদচ্যুতি জনিত সৃষ্টি-বিশৃঙ্খলের সম্ভাবনা নাই। তোমার সাংখ্যকারের পুরুষ ও প্রধানের ন্যায়, তন্ত্রকারের এই মহাকাল ও মহাকালী আত্মসর্ব্বস্ব নহেন। ইঁহারা উভয়েই আবার আপন ইষ্টবিশেষকে জপিয়া থাকেন। বলিতে পার, সে ইষ্ট কি?

বিস্তারবৈচিত্র অনন্ত বহুল হইলেও, ক্রমসংকোচে সংমিলিত হইয়া অন্তে যথায় বিন্দুমাত্রে পরিণত হইয়াছে, সেই বিন্দুই কি তবে ইহা-দিগের ইষ্ট দেবতা? সেণ্ট আগষ্টিনের ব্যক্তি—'যে বিন্দু বিশ্বচক্রের সর্ব্বত্রই মধ্য-বিন্দুরূপে বিরাজিত, তাহাই ঈশ্বর।' বলিতে পার আমাদের এ বিন্দু কোন বিন্দু? বলিতে না পার, ভাবিয়া দেখ; যতক্ষণ বুঝিতে

না পার, এ কথা কহিও না। এই বিন্দুরূপী মহান মূল হইতে যে কামনা প্রবাহ ছুটিয়াছে, কামনার সেই প্রবাহ-গুণই মহাশক্তি। এই মহাশক্তির আভাস ব্যাপ্তি, মহাকাল। মহাকালের বেষ্টি-সমষ্টি দেশ। মহাশক্তি এই তাহার আত্মাধারভূত মহাকালের সহ সংমিলনে, তদবলম্বনে বেগবতী হইয়া চলিয়াছে। তবে কি এই জন্যই, তান্ত্রিক ঋষি স্বকাম ব্রহ্ম-শক্তিরূপ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই ত্রিমূর্ত্তির প্রসূতিরূপে মহাশক্তিকে নির্দ্দেশ করিয়া, তাহাকেই আবার সেই মহেশ্বরের পরিণিতা-রূপে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন? কি গূঢ় গুহ্য, কি দুষ্কর তত্ব! আর্য্য ঋষি ভিন্ন এ গূঢ় গুহ্য উদ্ভেদ করিয়া তত্ব উদ্‌ঘাটন আর কাহার দ্বারা সম্ভব হইতে পারে? আর্য্য ঋষি! পিতৃ-দেবতা! তোমাকে শত শত নমস্কার।

কাল অনন্ত ব্যাপ্ত এবং নিশ্চল। তদবলম্বনে মহাশক্তি প্রবাহিত। অনন্তমূল হইতে সমুদ্ভূত হইয়া, অনন্ত পথে, অনন্ত বেগে, অনন্ত অন্তে ছুটিয়া যাইতেছে। আশ্রয়ভূতকাল অনন্তব্যাপ্ত, সুতরাং দুর্দ্দম-গতিতেও আধাররূপী কালচ্যুতির সম্ভাবনা নাই। এই অনন্ত গতিবশে প্রতি-মুহূর্ত্তে, অথচ পূর্ব্ব ও পর মুহূর্ত্ত সহ অবিচ্ছিন্ন ভাবে, কাল সহ শক্তির নিত্য নূতন সংমিলনে, নিরবচ্ছিন্ন নিত্য নূতন রূপ-বৈচিত্রের সঞ্চার। গতির বিরাম নাই, সুতরাং নিত্য নূতন রূপ-বৈচিত্রেরও বিরাম নাই। এ বিশ্বে যাহা কিছু দেখিতেছ, স্থূল নেত্রে যাহা কিছু নয়নগোচর হইতেছে, সকলেই সেই শক্তিস্রোতে নিরবচ্ছিন্ন ভাসিয়া যাইতেছে; ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সকলেই ভাসিয়া যাইতেছে; অথবা তাহাই বা বলি কি জন্য, শক্তি স্রোতে তাহারা ধারা প্রতিধারা ইত্যাদি মাত্র। ঐ যে বৈঠকের উপরে সুন্দর বাঁধা হুকাটি দেখিতেছ, ঢাকাই শিল্পকৌশলে একটি স্ফীতগণ্ড ব্যাঘ্র হাঁ করিয়া, ছাগ বা মনুষ্যশিশুর অভাবে, একটি কুসুমশিশুর মাথা ছিঁড়িতে উদ্যত, ভাবিতেছ যে উহাকে যেমন দিব্য হুকাটি বসাইয়া রাখিয়াছি, উহা তেমনই দিব্য হুকাটি রহিয়াছে। শক্তি স্রোতের ত কোন চিহ্নই দেখি না, রূপেরই বা রূপান্তর কই? কিন্তু নির্ব্বোধ! তুমি যতই বল, আমি তোমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, যে, তুমি যে সকল দেখিতে না পাইয়া উপহাস করিতেছ,

তুমি দেখিতে পাও বা না পাও, তথাপি জানিও, যাহা হইবার তাহা হইয়া যাইতেছে। তুমি যতক্ষণ ধরিয়া এই কয়টি কথা কহিলে, চক্ষু থাকিলে দেখিতে পাইতে যে, ইহারই মধ্যে ব্যাঘ্রবিক্রম সমেত তোমার বাঁধা হুকাটি শক্তিস্রোতে কতদূর ওতপ্রোত ভাসিয়া চলিয়া গিয়াছে। তথাপি প্রত্যয় না হয়, আর এক কার্য্য কর, তোমার ঐ বাঁধা হুকাটি যেমন ভাবে আছে, ঠিক তেমনই ভাবে পঞ্চাশ বৎসর ঘরে চাবি দিয়া ফেলিয়া রাখ, একবারও উঁকি দিয়া দেখিও না। পঞ্চাশ বৎসর পরে ঘর খুলিয়া হুকাটি যেমন অবস্থায় দেখিবে বলিও; তখন আবার তোমার সঙ্গে এ বিষয়ের বাক্যালাপ ও বাক্‌চাতুরী করা যাইবে।

ফলতঃ এই বিশ্বের প্রতি বারেক সযত্ন-অবলোকন করিয়া দেখ। পরমাণুটি হইতে বৃহত্তম জ্যোতিষ্কপিণ্ড পর্য্যন্ত বিশ্বস্থ যাবতীয় পদার্থই সচল, সকলেই নিরবচ্ছিন্ন গতিবশে অনন্তমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। শান্তি নাই, বিরাম নাই, সেই একই মুখে ছুটিয়া চলিয়াছে। ঐ যে লোক আসিতেছে, লোক যাইতেছে; কাপড় কিনিতেছ, কাপড় ছিঁড়িতেছ; ভাত হইতেছে, ভাত পচিতেছে; এ সকল কি? সেই সেই বস্তুর সেই অবিশ্রান্ত গতিক্রিয়া মাত্র। কালসমুদ্রজলে জলবুদ্বুদবৎ ক্ষণেক উঠিতেছে, ক্ষণেক ডুবিতেছে। এই জলবুদ্বুদবৎ যখন যাহা ভাসিয়া উঠিতেছে, তখনই তাহা আমরা ভাত, কাপড়, বা যে কোন সংজ্ঞাধারী বস্তুরূপে তাহাদিগকে অবলোকন, আবার যখন ডুবিতেছে, তখন তাহাদিগকে ধ্বংসরূপে দর্শন, করিয়া থাকি। অপার-ভ্রমণক্ষেত্র-বিহারী ভ্রাম্যমাণ ধূমকেতু সদৃশ, এই বিশ্বরঙ্গভূমে বারেক মাত্র তাহারা নয়নসমক্ষে সমুদিত হইয়া, অবিলম্বেই আবার স্বীয় গতিবশে নয়ন-অতীত-পথে বিলীন হইয়া যাইতেছে; আবার কখনও নয়নসমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইবে কি না, কে বলিতে পারে!

বৈচিত্র হইতে বৈচিত্রান্তর প্রবর্ত্তনে, পূর্ব্ববৈচিত্র যে ভিত্তিভাবে পর-বৈচিত্রের মধ্যে অপলোপ হয়, তাহাকেই আমরা ধ্বংস বলিয়া থাকি। তবে ধ্বংস কি বস্তুত ধ্বংস? বাঞ্ছারাম, কখন কোন বস্তু ধ্বংস হইবার সময় জ্ঞান চক্ষে কি তাহার প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিয়াছ?

যদি না দেখিয়া থাক, তবে একবার ভাল করিয়া দেখা উচিত। দেখিতে পাইবে, কোন বস্তু পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে, যেখানে যতদূর হইতে ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত, তাহার অবনতি প্রাপ্তির সূত্রপাত আরম্ভ হইয়াছে; ঠিক সেই খানে, ততদূর হইতে তাহার গাত্র উদ্ভূত ও গাত্র-সংলগ্ন ভাবে, আর এক বস্তুর সমুদ্ভবের সূত্রপাত হইয়া চলিয়াছে। পূর্ব্ব বস্তু ক্রমেই উত্তরোত্তর যেমন সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইয়া আসিতে থাকে, উত্তর-বস্তুও তেমনি ক্রমে ক্রমে উত্তরোত্তর পুষ্টতা প্রাপ্ত হইয়া, পূর্ব্ব বস্তুর ক্রম-সঙ্কীর্ণতাজনিত পরিত্যক্ত স্থানাধিকার করিয়া শ্রী। মধ্যাহ্ন যৌবন মুখে চলিয়া আইসে। উত্তরবস্তু ক্রমে ক্রমে, তিল তিল করিয়া, যতদূর আসিয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল, পূর্ব্ববস্তুও ঠিক ততদূরে ক্রমে ক্রমে তিল তিল করিয়া আসিয়া, উত্তরবস্তুতে সমাবিষ্ট হইয়া লোকনয়নে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। যেখানে পূর্ব্ববস্তুর এই অপলোপ, এবং উত্তরবস্তুর পূর্ণতা দৃষ্টি করিলাম, ঠিক তাহার অব্যবহিত পরেই বা সেইখান হইতেই, সেই পূর্ণতা প্রাপ্ত উত্তরবস্তুর কোল হইতে, আবার এক নূতন উত্তরবস্তুর সঞ্চার,—উত্তরবস্তু, আবার সেখান হইতে পূর্ব্ববস্তুর ভাব প্রাপ্ত হইতে চলিল। এই বিশ্ব সংসারের এই গতি। যে দিকে দেখিবে, ইহাই প্রতিমুহূর্ত্ত অভিনয় হইয়া আসিতেছে। অতএব এখন জিজ্ঞাসা করি, ধ্বংস কি বস্তুত ধ্বংস? রূপবৈচিত্র হইতে রূপবৈচিত্রান্তর গ্রহণ বা পূর্ব্ববস্তু উত্তরবস্তুর ভিত্তি হওনকে যদি ধ্বংস বল, তবে তাহাই। নতুবা বস্তুত ধ্বংস কোথায়? পদার্থ মাত্রের, প্রাণিমাত্রের, ইহাই ক্ষয় অবস্থা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

মহাকালপথে গমমান্ মহাশক্তিবশে আবর্ত্তনশীল পদার্থনিকর নিরন্তর স্থানান্তর, কালান্তর ও অবস্থান্তর প্রাপ্তে, তাহাদের নিত্য নবগুণবিকার-সমুৎপাদনে, নিত্য নবরূপ-বৈচিত্রের সম্ভব সংঘটিত হয়। গুণবিকারই লোকনয়নে ধ্বংস বা অসৎ; এবং রূপ, অস্তিত্ব বা সৎ। উপরে রূপবৈচিত্র সঞ্চারের যে আধ্যাত্মিক কারণ বলিয়াছি, এরূপেই তাহার আধিভৌতিক প্রচার। এই 'রূপ' এবং 'বিকার' ভাব, ইহারাই আধিভৌতিক জগতে বিষয়ভেদে ও বস্তুভেদে, শুভাশুভ, আলোক অন্ধকার, দিবা রাত্রি, বসন্ত

শিশির, উন্নতি অবনতি ইত্যাদি। বাঞ্ছারাম, তুমি যে মনোহর বাসন্ত-প্রদোষের ন্যায় সেই প্রদোষকাল দেখিয়া সুখানুভব করিতে করিতে আবার পরক্ষণেই তদ্বিপরীতে মেঘ বিদ্যুৎ বজ্র ঘটা ঝড় জল দেখিয়া ভয়ে অভিভূত হইয়া কাঁপিতেছিলে, তাহা কি? তোমার সেই সুখময় প্রদোষ, ও তাহার পরক্ষণেই তন্নাশক ঝড় জল, এই সর্ব্বজনীন অসৎ ও সতের প্রকারান্তর অভিনয় মাত্র। বস্তুভেদে, বিষয়ভেদে, ভিন্নরূপ দেখাইতেছিল, তাহাতেই চিনিতে পার নাই। যদি অজ্ঞানতা বশত চিনিতে না পারিয়া থাক; ভাল, এখন একবার দেখ দেখি চিনিতে পার কি না। কিন্তু আর এক তামাসা দেখিয়াছ এবং উপরেও তাহা আভাষিত করিয়াছ যে, যে অসৎকে, যে অশুভ বা যে অবনতিকে, আমরা সাধারণত অসৎ বলিয়া বিবেচনা করিতেছি; এবং যাহা স্মরণ করিয়া তজ্জন্য অনুতাপ-বশতঃ মুগ্ধ হইয়া থাকি, কখন কখন কতই বিলাপ-ব্যাকুলিত হই, তাহা পরিণামে সত্য সত্যই তদ্রূপ বিলাপ বা অনুতাপের বিষয় নহে। যেহেতু মহাশক্তি অগ্রগামী হইয়াই চলিতেছে, পশ্চাৎ হটিতেছে না, সুতরাং পূর্ব্ব অবস্থা হইতে উত্তর অবস্থার মধ্যে 'অন্তরতা' ভাবের অস্তিত্ব হেতু, এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে গমনে, সেই গমন দূর অর্থাৎ অগ্রস্থিত বা উচ্চ অবস্থার গতিমাত্র। যে অবস্থার যখন যাহাকে আমরা হ্রাস বলিয়া গণনা করিতেছি, সে অবস্থার তখন তাহা কার্য্যত উচ্চপথে গতিক্রিয়া মাত্র। মৃত্যু ও জন্মের যুগপৎ একত্র সমাবেশ।

এখানে যখন সদসদের কথা উঠিয়াছে, তখন আর একটী কথা বলা কর্ত্তব্য। আধিভৌতিক জগতের সদসৎ দেখিয়া ভাবিও না যে, আধ্যাত্মিক জগতের বা আত্মিক সদসদও তদ্রূপ। ভূত পদার্থ দেশ কালাদির অধীন, আত্মপদার্থ তাহার অতীত। অথবা ভূত পদার্থের মূল-উৎপাদক ও পরিচালক যে প্রাকৃতিক শক্তি, আত্মপদার্থ বা স্বেচ্ছাশক্তি তাহার সঙ্গে সম শ্রেণীর, সুতরাং ভূত পদার্থের বহু অতীতে। আত্মপদার্থও শক্তি। এখন দেখ শক্তির সদসৎভাব কি হইতে পারে? শক্তির যখন একমাত্র পরিচয় ও কার্য্য গতিশীলতা, তখন তাহারই ব্যতিক্রম বা

তদন্যতরে, অসৎ বা সত্তের সম্বন্ধ হইতে পারে। অতএব, শক্তির যথা-পথে গমনে সৎ, অযথা পথে গমনে অসৎ সঞ্চার হয়। শক্তির গতিশীল-তার ফল কার্য্য। সুতরাং তাহার যথাপথ বা সুপথ গমনে সুকার্য্য হয়, আর অপথ গমনে অকার্য্য এবং অকার্য্য হেতু সুকার্য্যের ব্যাঘাত হয়। এই অকার্য্য এবং অকার্য্যজন্য সুকার্য্যের ব্যাঘাতে আত্মিক অসত্তের সঞ্চার হেতু, মানবে পাপের সঞ্চার হইয়া থাকে, এবং ইহারই নিমিত্ত মানব "স্বর্গ নরকের" ভাগী হয়। যেমন মহাজ্ঞান হইতে মহাশক্তি চালিত হইয়াছে, তেমনি মানবীয় জ্ঞান হইতে স্বেচ্ছাশক্তি চালিত হইয়া থাকে। এই কারণে, মানব সেই শক্তির সুপথ বা বিপথ গমনের নিমিত্ত দায়ী হইবায়, পুণ্যবান বা পাপী হইয়া থাকে। প্রাকৃতিক শক্তি যাহা তাহা মহাজ্ঞান হইতে চালিত হওয়ায়, বস্তুত অসৎভাবপরিশূন্য। তবে যে আমরা তাহাতে অসৎ দেখিয়া থাকি, তাহা কেবল ভৌতিক পদার্থের রূপ হইতে রূপান্তর পরিগ্রহণের মধ্যবর্ত্তী অবস্থা অর্থাৎ পূর্ব্বাবস্থার ক্ষয়ে ও পর অবস্থার আরম্ভে বিকার ভাব। অতএব বলা বাহুল্য যে ইহা ভাক্ত অসৎ, কেবল বহ্বায়তন ও ক্রিয়া দুর্দ্ধর্ষতা হেতু যথার্থ অসৎ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। এই অসতেরই উন্মাদে সাধারণতঃ জ্ঞানিবর্গ হাতাকাতা ছাড়িয়া নানা উন্মাদে উন্মাদিত হইয়া আসিতেছেন। একটা কাঁকুড়ে তিন লক্ষ বিচী হইয়াছে, দুইটার মাত্র চারা হইল, কিন্তু আর সকলই ধ্বংস হইয়া গেল; এরূপ কেহ বাঁচে কেহ মরে, কেহ পাকে কেহ ফুলে, এ তরবতর সদসৎ লীলা খেলার কারণ?—ভাবিয়াই আকুল! বাপু, প্রকৃতির ঘরে একটা নূতন পুতুল তৈয়ার হইবে, তাহার মসলার নিমিত্ত দুই কম তিন লক্ষ কাঁকুড়ের বিচী হইতে প্রস্তুত মৃত্তিকার আবশ্যক;—আবশ্যক কিছু অদ্ভুত বা অসম্ভব নহে, তোমরাও কলম বাঁধিতে ত নানা রকমের মৃত্তিকার দরকার হইয়া থাকে। আমার বাগান, আমার শ্রম, তিন লক্ষ বিচী তৈয়ার করিতেছি, দুইটি বীজ জন্য রাখিতেছি, বাকি মাটি করিয়া লইতেছি, তাহাতে তোমার মাথাব্যথা এত কেন? শয়তান, শনি, মারাখ ধন্দ অথবা জরথুস্ত্রের অঙ্গ মইন্যু বা বিল সাহেবের অসৎ-তত্ত্ব ইহাদেরই মধ্যবর্ত্তিতার আবশ্যকতা ধরিয়া থাক কি

জন্য? এখন জিজ্ঞাসা করি, এখন একবার তোমার নিজের কাজ দেখিলে ভাল হয় না, পরের খোঁজে (যখন উন্মাদ বই হওনা) উন্মাদ না হইয়া নিজের সদসদের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেইত ভাল হয়। বলা বাহুল্য যে মানবীয় শক্তিচালনেও ভাক্ত অসতের সম্ভব অপরিহার্য্য, তবে কিনা সঙ্কীর্ণতা ও বহুলাংশে আয়ত্তাধীনতা হেতু সচরাচর তাহারা গণনায় আঁইসে না। যাহাহউক, আমরাও লোকাচার অনুসরণে প্রাকৃতিক ভাক্ত অসৎকে অসৎ বলিয়াই সংজ্ঞাযুক্ত করিয়া যাইব; বোধ করি তজ্জন্য প্রবন্ধোত্তরদেশে সদসদ্ বোধের জ্ঞান লইয়া কিছু জড়তা ঘটিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা। বাঞ্ছারাম, সে জড়তা হইতে মূল পদার্থ উদ্ধার করিয়া লইতে পারিবে না কি? অতঃপর—

তবে কি এ জগতের, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের, মানবীয়শক্ত্যতীত তাবত বিষয়ে শুভই সর্বস্ব; অশুভ কোথা তাহা স্বপ্ন? শুভ হইতে শুভান্তর-উচ্চে নীত হওয়ার গতিক্রিয়ার নাম যদি অশুভ হয়, তবে অশুভ শব্দ সম্বন্ধে আমাদিগের যে ভয়ভাব আছে, তাহা কি অলীক এবং অকারণ! তাহা এখন স্বপ্ন বলিয়াই বোধ হইতেছে। এই যে অশুভ দেখিতেছি, ইহা এখন প্রার্থনীয় বলিয়া বোধ হইতেছে। এখন দেখিতেছি যে এ অশুভের অস্তিত্ব না থাকিলে হয়ত দুঃখে মরিয়া যাইতাম। নির্ব্বোধ! সত্য সত্যই তাই কি! মঙ্গলময় মহা-উৎস হইতে যাহার উৎপত্তি, সে মহাশক্তি যেরূপেই গতিশীলা হউক না কেন, তাহা কি অমঙ্গলময় হইতে পারে, না তাহা হইতে অমঙ্গলময় ফল ফলিতে পারে? মঙ্গলময় মনীষা হইতে অমঙ্গলময় কামনার সম্ভব কোথায়? তুমি ইচ্ছা করিলে, আত্মবুদ্ধিগুণে আপনাপনি কখন কখন মানুষ ঘুচিয়া বানর সাজিতে পার, কিন্তু নিয়ন্তার নিয়ম পথ অবলম্বন করিলে কখনই তাহা পারিবে না। সে নিয়ম ধরিয়া চলিলে তোমার উচ্চ হইতে উচ্চতর লোকত্বে যাওয়া ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

রূপ এবং বিকার, এতদুভয়ের মধ্যে রূপ-ভাব কি নিকট কি দূর সম্বন্ধে অনাগত অনন্ত কার্য্য সমষ্টির জনক, সুতরাং ইহার সত্তা অনন্ত; বিকার তাহা নহে, যে রূপ প্রবর্ত্তিত করিতে উপস্থিত, তাহা করিয়াই

অন্ত, সুতরাং ইহার সত্তা অন্ত। মানবীয় সম্পর্কে ইহার একটী দৃষ্টান্ত দেখ,—রূপ নিত্যই উদ্ভব কার্য বাঁধিব কারণ শরীর নির্ম্মাণার্থে উপকরণ যোগাইয়া যাইতেছে, বিকার তাহা করে না। যাহা হউক, এই নিরন্তর অনন্ত অন্ত সংঘটন, পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডক্রিয়া। যে অবস্থায় নিনিবেশিত, তাহার স্বভাব সহ সমতার অনুরোধে, অন্তর সহ সমাবেশ হেতুই অনন্ত পর পর পরিদৃশ্যমান সৃষ্টিরূপে প্রকাশমান হইয়া আসিতেছেন নতুবা হইতে পারিতেন না। তুমি সেই রূপকেই আদি এবং অন্ত বা সর্ব্বস্ব ভাবিয়া, অথচ ইহাকে উৎপত্তিক্ষয়াদির অধীন দেখিয়া, রূপময়ী সমস্ত জগতকেই অনিত্য মায়াজ্ঞানে উন্মাদবৎ উপেক্ষা করিয়া আত্মধ্বংস করিতেছ। ধ্বংসক্ষয়াদির অধীন হইলেও যে বস্তু ভূতবিষয়কে পদস্থাপন করিয়া উদ্ভব, এবং যাহা ভবিষ্যতের উৎপাদক ও উত্তেজক স্বকীয় হয়, তাহাকে কখন অনিত্য বা ক্ষণিক বলা যাইতে পারে না। অতএব দেখ কি অন্যায়। তোমার মায়াবাদ কি ভ্রান্তিমূলক,—দেখ এখন এ জগতে মায়া বলিয়া কোন পদার্থের বস্তুত কোন অস্তিত্ব আছে কি না!

অদৃষ্টবাদও তদ্রূপ। লোকে যেমন উৎপত্তিক্ষয়াদি গুণের প্রভাব দেখিয়া,ভ্রমান্ধভাবে বস্তুর অনিত্য ভাব কল্পনায় মায়াবাদে মুগ্ধ হইয়াছে; সেইরূপ প্রাকৃতিক ক্রিয়াশক্তির প্রভাব দৃষ্টে দৃষ্টি চঞ্চলতায় স্বেচ্ছাশক্তির অভাব কল্পনা করিয়া অদৃষ্টবাদে মুহ্যমান হইতেছে। অদৃষ্টশক্তি অর্থে, যে শক্তি আমাদের ইচ্ছাশক্তির অতীত হইয়া কার্য্য করে; কিন্তু অদৃষ্টবাদীদিগের ধারণায় তাহা অন্যতর অর্থাৎ জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মানব শারীরিক, বাচিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ কর্ম্মদ্বার দিয়া যাহা কিছু করিবে, তাহা সমস্তই অগ্রে যথায় স্থিরীকৃত হইয়া রহিয়াছে, তাহাকেই ইহারা অদৃষ্ট বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকে। সুতরাং ইহারা স্বেচ্ছাশক্তির অস্তিত্ব, তাহার চালনা ও তজ্জনিত ফলাফল, বড় একটা বুঝে না; জড়পদার্থের কণে ঘুরিয়া বেড়ানর ন্যায়, মানবকে অদৃষ্টহস্তে ক্রিড়াপুত্তলের স্বরূপ বিবেচনা করিয়া, অকর্ম্মশীলতায় রত হয়। 'যাহা অদৃষ্টে আছে তাহাই হইবে' এ বড় সর্ব্বনাশকর বিশ্বাস! কেননা মানব ইহার প্রভাবে

অকর্ম্মা হইয়া অধঃপাতের পথে অগ্রসর হইবে। বাস্তবিক, অদৃষ্টকে আমরাও পঙ্কজ অদৃষ্টবাদীর অদৃষ্টের ন্যায় পূজা করিতাম, যদি দেখিতে পাইতাম যে মানবীয় স্বেচ্ছাশক্তি সর্ব্বসময়েই প্রাকৃতিক শক্তি হইতে পিছু হটন বা তদগ্রগমনে অসমর্থ; এবং সর্ব্বদাই যথা চালিতরূপে প্রাকৃতিক শক্তির অনুসরণ করিয়া থাকে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, তাহা নহে।

এ বিশ্বে আমরা শক্তির কেবল এই দ্বিবিধ মাত্র বিভাগ দেখিতে পাই, এক প্রাকৃতিক শক্তি, অপর স্বেচ্ছাশক্তি; ইহা ব্যতীত আর তৃতীয় শক্তি বিভাগ নাই। সুতরাং তুমি যাহাকে অদৃষ্টশক্তি বলিয়া থাক, তাহা হয় এই প্রাকৃতিক শক্তিকে বুঝাইবা থাকে নতুবা তাহা কিছুই বুঝায় না। এক্ষণে প্রাকৃতিক শক্তি ও স্বেচ্ছাশক্তির সম্বন্ধ বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। পূর্ব্বে অনেক স্থলে বলিয়াছি, প্রাকৃতিক শক্তি আগে, স্বেচ্ছাশক্তি তাহার পরে; এবং স্বেচ্ছাশক্তি প্রাকৃতিক শক্তির অঙ্কশয়নশায়ী। এই অঙ্কশয়নশায়ী ভাব দৃষ্টে ও এতৎ হেতু তদুভয় শক্তির পৃথকত্ব উপলব্ধি করণে অসমর্থতা জন্য মানব দুর্দ্ধর্ষ অদৃষ্টবাদের কল্পনা করিয়া তুলিয়াছে। সে যাহাহউক স্বেচ্ছাশক্তি প্রাকৃতিক শক্তির অঙ্কশয়নশায়ী ও তদুৎপন্ন কার্য্য প্রাকৃতিক শক্তির অনুকূলে হওয়া বাঞ্ছনীয় হইলেই যে প্রাকৃতিক শক্তি সহ তাহা সম্পূর্ণভাবে এক বা তাহাতেই লীন হইয়া যাইবে, এমন কোন কথা নহে। স্বেচ্ছাশক্তি প্রাকৃতিক শক্তির অনুকূলে সর্ব্বদা কার্য্য করিবে বটে, কিন্তু কার্য্যকালে স্বাধীন। ইহার এই স্বাধীনপরাধীন ভাবই মঙ্গলকর, তদতিরিক্ত একেবারে স্বাধীন বা একেবারে পরাধীন ভাব উভয়ই অমঙ্গলের কারণ হইয়া থাকে।

আমরা দেখিতেছি মানবচিত্ত বহির্জগত হইতে ভাবান্তর প্রাপ্ত হইতেছে, বহির্জগতই কার্য্যের উপকরণ রাশি যোগাইতেছে, এবং যখন উপকরণ রাশি যোগায় তখন ইহাও একরূপ আভাস দিয়া দিতেছে যে কিরূপ কার্য্য করিতে হইবে; কিন্তু করিবে কে? এই পর্য্যন্ত অদৃষ্ট হস্ত বলবান দেখিয়া আসিলাম, কিন্তু তাহার পর? তুমি বলিবে করিবার জন্য যে ইচ্ছা তাহারও প্রবর্ত্তক কথিত ভাবান্তর; করণ যাহা, তাহা

কর্ম্মেন্দ্রিয় দিয়া সেই ইচ্ছারই বিকাশ মাত্র; এবং সকলেই যে এক ইচ্ছায় সমভাবে উদ্দীপিত হয় না, তাহার কারণ প্রত্যেক চিত্ত পৃথক পরিমাণের গুণ ও উপকরণাদিতে গঠিত; সুতরাং প্রাকৃতিক ভাব-আভাস সকলের সমভাবে গ্রহণের পক্ষে তারতম্য ঘটনা হইয়া থাকে। তাহাই হউক। ফলত ইহাই অদৃষ্টবাদীদিগের নিজ মতের বিরুদ্ধবাদীর বিপক্ষে আপত্তি ও মীমাংসার চরম সীমা, ইহার অতীতে আর যাইবার সাধ্য নাই।'

কাষ্ঠে, ঘটনাচক্রের গতিবশে, প্রস্তর সংঘর্ষে অগ্নির উৎপত্তি হইল; এখানে অগ্নির প্রকৃত উৎপাদক কে? আমরা জানি প্রস্তর সংঘর্ষ নহে বা তাহার প্রবর্ত্তক ঘটনাচক্রও নহে; অনাদিকারণ সংজাত কাষ্ঠের আত্মভূ গুণ হইতে, অপরিজ্ঞেয় ভাবে সূর্য্যসত্বা সমবায়ে, স্বনিহিত তেজঃসমষ্টি যাহা তাহাই অগ্নি। উহাদের কেহই তাহার উৎপাদক নহে এবং উৎপাদন যাহা তাহা সুতরাং আদিমূলে নিহিত। ঘটনাচক্র এবং তদুৎপন্ন প্রস্তর সংঘর্ষণ কেবল নিমিত্তস্থলীয়, অগ্নি তাহাদের দ্বারা উদ্দীপিত এবং প্রকাশমান হইলেন এই মাত্র; আদত উৎপাদন যাহা তাহা সে সকলের অতীত ভাবে অনন্তগুণ দূরে অবস্থান করিয়া থাকে। এখন দেখ বাঞ্ছারাম, অনাদিকারণসংজাত মানবের আত্মভূ গুণ হইতে, ঐশ্বরিক সত্বা সমবায়ে, স্বনিহিত ইচ্ছাশক্তি যাহা; উদ্দীপক ও প্রকাশক জাগতিক ভাবকে তাহার উৎপাদক বলা যায় কি না? উদ্দীপনে এবং প্রকাশনে ভাবান্তরকারী জাগতিক ভাব কেবল নিমিত্ত মাত্র হইয়া থাকে, নতুবা স্বেচ্ছা পদার্থের আদিমূল যাহা তাহা সে সকল হইতে অনন্ত গুণ দূরে। তুমি বলিবে, যেন উপমায় বুঝিলাম যে স্বেচ্ছাশক্তি যাহা তাহা জাগতিক ভাবের ন্যায় সমানতর আদি পদার্থ ও তাহা আছে; কিন্তু তাহার পরিচয় কি, যাহাতে সত্যাসত্য উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই? উপলব্ধি গুণ পরিচয়ের দ্বারা ভিন্ন দার্ঢ্যতা প্রাপ্ত হয় না।

ইচ্ছা উদ্দীপিত হইবা মাত্র এবং তাহার পোষক উপকরণরাশি সম্মুখে পাইলেই যে কলচালিতের ন্যায় তাহাতে কার্য্যপ্রবৃত্ত না হইয়া, অগ্রে তদ্বিষয়িণী হিতাহিতের বিষয় বিবেচনা করিয়া থাকে; সেই হিতাহিত বিবেচনা ও তাহার জন্য যে কালব্যাজ, তাহাই স্বেচ্ছাশক্তির পরিচায়ক

স্বরূপ হয়। ইচ্ছা সমগ্র পরোৎপন্ন বা পরাধীন হইলে, সেরূপ হইতে পারিত না। জাগতিক ভাবে উদ্দীপিত হওন ও তজ্জনিত যে কার্য্যে প্রবৃত্তি, তাহাই স্বেচ্ছাশক্তির পরাধীন ভাব; তাহার পরে যে সেই কার্য্যের হিতাহিত বিবেচনা ও তদনুরূপ কার্য্যে প্রবর্ত্তনা বা অপ্রবর্ত্তনা, তাহাই ইহার স্বাধীন ভাব। এই উভয় ভাব সংযুক্ততা হেতুই, স্বেচ্ছাশক্তিকে স্বাধীন-পরাধীন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। হিতাহিত বোধের চালনা না করাকে স্বেচ্ছাশক্তির শুদ্ধ পরাধীন ভাব, এবং অতি-চালনাকে তাহার শুদ্ধ স্বাধীন ভাব বলা গিয়া থাকে।

যেমন কোন একটী জাগতিক ভাব বিশেষের প্রবর্ত্তনায় ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাশক্তি কার্য্যপ্রবৃত্ত হইয়া থাকে, জাতিগত স্বেচ্ছাশক্তি সম্বন্ধেও অবিকল তদ্রূপ। প্রাকৃতিক শক্তি তাহার অনন্ত প্রবাহ আবর্ত্তনে, দিগন্ত প্রসারিত এক এক এবং পর পর এমন ভিন্ন-গুণ তরঙ্গ আবর্ত্ত উপস্থিত করিয়া চলিয়া যাইতেছে যে, তাহার ভাবে ভাবান্তর প্রাপ্ত হইয়া জাতীয় প্রকৃতি কখন ম্রিয়মাণ, কখন উন্মাদিত, কখন বলদীপ্ত, কখন স্বদেশপ্রিয়, কখন কার্য্যবিশেষহীন, ইত্যাদি ইত্যাদি নানা ভাব ধারণ করিয়া; বিশ্ব-রঙ্গগৃহে কাল সমক্ষে নানা অভিনয়ে, কখন হাঁসাইয়া কখন কাঁদাইয়া, স্বীয় জীবনের সার্থকতা বা অসার্থকতা সম্পাদন করিতেছে। কতই না অভিনয় বৈচিত্র! নানা আবর্ত্তের আবর্ত্তন পর্য্যায়ে যখন অবার ধ্বংসাবর্ত্তের উপস্থিত হইতেছে তখনও, কতজন যেমন ধ্বংস বশীভূত হইয়া পৃষ্ঠভাসান দিতেছে, তেমনি আবার কতই না জন স্বচ্ছন্দে আত্মিক বা স্বেচ্ছাশক্তির পরিচালনে অটল রহিয়া তাহাতে উপেক্ষা করিতে সমর্থ হইতেছে! জগতের যেমন অপার বৈচিত্র, স্বেচ্ছাশক্তিরও তেমনি কি অপূর্ব্ব মহিমা;— কে না বলবে যে ইহাও দ্বিতীয় সৃষ্টিক্ষম শক্তি।

যেমন আধ্যাত্মিক সংসারে, প্রাকৃতিক শক্তির তরঙ্গাবর্ত্ত মানবীয় আধ্যাত্মিক ভাগকে অবলম্বন করিয়া সুতরাং স্বেচ্ছাশক্তিরও পরিচালন দ্বার দিয়া, শুভাশুভ প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ের যখন যেমন তখন তেমন আবির্ভাব ও তাহাদের প্রবর্ত্তনা করিয়া থাকে; আধিভৌতিক সংসারেও তদ্রূপ কার্য্য করে। এখানে মানুষের

ভৌতিক ভাগকে অবলম্বন করিয়া, এবং তাহাতে স্বেচ্ছাশক্তি পরিচালনার অপেক্ষা রাখিয়া বা না রাখিয়া, ভৌতিক শুভাশুভ প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ের আবির্ভাব ও তাহাদের প্রবর্তনা করিয়া থাকে। ইহাতে প্রাকৃতিক শক্তির অধিকারও আছে, যেহেতু মানবের আধিভৌতিক ভাগ অপরাপর আধিভৌতিক সৃষ্টির সঙ্গে সমশ্রেণীর। ইহারই প্রভাবে নৈসর্গিক নিয়ম অনুসারে দেশমধ্যে অতিবৃষ্টি, ম্যালেরিয়ার ন্যায় সর্ব্বজনীন রোগাদি, দুর্ভিক্ষ অথবা সুবৃষ্টি, সুভিক্ষ, সাধারণ স্বাস্থ্য. ইত্যাদি ইত্যাদি অগণনীয় বহুতর ভৌতিক শুভাশুভের উপস্থিতি হয় এবং মানব ইচ্ছার অতীতে এবং পাশবদ্ধবৎ তাহার ফলভাগী হইয়া থাকে। যেমন সাধারণ জাতীয় জীবনে, পরিমাণ ছোট করিয়া লইলে আবার ব্যক্তিগত জীবনেও অবিকল তদ্রূপ কথা প্রযুক্ত হয়। এই প্রাকৃতিক শক্তিকেই প্রকৃত পক্ষে অদৃষ্টক্রীড়া বলা যায়, এবং যাহা কিছু মানব অন্ধভাবে অদৃষ্টের দাস তাহা এই খানে। প্রাকৃতিক শক্তি এখানে মানবের আধিভৌতিক ভাগকে অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিয়া থাকে বলিয়া, উহার উপর মানবের স্বেচ্ছাশক্তির চালনা করিবার সম্বন্ধ অতি অল্পই ; এজন্য মানব সে সকল বিষয়ে জবাবদিহিশূন্য, এবং জবাবদিহিশূন্য বলিয়াই ঐ ঐ বিষয়ে সে সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক শক্তির ক্রীড়নক স্থলীয় হয়। কিন্তু মানবের তাহাতে নিজ প্রকৃতি বা আত্মিক পক্ষে আসে যায় কি ? সে যাহা হউক, বাঞ্ছারাম, ইহাই অদৃষ্ট, তদ্ভিন্ন আর দ্বিতীয় অদৃষ্ট নাই। এ অদৃষ্ট হইতে স্বেচ্ছাশক্তির পৃথক অস্তিত্ব ; এবং স্বেচ্ছাশক্তির অধিকার যতদূর লইয়া, ততদূরে কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য জ্ঞান, হিতাহিত বোধ, প্রবৃত্তি অপ্রবৃত্তি ভাব, ইত্যাদির ভাব অভাবে পাপ পুণ্যের সঞ্চার এবং জবাবদিহির উপস্থিতি হয়। অতএব স্বেচ্ছাশক্তিতে এখন প্রবুদ্ধ হও, আর বৃথা অদৃষ্টবাদ লইয়া আত্মধ্বংসে জগত ধ্বংসনে রত হইও না। ইহাই দিব্য যুক্তি এবং ইহাতেই দিব্য মুক্তি।

৩। তত্ত্ববিদ্যায় নাস্তিকতা

সূর্য্যে ছায়া আছে, আলোকে অন্ধকার আছে, তাপে শৈত্য আছে, ধর্ম্মে অধর্ম্ম আছে, সত্যে মিথ্যা আছে, হাঁতে না আছে, সুতরাং আস্তিকতায় নাস্তিকতা না থাকিবে কেন? থাকাই অবশ্যম্ভাবী; না থাকা অসম্ভব, আশ্চর্য্যের বিষয় ও অস্বাভাবিক। এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বমণ্ডলে, কি আধ্যাত্মিক, কি আধিভৌতিক, উভয় জগতেই, চিৎ এবং অচিৎ বা সৎ এবং অসৎ, এই দ্বিবিধ গুণের নিরন্তর বিদ্যমানতা। অসৎ সতের বিরোধী এবং নিত্য বৈপরীত্যসাধনকারী; যেখানে ঈশ্বর স্বর্গ রচনা করিয়া থাকেন, শয়তান তথায় নরকের আবির্ভাব করিয়া থাকে; অহুরমজদ্ যথায় সুখরাশি বিতরণ করিয়া থাকেন, আঙ্গ্রমইন্যু তথায় অসুখের ছড়াছড়ি করিয়া থাকে। মূর্খ বাঞ্ছারাম, এ বড় ঠিক কথা, ইহাই নিত্য হইয়া আসিতেছে, ইহাই নিত্য হইতে থাকিবে। কিন্তু জান, সেই অন্ধকারে আলোকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিয়া থাকে, সেই অসতে সতের প্রভা বৃদ্ধি হয়; মেঘমুক্ত দিবাকরের কিরণমালা উজ্জ্বলতায় ও তেজে বড় খরতর! যে আজীবন সম্পন্নাবস্থায় জীবনাতিবাহিত করিয়াছে, সে সম্পন্নাবস্থার মূল্য কি তাহা জানে না; সে মূল্য জানিতে হইলে ক্ষণিক অভাব ভোগের নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এ সংসারে, যথায় বিনা মূল্যে বিষ পর্য্যন্ত মিলে না, তথায় মূল্য জানাটাও নিতান্ত এবং আগে আবশ্যক। অতএব যদি আর কিছুরই জন্য না হয়, অন্ততঃ মূল্য জানার জন্যও, অসতের অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজন হইয়া থাকে। বিনা বৈপরিত্যে কোন বস্তুর রূপ, প্রভা বা মূল্য প্রকটিত হয় না।

অতএব সতের পার্শ্বে অসতের অস্তিত্ব একান্তই আবশ্যক, সুতরাং স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবীরূপে অসৎ সর্ব্বদাই সতের অনুসরণ করিয়া থাকে। যে জাতীয় সৎ তাহার পার্শ্ববর্ত্তী অসৎও সেই জাতীয় এবং সমশ্রেণীর, নতুবা বৈপরীত্য সাধনে পারক হইবে কিরূপে? সৎপদার্থ শ্রী, অসৎ পদার্থ বিকার। অসৎ, বিকার বা বৈপরীত্য

সাধনে, সতের অগ্রবর্ত্তী পর্ব্ববিশেষস্থ শ্রীবর্দ্ধন করিয়া, আপনি বিলীন হইয়া যায়; সৎ পুনর্ব্বার নূতন অসতের সহযোগে নূতন শ্রী ধারণে অগ্রসর হয়। সতের অস্তিত্ব এবং গতি নিত্য, অসতের অস্তিত্ব এবং গতি ক্ষণস্থায়ী—প্রতিপদে সৎকে অগ্রসারিত, প্রকটিত বা তাহার নব শ্রী বর্দ্ধন করিয়া, প্রতিপদে অসতের ধ্বংস। সৎ পদার্থই এ বিশ্বের পরিমাণ, অসৎ পদার্থ তাহার ক্ষণিক ব্যতিক্রম। সাময়িক কাল, অজ্ঞান-বিৎ বিজ্ঞানবিৎ সকল লোকেরই নিকট, সর্ব্বদা দুঃখসঙ্কুল এবং অসুখময়—মূর্ত্তিমান কলির রাজত্ব; তাহার কারণ, তাহার সৎভাব ও অসৎভাব উভয়ই আমরা চোখের উপর দেদীপ্যমান দেখিতে পাই বলিয়া। কিন্তু গতকাল? সর্ব্বদাই মনোরম, সর্ব্বদাই পূজনীয়, সর্ব্বদাই তাহাকে দেববৎ দেখিয়া থাকি; গতকালের নিতান্ত ক্রূরকর্ম্মা যে সেও শ্রদ্ধা এবং ভক্তির পাত্র হইয়া থাকে। তাহার কারণ, কাল সহ তাহার অসৎ-ভাব বিলয় হইয়া গিয়াছে; নিত্যস্থায়ী একমাত্র সৎভাব কেবল এখন নয়নপথে উদিত হইতেছে,—সৎভাব কবে কাহার না পূজনীয়, কবে কাহার না ভাল লাগিয়া থাকে? অসৎ পদার্থ অনিত্য এবং মিথ্যা; প্রতি কাল পরিবর্ত্তনে আবশ্যকতার সহ ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। এই অসৎ পদার্থ, মানবীয় বিভিন্ন ধারণাশক্তির তারতম্য অনুসারে, জরথুস্ত্রের নিকট অঙ্গ্রমইনু, মুসা ও মহম্মদের নিকট শয়তান, বৈদান্তিকের নিকট অবিদ্যা, ইত্যাদি নানা আকার ধারণ করিয়াছে।

জ্ঞান ধর্ম্মাদি পর্ব্বে আস্তিকতা সেই সৎ, নাস্তিকতা সেই অসৎ; সুতরাং নাস্তিকতা না থাকিলে চলে কই? জ্ঞানসংসার অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। আস্তিকতা আধ্যাত্মিক গুণময়ী বটে, কিন্তু উহাও, শরীরী আত্মার অবলম্বনভূত হওয়ায়, ভাব প্রকরণাদিতে জাগতিক পদার্থ; অপরাপর পদার্থ বা মানবীয় চিত্তের অপরাপর গুণ পদার্থের ন্যায়, উহাও শক্তিবশে গতিশীলতা, অগ্রগমন এবং শ্রীর বিষয়ীভূত। অতএব উহার বৈপরীত্যসাধক নাস্তিকতা না থাকিলে, সেই সেই অগ্রগমন বা শ্রীধারণ প্রভৃতি সম্পন্ন হইতে পারিত না। মানবীয় অপরাপর গুণ ও জ্ঞানের ন্যায় আস্তিকতারও পর পর উৎকর্ষ প্রাপ্তির প্রয়োজনীয়তা

আছে। কিন্তু এ সকল প্রয়োজনীয়তা—এ সকল নষ্টামির মূল, দৃষ্টিরোধক কাল; কালের ধ্বংসে সমগ্র সৎ পদার্থ দৃষ্টিপথে জাজ্বল্যমান হইলে, আর অসৎ পদার্থের প্রয়োজন হয় না। যতক্ষণ কাল বক্ষে স্থিতি, ততক্ষণ অসতের আবশ্যকতা অপরিহার্য্য। বঞ্ছারাম, তুমি বলিবে সতের পার্শ্বে অসতের যদি এতই আবশ্যক, আস্তিকতার পার্শ্বে নাস্তিকতার যদি এতই প্রয়োজন, তবে তুমি কেন তজ্জন্য এত ধকাবকি করিয়া মাথা ধরাইতে বসিয়াছ, কেনইবা নাস্তিকতার প্রতি এতটা বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিয়া থাক?

সকল সৃষ্টির আদি প্রবর্ত্তক, আদিকর্ত্তা জ্ঞান। মানবে সেই জ্ঞান অংশত প্রদত্ত হইয়াছে; এজন্য মানব স্বয়ং সৃষ্ট এবং সৃষ্টিমধ্যে থাকিয়াও, নিজে সৃষ্টিক্ষম। এই কারণে যে সকল কার্য্য অন্যত্র প্রাকৃতিক নিয়মে আপনা হইতে সম্পন্ন হইয়া যায়, মানুষের মধ্যে সচরাচর তাহা হয় না। মানব কিয়দংশে স্বয়ং-ক্ষম বলিয়া, প্রকৃতি তাহাদের প্রতি সেই পরিমাণে শিথিল-যত্ন বলিলে অপ্রযুক্ত হয় না। অন্যত্র সৎ এবং অসতের উপর 'স্বয়ং-ক্ষম' ভাবের অভাব হেতু, প্রকৃতি তথায় স্বয়ং যথাবিধানে কার্য্য করিয়া থাকেন; কিন্তু মনুষ্য প্রকৃতিতে সেরূপ নহে। মনুষ্য স্বয়ং-ক্ষম ভাব হেতু, স্বেচ্ছামত সৎ বা অসতের অপরিমিত সংগ্রহে পটু। বলা বাহুল্য যে, সৎসংগ্রহই উদ্দেশ্য, অসৎসংগ্রহ উদ্দেশ্য নহে। সুতরাং অধিক অসৎ সংগ্রহ অর্থাৎ সতের উপার্জ্জন অল্প হইতে দেখিলে, কাজেই গালিগালাজ করিতে হয়। অনুমান হয়, আমরা কেবল শুদ্ধ আত্মিক স্বেচ্ছাশক্তির চালনা করিতে পাইলে, হয়ত নিরবচ্ছিন্ন সৎ বা নিরবচ্ছিন্ন অসতের উপার্জ্জন করিতে পারিতাম। কিন্তু ভৌতিক শরীরী হওয়াতে, প্রাকৃতিক শক্তি ও স্বেচ্ছাশক্তিতে জড়িত এবং আধ্যাত্মিক সদসৎ ও আধিভৌতিক সদসৎ মিলিত হইয়া যাওয়ায়, এবং প্রাকৃতিক শক্তি ও তদনুগামী সদসৎ স্বেচ্ছাশক্তির অতীত ভাবে কার্য্যশীল হওয়ায়; শুদ্ধ আত্মিক স্বেচ্ছাশক্তির চালনা অথবা একেবারে শুদ্ধ অসৎ বা একেবারে শুদ্ধ সতের উচ্ছেদ বা উপার্জ্জনে আমরা অসমর্থ। কিন্তু তাই বলিয়া যথাসাধ্য সৎসাধন জন্য আমাদিগকে

প্রদত্ত শক্তির সম্যক সঞ্চালনে বিমুখ হওয়া আমাদের কর্ত্তব্য নহে, কারণ তাহা হইলে ব্যতিক্রম হেতু আত্মিক অসতের সঞ্চার বা পাপের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

আলোকে হইতে অন্ধকার ছাড়াইবার সাধ্য নাই। সূর্য্যের আলোকে এবং প্রদীপের আলোকে তফাত কেন, যেহেতু প্রদীপের আলোকে অধিক পরিমাণে অন্ধকার মিশ্রিত থাকায়, তাহা সূর্য্যালোক অপেক্ষা মলিন। এখন জিজ্ঞাসা করি, আলোক প্রাপ্তিই যথায় উদ্দেশ্য, তথায় আলোকের উপর যদি আরও অপরিমিত অন্ধকার মিশাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে কি সে আলোকের শ্রীবর্দ্ধন বা উদ্দেশ্য সাধন হইয়া থাকে? যদি তাহা না হয়, তবে এখন কর্ত্তব্য এই যে সেই আলোক হইতে অন্ধকার যথাসম্ভব বিচ্ছিন্ন করিয়া যথাসাধ্য সেই আলোকের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করা। এতদর্থে দুইটি পরিমাণের আবশ্যক, প্রথম কোন্ পরিমাণে অন্ধকার বিচ্ছিন্ন হইলে আলোক শ্রেষ্ঠতম রূপে লোভনীয় হইতে পারে তাহার আদর্শ; অপর যখন আলোক এবং অন্ধকার অবিচ্ছিন্ন, তখন কত পরিমাণে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিতে চেষ্টা করিব বা না করিব বা করিতে পারি তাহার পরিমাণ। আদর্শ, তত্ত্ব এবং কাব্যের বিষয়ীভূত পদার্থ; আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া, সতের পরিবর্দ্ধন হেতু তন্মুখে প্রধাবিত হইব; এবং অসতের দূরীকরণে, প্রকৃতি আমাদিগকে যতদূর যাইতে দেয়, ততদূর যাইব। মানব স্বয়ং প্রকৃতিবান্ হইলেও সে মহাপ্রকৃতির অঙ্কশয়নশায়ী, সুতরাং এখানেও সে প্রকৃতির শাসন-বহির্ভূত নহে; মানবকে স্বাধীনতা দিয়াছেন বলিয়া প্রকৃতি একেবারে তাহাদের সম্বন্ধে কার্য্যবিরত ও ছেদসম্বন্ধ হয়েন নাই; সুতরাং এ মুখে তাঁহার শাসনসীমা পর্য্যন্ত আসাই চূড়ান্ত, যেহেতু তদতিরিক্তে মানবীয় গতিচালনের চেষ্টা কেবল অনিষ্টের কারণ হইয়া থাকে।

সকল জ্ঞানের আদি সন্দেহের উৎপত্তি। সেই সন্দেহ পরিপক্ক হইলে, নাস্তিকতার আকার ধারণ করিয়া থাকে। অনুসন্ধিৎসু গুণের চালনে সন্দেহের উৎপত্তি হয়, পুনশ্চ সেই অনুসন্ধিৎসু গুণের চালনেই আবার তাহার নিবৃত্তি। কিন্তু অনুসন্ধিৎসু শক্তি উত্তরোত্তর অগ্রসর হইয়া

আসিয়া, গূঢ় গুহ্য ভেদের সময় যখন উপস্থিত হয়, তখন গূঢ় গুহ্যের সন্মুখীন হইবায়, ঘোর অন্ধকারে পতিতবৎ সহসা পথ না পাইয়া ব্যাকুলিত হইতে থাকে; এবং সেই ব্যাকুলতা হইতে চিত্ত শ্রমক্লান্ত হইয়া পড়ে। তখনই যে চিত্ত ক্ষীণ সে সেই ঘূর্ণাবর্ত্তমধ্যে, শ্রান্তি, তাপ ও বৈক্লব্য দিশাহারা হইয়া ক্ষিপ্ত-উন্মাদবৎ, যেন আস্তিকতার উপর প্রতিহিংসা-প্রতিশোধ লইবার জন্য, জেদ করিয়া নাস্তিকতাকে গতির সীমা জ্ঞানে তদবলম্বনে শান্তি পাইবার আশা করিয়া থাকে। যাহারা এই মধ্যপথে ভগ্নগতি হয়, তাহারাই এ জগতে নাস্তিক বলিয়া খ্যাতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যাহাতে বিষ তাহাতেই নির্বিষ, এবং একদেশের চরম সীমায় উঠিলেই, ঠিক তথা হইতে অপর দেশের সূত্রপাত হইয়া থাকে। যে অনুসন্ধিৎসু শক্তির চালনে নাস্তিকতারূপ সীমায় উপস্থিত হইয়াছে, সেই অনুসন্ধিৎসু শক্তিকে তদতিক্রমী চালনা করিলেই আবার সেই সীমা ছাড়াইয়া, আস্তিকতারূপী নূতন দেশের শোভনতম মোহিনী মূর্ত্তি পুরোভাগে দৃষ্টি করিতে পারিবে। তথায় বিচরণ কর, দেখিবে তাহা অপূর্ব্ব সুখের আকর; সন্দেহের পূর্ব্বগত আস্তিকতা অপেক্ষা তোমার এ আস্তিকতা অপরিসীম উজ্জ্বল ও চিরশান্তিকর,—তাহার কারণ ইহা বৈপরীত্য সমাবেশে উৎপন্ন। এ জগতে সকল বস্তুরই সার্থকতা আছে, সুতরাং নাস্তিকতারও সার্থকতা আছে, এবং সে সার্থকতা এইরূপে। কিন্তু নাস্তিকতা যখন আপন অধিকার-সীমা অতিক্রম করিয়া আপনিই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া দাঁড়ায়, তখনই তাহাকে শয়তানের প্রকৃত প্রতিমূর্ত্তি বলা গিয়া থাকে।

আমি অনেক ভাবিয়া দেখিয়াছি, এ জগতে যত প্রকার জীবসৃষ্টি আছে, তাহার মধ্যে বদ্ধমূল নাস্তিকের অপেক্ষা দুর্ভাগ্যবান্ জীব আর কেহই নাই। আজীবন শ্রম করিয়া, আজীবন মাথা ঘুরাইয়া, আজীবন তর্ক কাটাকাটি করিয়া, শেষে সিদ্ধান্ত করিলেন কি, এ জগতের স্রষ্টা বা শাসনকর্ত্তা নাই এবং আমিও কেহ নহি, এ জগতও কিছুই নহে এবং আমিও কিছুই নহি। এক মাত্র 'না' জানিতে 'হাঁ' প্রতিরূপ সমস্ত জীবন যে স্বচ্ছন্দে বিসর্জ্জন করিতে পারে, অজ্ঞানকে স্থাপিত করিবার নিমিত্ত

জ্ঞানকে যে বহু যত্নে হাড়িকাঠে ফেলিয়া বলিদান দেয়, তাহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্যবান নরকানুগৃহীত জীব আর কে হইতে পারে? নাস্তিক শিরোমণিগণ, 'ঘট পট' 'ষত্ব ণত্ব' 'ব্যাপ্য ব্যাপক' 'প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ' 'কার্য্য কারণ' ইত্যাদি দুরুচ্চার্য্য দেড় গজি শব্দ খেলা, তর্ক বিতর্ক, কার্য্য কারণ আলোড়ন করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন যে এ জগতে নাস্তিকতাই সৎ, আর সমস্ত অসৎ। অপূর্ব্ব বুদ্ধি! অপূর্ব্ব বুদ্ধি!! তর্কজালে সমস্তই আবদ্ধ করিয়া গ্রাস করিতে উদ্যত, ঋষি অগস্ত্য অপেক্ষাও অদ্ভুতকর্ম্মা! মূর্খ বাগাড়ম্বর, কত দিক ধরিয়া তর্ক করিয়া শেষ করিবে? এই বিশ্ব সাক্ষাৎ অনন্তরূপী, যে দিকে দেখিবে সেই দিকেই প্রতি অনন্তখণ্ড বিস্তৃত ও তোমাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। শক্তির অনন্ত মহিমা বারেক চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ কি? সামান্য সীমানিবদ্ধ ক্ষুদ্রাবয়বময় একই অক্ষর কোটি বিভিন্ন হস্তে কোটি বিভিন্ন আকারে প্রসবিত হইয়া থাকে, পুনঃ একই হস্তে কোটিবার প্রসবিত হইলেও কোটিবার বিভিন্ন আকারের হয়; এক এবং অসংখ্য পর্ব্ব পর্য্যায় ও শ্রেণীতে, অসংখ্য পদার্থ নিত্য উৎপাদিত হইতেছে; অথচ সকলেই অসংখ্য রকমের পৃথক পৃথক, কেহ কাহারও সঙ্গে এক নহে। তবে যে আমরা এখানে সেখানে সীমা দেখিয়া থাকি সে সীমা অনন্তের নহে, তাহা আমাদের যথা আবশ্যক ধারণা ও অবলম্বন হেতু আমরা দিয়াছি; মুছিয়া ফেল মানদণ্ডস্বরূপ তোমার চন্দ্র সূর্য্য ও তারকানিকর, এখনই দেখিবে তোমার এক মুহূর্ত্ত ও শত বৎসর কেমন সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অতএব অনন্তের মহিমা এবং তাহার অপার রচনা ও বিসারণ শক্তি কি অভাবনীয় ও কি অচিন্তনীয়! পুনশ্চ ইহা একদেশব্যাপিনী নহে। উর্দ্ধে অধে পার্শ্বে সর্ব্ব দিকে, ও ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সর্ব্বকাল ব্যাপিয়া, সমান অভিনীত। তুমি কি মনে করিয়াছ যে তোমার অন্তময় তর্করজ্জুতে সেই অনন্ত রাশি বাঁধিয়া আপন আয়ত্তে আনিবে? ভ্রান্ত, এ অসম্ভবে সম্ভববুদ্ধি তোমাকে কে দিয়াছে? তোমার চারি দিকে নিবিড় অনন্তরাশি বিস্তৃত, চারি দিকে তোমার নিবিড় অন্ধকারময় গূঢ় গুহ্য পরিবেষ্টন করিয়া অনন্তের রত্নভাণ্ডারকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে; মধ্যস্থলে জীবিকার্থেতু সেই রত্নপ্রার্থী তুমি এবং তুমি চৈতন্যরূপিণী

বিন্দুমাত্র আলোককণা। সেই কণা মাত্র আলোকে কণামাত্র স্থান আলোকিত দেখিতে পাইয়া ভ্রান্ত মনে ভাবিতেছ সকল পদার্থই তাহাতে পরিসীমা প্রাপ্ত হইয়াছে, হাত বাড়াইলেই তাহা আয়ত্ত করিতে সক্ষম হও। তুমি ক্রমাগত তর্কসূত্র প্রসব করিয়া, কেবল গুটিপোকার ন্যায় আপন জালে আপনি আবদ্ধ হইয়া, ভাবিতেছ এই বিশ্ব ও বিশ্বমূলও তোমার জালের সীমায় সমাপ্ত। নির্ব্বোধ, তাহা নহে। জালে আবদ্ধ হইওনা বা জাল কাটিয়াবাহির হও, নিবিড় গূঢ় গুহ্য ভেদ করিয়া সঞ্চরণ করিতে শিখ, অপরিজ্ঞেয় অথচ অনুভবনীয় ঐশ্বরিক সত্তার সংস্পর্শে শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে; অন্যথা গুটিবদ্ধ থাকিয়া শয়তানের উৎকৃষ্ট শয়তানী পোষাকের সূত্রসহায়তায় হত ও পর্য্যবসিত হইবে ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। অসীম পদার্থ তোমার জন্য সসীমের ন্যায় প্রতীয়মান হয় বটে, কিন্তু সে কেবল তোমার কর্ম্মক্ষেত্রে আবশ্যকের পরিমাণ অনুরূপ অবলম্বন পদার্থ দিবার জন্য; সে আবশ্যকের অতীতে আর সে সম্বন্ধ নাই—তোমার দোষ যে তুমি তথায়ও সসীমতা দেখিতে ব্যগ্র হও।

কেবল তর্কে এ গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা হয় না। যে কোন তর্ক যে কোন পদার্থকে স্বীয় ব্যুৎপত্তিবাদের ভিতরে সসীম করিয়া না আনিতে পারিলে, অগ্রসর হইতে অক্ষম; প্রতি তর্কে প্রমাণের আবশ্যক, কিন্তু এই বিশ্বের কোন বিষয়টি এ পর্য্যন্ত জানিয়া শেষ করিতে পারিয়াছ যে তাহাতে পূর্ণ ব্যুৎপন্ন, এবং তাহাকে সন্দেহরহিত প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে সক্ষম হও? আজন্ম জল যাহার অবলম্বন সে স্থলের অস্তিত্ব বুঝে না, অথচ মৃত্তিকাই জলের আধার। বাঞ্চারাম, তাহার পর তোমার প্রত্যক্ষ প্রমাণ! কুকুরেরা মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব জানিতে পারে নাই, অথচ ঐ দেখ কেমন উর্দ্ধলাঙ্গুল চারি পায়ের উপর ভর দিয়া মনের আনন্দে দৌড়িতেছে, বলা বাহুল্য যে কুকুরবুদ্ধির নিকট মাধ্যাকর্ষণের কথা নিতান্তই হাস্যাস্পদ! যে তর্কের উপর একটা সামান্য প্রাত্যহিক ব্যাপার মীমাংসা করিতে পাঁচটা এড়াইয়া যায়, তখন এ গুরুতমেরও গুরু বিষয় সম্বন্ধে, চিত্ত বুদ্ধ শ্রদ্ধা প্রভৃতি আর সমস্ত নিরূপক শক্তিকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া, একমাত্র যুক্তিশক্তির উপর ইহকাল পরকাল স্থাপন পূর্ব্বক,

যাহারা শান্ত হইবার প্রত্যাশা করে তাহারা কি ভ্রান্ত! ফলত বাঞ্ছারাম, নাস্তিকের নিকট যে ঈশ্বর অস্তিত্বশূন্য একথা ঠিক নহে; প্রকৃত পক্ষে নাস্তিকই ঈশ্বরের নিকট শূন্য হইয়া থাকে।

বলি তবে সত্য সত্য এবং নিতান্তই কি প্রত্যক্ষ প্রমাণ, প্রত্যক্ষ দৃষ্টি ভিন্ন তোমার মন উঠে না এবং মনে প্রত্যয় মানে না? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কোন্ প্রত্যক্ষে এ পর্য্যন্ত তোমা। মন উঠাইতে পারিয়াছে এবং কিসেইবা এখনও উঠাইতে পারে? বলিতে কি মানব, বিশেষতঃ উচ্ছৃঙ্খলচিত্ত মানব, এমনই অসাব্যস্ত এবং অব্যবস্থিতচিত্ত জানোয়ার যে প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ যে কোন বিষয়ই হউক না কেন, কিছুতেই সে চিত্তকে সাব্যস্ত ভাবে সমাহিত করিয়া তৃপ্ত এবং স্থির থাকিতে পারে না। ভাল, তুমি কিরূপ প্রত্যক্ষের প্রার্থী? যদি কৃতকার্য্য দ্বারা কর্ত্তাপক্ষে প্রমাণ প্রার্থী হইয়া বল, কোন অদ্ভুত কাণ্ড দেখিব, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, এই বিশ্বমণ্ডল, এই পৃথিবী, এই সৃষ্টিমধ্যে যে সকল কাণ্ড প্রতি-নিয়ত অভিনীত হইয়া যাইতেছে, তাহারা সকলেই ত অদ্ভুত, তাহাদের অপেক্ষা আবার অদ্ভুত বা আশ্চর্য্য কাণ্ড কি আছে? যদি বল তাহা নয়, পূর্ব্বে যাহা কখন দেখা যায় নাই এরূপ অদ্ভুত কাণ্ড দেখিব, আমি বলি তবে তুমি অন্ধ! এ সৃষ্টিতে কোন্ দ্রব্যটী হইতে দেখিয়াছ যাহা পূর্ব্বগত পদার্থ-সমূহ সহ সর্ব্বপ্রকারে একমূর্ত্তি এবং পৃথক্ত্ব-পরিশূন্য? সকলেই স্বতন্ত্র, সকলেই নূতন নূতন—এক গাছের দুই ফল, এক ঘাসের দুই পাতা, তাহাও পৃথক্ পৃথক্; ইহার পর দেশ এবং কালগত পার্থক্য ও নূতনতার ত কথাই নাই! যদি বল, এ গুলি নিয়মে সম্পন্ন হইতেছে, অপরিচ্ছেদ্য কার্য্যকারণ যোগে যাহা অবশ্য হইবার তাহাই হইতেছে; অতএব যাহা সেরূপ নিয়মের অতীত, তাহাই দেখিব। ইহার উত্তরে তোমাকে এই বলি যে, এমন কোন কার্য্যই হইতে পারে না যাহার মূলে নিয়মের অভাব; অনিয়মে নিয়মের উদয়ের নামই কার্য্য, অতএব নিয়মশূন্য কার্য্য দেখা আর চাঁদকে উদিত হইতে না দিয়া চাঁদ দেখা, এ উভয়ই সমান। আজন্মপঙ্গুকে যিশুখৃষ্ট স্পর্শমাত্র সুস্থশরীর করিয়া ছিলেন, এখানেও যে কিছু অনিয়মের কার্য্য হইল তাহা নহে, এখানেও নিয়ম অনুসারেই কার্য্য

হইয়াছে; তবে যে তুমি আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া মানিতেছ, তাহা অনিয়ম-সম্ভব বলিয়া নহে, নিয়মের বোধ পক্ষে তোমার জ্ঞানের অভাব হেতু,—যেরূপ আদিম আমেরিকগণ বারুদ ও বন্দুক দেখিয়া বিদ্যুৎ ও বজ্র এবং তাহাদের ধারককে দেবতা জ্ঞান করিয়াছিল! যদি যিশুখৃষ্টের পঙ্গুকে ভাল করাই আশ্চর্য্য কার্য্য বল, তবে তেমন এবং তাহা অপেক্ষা অপার গুণে গুরুতম কার্য্য সকল নিত্যই ত প্রকৃতিহস্ত দিয়া সম্পন্ন হইয়া যাইতেছে। বাপু, 'আশ্চর্য্য' অর্থে হাতিও নহে, ঘোড়াও নহে; যাহার নিয়ম এবং কার্য্য কারণ এখনও আমাদিগের নিকট অজ্ঞাত, তাহাই 'আশ্চর্য্য'।

স্থূলশরীরী এই সৃষ্টি, ইহাই যখন তোমার অভ্রমদৃষ্টি এবং আয়ত্ত করিবার শক্তি নাই, তখন সূক্ষ্ম বা অশরীরী এই সৃষ্টির সৃষ্টিপতিকে কেমন করিয়া দৃষ্টি এবং আয়ত্ত করিতে সাহসী হও? শরীরী শরীরী পদার্থই কত কত যখন দেখিতে পায় না, তখন আর সূক্ষ্ম অশরীরী পদার্থের কথা কেন বল। কৈ, মানব অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মশরীর গ্যাস দেখিতে পায় না ত, অনুভব করিতেও পারে না, কেবল কার্য্য বা ফল দৃষ্টে বুঝিতে পারে এইটী এই গ্যাস। ভাল কথা, কার্য্য দৃষ্টে গ্যাসের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পার, এবং ইহাও মনে হয় যে হয়ত ইহার ভিতর আরও কত গূঢ় তত্ত্ব নিহিত আছে; কিন্তু কার্য্য দৃষ্টে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পার না কেন; এবং যেস্থানে অপরে 'গূঢ় তত্ত্ব নিহিত' বলিয়া মনে সন্দেহ হয়, এখানে সে স্থানে নাস্তিকতার উপস্থিতি করিয়া থাকই বা কি জন্য? একটা সৃষ্ট বস্তু সম্বন্ধে মন বুঝাইতে পার, কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তা সমন্ধে মন বুঝাইতে পার না? গ্যাসের কার্য্য কেবল রাসায়নিক ক্রিয়া যোগে দৃষ্ট, কিন্তু ঈশ্বরের কার্য্য অবিচ্ছিন্ন প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ বং, তথাপি সেই ঈশ্বরের নাম হইলেই, অমনি সেখানে ঘট পট, ধ্বংসত্বের ধাঁকা নামাইয়া বসো,—তোমা অপেক্ষা আরও মূর্খ কোথায় গ্যাসের সত্তা আর ঐশ্বরিক সত্তা এতদুভয়ের উপলব্ধিতে একই বৈজ্ঞানিক প্রকরণ প্রযুক্ত হইতে পারে; তবে একটু প্রভেদ এই, গ্যাসের সত্তাকে ইচ্ছামত খাটাইতে পার, ঐশ্বরিক সত্তাকে তাহা পার না। চাকর যথ

মুনিবকে খাটাইতে পারে না, তখন স্রষ্ট এবং সৃষ্টিকর্ত্তার কথা ত অনেক দূরে। তবে চাকরও কখন কখন মুনিবকে যে একেবারে খাটাইতে না পারিবে এমন নহে,কিন্তু সে কেবল সুচাকরত্ব,ভক্তি এবং উপাসনার দ্বারা। চাকর মুনিবে এই সম্বন্ধ; কিন্তু যখন স্রষ্ট এবং সৃষ্টিকর্ত্তা লইয়া কথা, তখন জিজ্ঞাসা করি সেই সুচাকরত্ব, ভক্তি এবং উপাসনার কতখানি আবশ্যক হওয়া উচিত ?

এখন একবার তুমি কেমন অব্যবস্থিতচিত্ত জানোয়ার, তাহা দেখা যাউক। সূক্ষ্ম বা অশরীরীর কথা ত গেল, এখন যদি বলি যে ঈশ্বর তোমাকে দেখা দিবার জন্য স্থূল শরীর ধারণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কি বিশ্বাস করিবে ? তাহা যদি করিতে তবে যিশুখৃষ্ট, দশ অবতার, এ সকল তোমার নিকট উপহাসের পদার্থ কি জন্য ? যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মানবের সঙ্গে কথা কহিয়াছেন এরূপ বর্ণিত হইলে বিশ্বাস করিতে পারা যায়, তাহা হইলে বাইবেল আদিতে সেরূপ ত প্রভূত রূপেই বর্ণিত হইয়াছে; চাক্ষুষ দর্শকের কথা-প্রমাণও তাহাতে অনেক আছে, কই তথাপি ত তাহা বিশ্বাস করিতে চাহ না ? তাহাতে বিশ্বাস থাকিলেও ত অনেক কাজ হইত, যেহেতু একবারে বিশ্বাসশূন্যতা অপেক্ষা সৎবুদ্ধিযুক্ত যে কোন সাত্ত্বিক বিশ্বাস থাকিলে,তাহাতেও অনেক সুফল ফলিয়া থাকে। মনে কর, তোমাদের প্রত্যয়ের জন্য যদি ঈশ্বর ঘোষণা করেন, 'অমুখ তারিখে আমি দ্বিতীয় সূর্য্যমূর্ত্তিতে আকাশে উদয় হইব;' এবং হইলেনও সেইরূপ এবং তুমিও তাহা দেখিলে, হয়ত সেই মুহূর্ত্তের নিমিত্ত প্রত্যয়ও করিলে, কিন্তু পরক্ষণে ? অসাব্যস্তচিত্ত জানোয়ার! পরক্ষণে তোমার আর সে প্রত্যয় থাকিবে না। কেহ তাহা নিরাকরণ করিতে বিজ্ঞান খুলিয়া বসিবে, কেহ বলিবে দৃষ্টিভ্রম, কেহ বলিবে একটা নক্ষত্র জ্বলিয়াছিল; আবার উত্তর পুরুষেরা বলিবে, সকলেই সেই দিন উন্মত্ত হইয়াছিল, নতুবা এমন অদ্ভুত কথা রটাইয়া রাখিবে কেন ? অথবা যদি সেই সূর্য্যমূর্ত্তি, সকল কালের সকল লোককেই প্রবোধ দিবার জন্য সর্ব্বদেশ-ব্যাপী ও সর্ব্বকালীন হইয়া থাকেন, তাহাহইলেই বা নিস্তার কই ? হয়ত লোকে দুই দিনের জন্য বিশ্বাস করিবে, কিন্তু তৃতীয় দিন হইতেই

বুদ্ধিমান হইয়া বলিতে থাকিবে,—'ইহা আর একটী সূর্য্য, পূর্ব্বে লোকে কুসংস্কারাবিষ্ট হইয়া ইহাকে ঈশ্বর বলিয়া মানিত। আমি কিছু এ সকল অত্যুক্তি করিতেছি না, তুমি ত নিত্যই এরূপ নানা বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় দিয়া থাক। অতএব বাঞ্ছারাম, আমি বুঝিতে পারি না, ঈশ্বর কিরূপ প্রত্যক্ষ-প্রমাণযুক্ত হইলে তবে তোমার এবং তোমার বংশাবলীর বিশ্বাসের পাত্র হইতে পারেন।* এমন অসাব্যস্ত চিত্তের কোন বস্তুতে প্রত্যয় সম্ভব ? প্রত্যয় প্রাপ্তি হয় তাহাদের, যাহারা স্বয়ং প্রত্যয়-প্রতিরূপ। কিন্তু তুমি ? তুমি অপ্রত্যয়ের পুঞ্জ এবং রাশি, তোমার আবার প্রত্যয় ? স্বয়ং যাহারা প্রত্যয়-প্রতিরূপ, চিত্ত যাহাদের সাব্যস্ত, চেষ্টা যাহাদের সাত্ত্বিক, তাহারা সেই ঈশ্বরকে সহজেই অনুভব করিয়া থাকে। ইহা নিশ্চয় জানিবে, ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ অনুভব করা কঠিন নহে ; কঠিন প্রত্যয়-প্রতিরূপ, সাব্যস্তচিত্ত, সাত্ত্বিক চেষ্টা, ইত্যাদি সাধন দ্বারা তদর্থে প্রস্তুত হওয়া। সেরূপ প্রস্তুত না হইয়া ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে যাওয়া, আর অক্ষরশূন্যের কালিদাসের কাব্য পাঠ করিতে অগ্রসর হওয়া উভয়ই সমান। অক্ষরশূন্য ব্যক্তি ভাবে কথা ত এই 'খাই, যাই, নাই' ইত্যাদি, ইহার মধ্যে আবার কালিদাস কি ? 'কালিদাস, 'কালিদাস' যাহারা করে তাহারা খেপিয়াছে। সকল বিষয়েরই জন্য প্রস্তুত এবং অধিকারী হওয়া এবং সকল বিষয়েরই জন্য আয়োজন আবশ্যক ; এ পৃথিবীতে এই দুই ভিন্ন কোন পদার্থই উপার্জ্জনের সম্ভাবনা নাই। বিষয় যতই উচ্চ উচ্চ, ততই ক্লেশকর চেষ্টা, দুর্দ্দমনীয় চিত্তবৃত্তি এবং অপরিমিত অধ্যবসায়ের আবশ্যক হইয়া থাকে ; ইহাতে যে ফল এবং লাভ তাহা তোমার নিজেরই, অন্যের নহে। 'প্রত্যক্ষ' 'অপূর্ব্ব' 'অদ্ভুত' সকলেই তোমার পার্শ্বে রহিয়াছে, তুমিই কেবল তাহা, নিত্যদর্শন হেতু, অনুভব করিতে পারিতেছ না। ইহাতে দোষ 'প্রত্যক্ষ' 'অদ্ভুত' বা 'অপূর্ব্বের' নহে ; দোষ তোমার নিজের। তুমি অনাস্থাযুক্তচিত্ত, এ বয়স ধরিয়া রথ দেখিয়া আসিতেছ, তোমার আর রথ দেখায় কৌতূহল জন্মে না ; কিন্তু বালক, যে কখনও তাহা দেখে নাই, তাহার তাহা দেখিতে কৌতূহল কত ! অতএব অদ্ভুত অপূর্ব্বাদির

অর্থ এখন জানিবে যে কেবল আপেক্ষিক মাত্র, নতুবা পদার্থাংশে যাহা বর্ত্তমান আছে তাহাই। এখন দেখ তোমার আক্ষেপ, আকাঙ্ক্ষা, বা তর্কফলের যথার্থ অর্থ ধরিতে গেলে এই দাঁড়ায় যে, কেন তুমি বালকবৎ নিত্য অভিনবদর্শী হইয়া সৃষ্ট হও নাই। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিও যে তুমি কর্ম্মভূমিতে প্রেরিত হইয়াছ, সে স্থলে তুমি যদি নিত্য অভিনবপ্রার্থী বালকবৎ হও, তবে আর তোমার দ্বারা কর্ম্মসাধন হইতে পারে কিরূপে?—বালকের দ্বারা কোন কর্ম্ম সাধন হয় না। দেখ, তুমি অনাস্বাদদর্শী, বালক অভিনবদর্শী; আবার তোমাদের ছাড়া আরও এক দল দর্শী আছে, যাহারা আজন্ম রথ দেখিয়া আসিয়া তথাপি আবার দেখিবার জন্য ক্ষিপ্ত; ইহারা ভক্ত। তাহারা নিত্য রথ দেখিয়া আসিলেও, যতবার আবার দেখে ততবারই সেই রথ তাহাদিগের নিকট অভিনব, ততবারই চতুর্বর্গ প্রাপ্তির স্থল। তুমিও সেইরূপ ভক্ত-দর্শক হও, দেখিতে পাইবে এই নিত্যদৃষ্ট বস্তুতেই আবার কত অভিনব বস্তু নিহিত রহিয়াছে; তাহা হইলে, এবং কেবল তাহা হইলেই, দৃশ্য এবং দর্শক উভয়েতেই সার্থকতা অনুভব করিয়া আনন্দবান হইতে পারিবে।

কেবল একমাত্র সভক্তি চেষ্টা দ্বারাই ঈশ্বর অনুভূত এবং কার্য্যযোগে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন। চেষ্টা ভক্তিযুক্ত হওয়া, যে কোন শিক্ষার জন্য একান্ত আবশ্যক। রসায়ন বিদ্যা শিখিতে গিয়া যে গোড়াতেই তাচ্ছিল্য ভাব প্রকাশ করে, বা নিজ সঙ্কীর্ণ জ্ঞানে উহার বিবৃত বিবরণ গুলির প্রতি উদ্দেশে অসম্ভব বোধ হওয়ায় উদ্যমশূন্য হয়, সে কথনই রসায়ন-বিদ্যায় কৃতকার্য্য হইতে পারে না। পুনশ্চ, কেবল চেষ্টা হইলেই হয় না, চেষ্টায় অধ্যবসায় চাই। অনেকে ক্ষেত্রতত্ত্ব আরম্ভ করিয়া, কেবল রৈখিক মীমাংসা পর্য্যন্ত গিয়া, জীবনে রৈখিক মীমাংসার কি প্রয়োজন তাহা দেখিতে পায় না; সুতরাং পরীক্ষাকাল পর্য্যন্ত কোন রূপে তাহা স্মরণ রাখিয়া, পরে অনাবশ্যক বোধে তাহাতে জলাঞ্জলি দেয়। অবশ্যই, অনন্বিতভাবে, কেবল রৈখিক মীমাংসায় কিছুই প্রয়োজন বা ফল নাই; কিন্তু যদি তাহারা আরম্ভের সেই নিরাশকর-রূপে-প্রতীয়মান অংশ অতিক্রম করিয়া একবার যাইতে পারিত, তাহা হইলে তাহারা

অবশ্যই সকল দিকে সার্থকতা দেখিয়া চরিতার্থ হইত। অতএব অনেক চেষ্টাশীলেরও অধ্যবসায় অভাবে চেষ্টায় নানা দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে। আবার দেখ, অন্বেষণকারীর অন্বেষণ গভীর হইলেও, সে ব্যক্তি গভীরতার যতদূর সীমায় যাইতে সক্ষম বা যাওয়া উচিত ততদূর যদি না যায়, তবে একটু মাত্র ত্রুটিতে হয়ত সমস্তই বৃথা হইয়া যাইবার কথা। মনে কর, ৭০ফুট বালি কাটিয়া মাটি প্রাপ্তে শোননদের পুলের ভিত্তি আরম্ভ হইয়াছে। সন্দেহবাদীদিগের কথা শুনিতে হইলে, হয়ত ১০ ফুট কাটিয়াই মাটি পাইলাম না বা পাওয়া যাইবে না বলিয়া, বালির উপরে ভিত্তি আরম্ভ করিতে হয়; এবং পুলও যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে সে ভিত্তির উপরে নির্ম্মাণ না করা যায় এমন নহে, কিন্তু বালির উপর সে কাণ্ড কয় দিন থাকে? তোমার কোমতে আদি দার্শনিককে অবলম্বন করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইলে এই বালির উপর পুলের গাঁথুনি হইয়া থাকে। যে পাকা ভিত্তি খুঁজিতে চায়, তাহার পক্ষে ৬৯ ফুট খুড়িয়া ক্ষান্ত হইলেও নিস্তার নাই; কারণ তোমার ৬৯ ফুটেও যে ফল ১০ ফুটেও তাহাই! বাঞ্ছারাম, নিশ্চয় জানিবে, যেখানে আমার অনুসন্ধিৎসু শক্তির সীমা, ঠিক সেই থানেতেই আমার ধারণার উপযোগী অবলম্বন পদার্থরূপী ঐশ্বরিক সত্তারও পূর্ণাবয়বে বিদ্যমানতা। উহা ঈশ্বর কর্ত্তৃকই তদ্রূপ নিয়োজিত।

এই নাস্তিকতাবুদ্ধি জ্ঞানপর্য্যায় বিশেষের বিপ্লবদশাতে উপস্থিত হইয়া থাকে। উপার্জ্জনের কাল, বৃথা জল্পনে ব্যয় করিবার সময় নহে, তাহা পূর্ণ সাত্ত্বিক কাল; মানুষের তখন বাক্যাড়ম্বর থাকে না, মানুষ তখন ধীরে ধীরে নিস্তব্ধে অথচ নিশ্চয় ভাবে উপার্জ্জনরত হইয়া থাকে। সর্ব্বকালেই নির্ব্বাকভাব কার্য্যক্ষমতার এবং বচনবাগীশী অকর্ম্মা ভাবের লক্ষণ। এ সাত্ত্বিক সময়ে চাতুরী, কাপট্য বা অসত্য বা অপরিণামদর্শী প্রগল্‌ভ ভাব, বড় একটা স্থান পায় না; সুতরাং মানবও তখন প্রকৃত বলে বলী। সারল্য বলের চিহ্ন, কৌশল তাহার বিপর্য্যয়। উপার্জ্জনের পর ভোগের আরম্ভ, ভোগ হইতে স্বাভাবিক ভাবের বিকার উপস্থিত হইয়া, কৃত্রিম কৌশল বা

অলঙ্কারেরপ্রতি রুচি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে; আত্মিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন চিন্তা ক্ষয় পায়, অথচ সকল কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ হইয়া উঠে, মহত্ত্বের প্রতি ভক্তি লোপ হয়; তর্ক অলঙ্কারের ছড়াছড়ি, কৌশলসম্পন্ন বিষয় ও জটিলতাই এখন প্রশংসা স্থলীয়; অনুকরণপ্রিয়তা উপস্থিত হয়, অথচ দিগ্বিদিক-কম্পিতকারী বাক্যাড়ম্বরের সীমা পরিসীমা থাকে না। আসল বিষয়ে একেবারে দৃষ্টিরোধ হয়, নতুবা এক একতা এই কথার অর্থ বুঝিবার বা বুঝাইবার অভাবে সমগ্র ভারত ধ্বংস হয়! সত্যাবলম্বনে স্বাভাবিক সরল বিষয় যাহা তাহা নগণ্যের মধ্যে পড়িয়া যায়, বুঝাইতেও কেহ আয়াস লয় না এবং বুঝিতেও কেহ মন দেয় না। সরল বলিয়াই সামান্য জ্ঞান, প্রকৃত বলের চিহ্ন যাহা তাহা দুর্ব্বলের চিহ্ন বলিয়া উপেক্ষিত হয়। ভৌতিক গুণ ক্রমে ইন্ধন পাইয়া পরিপুষ্ট হইতে থাকে, কিন্তু আত্মিক গুণ শীর্ণ হইয়া যায়। মানব সর্ব্বদা স্বাধীনচেতা হইবে বটে কিন্তু লাগাম-সংযুক্ত; এ সময়ে স্বাধীনচেতা ভাবও নাই অথচ সে লাগামও নাই। মানব যদৃচ্ছা কোলাহলে যদৃচ্ছা তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়া ধ্বংসরূপী ঘূর্ণাবর্ত্তের আবির্ভাব করাইয়া থাকে। শক্তি কখনও ধ্বংস হইবার নহে, নিষ্ফলও কখন হয় না; সুতরাং চালনার ফলে যখন যেরূপ তখন সেরূপ ফল প্রসব করে। যে হিন্দুশক্তি এতকাল সুশাসনে, শাস্ত্রপ্রকটনে, তত্ত্ব উদ্ভাবনে, নানাবিধ মহৎ কার্য্যে অতিবাহিত হইত; এখনও সে শক্তি না আছে এমন নহে, এখনও তাহা তাহাই রহিয়াছে। কিন্তু তাহা এখন নিমকহালালি গোলামি করণে, গোলামির মহিমা গানে, অলঙ্কারশাস্ত্র নিষ্পীড়নে, বটতলা উজ্জ্বল করণে, কাব্য নাটক ও নবেল লিখনে, বিলাতি দর্শন বিজ্ঞানের বচনবাগীশী বিলোড়নে, নাস্তিকতা পাজিটিব-গিরী বা পাষণ্ডতাকে মহত্ত্বের চিহ্ন রূপে পরিজ্ঞাপনে পর্য্যবসিত হইয়া যাইতেছে। আশা কেবল এই, যথায় একের সীমা তথায় অপরের আরম্ভ। যে অভিনয় মহৎ বিষয়ের মহৎ বিপ্লবে, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বিষয়ের ক্ষুদ্র বিপ্লবেও তাহাই অভিনীত হয়; প্রকরণ এক, প্রভেদ কেবল উপকরণের।

নাস্তিকতা দুই প্রকার। এক ইচ্ছায় নাস্তিক, অপর বিপাকে নাস্তিক। ইচ্ছা-নাস্তিক যাহারা তাহারা ঈশ্বর না থাকেন, কর্ম্ম ও কর্ত্তব্য বুদ্ধি না

থাকে, পাপ পুণ্য ও পরোলোক বুদ্ধি না থাকে, ইহাই নিয়ত বাঞ্ছা করিয়া থাকে; ইহা হইলেই তাহাদে কুকর্ম্মশীল জীবনের পক্ষে ভাল হয়, এই হেতুই নাস্তিক হইবার জন্য আগ্রহবান। তাহারা আপন মনের স্বভাব অনুরূপ মনঃপুত প্রমাণ পদার্থাদি লইয়া মনঃপুত ফল আকর্ষণ করিয়া থাকে। আমি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, অনেক কর্ম্মপশু আপন কর্ম্মভয়ে নাস্তিকতা অবলম্বন করিয়াছে। ইহারা কায়িক বাচিক মানসিক বা সর্ব্বপ্রকার আপন কর্ম্মভয়ে, শান্তির আশায়, আগে এধর্ম্ম ওধর্ম্ম ও সেধর্ম্ম করিয়া, এবং সকল ধর্ম্মেরই শাসন অল্প ইতর বিশেষে কঠোরতায় প্রায় সমানই দেখিয়া, অবশেষে না-ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক মনকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। বিপাকে নাস্তিকের ভাব সেরূপ নহে। ইহারা ঈশ্বরকে পাইবার জন্য অশেষবিধ চেষ্টা করিয়া, শেষে চেষ্টা চালনায় ভ্রান্তগতি হওয়ায় দেখিতে না পাইয়া, অগত্যা নাস্তিকতার ভাব অবলম্বন করিয়া থাকে। ইঁহাদের উপর এখনও আশা করা যাইতে পারে, এবং এখনও ইহাদিগকে প্রকৃত ঈশ্বরের দাস বলিয়া গণনা করা যায়। ইহারা যে নাস্তিক হয়, তাহা পরিতাপের সহিত হইয়া থাকে। আরও এক শ্রেণীর নাস্তিক আছে, তাহা প্রধানতঃ কেবল আমাদের দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়; এ নাস্তিকতার ভাব স্বতন্ত্র, ইহা কি বুদ্ধি চালনা, কি প্রাকৃতিক গতি, কি কর্ম্মদোষ, কি ভ্রান্তমতি, ইহার কিছুরই অনুসরণে নহে। ইহা সাময়িক সখ বা ফেসিয়নের অনুসরণে। যে ফেসিয়নের অনুসরণে কথন হিন্দু, কথন ব্রাহ্ম, কথন খৃষ্টান; যাহার অনুসরণে দাড়ি চস্‌মা কোট পোষাকে নিত্য নূতন আকৃতি পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, এ নাস্তিকতাও সেই ফেসিয়ন হইতে উৎপন্ন। কোন স্কুলপাঠ্য তর্কদর্শন, কোন শিক্ষকবিশেষের বাক্যবিশেষ, বা ইয়ারগণের তদানীন্তন মতি গতি, তদ্রূপ মত পরিবর্ত্তনের পক্ষে যথেষ্ট। বঙ্গসন্তান বাঞ্ছারাম যেমন সারশূন্য আস্তিকতায় এবং ধর্ম্মপথে, তেমনিই সারশূন নাস্তিকতায় এবং অধর্ম্মপথে; অধিকন্তু উভয় দিকেই বচনের ছড়া ছড়ি। বিপাক-নাস্তিক, ইচ্ছা-নাস্তিক, ফেসিয়ান-নাস্তিক, এই ত্রিবিধ নাস্তিকের মধ্যে ফেসিয়ান নাস্তিকই সর্ব্বাপেক্ষা অধম; সত্য বটে

যে ইচ্ছা-নাস্তিক ঘোরতর কর্ম্মদূষিত, কিন্তু তথাপি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, ভালয় হউক মন্দয় হউক, তাহার আত্ম-অস্তিত্ববোধ এখনও লোপ হয় নাই।

নাস্তিক-শিরোমণি বাঞ্ছারাম কথা কহিয়া, ইতিহাস খুলিয়া, নানা-রূপে সর্ব্বদা দেখাইয়া থাকে যে, "তোমরা যে আস্তিকতাকে সকল মঙ্গলের নিদান বলিয়া থাক, তাহা বস্তুত সকল মঙ্গলের নিদান নহে; কারণ এ পৃথিবীতে ধর্ম্ম লইয়া যত বিগ্রহ বিপ্লব রক্তপাত ও নানা কুকাণ্ড হইয়া গিয়াছে, এত আর কোন বিষয় লইয়া হয় নাই; ধর্ম্ম যদি প্রকৃত মঙ্গলের নিদান তবে তাহাতে এত অমঙ্গলের ঘটনা কেন? আর দেখ হিতবাদ বা সাম্যবাদ, যদি তাহা কার্য্যে পরিণত হয়, তাহা হইলে এই পৃথিবী প্রকৃত স্বর্গ হইয়া দাঁড়ায় কি না?" ধর্ম্ম লইয়া যে এ পৃথিবীতে অনেক কাণ্ড হইয়া গিয়াছে তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও স্মর্ত্তব্য যে নাস্তিকতা লইয়া এ পৃথিবীতে কত কাণ্ড হইতে পারে তাহা এ পর্য্যন্ত দেখা হয় নাই; সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে নাস্তিকতা ভাল কি আস্তিকতা ভাল তাহা প্রমাণিত হইতে পারে না। একবার, একবার মুহূর্ত্ত মাত্র, এ জগতে নাস্তিকতা, হিতবাদ, সাম্য-বাদাদির কার্য্যে পরিণতি চেষ্টা দেখিতে পাইয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতে ফরাসি-রাজবিপ্লব-রূপী কি রোমহর্ষণকর ফলই উৎপত্তি হইয়াছিল! ভীষণতায় সমগ্র জাগতিক ইতিহাসের কোথাও আর তাহার সমান তুলনা পাওয়া যায় না। জীবজগতের অপরাপর জীব সহ মানবও একধর্ম্মবিশিষ্ট একটি জীব বিশেষ, সুতরাং হিতাহিতশূন্য উন্মাদ ক্রূরবুদ্ধি ও পাশব-ভাব, মানবে অপরাপর পশুর ন্যায় সমানই বা মানব উচ্চ সৃষ্টি হেতু আরও অধিক পরিমাণে নিহিত রহিয়াছে। পশু হইতে উপরন্তু মান-বের পার্থক্য কেবল জ্ঞান ও ধর্ম্ম। এই জ্ঞান ও ধর্ম্মই স্বীয় শাসনবলে পাশবভাবকে প্রশমিত করিয়া, মানবকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব পথে লইয়া আসিতেছে। এমন প্রত্যাশা করা যায় না যে, জ্ঞান ও ধর্ম্ম স্বীয় শাসনকে সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া একেবারেই আপন পূর্ণ আধিপত্যের ফল ফলাইতে সক্ষম হইবে, কারণ আমরা দেখিতেছি প্রকৃতি কোন কার্য্যই সহসা

নিষ্পাদন করেন না—ধীরে ধীরে, আস্তে আস্তে, ক্রমে ক্রমে, অতর্কিত ভাবে। এ সংসারে আদিম অবস্থার শাসন যেমন ক্রমে শিথিল, আবার উত্তরোত্তর অবস্থার শাসন ক্রমে তেমনি আয়ত্তকরী হইবাতে, মনুষ্যের মনুষ্যত্ব বিষয়িণী অবস্থান্তর সংঘটিত হয়; এবং এই জন্যই, বাঞ্ছারাম, একজন আদিম অসভ্য ও তথা হইতে পর পর তোমা পর্য্যন্ত, মনুষ্যত্ব ভাবের এত তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। পাশব বল সর্ব্বদাই অন্ধ এবং আত্মবলদৃপ্ত, সুতরাং সহসা শৃঙ্খলবদ্ধ হইতে চাহে না; এই জন্য, ধর্ম্মের নামে এ জগতে কথিত যে সকল কুকাণ্ডের বিস্তার দেখিতে পাই, তাহা বস্তুত ধর্ম্মের ফল নহে; তাহা ধর্ম্মশাসনের প্রতি পাশব ভাবের বিদ্রোহাচরণের ফল বা পাশব ভাবের এখনও অশাসিত অংশটুকুর ক্রীড়া। জ্ঞান ও ধর্ম্মে মনুষ্যত্ব; এক্ষণে, তাহার অভাবে বা নাস্তিকতার প্রবর্ত্তনে কতদূর ও কিরূপ ফল যে ফলিতে পারে, তাহা আর বলিবার অবশ্যক রাখে না। তবে সাম্যবাদের সমতা যে তাহাতে পূর্ণভাবেই ফলিতে পারে তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কে বলিবে যে বানরমণ্ডলে ধনী আছে, দরিদ্র আছে,—চাষার ক্ষেত্র বা কলা বেগুনের গাছ সকলেরই নিকট সমান প্রাপ্য!

আর একটী কথা আমি বড় বুঝিয়া উঠিতে পারি না। যদি নাস্তিকতাই সত্য হয়, তবে এ সংসার চলিতে পারে কিরূপে? মানবের হিতাহিত-জ্ঞান না থাকিলে, পশুবংশের ন্যায় একরূপ চলিবার পক্ষে বাধা হইত না; কিন্তু হিতাহিতজ্ঞানের অস্তিত্ব যথায় তথায় সেরূপ কোন মতেত চলিতে পারে না। উর্দ্ধদেশের সহিত বন্ধনশূন্য হইলে, আমাদের সকল কার্য্য,সকল চিন্তা, সকল কথা, সকল নীতি, সমস্তই অর্থশূন্য হইয়া পড়ে। তখন ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম, সত্য এবং মিথ্যা, হিত এবং অহিত, স্বদেশপ্রিয়তা সহৃদয়তা, এ সকল অর্থহীন মনুষ্যনির্ম্মিত নির্ব্বোধের বন্ধনপাশ হইয়া দাঁড়ায়। তখন প্রতি নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার প্রতি নূতন অসুখের কারণ স্বরূপ হয়, যেহেতু প্রতি আবিষ্কার নূতন অভাবের উৎপাদক। তখন সভ্যতার বৃদ্ধি, প্রয়োজন-জালের বিস্তার হেতু কেবল কষ্ট জীবনের বৃদ্ধি বলিতে হইবে: তুমি বলিবে যে তাহা নহে, উহা সুখজীবনের

বৃদ্ধি; তুমি বলিবে বটে কিন্তু তোমার শ্রেণীর অতীতস্থ আর কেহ সে কথা বলিবে না; সুখজীবন বলিতাম যদি উহা কেবল আপেক্ষিক বুদ্ধিজাত ধারণা না হইত,—তাহার সাক্ষ্য ঐ দেখ যে বসনে তুমি সন্তোষ লাভ করিতেছ, অসভ্য অরণ্যবাসী তাহা টুকরা করিয়া হেয়-নিক্ষেপ করিয়া ফেলিতেছে। আসল কথা বাঞ্ছারাম, যদি এ জীবন, এ জীবনের পরিণাম না থাকে, তাহা হইলে আমরা সকলেই বাতুলালয়ে প্রবেশ করিয়া বসিয়া আছি। যে ব্যক্তি তোমার স্বদেশপ্রিয়, যে সহৃদয়, যে পরহিতের জন্য কাতর, আমি বলি প্রথম নম্বরের পাগল সেই; কারণ এরূপ সংসার যথায়, তথায় স্বার্থপরতাই একমাত্র উপাস্য দেবতা হওয়া উচিত। তুমি বলিবে পরহিতও ভাল বিষয়, আমি বলি এই "ভাল বিষয়" কেবল তোমার কথায়, তদ্ভিন্ন উহার জন্য কোন মূল নাই; তোমার মস্তিষ্কের শিরা ধমনীর আকুঞ্চন বিকুঞ্চনের একটু এদিক ওদিকের ফল মাত্র, এবং আমরা জানি তদ্রূপ আকুঞ্চন বিকুঞ্চনের বিশেষ কোন মূল্য নাই। "অন্যের প্রতি সেইরূপ হিত আচরণ করিও যেরূপ তোমার প্রতি আচরিত হওয়ার বাঞ্ছা করিয়া থাক"— ইহা যদি তোমার নীতিমূল হয়, তাহা হইলে দেখ ইহা দ্বারাও আমার সেই আত্মস্বার্থ সূচিত হইতেছে, প্রতিদানে যে টুকুতে আমার ভাল, কেবল সেই টুকুই অপরের জন্য করিব; তদতিরিক্তে কিছু করিলে আমার নিজের লোকসান এবং তেমন স্থলে কে না বলিবে যে আমি নির্ব্বোধ। আমি আমার স্বার্থপরতা সহ বলি হইলাম, দেশ বা আর দশ জনে তাহাতে উপকার লাভ করিল, ইহাতে আমার লাভের অংশ কি? আমার অংশ জীবনান্ত! আরও প্রথম নম্বরের পাগল কাহাকে বলে? হিন্দু শাক্যসিংহ, হিব্রু যিশুখৃষ্ট, সামান্য লোকের মধ্যে গ্রীক লিওনিদা প্রভৃতির ন্যায় বোকা ভূভারতে নাই। জগতের অপরাপর হিতের জন্যও যাহারা জীবনের সাধারণ সুখাদিকে বিসর্জ্জন করিয়া থাকে, যথা নিউটন, কলম্বস প্রভৃতি, তাহারাও সামান্য বোকা নহে। বাপু বাঞ্ছারাম, আবার জিজ্ঞাসা করি আমার জীবন উৎসর্গ করিয়া তোমার হিত সাধনে ফল? তুমি বলিবে যশ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,

তুমি যখন আমার যশোগান করিবে, আমি তখন থাকিব কোথায়? তবু যদি আমি সেই যশের লোভে মজিয়া যাই, তবে আকাশ কুসুমে অপরাধ করিয়াছে কি? ভোগী থাকিলেই ভোগ্যের মূল্য, অতএব আমি যখন থাকিব না তখন আর সে যশের মূল্য কি? আমি বলি এরূপ যে যশের ইচ্ছা, তাহাও সেই মস্তিষ্কের শিরা ধমনী আদির বিকৃত আকুঞ্চন ও বিকুঞ্চনের ফল; এবং এমন স্থলে তদ্রূপ সকল কর্ম্মের মূলদেশে বস্তুত একমাত্র খেয়াল ভিন্ন অন্য কিছুই দাঁড়ায় না। 'নিজের লোকসানে দশ জনের ভাল,' 'স্বকপোলকল্পিত ন্যায় অন্যায় বুদ্ধিভ্রমে সম্ভোগবিরতি' যাহারা সেই সকল খেয়ালকে অবলম্বন করিয়া আত্মবঞ্চনা ও নানা চিত্ততৃপ্তিকর পদার্থ সকল পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তাহারা যদি পাগল না হয় তবে আবার পাগল কে? কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তথাপি আমরা দেখিয়া আসিতেছি যে, এ জগত কেবল সেই একমাত্র পাগলের দল হইতেই যাহা কিছু চির-উপকৃত হইয়া আসিয়াছে ও আসিতেছে; সুবুদ্ধিদলের দ্বারা কখন হয় নাই। "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ"— দেখা যাইতেছে যে ঋণ করিয়া ঘৃত পান করিয়াও, বুদ্ধিমানগণের সুখের অঙ্কে সঙ্কলন হওয়া দূরে থাকুক, পদে পদে অকুলানই পড়িয়া গিয়াছে; কিন্তু পাগল যাহারা, তাহারা বুদ্ধিমানদিগকে ঋণ দিয়াও, হাসিতে হাসিতে এ জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে।

নাস্তিকবুদ্ধি ব্যক্তি 'সুখ'রূপ ফলের জন্য কিছু অধিক আগ্রহবান, এবং তাহার বিবেচনায় উহাই এ জগতে এক মাত্র আকাঙ্ক্ষণীয় পদার্থ; আস্তিকবুদ্ধিও যে সাধারণত সে সুখ পদার্থের জন্য কিছু কম ব্যস্ত তাহা নহে। 'সুখ' পদার্থ কি?—ইহা যাহার যেমন ধারণা, সকলে সেই স্ব স্ব ধারণা অবলম্বনে তদাশয়ে, নিজ-কৃত ঘূর্ণাবর্ত্তমধ্যে বিঘূর্ণিত হইয়া ফিরিতেছে; এবং সতে বা অসতে যথায় যখন স্বীয় কল্পিত সুখের ছায়াপাত দেখিতেছে তখন তথায়, সতে বা অসতে, ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া কদাচ আত্মতৃপ্ত, কখন বা আমূলত আত্মধ্বংস করিতেছে। সুখ পদার্থকে একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য করিলে, এবং সুখ পদার্থ কি তাহার ধারণা প্রকৃত না হইলে, কাজেই এরূপ ঘটনা অবশ্যম্ভাবী। এরূপ সুখের ধারণা সাধারণত বাহ্য সম্পদে বা ভোগে

নিহিত; লোকেও সদসৎ নানা পথে জীবন মন বিক্রয় করিয়া তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে; অনুসরণ করে বটে তথাপি আমরা দেখিতে পাই যে তাহাদের অসুখ পদার্থের যে তাহাতে কিছু ন্যূনতা হইয়াছে তাহা নহে। সুতরাং এরূপ সুখের ধারণা ও অনুসরণপ্রণালী এ দুই যদি প্রকৃত হইত, তাহা হইলে তাহাতে এরূপ ফল ফলিবে কেন? অপার সম্পদে ও ভোগেও আমরা দেখিতে পাই যে মানব অসুখী, অথচ অসম্পদে ও অভোগেও দেখিতে পাই যে মানব সুখী! ইহার কারণ? বাপ্পারাম, সুখ বাহ্য সম্পদে বা ভোগে নহে, এবং সুখ ক্ষণিক চিত্তোন্মাদ নহে। চিত্তের যে তৃপ্তি, যাহাকে চিত্তপ্রসাদ বলে, তাহাই প্রকৃত সুখ। সে সুখ একমাত্র সাত্বিক বুদ্ধিতে কর্ত্তব্য সাধন দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহার জীবন, স্বীয় ধারণা অনুরূপ, আমূলতঃ সাত্বিক এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ; তাহার চিত্তপ্রসাদ সর্ব্বক্ষণ, এবং সেই এ জগতে প্রকৃত পক্ষে সুখী। সুখ কর্ত্তব্য সাধনের মজুরী স্বরূপ। কর্ত্তব্য বুদ্ধির অপেক্ষা না রাখিয়া সুখের প্রার্থনা করা, আর মজুরের কার্য্য না করিয়া মজুরী প্রত্যাশা করা, উভয়ই সমান। জ্ঞানীরা সুখের মূল স্বরূপ কর্ত্তব্য সাধনকে জীবনের উদ্দেশ্য ভাবিয়া থাকেন, এবং সুখের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়াই তাহার অনুসরণ করেন; এই জন্য তাঁহাদের দ্বারা জগতও স্থায়ীরূপে উপকৃত হয়, এবং সুখও তাঁহাদের অযাচিতের ন্যায় প্রাপ্তি হইয়া থাকে। কর্ত্তব্য বুদ্ধির অভাবে যে সুখের ধারণা, তাহা মূলশূন্য ধারণা সুতরাং যদৃচ্ছা-কল্পিত ও বিকৃত; এ নিমিত্ত তাহার অনুসরণ ক্রিয়া ও ফলও তদ্রূপ বিকৃত হইয়া থাকে। অতএব কেবল "সুখ" "সুখ" করিয়া মাতালের ন্যায় ভ্রান্তিমদে মাতিয়া বেড়াইও না। যেমন তোমার মূল্যশূন্য বিকৃত সুখচেষ্টা অনীতি ও অহিতাদির কারণ স্বরূপ হয়, তোমার যশচেষ্টাও তদ্রূপ; কারণ উহাও কর্ত্তব্য সাধনের পুরস্কার বিশেষ বা সুখের অংশকলা, উহাও সুখের ন্যায় উহারই জন্য অনুসর্ত্তব্য নহে। পুনশ্চ কর্ত্তব্যবুদ্ধি ব্যতীত, কেবল যশঃপ্রার্থী কখন এ জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না। ভাল, যশ কত দিনের বস্তু? কাল যথায় অনন্ত, তথায় যশ দ্বিসহস্র বা দ্বিলক্ষ বর্ষ স্থায়ী হইলেও ত

তাহা মুহূর্তবৎ! মুহূর্ত এবং বর্ষে প্রভেদ কি? ইহার ধারণা কি এতই কঠিন?

সুখের ধারণা নাস্তিকদিগের সর্ব্বদাই বিকৃত, তাহার কারণ উর্দ্ধদেশের সহ সংস্রব ছিন্নে তাহাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধির অভাব। যাহা হউক, তথাপি দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন কোন নাস্তিক এখনও আপনি না খাইয়া অন্যকে খাওয়াইয়া থাকে; আপনার ক্ষতি করিয়া অন্যের হিত করে; এখনও গুরুর প্রতি ভক্তি, লঘুর প্রতি দয়া; এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম, সত্যাসত্য, ইত্যাদির মোহ একবারে ছাড়াইতে পারে নাই। সাধ্য কি? পথে হউক অপথে হউক, মানব স্বয়ং কর্ম্মক্ষম বলিয়াই যে সকলকর্ম্মক্ষম তাহা নহে, তাহারও সীমা আছে। সুপথমুখে হউক বা কুপথমুখে হউক, তাহার সাধ্য কি যে প্রকৃতির যে নির্দ্দিষ্ট গণ্ডি তাহা একবারে অতিক্রম করিয়া স্বাধীন হয়। অতএব নাস্তিক এবং আস্তিকের মধ্যে ফলে এই পর্য্যন্ত দাঁড়ায়,—যথায় অপরে জীবন্ত বৃক্ষের পুষ্পঘ্রাণে আমোদিত, ফলের রসাস্বাদনে তৃপ্ত, নবপত্রপুঞ্জের শৈত্যে শান্ত, এবং বৃক্ষস্থ বিহঙ্গমকুলকলে মোহিত হইয়া থাকে; তথায় নাস্তিকেরও সেইই বৃক্ষ আশ্রয় বটে কিন্তু বৃক্ষ এখানে ছিন্নমূল হেতু, ফুল শুষ্ক নির্গন্ধ, ফল রসশূন্য বীতস্বাদ, পত্র শুষ্ক তাপোত্তেজক এবং কোন বিহঙ্গম আসিয়া সে বৃক্ষে আশ্রয় লয় না—যদি আসে ত সে দাঁড়কাক! কি সুখ! কি তৃপ্তি! ইহাদের নিকট বিশ্বস্থ তাবৎ বিষয় বন্ধনশূন্য এবং বিকৃত; এবং তত্ত্বস্থলে তাবৎ বিষয়েরই মূল অনিরাকৃত বা কল্পনায় নিহিত, সকলেই পৃথক পৃথক ও সামঞ্জস্যশূন্য; বহুত্বই সর্ব্বত্র, একত্ব কোথাও নাই। কিন্তু যথায় তদ্রূপ দুষ্ট বুদ্ধির অভাব, তথায়?—সর্ব্বত্রই বহুত্বের মধ্যে একত্ব বিরাজিত; সর্ব্বত্রই সকল বিষয় নিরাকৃত হইয়া মধ্যবিন্দুতে আসিয়া সমাহিত। মধ্যবিন্দু হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া তাবৎ বিষয় দিগন্ত-প্রসারিত হইতেছে, আবার সে সকলই পর্ব্বে পর্ব্বে গুটিত হইয়া মধ্যবিন্দুতে আসিয়া সংমিলিত হইয়া যাইতেছে। কি অচিন্তনীয়! কি অনন্তবিকাশী লীলা-প্রকট!

যখন মানবীয় অপরাপর সকলপ্রকার চিত্তবৃত্তি, যথা বুদ্ধি বিদ্যা তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি, পর পর পর্য্যায়ক্রমে উন্নতি প্রাপ্ত হয়; তখন বলা বাহুল্য যে

আস্তিকতা ও তাহার বৈপরীত্যসাধক নাস্তিকতা সম্বন্ধেও সেইরূপ হইয়া থাকে। যে কোন বস্তুর স্বাভাবিক অবস্থা বা বিকারে, বস্তু ফলত একই; প্রভেদ কেবল অবস্থাদ্বয়ের অন্যতর ভাব। অতএব যখন যে প্রকৃতির আস্তিকতা,তখন নাস্তিকতাও সেইরূপ প্রকৃতির হয়। আস্তিকতা যখন দেবতত্ত্ব লইয়া,নাস্তিকতাও তখন দেবতত্ত্ব লইয়া। আস্তিকতা যখন জ্ঞানকাণ্ডের উপর, নাস্তিকতাও তখন জ্ঞানকাণ্ড আশ্রয়ী। আস্তিকতা যখন বৈজ্ঞানিক, নাস্তিকতাও তখন বৈজ্ঞানিক আকার ধারণ করিয়া থাকে। বর্ত্তমান ইউরোপীয় আস্তিকতা ও নাস্তিকতা উভয়ই বৈজ্ঞানিক; বর্ত্তমান বঙ্গীয় আস্তিকতা ও নাস্তিকতা উভয়ই ফেসিয়ন-প্রাণ। আমরা যে সময়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, সে সময়ের আস্তিকতা ও নাস্তিকতা উভয়ই আংশিক দেবতত্ত্ব এবং আংশিক জ্ঞান-কাণ্ড-আশ্রয়ী। গ্রীকের নাস্তিক-শিরোমণি এপিক্যুরস্; হিন্দুর নাস্তিক-শিরোমণি চার্ব্বাক,—"যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।"

গ্রীকভূমে তত্ত্ববদ্ধ নাস্তিকতা আরিষ্টিপুসের সময় হইতে দৃষ্ট হয়। আরিষ্টিপুসের পূর্ব্বগত তত্ত্ববিৎবর্গের কাহাতে কাহাতে যদিও নাস্তিকতার আভাস দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা আরিষ্টিপুসের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসৌষ্ঠব শাস্ত্রস্বরূপে শ্রেণীনিবদ্ধ হয় নাই। আরিষ্টিপুস্ তত্ত্ববিদ্যার ব্যাবসায়ী ছিলেন। ইনি সক্রেতিসের নিকট তত্ত্বশিক্ষা করেন, শেষে আত্মবুদ্ধির কৌশলে নাস্তিকতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইনি প্লেটোর সম-সাময়িক লোক। ইহাঁর বিশ্বাসে যে কোন ব্যক্তির সঙ্গে যেমন সে সেইরূপ হইয়া, মিলিত হইতে পারাই তত্ত্ব-জ্ঞানলাভের একটি বিশেষ ফল। ইহাঁর মতে পরম পুরুষার্থ,—যে কোন উপায়ে সুখ বা প্রমোদলাভ; এবং তাহা যদি কোন অপকৃষ্ট বা ঘৃণিত উপায় দ্বারা সাধিত হওয়া প্রয়োজন হয়, তাহাতেও ক্ষতি নাই। ইনি বলিতেন শারীরিক সুখ মানসিক সুখ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং শারীরিক দুঃখ মানসিক দুঃখ অপেক্ষা মন্দ। পৃথিবীতে সুখ এবং দুঃখ এই দ্বিবিধ পদার্থ আছে,লোকে যে কোন দ্রব্য সুখজনক তাহা আহরণ করিবে ও সেইরূপ যে কোন দ্রব্য দুঃখজনক তাহা যে কোন উপায়ে পরিহার করিবে।

আরিষ্টিপুস্ অতিশয় কুতার্কিক ছিল, এবং কুতর্কযোগে অসৎকে সৎ এবং সৎকে অসৎ বলিয়া ভুলাইত। একদা প্লেটো তাহাকে অমিত-ব্যয়িতার জন্য ভৎসনা করায়, আরিষ্টিপুস্ প্লেটোকে জিজ্ঞাসা করিল,

"দিওনিস্যুস্ ভাল লোক কি না ?"

প্লেটো। "ভাল।"

আরি। "দিওনিস্যুস্ আমার অপেক্ষা অনেক অধিক ব্যয় করে অথচ সে ভাল; অতএব দেখ অধিক ব্যয় করা ও ভাল মানুষ হওয়া এক সঙ্গে না হইতে পারে এমন নহে।"

একদা কোন ব্যক্তি আরিষ্টিপুস্‌কে একটা বেশ্যা লইয়া ঘরকন্না করার নিমিত্ত ভৎসনা করিলে,

আরি। "ভাল, একটা বাড়ী যথায় বহুলোক বাস করিয়া গিয়াছে তথায় এবং যথায় কেহ কখন বাস করে নাই তথায়, এ দুই স্থানে বাস করায় কিছু প্রভেদ আছে কি না ?

উত্তর। "না।"

আ। "যে জাহাজে আগে বহুসহস্র লোক পার হইয়া গিয়াছে, এবং যাহাতে কেহ কখন পার হয় নাই, এই দুয়ে পার হওয়ার কিছু প্রভেদ আছে কি না ?

উ। "না"।

আ। "এখানেও ঠিক তাহাই, একটা স্ত্রীলোক যাহার সঙ্গে বহুলোক সহবাস করিয়া গিয়াছে, এবং যাহাতে কেহ কখন উপরত হয় নাই, আমার পক্ষে এ উভয়ই সমান।"

এই স্ত্রীলোকটি গর্ভিণী হইলে, আরিষ্টিপুসের নিকট প্রকাশ করে যে তাঁহা কর্ত্তৃক তাহার গর্ভ ধারণ হইয়াছে; ইহাতে সেই স্ত্রীলোকটার প্রতি আরিষ্টিপুসের উত্তর— "সেকি কথা! কাঁটাবন বেড়াইয়া কে কবে বলিতে পারে যে কোন কাঁটায় তাহার আঁচড় লাগিয়াছে ?" এরূপ তর্ক ও বুদ্ধি খরচে আরিষ্টিপুসের শিষ্য থিওডোরুস আরও পণ্ডিত। এই ব্যক্তি সর্ব্ববিষয়ে, বিশেষ স্ত্রীলোক সম্বন্ধে, অত্যন্ত যথেচ্ছাচারী ছিল; তজ্জন্য ইহার তর্ক এইরূপ ছিল :—

থি। "যে স্ত্রীলোক শিক্ষিত, তাহার প্রয়োজনীয়তা সেই পরিমাণে অধিক কি না?"

উ। "অধিক।"

থি। "যে বালক বা যে যুবা যে পরিমাণে শিক্ষিত, তাহার প্রয়োজনীয়তা সেই পরিমাণে অধিক কি না?"

উ। "অধিক।"

থি। "এই নিয়ম অনুসারে যে স্ত্রীলোক বা যে বালক যে পরিমাণে সুন্দর, তাহারা সেই পরিমাণে শ্রেষ্ঠ কি না?"

উ। "শ্রেষ্ঠ।"

থি। "যে যে পরিমাণে শ্রেষ্ঠ, তাহার প্রয়োজনীয়তা সেই পরিমাণে অধিক কি না?"

উ। "অধিক।"

থি। "ভাল, তাহা যদি হইল, তবে এখন দেখা যাইতেছে যে সৌন্দর্য্যের প্রয়োজনীয়তা এই যে তাহা অপরের দ্বারা সম্ভোগিত হয়; আমি সেই সম্ভোগ করিয়া থাকি। প্রয়োজনীয়তার প্রয়োজনীয় ভাব রক্ষা করাই ন্যায়সঙ্গত, তদন্যতর অন্যায়, আমি সেই অন্যায় কার্য্য করি না।"

ইহারা অর্থপ্রাপ্তির জন্য কোন প্রকার নীচতা স্বীকারে কুণ্ঠিত ছিল না। দিওনিস্যুসের নিকট আরিষ্টিপুস একদা অর্থ যাচ্ঞা করায়, দিওনিস্যুস্ বহু বিরক্ত হইয়া ও ভৎসনা করিয়া বলিলেন "তুমি বলিয়াছিলে না যে জ্ঞানীদিগের কখন অভাব হয় না?" আরিষ্টিপুস,—"আগে আমাকে কিঞ্চিৎ দিউন, পরে যাহা বলিবেন তাহার উত্তর দিতেছি"। দিওনিস্যুস্ কিঞ্চিৎ দান করিলে পর, অর্থ দেখাইয়া—"এই দেখুন আমার কথা সত্য কি না।" আর এক সময়ে,

দি। "কি জন্য তুমি এখানে আইস?"

আ। "যখন তত্ত্বজ্ঞানের আবশ্যক ছিল, তখন সক্রেটিসের দুয়ারে যাইতাম; এখন অর্থের আবশ্যক, এখন তোমার দুয়ারে আসিয়া থাকি।"

আরও এক সময়,

দি। "তত্ত্ববিদেরা কি কারণে ধনীর দুয়ারে আসিয়া থাকে, ধনীরাত তত্ত্ববিদের দুয়ারে যায় না?"

আ। "তাহার কারণ তত্ত্ববিদেরা আপন অভাব যাহা তাহা বুঝে, ধনীরা আপন অভাব বুঝে না।"

ইহার মতে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতে, ভাঙ্গা এবং আভাঙ্গা ঘোড়ায় যে প্রভেদ সেই প্রভেদ। আরিষ্টিপুসের শিক্ষায় 'ন্যায়' 'যশ' 'অযশ' বলিয় বস্তুত কোন পদার্থ নাই, লোকের মনের খেয়াল হইতে ঐ ঐ বিষয় উৎপন্না ও বদ্ধমূল হইয়া ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

থিওডোরুসের মতে,—'সুখ এবং দুঃখ, এই দুইটি মুখ্য বস্তু। সুখ জ্ঞানের দ্বারা লাভ হয়, দুঃখ অজ্ঞান হইতে প্রবর্ত্তিত হয়। বন্ধুত্ব বলিয়া কোন পদার্থ নাই, কারণ তাহা কি নির্ব্বোধ কি জ্ঞানী কাহারই কার্য্যে লাগে না যেহেতু, প্রথমোক্ত ব্যক্তিদিগের নিকট কার্য্য উদ্ধার হইলেই বন্ধুত্বের কারণ লোপ হইল; এবং জ্ঞানী যাহারা তাহারা আপনাতেই পূর্ণ আত্মা, অন্যের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে না। বিজ্ঞতা থিওডোরুসের মতে প্রধান আচরণীয় গুণ। যে ব্যক্তি জ্ঞানী ও বিজ্ঞ সে কখন স্বদেশ-প্রিয়তার মোহে আশঙ্কার স্থলে পা দেয় না, কারণ কি জন্য সে পাঁচ জন মূর্খের মঙ্গল হেতু আপনার বিপদ জড়াইতে যাইবে; বিশেষ যে ব্যক্তি জ্ঞানী, দেশ তাহার নিকট কোন সীমাবদ্ধ স্থান নহে, সমস্ত পৃথিবীই তাহার দেশ। জ্ঞানী ব্যক্তি যে, সে স্বচ্ছন্দে চুরী, বেশ্যাগমন বা যে কোন অপকর্ম্ম সময় মত করিতে পারে; কেবল এই পর্য্যন্ত দেখা আবশ্যক যে, যে সকল নির্ব্বোধমণ্ডলীর ধারণা অনুসারে ঐ ঐ গুলি অপকর্ম্ম বলিয়া গণিত, তাহাদের দৃষ্টিতে না পড়ে কারণ সমাজ রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। জ্ঞানী ব্যক্তি দেশ কাল পাত্র বজায় রাখিয়া যে কোন বিষয়ে মনের সাধ মিটাইতে পারেন। এইটি সত্য, এইটি অসত্য, ইত্যাদি ন্যায় অন্যায়, সৎকর্ম্ম অপকর্ম্ম, এ সকল কেবল লোকের ধারণা ও চলিত রীতি হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে, তদ্ভিন্ন উহাদের আর কোন অর্থ বা মূল নাই।' ইত্যাদি। ইহাই অল্প ইতর বিশেষে আরিষ্টিপুসের সাম্প্রদায়িক তাবৎ নাস্তিকের মত। আরিষ্টিপুসের সম্প্রদায় ব্যতীত, ইউক্লিড ও বিওন

প্রভৃতি আরও বহুতর নাস্তিক তত্ত্ববিৎ ও তাহাদের শিষ্যানুশিষ্য প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল।

হিন্দুদিগের মধ্যে নাস্তিকতা-পর্ব্বে চার্ব্বাক-দর্শন, তৎপূর্ব্বগত বৃহস্পতি-সূত্র, তৎপূর্ব্বগত রামায়ণস্থ জাবালির উক্তি দৃষ্ট হয়। জাবালির উক্তি রামায়ণ হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে। জাবালি রামকে বুঝাইতেছেন,—

"রাম, তুমি সুবুদ্ধি এবং তপস্বী, সামান্য মানবের ন্যায় তোমার পিতৃবাক্য প্রতিপালন বিষয়িণী বুদ্ধি নিরর্থক না হউক। কিন্তু পিতা পুত্র সম্বন্ধই মিথ্যা; এ জগতে কে কাহার বন্ধু, কাহার দ্বারা কোন পুরুষ কি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জীব একাকীই জন্মগ্রহণ করে, আর একাকীই বিনষ্ট হয়, অতএব ইনি মাতা, ইনি পিতা, এইরূপ সম্বন্ধ নিবন্ধন পূর্ব্বক যে ব্যক্তি তাহাতে আসক্ত হয়, তাহাকে উন্মত্তবৎ জ্ঞান কর, কেহই কাহারও নয়। যেমন কোন লোক গ্রামান্তরে গমন করত কোন গৃহের বহির্ভাগে বাস করে, পরদিন সেই আবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিয়া থাকে, তেমনি পিতা মাতা গৃহ ধন সম্পত্তি মনুষ্যগণের আবাস মাত্র। হে কাকুৎস্থ! সজ্জনগণ এ বিষয়ে সংসক্ত হয়েন না।" পুনশ্চ,

"দশরথ তোমার কেহই নহেন, তুমিও তাঁহার কেহই নহ, রাজা স্বতন্ত্র তুমি স্বতন্ত্র, অতএব আমি যাহা কহিতেছি তাহাই কর। পিতা জীবগণের বীজ, অর্থাৎ নিমিত্ত কারণ মাত্র, ঋতুমতী মাতার গর্ভে একত্র মিলিত শুক্র ও শোণিতই উৎপাদনের কারণ, অর্থাৎ তাহাতেই ইহলোকে পুরুষের জন্ম হয়। সেই নৃপতি যে স্থানে গমন করিয়াছেন, তোমাকেও তথায় যাইতে হইবে, সুতরাং তাঁহার সহিত তোমার সম্বন্ধ কি? জন্তু সকলের স্বভাবই এইরূপ, কিন্তু তুমি পুরুষার্থ ভোগে নিস্পৃহ হওয়া বৃথা নষ্ট হইতেছ। যাহারা প্রত্যক্ষসিদ্ধ রাজ্যাদিরূপ পুরুষার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপ্রত্যক্ষ পারলৌকিক ধর্ম্ম আশ্রয় করিতে তৎপর হয়, আমি তাহাদিগের জন্য দুঃখ প্রকাশ করি; অন্যের জন্য শোক করি না, কেন না তাহারা ইহলোকে দুঃখভোগ করিয়া জীবনান্তে নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অষ্টকা-প্রভৃতি পিতৃদৈবত্য শ্রাদ্ধ করিতে যে লোকে প্রবৃত্ত হয়,

সে কেবল নিজ ভোগ সাধন অন্নাদির হেতু; দেখ মৃত ব্যক্তি কি ভোজন করিবে? এই স্থানে অপরের কর্ত্তৃক ভুক্ত অন্ন যদি অপরের উদরে গমন করে, তবে প্রবাসস্থ ব্যক্তির উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করিয়া অন্নদান করুক, কৈ এরূপ করিলে তাহাতে ত পথিকের পাথেয় হয় না। দেবপূজা কর, অন্নদান কর, যজ্ঞে দীক্ষিত হও, তপস্যা কর এবং সন্ন্যাস অবলম্বন কর,এই সকল দানের বশীকরণোপায় স্বরূপ বেদাগমাদি গ্রন্থ মেধাবী ধূর্ত্তগণ স্বার্থসম্পাদন কারণ ও পামরগণ বঞ্চনা করিবার জন্য প্রস্তুত করিয়াছে। হে মহামতে! ইহলোকের পর পারলৌকিক ধর্ম্মাদি কিছুই নাই, তুমি নিজ বুদ্ধিতে ইহা বিজ্ঞাত হও, যাহা প্রত্যক্ষ হইতেছে তাহাই অনুষ্ঠান কর, আর অনুমানাদিগম্য পরোক্ষকে পরিত্যাগ কর।"১—অঘোর নাথ তত্ত্বনিধির অনুবাদ। উপরে উদ্ধৃত অংশ যথার্থতই বাল্মীকির লেখনীনিসৃত কি না, সে মীমাংসা স্বতন্ত্র। সে মীমাংসার স্থান এখানে নহে।

এক্ষণে বৃহস্পতিসূত্রের বুদ্ধিযোগে তর্কসমুদ্র মন্থনের ফল দেখা-যাউক। "কামশাস্ত্রানুসারেণার্থকামাবেব পুরুষার্থৌ" কামশাস্ত্রানুসারে অর্থ এবং কামই পুরুষার্থ। চার্ব্বাকমতে "অঙ্গনালিঙ্গনাদি জন্যং সুখমেব পুরুষার্থঃ" অঙ্গনা আলিঙ্গনাদি জন্য যে সুখ, তাহাই পুরুষার্থ। বৃহস্পতিসূত্র হিন্দুনাস্তিকগণের বেদস্বরূপ। হিন্দুদিগের মধ্যে সকল আস্তিক তত্ত্ব যেমন বেদের দোহাই দিয়া থাকে, তেমনি সকল নাস্তিক তত্ত্ব বৃহস্পতিসূত্রের দোহাই দেয়। এখন দেখ বৃহস্পতির শেষ শিক্ষা কি, ২—"স্বর্গও নাই, অপবর্গও নাই, পরলোকগামী আত্মাও নাই। বর্ণ ৩ আশ্রমাদির ফলদায়িকা যে কোন ক্রিয়া তাহাও কিছুই নাই।

১। রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড ১০৮ সর্গ।

২। সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ ধৃত বৃহস্পতি বাক্য।

৩। নাস্তিকদিগের পক্ষে বর্ণাশ্রমাদি স্বীকার করিবার কোন আবশ্যকতা নাই, এবং স্বীকারও করে না। বর্ণাশ্রমাদি যে সিদ্ধ নহে, নাস্তিকের তদ্বিষয়ক কারণ বা বিচার নৈষধকার চার্ব্বাকের মুখ দিয়া এরূপে প্রকাশ করিয়াছেন,—

"শুদ্ধির্বংশদ্বয়ী শুদ্ধৌ পিত্রোঃপিত্রোর্যদেকশঃ।
তদনন্তকুলাদোষাদদোষা জাতিরস্তিকা।।"

—নৈষধ ১৭ সর্গ।

অগ্নিহোত্র, বেদত্রয়, দণ্ডধারণ, ও ভস্মগুণ্ঠন, এ সকল বুদ্ধিপৌরুষহীন ব্যক্তিদিগের উপজীবিকা মাত্র। জ্যোতিষ্টোমে নিহত পশু যদি স্বর্গে গমন করে, তবে যজমান কি জন্য আপন পিতাকে সেই রূপ হিংসা না করিয়া থাকে? যে সকল জীব মৃত, শ্রাদ্ধ যদি তাহাদের তৃপ্তির কারণ হয়, তবে এখান হইতে দূরগামী ব্যক্তির পাথেয় কল্পনা করার আবশ্যকতা কিছুই নাই। এখান হইতে কৃত দানে যদি স্বর্গস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তিলাভ হয়, তবে এখানে প্রদত্ত দ্রব্যে প্রাসাদোপরিস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তিলাভ না হইবে কেন? অতএব সে সকল কোন কাজের কথা নহে। যতকাল বাঁচিবে, সুখে কাটাইবে, এবং ধার করিয়াও যদি ঘৃতাদি সুখকর দ্রব্যাদি খাইতে হয় তাহাও খাইবে, কারণ এই দেহ একবার ভস্মীভূত হইলে আর তাহার ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা নাই। যদি আত্মা এই দেহ পরিত্যাগে পরলোকে যাইতে পারে, তবে কি জন্য বন্ধুস্নেহসমাকুল হইয়া পুনঃ পুনঃ না আইসে? মৃত ব্যক্তির প্রেতকার্য্যের আর কোন অর্থ দেখিতে পাই না, কেবল এক ব্রাহ্মণের জীবনোপায় বলিয়াই বিহিত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ধূর্ত্ত ভণ্ড নিশাচর, এই তিন জন বেদের কর্ত্তা।”

চার্ব্বাক কেবল উক্ত মত, প্রমাণাদি প্রয়োগ দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন মাত্র। ইহার মতে ভূত চতুর্ব্বিধ,ক্ষিতি,অপ,তেজ ও মরুত। যেমন ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য সংযোগে মদ বলিয়া বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট বিভিন্ন একটি পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে, এই ভূতচতুষ্টয়ের সংযোগেও তেমনি চৈতন্যের উদয় হয়; আবার সেই সংযোগ ভাঙ্গিয়া গেলেই চৈতন্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়, এবং তাহাতে পরলোক বা প্রেত সংজ্ঞার কোনই আবশ্যকতা দেখা যায় না। চৈতন্যবিশিষ্ট দেহে, দেহের অতিরিক্ত যে আত্মা আছে সে পক্ষে প্রমাণাভাব,সুতরাং তাহা অসিদ্ধ। প্রমাণ একমাত্র যাহা প্রত্যক্ষ তাহাই গ্রাহ্য; অনুমানাদি প্রমাণ নহে। ইহার মতে ইষ্টানিষ্ট বা অদৃষ্ট নাই, জগদ্বৈচিত্র আকস্মিক এবং স্বভাব হইতে উৎপন্ন। অঙ্গনা আলিঙ্গনাদি জন্য সুখ প্রাপ্তিই একমাত্র পুরুষার্থ, মানব তাহারই অনুসরণ করিবে। সুখ প্রাপ্ত হইতে হইলে দুঃখও অপরিহার্য্য,যেহেতু সকল বস্তুই সুখদুঃখজড়িত।

কিন্তু তাই বলিয়া সুখানুসরণে ক্ষান্ত হইবে না। তাহা এইরূপ উপমা দ্বারা দেখাইতেছে,—দেখ মৎস্যে শল্ক কণ্টকাদি আছে, তাই বলিয়া কি মৎস্য ভক্ষণ পরিত্যাগ করিবে; অথবা ভিক্ষুকে জ্বালাতন করে বলিয়া কে অন্নাদি পাক করিয়া না খায়, ইত্যাদি। যদি কোন ভীরু দুঃখের ভয়ে সুখ পরিত্যাগ করে, তবে সে পশুবৎ মূর্খ। "যদি কশ্চিৎ ভীরু দৃষ্টং সুখং ত্যজেৎ তর্হি স পশুবন্মূর্খো ভবেৎ।"

অতঃপর গ্রীকনাস্তিকচূড়ামণি এপিকুরসের নাস্তিকতার সারতত্ত্বগুলির কোন কোন অংশ, অগ্রে দিওগিনীস লেয়ার্টিওস হইতে সংগ্রহ করিয়া নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

"যাহা তৃপ্তিকর এবং ধ্বংস হয় না, যাহা স্বয়ং ক্লেশকর নহে বা অন্যের পক্ষেও ক্লেশকর হয় না, আরও যাহা অন্যের ক্রোধ বা অকৃতজ্ঞতার কারণোদ্দীপক হয় না, তাহাই পরম পুরুষার্থ ও প্রকৃত সুখ পদার্থ স্বরূপ।

"মৃত্যু কিছুই নহে; কারণ যাহার ধ্বংস হয় তাহার অনুভবশক্তি রহিত হইয়া থাকে, যাহার অনুভবশক্তি রহিত হয়, তাহা অবশ্যই আমাদিগের নিকট কিছুই নহে।

"ন্যায়সঙ্গত ভাবে, সততা ও বিজ্ঞতার সহিত না চলিলে, প্রকৃত সুখসম্পৃক্ত রূপে জীবনাতিবাহন করা অসম্ভব; অথবা প্রকৃত সুখসম্পৃক্ত রূপে জীবনাতিবাহন করিতে গেলে, ন্যায়সঙ্গত, সততা এবং বিজ্ঞতার সহিত না চলা অসম্ভব। যে ব্যক্তি ন্যায়সঙ্গত ভাবে ও সততা এবং বিজ্ঞতার সহিত না চলে, সে কখন সুখী হইতে পারে না।

"যে কোন প্রকারে উৎপন্ন সুখ বস্তুতঃ মন্দ নহে; কিন্তু যে যে কারণ যোগে সেই সুখের উৎপত্তি হয়, তাহার আনুষঙ্গিক ব্যতিক্রম গুলির প্রাচুর্য্য হেতুই তাহা দূষণীয় হয়।

"কেবল মনুষ্য-সম্ভব ও সাধ্য সুখকর বস্তু আয়োজন করিতে পারিলেই যে সুখী হইয়া থাকে এমন নহে; যে পর্য্যন্ত পরলোক, নরক, ও অপরাপর অদৃষ্টশক্তি হইতে ভয়ের নিরাকরণ করিতে না পারে, সে পর্য্যন্ত সুখের সম্ভাবনা অতি অল্পই।

"অপরিমিত ক্ষমতা এবং ধনে, মনুষ্য সম্বন্ধে মানবকে কিয়ৎ পরিমাণে নিঃশঙ্ক করিতে পারে বটে; কিন্তু সর্ব্ববিষয় সম্বন্ধে নিঃশঙ্ক ভাবের জন্য আকাঙ্ক্ষার ক্ষান্তি ও আত্মার শান্তির আবশ্যক হইয়া থাকে।

"জ্ঞানী ব্যক্তি যাহারা তাহারা প্রায়ই সৌভাগ্য দ্বারা তিরস্কৃত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের মনীষাশক্তি তাহাদিগকে যে শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট রত্ন সকল নিয়ত প্রদান করে, তাহাই তাহারা সর্ব্বদা সম্ভোগ করে এবং আজীবন করিতে থাকিবে।

"যে ব্যক্তি ন্যায়পথগামী সে সর্ব্বত্রই স্বাধীন, এবং সর্ব্বদাই সুর্দ্ধ- লোক সমক্ষে শান্তি ভোগ করিয়া থাকে। অন্যায়কারী যে, সর্ব্বদাই সে তদ্বিপরীত ভাবের নিকট শঙ্কিত হয়।

"আমরা যুক্তিশক্তির সহায়তায় শরীরের পরিণাম এবং ধ্বংস নিরাকরণ করিয়া, পরলোক বা অনন্ত সম্বন্ধীয় ভীতি হইতে যদি মুক্ত হই এবং পরলোকের সম্বন্ধ হইতে একেবারে মুক্ত হইতে পারি, তাহা হইলে এই জীবন যে কোন প্রকার সুখানুভব ও সুখ পদার্থের সংগ্রহে পারক হয়। মনের ভাব এইরূপ অর্থাৎ ভয়শূন্য করিতে পারিলে মানব, তাহার ক্লেশ জীবনের ক্ষয়করীরূপে যন্ত্রণাদায়ক হইলেও, তাহার মধ্যে সুখী হইতে পারে; এবং এরূপ অবস্থায় যে মৃত্যু তাহা কেবল সুখ-জীবনের সীমাপ্রাপ্তি বা নিবৃত্তি ভিন্ন কিছুই নহে।

"'ন্যায়' ভাবের বস্তুত কোন অস্তিত্ব নাই; ইহা পরস্পর লৌকিক অঙ্গীকার হইতে উৎপন্ন হয়, এবং পরস্পর পরস্পরের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত বা ক্লেশবিদ্ধ হইতে না হয় এরূপ অর্থেই সংঘটন হইয়া থাকে।

"'অন্যায়' ভাব বস্তুত মন্দ নহে; তবে ইহা মন্দ এই জন্য যে ইহার সঙ্গে এরূপ ভয় সংযোজিত আছে যে, যাহারা অন্যায় নিবারণে নিয়োজিত তাহাদের দ্বারা ধৃত হওন ও শাস্তিপ্রাপ্ত হওন হইতে পলাইবার সম্ভব নাই।

"অমুক বিষয় করিব না;" পরস্পরের অহিতকর বা ক্লেশজনক অমুক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব না; পরস্পরের সহ যে এরূপ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়া যায়, কোন মানব গোপনে গোপনে তাহার অন্যথাচরণ করিবে

না বা তাহা করা উচিত নহে। কারণ, যদিও সে সহস্রবার এরূপ করিয়া সহস্রবার ফাঁকি দিতে সক্ষম হইয়াছে, তথাপি এরূপ বিবেচনা করা অন্যায় যে সে বরাবর ফাঁকি দিতে সক্ষম হইবে, যেহেতু তাহার মৃত্যু পর্য্যন্ত জীবিতকালে সে যে কখন ধরা পড়িবে বা পড়িবে না তাহার স্থিরতা নাই।

"যে সর্ব্বজনসমক্ষে নিঃশঙ্ক ভাবে জীবনাতিবাহিত করিতে ইচ্ছা করে, সে সকলেরই সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপন করিবে। যাহাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব সম্ভব নহে, অন্ততঃ তাহাদের সহ শত্রুতা যাহাতে পরিহার হয় সেরূপ করিয়া চলিবে। যদি তাহাও সম্ভব না হয়, তবে আত্মস্বার্থ বজায় রাখিয়া যতদূর সাধ্য তাহাদের সংস্রবে আসিবে না।

"সেই ব্যক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা পরম সুখী যে এরূপ অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, যথায় পার্শ্ববর্ত্তী কোন বিষয় হইতেই তাহার ভয়ের সম্ভাবনা নাই। এরূপ লোক পরস্পরের উপর পূর্ণ বিশ্বাসবুদ্ধি সহ, পরস্পরের বন্ধুত্ব সুখ পূর্ণ ভাবে ভোগ করিয়া, অথচ কোন বন্ধুর অকাল মৃত্যু হইতে শোকসন্তপ্ত না হইয়া, সর্ব্বজন সহ সৌহার্দ্দ সুখে সম্পৃক্ত ভাবে জীবনাতিবাহন করিয়া থাকে।"

আমূলত পর্য্যালোচনায় দেখা যাইতেছে যে এপিকুরসের প্রবর্ত্তিত তত্ত্বের মূলমন্ত্র ভয়। কি লৌকিক কি পারলৌকিক যাবতীয় প্রকারের ভয়ের নিরাকরণ করিয়া, ইহলৌকিক সুখাদি যথাসম্ভব উপভোগ করাই পরম পুরুষার্থ। অন্যান্য নাস্তিকগণ, পরলোকবুদ্ধিকে একবার উড়াইতে পারিয়া, বাঁধা ঘোড়ার বন্ধনবিহীনতার ন্যায় যেমন একেবারে দিগ্‌দিক্‌শূন্য হইয়া ছুটিয়াছে; এপিকুরসে, যদিও সে পরলোক নিরাকৃত এবং ন্যায়-অন্যায় জ্ঞান মূলশূন্য, তথাপি সে স্বাধীনত্ব ও যথেচ্ছাচারী ভাব তেমন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। তাহার কারণ, ইহার পরলোকের প্রতি ভয় এমন যে, তাহার নিরাকরণ করিতেই অবসর পর্য্যবসিত হইয়াছে, তদতিরিক্তে উন্মাদিত হইতে আর অবসর পাইয়া উঠেন নাই। চিরভয়শূন্য গ্রীকচিত্তে, পরলোকবোধের সহসা জাগরিত নববুদ্ধি এতই ভয় সঞ্চালনে সমর্থ হইয়াছিল!—অনন্তের মধ্যে সহসা

অভ্যাস, সাধারণত অপেক্ষা সহজেই কিছু উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে। এপিক্যুরসের ন্যায় অন্যায়, সৎ অসৎ, সত্য অসত্য ইত্যাদি ভাল মন্দ, কেবল ভয়ের কারণ ও তদন্যতর হইতে গঠিত। দেখা যাইতেছে যে ইহার মতে সুখ যাহা তাহা ভয়ের নিরাকরণে, দুঃখ যাহা তাহা ভয়ের আধিক্যে। ভয়ের বিনাশ নিমিত্ত বন্ধুত্বের প্রয়োজন; এবং লোকাতীত ভয়ের দূর করার জন্য নাস্তিকতা-জ্ঞানের আবশ্যক। এপিক্যুরস বোধ হয় নিতান্তই ভয়ভ্রান্ত ছিলেন। দুঃখের নিরাকরণ করিতে গিয়া বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ; আর ভয়ের নিরাকরণ করিতে গিয়া এপিক্যুরসের নাস্তিকতা। যতদূর অনুসন্ধানে পাওয়া যায়, এপিক্যুরসের জীবন অপেক্ষাকৃত নীতিসম্পন্ন ছিল, এবং মৃত্যুকেও ইনি সহাস ও সদানন্দ চিত্তে আলিঙ্গন করেন। ইহার পরবর্ত্তী শিষ্যবর্গে আর সেরূপ ভাব থাকে নাই; তাহারা বহু পরিমাণে যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠিয়াছিল।

এপিক্যুরস কহিয়া থাকেন, এই বিশ্ব অনন্ত; পরমাণু সহযোগে নির্ম্মিত। পরমাণু অনন্ত বিভাগে বিভাজ্য নহে, কেবল ইহার গুণের পরিবর্ত্তন সম্ভব। পৃথিবী একটা নহে, বহুতর এবং অসংখ্য। পরমাণু অবিরত গতিশীল; সেই গতিযোগে এবং পরস্পর সংযোগে রূপের উৎপত্তি হইয়া থাকে। শরীরাদি বলিয়া আমরা যাহা প্রত্যক্ষ করি, তাহা ঐরূপ রূপ বিশেষ। শ্রবণ ঘ্রাণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত পদার্থগুলি, বহির্জগৎস্থ পদার্থনিচয়ের সহ ইন্দ্রিয়-পদার্থ সমগুণধর্ম্মাদিবিশিষ্ট হওযায়, তাহাদের পরস্পর আকর্ষণ ও ঘাত প্রতিঘাতে, সমুৎপাদিত হয়। চৈতন্য ও জ্ঞান যাহা, তাহা শরীরের অভ্যন্তরস্থ কতকগুলি সূক্ষ্ম পরমাণুর সূক্ষ্ম সমাবেশ হইতে উৎপন্ন হয়। উহা যথায় যে প্রকার ও যে পরিমাণে সমাবিষ্ট, তথায় সেইরূপ বিভিন্ন ভাব ও স্বভাব প্রকাশ করিয়া থাকে; এবং ইহা হইতে মানব বিভিন্ন প্রকৃতির হয়। ঐ পরমাণুর ক্রিয়াশক্তি সর্ব্বত্র দেহের সঙ্গে সম্বন্ধবান, এজন্য তাহার যে কিছু কার্য্য তাহা সমস্ত শারীরিক ইন্দ্রিয়কে স্পর্শ করিয়া থাকে। আবার ঐরূপ শরীর-কার্য্য যাহা তাহা আত্মাকে স্পর্শ করে, এজন্য পরস্পর পরস্পরের সুখে ও দুঃখে সুখদুঃখবান্। দেহের সহ আত্মা ও

চৈতন্যের ধ্বংস হয়। এই জীব ও চৈতন্যাদির বীজ অন্য কোন পৃথিবী বা অনন্ত গর্ভ হইতে যে পৃথকরূপে আনীত ও নিহিত হইয়াছে এরূপ নহে। এই পৃথিবীতে যে বীজ নিহিত এবং এই পৃথিবী হইতে স্বতঃই তাহা উৎপন্ন হইয়াছে। আকাশস্থ গ্রহ নক্ষত্রাদি দর্শনে মানব বিস্ময়রসে মগ্ন হইয়া এবং তাহাদিগকে চৈতন্যবিশিষ্ট রূপে কল্পনা করিয়া, তাহাদিগের উপর দেবত্ব ভাব আরোপ করে; এবং এইরূপে লোকাতীত শক্তি ও স্বর্গ নরকাদির ভয় মানবের মনে বদ্ধমূল হয়। এক্ষণে এপিক্যুরস দেখাইতেছেন যে, মানব এইরূপে আপনার কল্পনা হইতে উত্থিত ভয়ে আপনি আবদ্ধ হইয়া, নিজের অসুখের কারণ নিজে উৎপাদন করিয়া থাকে।

ঈশ্বর ও দেবতাবর্গ সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, যদি তাহাদের প্রতি বিশ্বাসের অবলম্বনে জীবন নীতিপথে অতিবাহিত করিতে পার, ও উপাসনা ও অর্চ্চনাদির দ্বারা পরলোকের ভয় হইতে পরিত্রাণ পাও, তাহা হইলে সেই দেবতত্ত্ব কল্পিত হইলেও, তাহাকে অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। বরং দেবতায় বিশ্বাস করা ভাল, তথাপি প্রাকৃতিক তত্ত্বদর্শীর অপরিহার্য্য ও অনতিক্রম্য অপরিণামদর্শী হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য প্রয়োজনজালে জড়িত হওয়া ভাল নহে। এপিক্যুরস বলেন যে যদি দেবতা ও ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে চাও, তবে যত দূর পবিত্র ও দিব্য বিভূতি ঐ দেবতত্ত্বজ্ঞানের সহিত সংযোজিত করিতে পার ততই প্রার্থনীয়। যে দেবচরিত্রে সকলে বিশ্বাস করিয়া থাকে, তাহাতে অবিশ্বাস করা তত দূষণীয় নহে; যত সাধারণ লোকে তাহাদের সাধারণ জ্ঞানের অনুকরণে দেবচরিত্রে যে অপকৃষ্ট বিভূতি আরোপ করিয়া থাকে তাহা। ফলত এপিক্যুরসের উদ্দেশ্য, যে কোন পদার্থ আদর্শ করিয়া হউক, নৈতিক ভাবে ও সুখে জীবনাতিবাহন ও পরলোকের প্রতি ভয়শূন্য হওন মনুষ্যজ্ঞানের মুখ্য ফল হওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি বলিতেছেন,—যুবাও যেন ইহার অনুসরণ করিতে মনে না করে যে তাহার এখনও সময় আছে, অথবা বৃদ্ধও যেন এমন মনে না করে যে তাহার সময় নাই। আত্মার শিক্ষাকল্পে কোন সময়ই অযোগ্য বা প্রতিকূল নহে।*

* এপিক্যুরস হইতে মিনিকিওসের নিকট পত্র।

অন্যান্য নাস্তিক তত্ত্ববিদের ন্যায় এপিকুরসও প্রত্যক্ষপ্রমাণবাদী। পরমাণু সকলের সংযোগে রূপের সঞ্চার হয় ও তাহাতেই সৃষ্টি প্রকাশমান হইয়া থাকে। পরমাণু অবিরত গতিশীল, এজন্য তাহাদের সংযোগজাত রূপ যাহা, তাহাও অনবরত পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে। কিন্তু সেই 'রূপ' কতক অংশ পরমাণু বিক্ষেপ দ্বারা যে প্রতিভাস রাখিয়া যাইতেছে, ও আমাদের শরীর সমগুণধর্ম্মী হওয়ায় যে প্রতিভাস সেই শরীরে পতিত হইবাতে ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইতেছে, তাহাই একমাত্র প্রমাণস্বরূপে বিচারস্থলে অবলম্বিত হওয়া উচিত। চিত্তবৃত্তি সকলের অনুভূত বিষয়ও প্রমাণস্থলে গ্রাহ্য হইতে পারে, কিন্তু অগ্রে তাহার প্রামাণ্যভাব রূপ-প্রতিভাস-জনিত জ্ঞান দ্বারা পরীক্ষিত হওয়া উচিত। যদি সে পরীক্ষায় তাহা তিষ্ঠে, তবেই তাহা প্রমাণ; নতুবা ভ্রমের কারণ স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। ভ্রম প্রধানত এই দুই কারণে উৎপন্ন হয়, প্রথম যখন এরূপ বিশ্বাস থাকে যে আমার এই মত প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত অবশ্যই হইবে: এরূপ স্থলে যখন প্রমাণ পদার্থ না পাওয়া যায়, তখন আমাদের কল্পনা বা চিন্তাশক্তির প্রবর্ত্তনা সেই অভাব পূরণের সহায়তা করিয়া থাকে। সেই প্রবর্ত্তনা যদিও মূলে কোন রূপ-প্রতিভাস সংস্রবে উৎপন্ন হইয়াছে বটে, কিন্তু পরে তাহার আর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রূপ-সংস্রব না থাকায়, ভ্রমের উৎপত্তি হইয়া থাকে। দ্বিতীয়ত, যেরূপ রূপ-প্রতিভা প্রত্যক্ষ এবং অনুভূত হইতেছে, চিন্তাশক্তি যখন তাহাকে তাহার অতিরিক্ত বুদ্ধিতে লইয়া যায়। যে কোন বিষয় এইরূপ প্রকারের প্রমাণ গ্রহণ ও ভ্রম নিবারণ পূর্ব্বক যুক্তি দ্বারা স্থাপিত করিলে, তাহাই যথার্থ সত্য স্বরূপ হয়।

আশ্চর্য্য! মানব কি সামান্য বিষয়ের উপর নির্ভর করিয়া, কি গুরুতর বিষয় সকল মীমাংসা ও নিরাকরণ করিতে উদ্যত হইয়া থাকে! প্রতি কাল পরিবর্ত্তনে প্রতি দর্শনমথিত মতাদি অকর্ম্মণ্যতায় পড়িয়া যাইতেছে, অথচ প্রতি দার্শনিক ভাবিয়া থাকে আমি যাহা করিলাম, ইহা অভ্রান্ত এবং সর্ব্বকামপ্রদ। না হইবে কেন, নিত্য শত শত লোক মরিতে দেখিয়াও যে মানব আপনাকে অমর বলিয়া জ্ঞান করে,

সে মানবচিত্তের পক্ষে স্বকৃত মত যে অভ্রান্ত এবং সর্ব্বকামপ্রদ বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাতে বিচিত্র কি?

নাস্তিক-তত্ত্ববিদ্যার ভাল মন্দ ভেদ অতি অল্পই, ইহা ফলে সর্ব্বত্রই সমান, এবং শিষ্যবর্গ সর্ব্বত্র পরিপক্ব ষণ্ডা হইবার কথা। নাস্তিকতার গুণ এমনি যে মানবকে পাষণ্ড হইতেই হইবে!—এপিকুরসের সৎশিক্ষা সত্বেও এপিকুরসের শিষ্যবর্গের যথেচ্ছাচার জগৎপ্রসিদ্ধ। ফলত, গ্রন্থিসূত্রের অভাবে কখন মাল্য সজ্জিত হইতে পারে না; বিক্ষিপ্ত ছন্ন ভাবই সেরূপ স্থলের নিয়ম। পুনশ্চ প্রকৃতির মিথ্যা বা অচিৎভাগ যাহার মূল, সে তত্ত্ব কখনই সুফল প্রসব করিতে পারে না। ফল সর্ব্বদা মূলেরই ধর্ম্ম অনুসরণ করিয়া থাকে।

এক্ষণে দেখা যাউক, নাস্তিকতত্ত্ব জাতীয় প্রকৃতি অনুসারে কিরূপ বিভিন্ন প্রকৃতির হইয়াছে ও কতদূর জাতীয় জীবনের উপর আধিপত্য ও তাহাকে চালিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। গ্রীক নাস্তিকতত্ত্ব বহুলাংশে প্রাকৃতিক-বিজ্ঞান-প্রাণ, আর হিন্দু নাস্তিকতত্ত্ব তাহার বিপরীতে বহুলাংশে অনন্বিত স্বাত্ম-চিন্তা-প্রাণ। আরিষ্টিপুস ও তদীয় সাম্প্রদায়িক থিওডোরুস প্রভৃতির যে নাস্তিকতা, তাহা ষণ্ডামির নাস্তিকতা; এবং এপিকুরসের যে নাস্তিকতা, তাহা ভয়ের তাড়নে নাস্তিকতা, বলা অধিক যে ইহা সমস্তই গ্রীক প্রকৃতির সহ সমধর্ম্মী, এবং ঐরূপ প্রকৃতি হইতে ঐরূপ ফলই আশা করা গিয়া থাকে। আরিষ্টিপুসের সময়ে লোকের পরিষ্কার পারলৌকিক অস্তিত্ব জ্ঞান কেবল প্রভাত হইয়াছিল মাত্র। স ক্রটিদের দ্বারা পূর্ব্বে উহা উপলব্ধ হইয়া, প্লেটো কর্তৃক তখন তর্কতত্ত্বাদি দ্বারা সম্প্রসারিত হইতেছিল। এই সময়ে আরিষ্টিপুসের নাস্তিকতা যেন তাহার প্রতিহিংসা ও প্রতিদ্বন্দ্বীস্বরূপে উত্থিত হয়; এবং প্লেটোর দ্বারা যে পরিমাণে সতের মহিমা কীর্ত্তিত হইতেছিল, উহারা সেই পরিমাণে অসৎকে বাড়াইয়া তাহাকে আসন প্রদান করিতেছিল। এপিকুরসের সময়ের ভাব ভিন্নতর; তখন কি পরলোকবুদ্ধি কি সামাজিক বুদ্ধি উভয়ই ঘোর ভয়সঙ্কুল ভাব ধারণ করায়, তাহা হইতে মুক্তির উপায় স্বরূপ এপিকুরসের নাস্তিকতার উৎপত্তি হয়। ভয়ের মোহ ছাড়াইলেও,

তাহার ছায়াতে ও আজন্ম সংস্কারের অনিবার্য্য প্রভাবে, মানবকে নম্র করিয়া রাখে; এই নিমিত্ত এপিকুরাসের তত্ত্বে তেমন অমিশ্রিত অসতের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশেষত এই ছায়া যতই বিকৃত ভাবযুক্ত হউক না কেন, ইহা সৎপদার্থ-উদ্ভূত যে ভয় তাহার ছায়া; সুতরাং ইহার কিঞ্চিন্মাত্র বর্ত্তমানতা থাকিলে, অসৎকে অবশ্যই সেই পরিমাণে হীন-অঙ্গ হইতে হইবে। সত্তের ছায়া হইলেও, সাধ্য কি যে অসৎ তাহার সম্মুখে সবিকাশে তিষ্ঠিতে সমর্থ হয়; সত্তের শক্তি এতই প্রখর এবং সর্ব্বজয়ী! মানব কিন্তু তাহা বুঝে না।

তাহার পর আরও এক কথা আছে। যে পদার্থ যে পরিমাণে শ্রেষ্ঠ বা অপকৃষ্ট,তাহার বিকারও সেই পরিমাণে অধিক বা অল্প মন্দ হইয়া থাকে। গ্রীকদিগের আস্তিকতা কখনই উচ্চ অঙ্গের ছিল না, সুতরাং তাহাদের নাস্তিকতাও অতিশয় বীভৎস আকার ধারণ করিতে পারে নাই। আরিষ্টিপুসের সামযিক নাস্তিকতা আপাতত নিতান্ত বীভৎস আকারের বলিয়া বোধ হয় বটে; কিন্তু কোন অসতেই দোষ নাই বলিয়া যেমন ঘোষিত হইয়াছে, তেমনি আবার কোন অসতই, অন্তত ক্ষতিকর অসৎ, সামাজিকতার খাতিরে যে অনবলম্বনীয় ইহার শিক্ষা দেওয়ার পক্ষে ক্রটি হয় নাই। সমগ্র ধরিতে গেলে, এখানকার নাস্তিকতা মাধুর্য্যগুণময়ী। হিন্দুর সেরূপ নহে। গ্রীকের চিন্তাশক্তি ক্ষীণ, বাহ্যদর্শনশক্তি তীব্র এবং বৈজ্ঞানিক, সুতরাং আত্মিক সংসারে ইহাদের তত্ত্ব সঙ্কীর্ণায়তন অথচ সুসজ্জিত; কাজেই ইহা মাধুর্য্যময় হওয়ার কথা। হিন্দুর চিন্তাশক্তি গগনভেদী, প্রত্যক্ষ প্রমাণ-প্রিয়তা হেতু যদিও তীক্ষ্ণ বাহ্যদর্শনের আবশ্যক তথাপি চিন্তাশক্তির আতিশয্যে ইচ্ছা সত্ত্বেও ইহার মন তদ্বিষয়ে অনন্যমনা ও অবৈজ্ঞানিক; এ নিমিত্ত হিন্দুর তত্ত্ব বৃহদায়তন, শৃঙ্খলমুক্ত উন্মাদমূর্ত্তি, তত্ত্বও অনুরূপ বীভৎস ভাবাপন্ন। হিন্দুর আস্তিকতাও যেমন উচ্চ অঙ্গের, উহার নাস্তিকতার যে শিক্ষা তাহাও তেমনি বীভৎস আকার ধারণ করিয়াছিল। হিন্দুর নাস্তিকতা গ্রীকের ন্যায় সমধর্ম্মী কোন কারণ হইতে উৎপন্ন হয় নাই, উহা নিরাশা হইতে উৎপন্ন। মোক্ষপ্রয়াসী হইয়া পরলোক নিরাকরণ ও আয়ত্ত করিবার জন্য অপরিমিত চেষ্টা করিতে

করিতে, তাহার সন্ধান না পাওয়ায়,হিন্দু নাস্তিকতার উৎপত্তি হইয়াছে। যখন উৎপন্ন হইল, তখন যাহার জন্য চেষ্টা হেতু এত ক্লেশ পাওয়া গিয়াছে যেন সেই আস্তিকতার উপর প্রতিশোধ লইবার জন্যই, নাস্তিকতা ওরূপ বীভৎস আকার ধারণ করিয়াছিল। অনেক যত্নের পদার্থে বিফলতা উপস্থিত হইলে, তাহার অনেক দুর্দ্দশা হইয়া থাকে।

কিন্তু ঘোর আস্তিকতাময় হিন্দুসমাজে, নাস্তিকতা বড় একটা আত্মপ্রকাশ করিয়া উঠিতে পারে নাই। বুদ্ধ-শিক্ষাকে অনেকে নাস্তিকতা বলিয়া থাকে, কিন্তু বস্তুত বুদ্ধ-শিক্ষা নাস্তিকতা নহে, কেবল বহুপরবর্ত্তী মাধ্যমিক নামক একটী সম্প্রদায় নাস্তিকতা অবলম্বন করিয়াছিল। যাহা হউক, নাস্তিকতার শিষ্যসংখ্যা যদিও কখন গণনায় আইসে নাই, তথাপি উহা সমাজকে, বিশেষত ধর্ম্মব্যবসায়ীদিগকে উত্তেজিত করার পক্ষে নিতান্ত হেয় ছিল না। ধর্ম্মব্যবসায়ীরা যে ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মবন্ধন কঠোর করিয়া তুলেন; এবং শেষে পৌরাণিক সময়ে, লোকের অনুসন্ধিৎসা বৃত্তি ও দর্শনশক্তি প্রভৃতি পর্য্যন্ত হরণ করিয়া, সর্ব্বসাধারণকে ধর্ম্মকার্য্যের নানারূপ কল্পিত কঠোর বন্ধনে বন্ধন করেন; এই নাস্তিকতা তাহার একটি অন্যতর কারণ স্বরূপ। অনেকে ভাবিয়া থাকে যে, কেবল স্বার্থসাধন উদ্দেশে ধর্ম্মব্যবসায়ীরা এরূপ কার্য্য করিয়াছিল; হইতে পারে অংশত তাহাই, কিন্তু কেবল তাহা নহে। স্বার্থ মানুষে কখন ছাড়া, তবে সমতা আর আধিক্য, এবং মহাপুরুষে ন্যূনতা। হয়ত এ সময়ে স্বার্থের কিছু আধিক্য হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও এমন কতক গুলি উপলক্ষ্যের আবশ্যক যে স্বার্থ সাধন করিতে করিতেও লোক সকলকে বুঝাইতে পারা যায় যে, আমরা যাহা করিতেছি তাহা তোমাদেরই ভালর জন্য করিতেছি। পুনশ্চ যথায় লোকসমিতি বিপুল এবং তৎপার্শ্বে স্বার্থসাধকও বিপুল, তথায় স্বার্থ সাধারণত তদ্রূপ উপলক্ষ্যের আবির্ভাব করিয়া থাকে না; বহিরুৎপন্ন উপলক্ষ্যই, ইন্ধনদানে তথায় স্থিত স্বার্থের আধিক্য করিয়া থাকে।

গ্রীকভূমে নাস্তিকতা বহুব্যাপিনী হইয়াছিল। সক্রেটিস ও প্লেটোর পূর্ব্বে পরলোকের ধারণা বা চিন্তা ততটা পরিস্ফুট না থাকায়, লোকে

আস্তিকতত্ত্ব সাধারণত সাংসারিক মঙ্গলোদ্দেশে নিয়োজিত করিত; অতএব আস্তিকতা এখানে অতি ক্ষীণপ্রাণ ছিল বলিতে হইবে। এমন স্থলে, ভয়শূন্য অস্ফুট যে পরলোক, যাহার থাকা বা না থাকার প্রতি লোকে তত আগ্রহযুক্ত নহে, যদি বুঝাইতে পারা যায় যে তাহা বস্তুত অস্তিত্বশূন্য, এবং সাংসারিক মঙ্গল যাহা তাহা দেবার্চ্চনা না করিলেও পাওয়া যায়; অথচ সামাজিকতারও কোন হানি হয় না; তাহা হইলে লোকে কেন না সে নাস্তিকতা অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিবে? আস্তিকতার প্রতি অনপনেয় দৃঢ় সংস্কার হয়, পরিষ্কার পরলোকচিত্র এবং উর্দ্ধদেশের নিকট নিজের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও পাপপুণ্য বোধ হইতে; কিন্তু গ্রীকদিগের সে বোধ তেমন ছিল না। ক্ষীণ পদার্থ সহজেই স্থানচ্যুত হইয়া থাকে; গ্রীক নাস্তিকতা ও আস্তিকতা উভয়েই, গ্রীকচিত্তে সেইরূপ সহসা স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া ফিরিত।

এপিকুরসের নাস্তিকতা গ্রীসে অত্যন্ত প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল। সে সময়ে গ্রীস ধ্বংসমুখ। ৫ তখন গ্রীসের পূর্ব্বশ্রী বিগত, আচার ব্যবহার উচ্ছৃঙ্খল, রাজ্যমধ্যে স্বার্থবিপ্লবে আত্মকলহ ও রাষ্ট্রবিপ্লব, রাজনীতিজ্ঞগণ ক্ষীণচেতা ও ঘুষখোর—অর্থলোভে স্বচ্ছন্দে স্বদেশ পরের নিকট বিক্রয় করিতেছে। তত্ত্ববিৎনামধারিগণ, পতন সময়ে যেরূপ হইয়া থাকে, কুতর্ক, বাক্যাড়ম্বর, টীকা, টিপ্পণি প্রভৃতি লইয়া ব্যস্ত। পূর্ব্বগত পদার্থনিকরের পরিপাটনে কালে নব পদার্থের উৎপত্তি নিমিত্ত, তাহাদের বিয়োজন ও বিশ্লেষণ হেতু, এপিকুরসের তত্ত্ব তৎসধর্ম্মবিশিষ্ট রাসায়নিক পদার্থ সমাবেশ বলিলে অসঙ্গত হয় না। পুনশ্চ যে জগদ্ব্যাপী ধর্ম্মবিপ্লব ও নীতিবিপ্লব পূর্ব্ব গগনে সমুদিত হইবে, তন্নিমিত্ত নবপ্রভাত আনয়নের জন্য, তাহা পূর্ব্ব দিবার অন্ধকারময়ী অবসান সন্ধ্যা স্বরূপ; এখনও মধ্যরাত্রির অপার ক্লেশ সঙ্কুল অন্ধতামস ও তাহার অতিক্রম ক্রিয়া পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ঈশ্বর কি উপায়ে, কাহার দ্বারা, কোথায় দিয়া যে কিরূপ

৫। এপিকুরসের জন্ম আনুমানিক ৩৪২ খৃঃ পূঃ, এবং মৃত্যু ২৭০ খৃঃ পূঃ। ইহাঁর শিক্ষা সামোস ও আথেন্স এই উভয় স্থান হইতে প্রথম প্রচারিত হয়।

কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া থাকেন, তাহা একমাত্র তিনিই জানেন; মনুষ্য বুদ্ধির নিকট তাহা অপরিজ্ঞেয়; আমরা কেবল তাহার ছায়াকণা মাত্র অনুভব করিতে পাইয়া, অনাহূত বাক্‌বিতণ্ডায় কালক্ষেপ করিয়া থাকি। "সহি ভূতানাং এব সর্ব্বেশ্বর এব সর্ব্বজ্ঞ এবোঽন্তর্য্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বাস্য প্রভবোপ্যযৌ।"

৪। তত্ত্ববিদ্যায় সামাজিকতা।

"সামাজিকতা ও রাজনীতি, অথবা মোটের উপরেই সমগ্র সাংসারিক সৎ-বিষয়ের প্রতি মানবীয় আগ্রহ, পারলৌকিক তত্ত্বের প্রতি যেরূপ, ধরিতে গেলে, সেইরূপ সম পরিমাণেই হওয়া উচিত; তাহা হইলে উভয় দিকে তাহার সঙ্গে ওজন রক্ষা হইবায়, সামঞ্জস্য ভাবের উৎপত্তি হেতু, নিষ্কলঙ্ক সুফল প্রসবিত হইয়া থাকে। মানব সামাজিক জীব; এই কর্ম্ম-ক্ষেত্রে সে একাকী ঐশ্বরিক অভিপ্রায়-নিযুক্ত মহাকর্ম্ম সম্পাদনে অক্ষম, বহুজনের সহ মিলিত হইলেই তাহাতে পারক হইয়া থাকে। মানবীয় আত্মা এ পৃথিবীতে কেবল পরলোক চিন্তা করিতে আইসে নাই, কর্ম্ম করিতে আসিয়াছে; যে ব্যক্তি এ কথা ভুলিয়া গিয়া, কেবল পরলোক চিন্তায় রত হইয়া সন্ন্যাস ভাবে সামাজিকতা-পরিশূন্য জীবনাতিবাহন করে, সে যে কখন প্রকৃতরূপে ঈশ্বরের প্রিয় সাধন করিতে সমর্থ হয়, এরূপ বোধ হয় না; কারণ ফলে ইহা কার্য্য না করিয়া পুরস্কারের প্রার্থনা স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। আমার কর্ম্মক্ষেত্র সংসারক্ষেত্রে, যদি সেই সাংসারিক ভাবই পরিত্যাগ করিলাম, তবে আর আমার রহিল কি? সত্তের ন্যূনতাও যেমন অসৎ, সত্তের অতিরেক ভাবও তেমনি অসৎ, অথবা এক কথায় যাহা দ্বারা কর্ম্ম পণ্ড হইবে বা কর্ম্ম হইবে না, তাহাই অসৎ। পরলোক-বুদ্ধির জন্য সন্ন্যাসী হওয়া উদ্দেশ্য নহে; পরলোক-বুদ্ধি ও ঈশ্বরভক্তি দ্বারা সুস্বভাবে আসিয়া, সত্য জ্ঞানে ও সাত্ত্বিক ভাবে কর্ম্ম ক্ষেত্রস্থ কর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ হওয়াই উদ্দেশ্য। ঈশ্বর যেমন প্রতি কার্য্য সহ তাহার পুরস্কার, আনুষঙ্গিক চিত্তপ্রসাদ বা চিত্ততৃপ্তি, সংযোজন

করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন; তেমনি কর্ম্মজীবনরূপী সমস্ত কর্ম্মসমষ্টির জন্যও পুরস্কারসমষ্টি সংযোজন করিয়া রাখিয়াছেন। সাত্বিক কর্ম্মসকলকে যেমন এক পক্ষে, অন্তত ইহলোকে, অনন্তস্থায়ী হইয়া অনন্ত ফলপূর্ণ হইতে দেখা যায়; তাহার পুরস্কার-জনিত তৃপ্তিও অপর পক্ষে, যে লোকে হউক, অনন্তস্থায়ী হইবার কথা। ঈশ্বরনিয়োজিত পদার্থ কখন বিফলে যায় না, সুতরাং এ তৃপ্তিরূপী অনন্তভোগ্য পদার্থের জন্য অনন্তস্থায়ী ভোগীও একান্ত আবশ্যক,—ইহা দ্বারাও ইহলোকের পর পরলোকের অস্তিত্ব সূচিত হয়। এই অনন্তভোগ্য পুরস্কারসমষ্টিকেই, লোকে স্ব স্ব ধারণার প্রকৃতি অনুসারে কেহ স্বর্গ, কেহ মোক্ষ, ইত্যাদি নানাবিধ নামে জ্ঞান বা অজ্ঞান পূর্ব্বক অভিহিত করিয়া থাকে। স্বর্গ বা মোক্ষের যদি কিছু অর্থ থাকে তবে ইহাই সে অর্থ, তদ্ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না। এখন জীবনকে যদি সংসারবিরতি দ্বারা কর্ম্মশূন্য করা যায়, তবে সেই পুরস্কারের প্রাপ্তি জন্য আশা এবং সেই আশা সুফলবান করা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে?

অতএব সমাজই মানবের কর্ম্মস্থল, এবং কর্ম্মার্থে একমাত্র অবলম্বন। সুতরাং সে সমাজকে পরিত্যাগ বা তাহার প্রতি উপেক্ষা করিলে, আর কর্ম্মের, অন্তত গণনীয় কর্ম্মের, সম্ভবতা রহিল কোথায়? এমন স্থলে কাজেই বলিতে হইবে যে একমাত্র সমাজকে অবলম্বন করিয়াই আমরা পারলৌকিক সুখে হস্ত প্রসারণ করিতে সমর্থ হই। সমাজে করণীয় কার্য্য যেরূপ অশেষবিধ ও অগণনীয়, তদ্রূপ অশেষবিধ এবং যোগ্যতা সহ কর্ম্মকারকও অগণনীয় যাইতেছে আসিতেছে। পুনশ্চ যে সে কাজ লইয়া লিপ্ত থাকিলে যে তোমার জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইল তাহা নহে; তোমাকে যতটা কার্য্যশক্তি দেওয়া হইয়াছে, তাহা যখন সমগ্রত ও সাত্বিকভাবে কর্ম্মার্থে নিয়োজিত হইবে, তখনই তোমার জীবনের উদ্দেশ্য সফল বলিয়া জানিও, নতুবা তোমাকে এতাদৃক অধিক কার্য্য-শক্তি প্রদান করার অভিপ্রায় কি? স্বভাবত কার্য্যশক্তির কিয়দংশ জাগ্রত ও কিয়দংশ সুপ্ত ভাবে মানবমনে তিষ্ঠে। জাগ্রত অংশ নিত্য কর্ম্মে প্রয়োজন হয়; সুপ্ত অংশ যাহা তাহা নৈমিত্তিক এবং গুরু

কর্ম্মের নিমিত্ত। সুপ্ত শক্তির আভাস হইতে, দেশ ও ক্ষণ অনুকূল হইলে, সেই শক্তিসাধ্য কর্ম্মের নিমিত্ত মনে আকাঙ্ক্ষা ও সাহসের উদয় হইয়া থাকে। সেই আকাঙ্ক্ষা ও সাহসে যাহারা ভর করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহারাই এ জগতে ধন্য; যাহারা তাহা হয় না, তাহারা অপদার্থ বা কাপুরুষ; আবার সেই আকাঙ্ক্ষা ও সাহসকে যাহারা পরিমাণাতিরিক্তে বিপুল ভাবে গ্রহণ করে, তাহাদিগকেই এ জগতে অপরিণামদর্শী বলা যায়। যাহা হউক, প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ত্তব্য, আপন আপন শক্তি ও যোগ্যতা অনুসারে যে যে কার্য্যে পারক, সে সে কার্য্য প্রাণপণে সংসাধন করিতে থাকে। যথায় যথায় এরূপ ঘটনা হয়, তথায় সমাজ মঙ্গলময়, এবং কর্ম্মকারকও, ইহলোক পরলোক, উভয় লোকে মঙ্গল উপভোগী হয়। পুনর্ব্বার বলিতেছি, এই কর্ম্মসাধন কেবল যদৃচ্ছা বুদ্ধিতে উদ্ভাবিত ও সংসাধিত হয় না। এতদর্থে পূর্ণ সাত্ত্বিক বুদ্ধির প্রয়োজন; সেই সাত্ত্বিক বুদ্ধির আবার, ঈশ্বরে ভক্তি এবং তাঁহার নিয়ম চিন্তন ও ধর্ম্মবিদ্যার অনুশীলনে, প্রাপ্তি হইয়া থাকে। এইরূপেই কেবল ইহলোক পরলোক, সামাজিকতা ও ধর্ম্মানুশীলন, ইহাদের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। এই সামঞ্জস্যের বিপরীত হইলে, কর্ম্মফল, অথবা প্রকরণ এবং ফল উভয়ত, দূষিত এবং ছন্নপরিণাম হইয়া থাকে। অতঃপর কর্ম্মসামঞ্জস্য ঠিক রাখিয়া এবং কর্ম্মসংসাধনান্তে, ঈশ্বরের প্রতি যে প্রার্থনা এবং ধ্যান ধারণা আদি, তাহাই মানবজীবনস্থ আত্মিক ভাবের যে আধিক্য, তাহার পরিচায়ক স্বরূপ হয়। প্রার্থনা ও ধ্যান-ধারণাদি অঙ্কশাস্ত্রীয় শূন্যের ন্যায়, স্বয়ং একাকী মূল্যশূন্য; কিন্তু কর্ম্মরূপী অঙ্কের পার্শ্বে যখন বইসে তখন কর্ম্মের মূল্য দশগুণ বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

ধর্ম্মাদি বিদ্যা সহ সামাজিকতার অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ, প্রয়োজনীয়তাও সেইরূপ উভয়ে উভয় দিকে সমান; সুতরাং উভয় দিকের তত্ত্ব সমান আলোচনায় উভয় দিকের শ্রী এবং উৎকর্ষ পক্ষে সমতা রক্ষিত হয়। হিন্দুর তত্ত্ববিদ্যা, সামাজিকতা বা সামাজিকতার সারাংশ বা পরিচালক স্বরূপ রাজনীতি বিষয়ে নির্ব্বাক ও নিস্তব্ধ। হিন্দু কখন এ সকল বিষয়ের গূঢ় আলোচনা করিয়াছিলেন কি না তাহা বলিতে পারি না;

হয়ত করিয়া থাকিবেন, কিন্তু লেখনী ধারণে তাহার কোন চিহ্ন রাখিয়া যায়েন নাই। তদ্রূপ কোন চিহ্নের অভাবে, এবং আপাতত দৃষ্টিপাতে দেখিলে, এরূপ বোধ হয় যে, ইহাঁরা কেবল বুদ্ধিশক্তি হইতে যথা-উৎপন্ন-ভাবে "এই করিবে" "এই করিবে না" ইত্যাকার শাসনবাক্য স্বরূপে বিধি দিয়া গিয়াছেন। রাজাকে ইন্দ্র যম প্রভৃতি দেবতার স্বরূপ বর্ণন করিয়া, এবং তাহার হাতে সমস্ত রাজকার্য্যের ভার সমর্পিয়া, নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। হিন্দুরা পূর্ব্বাপরই একান্ত ভক্তিসংযুত শক্তি-উপাসক, এবং কখনই ইহাঁরা শক্তির সমকক্ষতা বা তাহার উচ্চতর ক্রীড়াশীলতার আয়ত্তীকরণে সমর্থ হয়েন নাই, হইবেন বলিয়া চেষ্টাও বিশেষ করেন নাই, এবং চেষ্টা করিবার আশাও রাখিতেন না। যে শক্তিমূর্ত্তির নিকট হিন্দুচিত্ত আদিতে মুহ্যমান হইয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন, সে মোহ কখন পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই; বরং তাহা শেষে স্বভাবরূপে পরিণত হইয়া এরূপ দাঁড়াইয়াছিল যে, তাঁহারা ঐ মোহাকৃষ্ট থাকিতেই অধিক প্রীতি বোধ করিতেন। এখানে, এ সামাজিকতা স্থলেও, সেই কারণে ও সেই শক্তি-উপাসনা হইতে, রাজাতে বহুশক্তিমানত্ব প্রদান করিয়া, তৎসমীপে বিনতভাবে অবস্থান করিতেন। শক্তির বিশ্লেষণ, বিভাজন, বিভিন্ন বিভিন্ন আধারে আবশ্যক অনুসারে পরিচালিত করিয়া স্থাপন, আবার তাহার সঙ্কলন, ইত্যাদি যে হইতে পারে, ইহা তাঁহাদের ধারণার অতীত। রাজা ও রাজতন্ত্র শাসন ভিন্ন যে রাজ্য আর কোন প্রকার শাসনপ্রণালীর অবলম্বনে চলিতে পারে, ইহাও তাঁহাদের ধারণার অতীত। এই নিমিত্ত রাজা সর্ব্বদা ইহাদের নিকট দেবতার অবতার স্বরূপে সম্মানিত হইতেন; এবং ইহার সমগ্র অধিকার যেমন এক রাজ্যচক্র বিশেষ, অধিকারের বিভাগ মহকুমা আদিও সেইরূপ এক একটী পৃথক রাজ্যচক্রস্বরূপ হইত, প্রভেদ কেবল আয়তনের ক্ষুদ্রত্ব এবং বৃহত্ত্বে। গ্রামপতির গ্রাম, দশপতির দশ গ্রাম, শতপতির শত গ্রাম প্রভৃতি হইতে রাজার রাজ্য পর্য্যন্ত সকলেই এক একটি রাজ্য; এবং গ্রামপতি, দশপতি, শতপতি প্রভৃতি রাজা পর্য্যন্ত ইহারা সকলেই অবিশ্লেষিত এবং পূর্ণতাময়ী শক্তিবিশিষ্ট এক একটি রাজা, প্রভেদ যাহা কেবল আয়তন ও আসবাব

লইয়া। অথবা অন্য কথায়, চক্র-অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র চক্র কল্পনা ব্যতীত, কেন্দ্র হইতে পরিধিমুখে রেখা বিচ্ছুরণে যে চক্রকে অংশে অংশে বিভাগ করা যাইতে পারে, ইহা হিন্দু বুদ্ধির সীমামধ্যে কখন প্রবেশ করে নাই। এই কারণ হইতে, রাজার অত্যাচারের বিরুদ্ধে, সমাজ বা লোকসমিতির মতামত হইতে যে কোন প্রতিবন্ধক হইতে পারে, তাহারও কল্পনা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সুতরাং রাজারও বন্ধনরজ্জু সেই পারলৌকিক স্বর্গনরকাদির ভয় ভিন্ন বস্তুত আর কিছুই ছিল না। এমন অবস্থাতেও যে সমাজ এত দিন এমন সুশৃঙ্খলে চলিয়াছিল, এবং তথাপি যে সমাজ-নীতি গুলি বহুলাংশে এত উত্তম, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, যে প্রকৃতি হইতে সেই সকল উদ্ভাবিত ও পালিত হইত সে প্রকৃতি অধম ছিল না। সেরূপ প্রকৃতি হইতে যাহা কিছু উদ্ভব হয়, তাহা কোন অংশে মন্দ হইলেও সে মন্দ, অসৎশ্রেণীস্থ অসতের আকার ধারণ করে না; সৎশ্রেণীস্থ অসতের আকার ধারণ করিয়া থাকে অর্থাৎ সদ্বুদ্ধির অতিরেক ভাব হইতে যে অসতের উৎপত্তি হয়;—সে মন্দ অসৎপথের মন্দ নহে, সৎপথের মন্দ। তাহার পর, যে প্রকৃতির লোক লইয়া সমাজ, রাজাও তাহার মধ্যে একজন; সুতরাং সে রাজার অত্যাচারের সমতার নিমিত্ত, সেই স্বর্গনরকাদির ভয়ই যথেষ্ট হইয়াছিল। যখন যে প্রকারের সংস্কার লোক চিত্তকে আকৃষ্ট করে, তখন তজ্জাতীয় অত্যাচারের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে। কিন্তু তাৎকালিক নীতিগুলি কতদূর অসার তাহা, সেই সংস্কার যতদিন ধ্বংস না হয়, ততদিন বড় বুঝিতে পারা যায় না। অপেক্ষাকৃত অক্লেশসাধ্য হিন্দু বিধি নীতি আদি বস্তুত কতদূর অসার তাহা, যখন হিন্দুধর্ম্মের প্রাণ পলাইয়া যাওয়ায় কেবল মন্ত্র প্রকরণাদি মাত্র অবলম্বনস্থলীয় হইয়াছিল, তখনকার অবস্থা দৃষ্টে অনুভব করিতে পারা যায়। সমাজ তখন কেমন ছিন্নমস্তারূপ, আপনি আপনার ধ্বংস প্রকরণ বলিয়া দিয়া ও ধ্বংসকার্য্যে সহায়তা করিয়া, অস্পর্শীয় যবন ম্লেচ্ছ পদে মাথা লুটাইয়াছিল। সকল দিকে সমান মন রাখিয়া বুঝিয়া চলিলে আর ওরূপ ঘটিত না। সামঞ্জস্যের ব্যতিক্রমে পাপ, পাপে ধ্বংস হইয়া থাকে। বিনা পাপে ধ্বংস নাই।

গ্রীকদিগের সম্বন্ধে বলিতে গেলে ঠিক ইহার বিপরীত। হিন্দুর যেমন সামাজিক ও রাজনৈতিক তত্ত্ববিদ্যা নাই; গ্রীকদিগের মধ্যে তেমনি তাহা পরিমাণ অপেক্ষা প্রচুর বলিয়া দৃষ্ট হয়। গ্রীকদিগের তত্ত্ব-জীবনের উদ্দেশ্যই যেন সামাজিক ও রাজনৈতিক তত্ত্ব আলোচনা করা; তাহার মধ্যে যে ধর্ম্মবিষয়িণী তত্ত্ববিদ্যা, তাহা প্রায় আসবাবের ন্যায় ব্যবহৃত ও আলোচিত। যাহা হউক, তথাপি সমগ্র দেখিতে গেলে, ইহারা হিন্দুদিগের অপেক্ষা ভাল; কারণ হিন্দুরা যেমন তত্ত্ববিদ্যার একদিক একেবারে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, ইহারা ততটা করে নাই। দুই দিকই স্পর্শ করিয়াছিল। কিন্তু যে দিক স্পর্শ ভাল রূপ করিলে সর্ব্বস্থ মঙ্গলের অধিক সম্ভাবনা, সেদিক তেমন স্পর্শ করিতে পারে নাই। যাহা হউক, তথাপি সামাজিক ও রাজনৈতিক তত্ত্বের অপর্য্যাপ্ত আলোচনা হেতু, গ্রীকজাতি হিন্দুর অপেক্ষা পার্থিব সৌভাগ্যে বেশি সৌভাগ্যবান হইয়াছিল। তবে কথা এই, সর্ব্ব সৌভাগ্যের মূলের সহ এতটা বিচ্ছিন্ন ভাব হেতু, সেই সৌভাগ্য বহুস্থায়ী হইতে বা অবিকৃত রহিতে পারে নাই। পুনশ্চ এই বিচ্ছিন্নভাব হেতু, সামাজিক তত্ত্ব-বিদ্যা শ্রেষ্ঠ হাতে পড়িলেও, বহুতর বিকৃতির হাত হইতে এড়াইয়া যাইতে পারে নাই; উপরন্তু তাহার স্থানে স্থানে মন্তব্যাতিরিক্ত বীভৎস ভাবের দাগ লাগিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যেও সৌভাগ্য এই যে, যতটা উদ্ভাবিত বা আলোচিত হয়, কার্য্যে ততটা পরিণত হয় না; নতুবা গ্রীক সামাজিকতা বিষয় বিশেষে কি বীভৎস আকারই ধারণ করিত!

সামাজিকতা-বিষয়িণী তত্ত্ববিদ্যা গ্রীকদিগের মধ্যে যত প্রকারের উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্লেটোর সাধারণতন্ত্র (Republic) নামে যে গ্রন্থ, তাহাই বহুবিখ্যাত এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। প্লেটো ইহা আত্মিক মূল হইতে কর্ষণ এবং স্থাপনা করিয়া গিয়াছেন। প্লেটোর মতে মনীষা, শ্রদ্ধা এবং আকাঙ্ক্ষা এই তিনটি বৃত্তি মনুষ্যকে ন্যায় পথে চালনা করিবার প্রধান পরিচালক। আকাঙ্ক্ষা হইতে সকল প্রকারের কার্য্যের উৎপত্তি হয়, মনীষা তাহার সদসৎ নিরূপণ

করিয়া থাকে, এবং শ্রদ্ধায় সেই সদসৎ ভাবের মধ্যে সৎ-ভাবকে স্থাপনার্থে মনীষা শক্তির সহায়তা করে। এই তিনের সংমিলনে "ন্যায়" রূপী আর একটি চতুর্থ পদার্থের উৎপত্তি হয়।

যাহা ব্যক্তিবিশেষের পরিচালক. ব্যক্তিসমূহ দ্বারা সংঘটিত সমাজের পরিচালকও তাহাই। অতএব সমাজ স্থাপন ও পরিচালনার্থে, মনীষার প্রতিরূপ রাজন্যবর্গ, শ্রদ্ধা প্রতিরূপ যোদ্ধৃবর্গ এবং আকাঙ্ক্ষা প্রতিরূপ শ্রমজীবিগণ। এই তিন সংমিলিত হইলে আর একটি চতুর্থ পদার্থের উৎপত্তি হয়, তাহা ন্যায়াধিকার (Law) অর্থাৎ রাজ্যমধ্যে সুবিচারের আবির্ভাব। যে সকল ব্যক্তি অজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞানে অন্ধ অর্থাৎ নিম্নশ্রেণীর সমাজস্থগণ, তাহারা রাজন্যপদে অধিকার প্রাপ্ত হইবে না। যে শ্রেণী হইতে রাজন্যবর্গ মনোনীত হইয়া থাকে, যোদ্ধৃবর্গও তথা হইতে মনোনীত হইবে: অর্থাৎ একই শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা এবং গুণের তারতম্য অনুসারে, কেহ রাজন্য, কেহ যোদ্ধৃশ্রেণীভুক্ত হইবে। অতঃপর এই ত্রিবিধ শ্রেণী যেরূপ পরস্পর সুসংমিলনে কার্য্য করিবে, রাজ্যের দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য তাহার উপর নির্ভর করিবে।

ইহার পর প্লেটো সামাজিক জীবনযাত্রার ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের জন্য, ভিন্ন ভিন্ন রকম সমিতি ও অনুষ্ঠান আদির প্রকরণ বর্ণন করিয়াছেন; এবং সেই প্রকরণাদির মধ্যে যাহাতে কখন কোন নূতনত্ব প্রবেশ করিয়া সমাজকে উচ্ছৃঙ্খল করিতে না পারে, তৎপক্ষে আশঙ্কা পূর্ব্বক, বিশেষ বিশেষ নিয়ম সকলের অবতারণা করিয়াছেন। প্লেটো বোধ হয় ভাবিতেন যে লোকচরিত্রের আর পরিবর্ত্তন নাই, একই ভাবে চির কাল চলিবে। বিশ্বের পরিবর্ত্তন নীতিতে ইহার তাদৃক দৃষ্টি ছিল না। সে যাহা হউক, প্লেটোর মতে লোকের সামাজিক জীবন ব্যতীত আর পৃথক জীবনের অস্তিত্ব না থাকে, এবং ব্যক্তিগত গৃহধর্ম্মও সামাজিকতার মধ্যে প্রবেশ করে অর্থাৎ সমস্ত সমাজ লইয়া যেন এক গৃহস্থের ন্যায় হয়। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে আত্মস্বার্থকে বলি দিবে, এবং সম্পূর্ণরূপে নিজের হানি করিতে হইলেও, তাহা করিয়া সমাজের হিত সাধন করিবে। পুরুষেরা যে যে বিষয়ে বুদ্ধিমান ও

পারক, সে সেইরূপ বিষয়ে শিক্ষিত ও সেইরূপ কার্য্যে নিয়োজিত হইবে। স্ত্রীলোকেরাও সেইরূপ সামাজিক একজন হইবে; এবং তাহাদের মতিগতি অনুসারে, সমাজের মধ্যে স্ত্রীসুলভ কাজের যে যাহাতে বিশেষ পারক হইবার সম্ভব, তাহাকে সেইরূপ শিক্ষা দিতে হইবে। পুরুষের ন্যায় স্ত্রীগণও সমানরূপে সমাজের পরিরক্ষক হইবে, প্রভেদ কেবল ইহারা কোমল শক্তি বশত স্বল্পায়তনসাধ্য কার্য্যগুলি সম্পাদন করিবে। ধন সম্পত্তি আদি ব্যক্তিগত না থাকিয়া সামাজিক হইবে। স্ত্রীগণ সাধারণভোগ্যা হইবে; সুতরাং পুত্র কন্যা একমাত্র সমাজের সন্তান স্বরূপে গণিত হইবে।[১] স্ত্রী পুরুষ সম্বন্ধে, যাহার যাহাতে ইচ্ছা, পরস্পরের সম্মতিক্রমে, তাহাতে উপরত হইবে ও সন্তানোৎপাদন করিবে। কে কাহার স্ত্রী, কে কাহার সন্তান, কিছুরই ঠিকানা না থাকে, কারণ তাহা হইলে সমাজের মধ্যে স্বার্থের অস্তিত্ব না থাকায় কোন অনিষ্ট হইতে পারিবে না; এবং সর্ব্বদাই তথায় শান্তি বিরাজ করিতে থাকিবে। বাঞ্ছারাম, মানুষ কি অদ্ভুত জন্তু! এমন ফন্দিই নাই যে বাহির করিতে না পারে, এমন কাজই নাই যে যাহাতে পিছু-পা হয়। মনুষ্য হৃদয়ে স্বর্গ নরক উভয়েরই সমান রাজত্ব। সাম্যবাদীরা জানে না যে, যে প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া তাহারা সাম্যবাদের ঘোষণা করিয়া থাকে, সে প্রকৃতি স্বয়ং অসাম্যবাদী; তাহার তুল্য অসাম্যবাদী আর দ্বিতীয় নাই! কি আধ্যাত্মিক, কি আধিভৌতিক, কি আধিদৈবিক, সর্ব্বত্র এবং সর্ব্ব সময়ে তাহার অসাম্যবাদ সমান দুরন্ত! বাঞ্ছারাম, সাম্যবাদীদের সাম্যবাদ স্বপ্ন; অসাম্যবাদের অতিরেক ভাব দূষ্য; অসাম্যবাদের সমতা বা পরিমিত ভাব এ জগতের প্রকৃত মঙ্গলদায়ী হয়।

গ্রীকতত্ত্ববিৎদিগের মধ্যে আরিষ্টটল সর্ব্বাপেক্ষা সমতাবাদী। ইহার তত্ত্বগুলিও, যাহা যাহা প্রকৃত পক্ষে কাজে লাগিতে পারে, এবং হাওয়ায় দড়ি না দিয়া উপস্থিত বিষয়কে কিরূপে সংস্কার করিয়া কার্য্যে লাগাইতে পারা যায়, তদর্থে সদুপদেশ-দায়ক। আরিষ্টটলের শিক্ষা এই যে,[২] যে কোন

১। Plato, Rep. V & VII.

২। Aristot Ethics II 7-9.

বিষয় হউক, তাহার সৎ-ভাব অসৎ-ভাব, এ উভয় দিকের অভিভাব পরিত্যাগ করিয়া, সেই উভয়ের মাঝামাঝি যাহা তাহাই বুদ্ধিমানেরা গ্রহণ করিয়া থাকেন; যেমন সাহস,—ভয় এবং অকপট বিশ্বাস, বা ভীরুতা এবং দিগ্বিদিকশূন্য উগ্রতা, এতদুভয়ের মাঝামাঝি যাহা তাহাই প্রকৃত সাহস। সেইরূপ মিতাচার,—অপরিমিতাচার এবং শূন্যাচার এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী যাহা তাহা মিতাচার। অর্থ সম্বন্ধে, কৃপণতা এবং মুক্তহস্ততা ইহার মধ্যবর্ত্তী যাহা তাহা দাতৃত্ব। নীচ বিনতচিত্ত এবং আত্মগরিমা, ইহার মধ্যবর্ত্তী যাহা তাহা মহানুভাবকতা। নীরাগ এবং কথায় কথায় রাগ ইহার মধ্যবর্ত্তী যাহা তাহা নম্রতা। হিংসা এবং ক্রূর বৈরতা ইহার মধ্যবর্ত্তী যাহা তাহা রাগ। গর্ব্ব এবং মুখচোরা ভাব ইহার মধ্যবর্ত্তী যাহা তাহা লজ্জা। ইত্যাদি। এই মধ্যমভাবরূপী সৎ-জ্ঞানে আসিবার নিমিত্ত আরিষ্টটল এই ত্রিবিধ উপদেশ দিতেছেন,—১ম। যে অতিরেক ভাব মধ্যম ভাবের বিরোধী তাহা হইতে যতদূর পার দূরে যাইবে;—২য়। যে বিষয়টীর প্রতি মন নিতান্ত ধাবিত, তাহা যথাসাধ্য পরিহার করিবার চেষ্টা করিবে। ৩য়। আমোদের মোহে ভুলিও না। আরিষ্টটল বলিতেছেন যে, আমরা সর্ব্বদাই যে ঠিক সামঞ্জস্যময় মধ্যভাবে সর্ব্বদাই উপস্থিত হইতে পারিব এমন আশা করা যাইতে পারে না; অতএব অল্প ইতর বিশেষ কিছু হইলে তাহা মার্জ্জনীয়। পুনশ্চ এরূপ মধ্যম ভাবে উপস্থিত হওয়ার জন্য, কোন নিয়মও ঠিক করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া যাইতে পারে না; এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞান এবং নীতিই সুন্দর পথ-প্রদর্শক। আরিষ্টটল বয়ঃ-বালককে বা বৃদ্ধকে, বালক বা বৃদ্ধ বলেন না; জ্ঞানের তারতম্য অনুসারেই বালক বৃদ্ধাদি পৃথকত্ব হইয়া থাকে। ইহাঁর মতে সামাজিকতার শ্রীবৃদ্ধি সর্ব্বতোভাবে সাধনই পরম পুরুষার্থ; এবং তজ্জন্য ইনি প্লেটোর ন্যায় নূতন সাধারণতন্ত্র কল্পনা করিতে প্রস্তুত নহেন; উপস্থিত অবস্থার সংস্কার দ্বারা যথাসাধ্য সৎ-ভাবের স্থাপনই ইহার উদ্দেশ্য। প্লেটোর অদ্ভুত তত্ত্বসকলের সহ আরিষ্টটলের বড় একটা সাহানুভূতি ছিল না। উপরে কথিত প্লেটোর সামাজিকতা, সামাজিক সম্পত্তি এবং সামাজিক স্ত্রীপুত্র বিষয়িণী তত্ত্ব, আরিষ্টটলের

দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে দূষিত এবং উপহসিত হইয়াছে।৩ ফলত সমস্ত গ্রীকতত্ত্ববিৎদিগের মধ্যে একমাত্র আরিষ্টটল যেরূপ সমাজের এবং জগতের উপকারে লাগিয়াছেন, এরূপ আর কেহ লাগে নাই ; এবং সমগ্র বিবেচনা করিয়া দেখিলে, আরিষ্টটলকেই সমগ্র গ্রীকতত্ত্ববিৎবর্গের চূড়া বলিলে বলা যায়।

যাহা হউক, সূক্ষ্মপাঠী বাঙ্গারামকে অতঃপর আর অধিক সংগ্রহ বা উদ্ধৃত করিয়া বিরক্ত করিব না। গ্রীকেরা যে বন্ধনশূন্য ভাবে সমাজিকতার দিকে কতদূর পর্যান্ত দৌড়াইতে প্রস্তুত ছিল, তাহা প্লেটোর সামাজিকতত্ত্ব হইতেই প্রতিপন্ন হইতে পারিবে। গ্রীকতত্ত্ববিৎদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই সমাজতত্ত্ব লইয়া কিছু না কিছু লিখিয়া গিয়াছেন। সে সকলের এখানে আর উল্লেখের প্রয়োজন নাই। এক্ষণে ফলের প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখা যাইবে যে, হিন্দুরা যেমন একমাত্র রাজার উপর সকল বিষয়ের বরাত দিয়া, নির্ভাবনায় ও অনুত্তেজিতরূপে ঘরে বসিয়া, গৃহসুখ ভোগ করিত ; গ্রীকদিগের মধ্যে তেমন নহে। ইহারা সকলেই, চর্ম্মকার হইতে লক্ষেশ্বর পর্য্যন্ত, পূর্ণমাত্রায় রাজনৈতিক বিগ্রহে মাতিয়া, সমাজকে উত্তেজিত এবং শাসনকর্ত্তা বা রাজন্যবর্গকে বিকম্পিত ও বিশোধিত করিয়া ফিরিত।—গ্রীক ইতিহাসের চাকচিক্য এবং উপকারিত্বও, তাহাদের এই গুণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

ইতি চতুর্থ প্রস্তাব।

৩। Aristot. Polit. II. c. 2.

পঞ্চম প্রস্তাব।

লোকবিদ্যা।

বিদ্যা কাহাকে বলে, বিদ্যার আবশ্যকতা কি? ইহার উত্তরে আমাদের বাঞ্ছারাম বাবু বলেন যে, যে উপায়ের দ্বারা ওকালতি, ডেপুটিমাজিষ্ট্রেটগিরি, মুন্সফী, অন্তত কেরাণীগিরি, অন্তত রেলের চাকুরীটাও করিতে পারা যায়. তাহার নাম বিদ্যা। তাহার পর, বিদ্যা কি, তাহা যদি এইরূপে স্থিরীকৃত হইল, তখন আর 'বিদ্যার আবশ্যকতা কি?' সে বিষয়ে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন হইবে না,—বিদ্যার আবশ্যক অর্থ উপায়ের জন্য: সময়ে সময়ে পাণ্ডিত্য ফলাইয়া বাহবা লওয়ার জন্যও বটে, তবে কথা কি, অর্থ উপার্জ্জিত হইলেও বাবুগিরিটে যেমন সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না, বিদ্যা থাকিলেও পাণ্ডিত্য ফলান সেইরূপ সকলের ভাগ্যে ঘটে না; উহা ঘটান, সময় এবং সুযোগের কাজ ও আয়েসের বিষয়। ইহার পর জিজ্ঞাস্য, গ্রন্থ, পুঁথি, কেতাব, এ সকল কি? তাহার উত্তরে বাঞ্ছারাম বাবু বলেন এবং জলধর দাদা ও প্রভু ঘটিরামও তাহাতে সায় দেন যে, কালী কলম লইয়া আঁচড় পাড়িয়া তাহা মুদ্রাযন্ত্র যোগে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিতে পারিলেই, গ্রন্থ, পুঁথি, কেতাব সকলই হইতে পারে। অতঃপর সেইরূপ কালির আঁচড় যাঁহারা পাড়েন, তাঁহারা গ্রন্থকার; যদি তাহা না হইবে, তবে প্রত্যেক কালী কলম ব্যবসায়ী বঙ্গসন্তান "গ্রন্থকার," "প্রসিদ্ধ লেখক," "কবি," "মহাকবি," ইত্যাদি নামে এক দিনের জন্য খ্যাত হয়েন কিরূপে, এবং কেনই বা তাঁহাদের প্রতি চটী চাপাটী "প্রসিদ্ধ গ্রন্থ," "সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ," ইত্যাদি খ্যাতিতে বিখ্যাত হইয়া থাকে? গ্রন্থাদির উদ্দেশ্য কি?—কথাটা কিছু গোলমেলে বটে, কিন্তু মোটের উপর এই পর্য্যন্ত বলিলে পর্য্যাপ্ত হইবে যে, গ্রন্থাদির উদ্দেশ্য ভাষার গায় গহনা পরান, ভাষার সম্পত্তি বৃদ্ধি করান, সঙ্গে সঙ্গে

নিজের যশ খ্যাতি এবং বাহবা উপার্জ্জনও বটে। আমরাও বলি তাহাই, তবে কিনা নূতন কেতাব লিখিতে বসিয়া কথাটা একটু ফিরাইয়া ঘুরাইয়া নূতন করিয়া বলিলেই ভাল দেখায়, এই জন্য এখানে সে কথায় এ কথায় যাহা কিছু প্রভেদ দৃষ্ট হইবে।

কর্ম্মস্থলী পৃথিবীতে কর্ম্মসম্পাদনার্থ মানবের সমাগতি হইয়াছে। নিত্য-আবর্ত্তনশীল কালচক্র সহ কর্ম্মপদার্থের সংযোজন হেতু, তাহারা নিত্য নবরূপ সম্পাদনার্থ নিকটে সমুপস্থিত হইয়া থাকে। মানব তাহার সম্পাদন কার্য্যে নিযুক্ত, মানব কর্ম্মকারক। কর্ম্মকারক মাত্রে দ্বিভাগে বিভাজিত, পরিচালক ও পরিচালিত। পরিচালিত যে, তাহাকে কার্য্য বিষয়ে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে শ্রম, তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে হয়; পরিচালকের কার্য্য পরিচালিতকে পরিচালন করাই প্রধান। কাল ও কাল কর্ত্তৃক আনীত কর্ম্ম-ভাবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, ও যাহাতে কালের সহ সমতায় স্খলিতপদ না হয় এরূপ সতর্ক হইয়া, পরিচালককে পরিচালনা করিতে হয়; এ নিমিত্ত পরিচালিতের অপেক্ষা পরিচালকের দৃষ্টি সর্ব্বদা দূর-প্রসারিত বা দূবদর্শনসম্পন্ন হওয়া উচিত। এই দূরদর্শন-শক্তি, চালিত হইয়া যে যে পদার্থ উপলব্ধি করিয়া থাকে, তাহার নাম বিদ্যা; এবং দূরদর্শনশক্তির চালনা প্রকরণের নাম সাধারণত শাস্ত্র। দূরদর্শনশক্তির লঘুত্ব, গুরুত্ব, প্রকৃতি, প্রকরণাদিভেদে, বিদ্যাও ধর্ম্মবিদ্যা, তত্ত্ববিদ্যা, লোকবিদ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন বিদ্যা; এবং এই এক একটি বিদ্যার ভিতরেও আবার নানাবিষয়িণী নানা বিদ্যা, ইত্যাদি ইত্যাদি নানারূপে প্রকটিত ও নানা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সাধারণত বিদ্যা যাহাদের অবলম্বন, ও যাহারা তাহার দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে তাহাদিগকে বিদ্বান; এবং যাহাদিগের হইতে তাহা উদ্ভাবিত হয় তাহাদিগকে পরিমাণ অনুসারে ঋষি, গুরু, জ্ঞানী প্রভৃতি বলা গিয়া থাকে। কর্ম্মস্থলে পরিচালক ও পরিচালিত ভিন্ন, শারিগাহকের ন্যায় আরও একদল ভেড়ুয়া, ভাঁড় প্রভৃতির প্রয়োজন হইয়া থাকে; যথা প্রমোদকর উপন্যাস, জয়দেবাদির ন্যায় ছুটকে কাব্য, ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহাদিগেরও মধ্যে ভাল মন্দ আছে, ইহাদিগেরও ব্যবহার আছে; কে না

জানে কষ্টসাধ্য কার্য্যে শারিগাহক কতটা সহায়তা করিয়া থাকে। শারিগান প্রায়ই অকর্ম্মা অলস সময়ে গীতবদ্ধ হয়।

প্রতি পরিচালক ও পরিচালিতেরই, কর্ম্মস্থলীতে কর্ম্মক্ষেত্রের পরিমাণ ও সীমা নিরূপণ করা রহিয়াছে; পরিচালকের দৃষ্টিদৃষ্ট বিষয় বা সহজ কথায় তাহার উদ্ভাবিত সত্য, সেই সীমান্তমধ্যে প্রচারিত ও পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। এই সীমান্ত, বলা বাহুল্য যে, দেশ ও কাল—এক এবং উভয় ব্যাপিয়া প্রসারিত। সীমান্তবর্ত্তী স্থান সঙ্কীর্ণ হইলে, একা বাক্যের দ্বারা সেই উদ্ভাবিত নবসত্য প্রচারণা সংসাধিত হইতে পারে। কিন্তু যখন তাহা বহুবিস্তৃত ও বহ্বায়তন, তখন আর প্রচারকার্য্য একা বাক্যের দ্বারা সমাধা হইয়া উঠে না; তখন কাজেই নানা লোকমুখে প্রচার এবং প্রচারের আরও বহু বিস্তার আবশ্যক হওয়ায়, কালী কলমের আবশ্যক হয়। এরূপ কালি কলমের ব্যবহার হইতে যে পদার্থের উৎপাদন হইয়া থাকে, তাহাকেই প্রকৃতরূপে গ্রন্থ বলা যায়; এরূপ গ্রন্থের গ্রন্থকার যাঁহারা, তাঁহারা এ জগতে বহুকাল জীবিত থাকিয়া জগতবাসীর নিকট হইতে স্বেচ্ছা ও সভক্তিপ্রদত্ত পূজা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। নতুবা অপর যাহারা,তাহারা উৎপতিতবৎ একবারমাত্র কালের তরঙ্গকল্লোলে উঠিয়া, অমনিই আবার বিলীন হইয়া যায়। প্রকৃত গ্রন্থকার যাহারা, তাহাদিগকে খোষ-আমোদ বা সখের গ্রন্থকার বলিয়া ভাবিও না। নিজের নিকট এ জগতে যাহা অকাট্য এবং অনুসরণীয় সত্য বলিয়া অনুভূত হইয়াছে, যাহা জীবনের অবলম্বন এবং পরিমাণ স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যাহার খাতিরে জীবনদানও তুচ্ছ কথা, এরূপ গ্রন্থকার কেবল সেই সকল কথাই গ্রন্থবদ্ধ করিয়া থাকে। ইহারা যাহা উদ্ভাবন করে, তাহার খাতিরে ইহারা জীবন দানেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না,এবং সে পক্ষে উদাহরণও যে কিছু বিরল তাহা নহে। যাহা নিজে বিশ্বাস করিতে পারি নাই, তাহা অপরকে বিশ্বাস করাইব কিরূপে; যাহাতে নিজে চালিত হই নাই, তাহা দ্বারা অপরকে চালনা করিব কিরূপে? যে সেরূপ করিতে যায়, সে ধূর্ত্ত এবং ভণ্ড; এ জগতে সে কখনই সফলতা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না, এবং যদি বা কখন কালের কুলটি

গড়িতে পারে, তবে সে দুই দিনের জন্য! দুর্ভাগ্যক্রমে এ জগতে ধূর্ত্ত এবং ভণ্ডেরই রাজত্ব এবং প্রভুত্ব বেশী। ফলত বাঞ্ছারাম, যদি তুমি এমন কোন বিষয় নূতন অনুভব করিতে পারিয়া থাক যাহা অন্যের নিকট এখনও অনাবিষ্কৃত, তাহাই প্রকাশ করিতে বাক্যস্ফূর্ত্তি করিও; এবং যদি তাহা সহজ কথায় প্রকাশ করিয়া শেষ করিতে পার, তবে আর বাঁকা কথা বা তদধিকে লেখার দিকে যাইও না; ইহাই সৎ-পরামর্শ। পুনশ্চ আর একটী সোজা কথা বলি, যাহা পদ্যে প্রকাশ করিতে পারিবে তাহাতে আর সুর সংযোগ করিও না; যাহা গদ্যে প্রকাশ করিতে পার তাহাতে আর পদ্য আনিয়া ফেলিও না; এবং যাহা কথায় বলিলে চলিবে, তাহা গদ্যতেও কখন লিখিও না। যদি সহজে হয়, তবে কেন মিছা উত্তরোত্তর পরিশ্রম স্বীকার? লেখা পড়া বা গ্রন্থের সৃষ্টি, পৃথিবীতে একেবারেই আদি কাল হইতে হয় নাই। আবশ্যক মত ক্রমে ক্রমে হইয়াছে। যতদিন কথায় চলিত, ততদিন সঙ্কেতলিপি ছিল না; যতদিন সঙ্কেতলিপিতে চলিত, ততদিন লেখা পড়া ছিল না; যতদিন লেখায় চলিত, ততদিন ছাপার বন্দোবস্ত ছিল না; আবার ছাপায় যখন না চলিবে, তখন হয়ত নূতন রকমের আরও কিছু নূতন আসিয়া উপস্থিত হইবে। এ প্রকৃতির এই নিয়ম; ইহা দেখিয়া, ইহা বুঝিয়া, তুমিও কেন তাহার অনুকরণ না কর বা নিজের জবাবদিহিতে প্রবুদ্ধ না হও। যাহা তুমি করিতে সক্ষম, আগে তাহা সুসম্পন্ন করিয়া তোল; পরে যদি কাজ না থাকে ও সময় পাও, তখন তাহার অতিবৃদ্ধি ও আড়ম্বরে মাতিও, কেহ তোমাকে বারণ করিবে না। এ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রকৃত তেমন অবসর আছে কি?

সকল পদার্থই এ জগতে দ্বৈতকার্য্যের সাধক হয়, প্রথম আত্মচালন, দ্বিতীয় অপরকে উত্তেজিত করণ। বিদ্যাও সেই দ্বিবিধ কার্য্য সাধন করিয়া থাকে। এক স্বসীমান্তবর্ত্তী আরব্ধ কর্ম্মের পরিচালন, অপর অনাগত ভাবী মানবের নিকট স্বসময়ের প্রতিকৃতি প্রকটন। বিদ্যার এই দ্বিবিধ কার্য্য দুই দিকেই বিশালতা-আত্মক হওয়ায়, বিদ্যা নিজ অবস্থা অনুসারে জাতীয় উন্নতি বা অবনতির পরিচায়ক স্বরূপ হইয়া থাকে।

কার্য্যকারক আরব্ধ কার্য্যে হস্ত প্রদান করিলেই কার্য্য হয় না; পূর্ব্বে কতদূর কৃত হইয়া গিয়াছে, এবং এখন যাহা করিতে হইবে তাহার প্রকৃতি ও প্রকরণ কি এবং পূর্ব্বকৃত অংশের সহ তাহার সম্বন্ধ কতদূর ও পূর্ব্বকৃত অংশ কি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, এ সকল জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। এ নিমিত্ত, শিক্ষাস্থলে পূর্ব্বগত ও অধুনাতন, উভয় বিষয়েতেই শিক্ষার আবশ্যকতা হইয়া থাকে। শিক্ষা এ উভয় বিষয়েতে একান্ত প্রয়োজন; তবে তাহার বহুত্ব ন্যূনত্ব আছে বটে, কিন্তু সে কেবল শিক্ষানবিশের শক্তির পরিমাণ লইয়া। যথায় এ উভয়ত শিক্ষার পক্ষে কোনরূপে হানি হয় অথচ যথায় কার্য্যশক্তি সেরূপ শিক্ষা গ্রহণের পক্ষে উপযুক্ত, তথায় কার্য্যশক্তি সেই পরিমাণে ভ্রান্ত হইয়া থাকে। অথবা যে স্থান বিশেষে, যাহাদের পরিচালিত হওয়া উচিত; তাহারা যদি সে স্থানে, স্বভাব ছাড়িয়া, পরিচালকের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে যায়, তাহা হইলেও সুমঙ্গলের সম্ভাবনা দূরগমন করিয়া থাকে। কালের আবর্ত্তন সহ কার্য্যও যেমন গুরুতর হইয়া আসিতেছে, শিক্ষার গুরুত্ব পক্ষেও তেমনি প্রয়োজন হইয়া উঠিতেছে। শিক্ষা মানব জীবনের মূল দেশের সহিত সম্মিলিত হইয়া, একত্বে পরিণত হইয়া গিয়াছে। মানব জীবনের সার স্বরূপ ধর্ম্ম এবং কর্ম্ম, উভয়ই এই শিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া থাকে।

বিদ্যার উদ্দেশ্য অর্থ উপার্জ্জন নহে, তবে সুখ উপার্জ্জন বলিতে পারা যায় বটে, কিন্তু সুখ অর্থে নহে; অর্থ ও সম্পদের সুখ যাহা তাহা সম্পূর্ণই আপেক্ষিক, স্বয়ং কখন পূর্ণ সুখ নহে। সুকার্য্য সাত্বিক ভাবে সম্পাদন করিলে যে চিত্তপ্রসাদ উপস্থিত হয়, তাহাই পূর্ণ সুখ। সুকার্য্যশ্রেণীগ্রথিত, বা সুকার্য্যসমষ্টিস্বরূপ যাহার জীবন, সেই কেবল এ জগতে পূর্ণ সুখে সুখী হইতে পারে; কোন অবস্থা বা ঘটনা চক্রে তাহাকে বিচালিত করিতে সমর্থ হয় না এবং তাহার যেমন ইহলোক, পরলোক পরিণামও তেমনি সুখময় হইয়া থাকে। অর্থ সম্পদাদির সুখ ক্ষণিক উন্মাদন মাত্র, প্রকৃত তাহা সুখ নহে। বাপু বাঞ্ছারাম, যদি অর্থ উপার্জ্জনই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে নিতান্তই,

আজিকে আমরা তাহার সহজ পথ হইতে স্খলিত হইয়া অনেক দূর বিপথে আসিয়া পড়িয়াছি!

কর্ম্মক্ষেত্রমধ্যে ধর্ম্মবিদ্যা ও তত্ত্ববিদ্যা নিয়ামক স্বরূপ, এবং লোকবিদ্যা যাহা তাহা প্রবর্ত্তক। লোক বিদ্যাকেও আবার আমরা এখানে তাহার দ্বিবিধ প্রকৃতি হেতু, তাহাকে দ্বিভাগে বিভাগ করিতেছি, এক উপপাদ্য, অপর আনুষ্ঠানিক। উপপাদ্য বিদ্যা যাহা, তাহা প্রধানত অন্তর্জগৎকে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন বা অন্তর্দর্শনে মুগ্ধ ও তদ্দিকে লীন। আনুষ্ঠানিক বিদ্যা তাহা, যাহা প্রধানত বহির্জগৎকে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন বা বহির্দর্শনে মুগ্ধ ও তদ্দিকে লীন। হিন্দু এবং গ্রীকের ধর্ম্মবিদ্যা ও তত্ত্ববিদ্যার বিষয় পূর্ব্বে আলোচনা করা গিয়াছে। এক্ষণে লোকবিদ্যার বিষয় আলোচনা করা যাউক।

এ পর্য্যন্ত আমরা যতদূর এতদুভয় জাতীয় জীবন সমালোচন করিয়া আসিলাম, তাহাতে নিঃসন্দেহ অনুমিত হইবে যে, যে বিদ্যা উপপাদ্য, তাহাতে হিন্দুদিগের; এবং যাহা আনুষ্ঠানিক, তাহাতে গ্রীকদিগের উৎকর্ষ-লাভ করিবার কথা। বস্তুত তাহাই ঘটিয়াছিল। হিন্দুরা যে কোন বিষয়ে যাহা দেখিতেন, তাহা উপপাদিকা দৃষ্টি সাহায্যে; গ্রীকেরা সেইরূপ যে কোন বিষয়ে যাহা দেখিতেন, তাহা আনুষ্ঠানিক দৃষ্টি সাহায্যে। ফলত এতদুভয় দৃষ্টি এতদুভয় জাতীয় চিত্তকে এতদূর আকৃষ্ট করিয়াছিল যে, বিষয় আনুষ্ঠানিক হইলেও, হিন্দুর হাতে পড়িবামাত্র তাহা উপপাদ্যের আকার ধারণ করে; সেইরূপ আবার যাহা উপপাদ্য তাহা গ্রীকের হাতে পড়িলে, আনুষ্ঠানিক আকার ধারণ করিয়া থাকে। ইহার ফল এই, উভয়ের তুলনায় হিন্দুর তত্ত্বভাগ যেমন ভাল, কর্ম্মভাগ তেমন সুসম্পাদিত নহে, বরং অনেক স্থলে কুসম্পাদিত বলিয়া বলা যায়; গ্রীকের তেমনি তত্ত্বভাগ তেমন ভাল নহে বটে, কিন্তু কর্ম্মভাগ অতি সুসম্পাদিত ও চক্ষু-তৃপ্তিকর। হিন্দু ভাবিতেন উচ্চ, বুঝিতেনও উচ্চ, কিন্তু কার্য্যে তাহা তেমন আনত করিতে পারিতেন না; গ্রীক ভাবিত সামান্য, বুঝিতও সামান্য, কিন্তু কার্য্যে তাহা ধারণার অতিরিক্ত সুসম্পাদিত করিত বলিলে স্বচ্ছন্দে আদর করিয়া বলা যায়। এই নিমিত্ত গ্রীকের চাকচিক্য এত অধিক, এবং এই নিমিত্ত হিন্দু উচ্চ হইয়াও নিদর্শনশূন্য।

প্রথমে ব্যবহারশাস্ত্রের বিষয় আলোচনা করা যাউক। ব্যবহার-শাস্ত্র প্রকৃত পক্ষে ধরিতে গেলে, উহা স্বভাবে এবং প্রয়োগে, সম্পূর্ণই আনুষ্ঠানিক এবং লৌকিক। লোকযাত্রা নিরাকরণ ও নিরূপণ উহার উদ্দিষ্ট বিষয়; সুতরাং উহা দৈব এবং নৈতিক নিয়মের কোন রূপে বিরুদ্ধ-বাদী হইয়া সামঞ্জস্যচ্যুত হইতে না পায় কেবল এই পর্য্যন্ত দৃষ্টি রাখিয়া, যথাস্থিত এবং যথাসম্ভব লোকযাত্রা বিধায়করূপে উহার অবধারণা হইলেই উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয়। ব্যবহারনীতি ধর্ম্মনীতির ফলস্বরূপ, স্বয়ং ধর্ম্মনীতি নহে। অতএব ব্যবহারনীতি, পারলৌকিক গূঢ়ভাবসমাহিত ধর্ম্মনীতির পদবীতে উঠিয়া বিকৃত হইবে না; অথচ ব্যবহারনীতি ব্যবহার-নীতিই থাকিয়া ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধবাদী হইয়া বিকৃত হইতে না পায়; ইহা হইলে সেই ব্যবহারনীতি, ধর্ম্মনীতির সহ সামঞ্জস্য সংরক্ষিত হইবায়, পূর্ণ সংসারহিতকরী আকার ধারণ করিয়া থাকে। হিন্দু এবং গ্রীক-দিগের মধ্যে ব্যবহারশাস্ত্র আলোচনা করিলে, সেই সামঞ্জস্যের অস্তিত্ব বড় একটা দেখিতে পাই না। স্ব স্ব বিভিন্ন গুণময়ী চিত্ত ও প্রকৃতি অনুসারে, একের হাতে উহা ধর্ম্মনীতির পদবীতে উত্থিত, এবং তাহার খাতিরে প্রকৃত লৌকিক স্বার্থ যাহা তাহা কখন কখন উপেক্ষিত; আবার অপরের হাতে তেমনি উহা ব্যবহারনীতির অতিব্যবহার নীতিত্বে আনীত, এবং তজ্জন্য ধর্ম্মনীতিও কখন কখন উপেক্ষিত, ইহাই দেখিতে পাইয়া থাকি। উভয়েতেই, সম্ভব ও সাময়িক লোকাচারকে অতিক্রম করিয়া, বিধান প্রদানের ঘটার কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই; এজন্য উভয় স্থানেই, তাহার কোন কোন অংশ লোকসাধ্যের সাধনাতীত হেতু, অননুষ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু কি জন্য—কোথায়—কি কি বিষয়ে সেই সকল অতিনীতি, যাহা অননুষ্ঠিত? এখানেও স্ব স্ব জাতীয় স্বভাব আত্ম-পরিচয় প্রদান করিতেছে। হিন্দুদিগের অতিনীতি, ধর্ম্মনীতির প্রতি আবশ্যকের অতিরিক্ত দৃষ্টিহেতু, নৈতিক জটিলতা এবং কঠোরতা; গ্রীক-দিগের মধ্যে, লোকনীতির প্রতি আবশ্যকের অতিরিক্ত দৃষ্টিহেতু, লোকাচারের ক্রূরতা এবং কঠোরতা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। পুনশ্চ এতদুভয় অতিনীতিই উপপাদিকা শক্তি-সম্ভূত বটে, কিন্তু প্রভেদ এই

হিন্দুদিগের মধ্যে উহার ভিত্তি, উপকরণ এবং ফল, এতৎ ত্রিবিধ বিষয়ই, বহুপরিমাণে উপপাদিত ভাবনিবেশনে গঠিত হইয়া স্থিত পদার্থের আকার ধারণ করিয়াছে; এবং আপাতত তাহারা স্থিতপদার্থরূপে দৃষ্ট হইলেও, বস্তুত তাহাদের অস্তিত্ব চিত্তের ধারণাক্ষেত্রে ভিন্ন অন্যত্র অতি অল্প। গ্রীকদিগের তাহা নহে, ফল অবশ্যই উপপাদিত হইলেও, তাহার ভিত্তি এবং উপকরণ প্রায়শ আনুষ্ঠানিক ভাবনিবেশনে নির্ম্মিত, এবং তাহাদের অস্তিত্বও চতুষ্পার্শ্বস্থ আনুষ্ঠানিক জগতে। সুতরাং একস্থানে উপপাদিকা শক্তি, অপর স্থানে তদ্বিপরীতে আনুষ্ঠানিকী শক্তি, স্থানভেদে লোকচিত্তের উপর ইহাদের অন্যতরের প্রভুত্ব অবলোকিত হইতেছে।

উপরি-উক্ত বিষয়ের সত্যতা, ভারতীয় প্রাচীন ব্যবহারশাস্ত্র, এবং সমপ্রাচীনত্বযুক্ত স্পার্টাদেশীয় লাইকর্গসপ্রণীত ব্যবহারশাস্ত্র, এতদুভয়ের তুলনা করিলে প্রতীয়মান হইবে। লাইকর্গসের ব্যবহারশাস্ত্রের ব্যবস্থা, কিরূপে সমাজের লৌকিক সচ্ছন্দতা সাধিত হইবে, তাহা নিরাকরণ করিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে; এবং ব্যবহারদাতার তদ্বিষয়ে ঔৎসুক্যের আধিক্য হেতু, তাঁহার লৌকিক সচ্ছন্দতা ও তাহার প্রকরণ অতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়াছে।

লাইকর্গসের চিত্তে যাহা লৌকিক সচ্ছন্দতা বলিয়া ধারণা, তাহা বড় সহজ পদার্থ নহে;—উহা একমাত্র জাতীয় দৈহিক বলদৃপ্ত ভাব। লাইকর্গসের উদ্দেশ্য, মানুষকে মনুষ্যত্বযুক্ত, সমাজকে লৌকতা ও মৌলিকতায় পূর্ণ করণ,এ সকল নহে ,মানবকে ক্ষিপ্ত-সৈনিক,সমাজকে বলমদ-উন্মাদিত সেনানিবেশ করণ, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য; ইহাই তাঁহার নয়নে সামাজিক মঙ্গল বলিয়া প্রণোদিত হইত। এই সামাজিক মঙ্গলের জন্য পারিবারিক স্নেহের দমন; অসুখকর, অখাদ্য, অরুচিকর খাদ্য ভোজন; ইচ্ছার অনভিপ্রায়ে বহু লোকসমিতিতে এক আখড়া ও এক গৃহে বাস; চৌর্য্যাদি অপকর্ম্মের সৎকর্ম্মভাবে পরিণতি, ইত্যাদি ইত্যাদি। ফলত এই সমাজ-সচ্ছন্দতার খাতিরে কোন নৈতিক বিষয় বা মনুষ্যত্বকে যদি তাহার নিকট বলি দিতে হয়, তাহাও স্বীকার, তথাপি সামাজিক মঙ্গল সাধনে যত্নপর হও। লাইকর্গসের সকল বিধিরই অভিপ্রায় সেই একমাত্র স্থির-

উদ্দেশ্য সাধন, তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। তাহার পর সোলনের বিধি দেখ, কিছু মনুষ্যত্বপূর্ণ বটে নতুবা এখানেও প্রকৃতির কিঞ্চিৎ রূপান্তরে সেই একই উদ্দেশ্য—বাহ্যসম্পদসাধন।

এক্ষণে হিন্দুদিগের ব্যবহারগ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, ঠিক উহার বিপরীত দেখিতে পাইবে। ধর্ম্মবোধে যে যে বিষয় পবিত্র বলিয়া বিবেচিত, পবিত্রতা ও ধার্ম্মিকতা যাহাতে সঞ্চয় হইতে পারে, এবং ধর্ম্মবোধের পক্ষে যাহা ভুলেও কখন বিরোধী হইবার নহে, হিন্দুব্যবহারগ্রন্থসমূহে তাহার সংসাধন পক্ষেই অধিকাংশ বিধি পর্য্যবসিত হইয়াছে। তজ্জন্য যদি লৌকিক হিত ও বাহ্য সম্পদ বলি দিতে হয়, তাহাতেও ক্রটি হয় নাই। বাহ্য সম্পদ সমস্তই যাউক, তাহাতে ক্ষতি নাই; তথাপি যাহাতে পরলোকে সচ্ছন্দতা লাভ হইতে পারে, এরূপ পবিত্রতা সাধনে ক্রটি না হয়। লাইকর্গস বাহ্য সম্পদের অনুরোধে, অসম্পন্ন-অবয়ব বা ক্ষীণদেহ শিশুহত্যায় কিছু মাত্র ক্ষুণ্ণ হয়েন নাই; বা তাঁহার মনে তজ্জন্য কিছুমাত্র বিষাদ পর্য্যন্তও উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু হিন্দু ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, মানুষ দূরে থাকুক, কোন একটি ইতর জাতীয় প্রাণীর প্রাণবধ-জনিত নিমিত্তের ভাগী হইলেও, কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাহাকে পরলোকের পথপরিষ্কারক মন ও অঙ্গপবিত্রতা সাধন করিতে হইত। এতদপেক্ষা ব্যবহারশাস্ত্রদ্বয়ের প্রকৃতিবিভিন্নতা এবং হিন্দু ও গ্রীক চিত্তের বিভিন্ন প্রকৃতি এবং গতিবিষয়ক সুন্দর দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে?

যথায় সমালোচ্য বিষয় সমগ্রত ধরিয়া, তথায় অংশ বিশেষ উদ্ধারণ পূর্ব্বক উদাহরণ প্রদর্শন করিতে যাওয়া, বিশেষ সুবিবেচনার কার্য্য নহে। ইহাতে দ্বিবিধ জ্ঞানভ্রম উপস্থিত হইতে পারে। প্রথমত, যে জ্ঞান আমূলত দর্শনের উপর স্থাপিত হওয়া উচিত, তাহা অংশবিশেষের দ্বারা প্রদর্শিত হইবায়, সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হইবার আশঙ্কা। দ্বিতীয়ত, অংশবিশেষের উদ্ধারণে, সমগ্রের গুণাগুণ পাঠক সমক্ষে উপস্থিত করা সম্ভবপর নহে, এজন্য সমগ্রের প্রতি একরূপ অন্যায়াচরণ করা হয় বলিতে হইবে। তৃতীয়ত, আর একটী কথা, পাঠক মূর্খ হইলে লেখককে কখন কখন

একদেশদর্শী ও প্রতারকের নাম ও কলঙ্কও বহন করিতে হয়। যাহা হউক, তথাপি বাঞ্ছারাম বাবুর প্রীত্যর্থে, ব্যবহারশাস্ত্র হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উদ্ধার করিয়া দেখাইব।

নিম্নোদ্ধৃত লাইকর্গসকৃত বিধানবিশেষের তৎপর্য্য বিভিন্ন গ্রীক গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।

১। দেশমধ্যে অক্ষর পরিচয়াদির অতীত সাহিত্য বিজ্ঞানাদি অধীত হইতে পারিবে না, যেহেতু তাহা, লোকহিতে চিত্তনিবেশন এবং সাহস ও সামরিক প্রস্তুতির পক্ষে, প্রতিবন্ধকতা করিতে পারে।

২। সন্তান বিকলাঙ্গ হইলে, তাহা পর্ব্বতগুহায় পরিত্যক্ত হইবে, যেহেতু যে সন্তান দুর্ব্বল সে সমাজের উপর অকর্ম্মা ভারস্বরূপ হইবার সম্ভাবনা।

৩। সন্তান সপ্তবর্ষ বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে পিতা মাতার নিকট হইতে অন্তর করিয়া, সাধারণ বালকাগারে প্রতিপালিত ও শিক্ষিত করিতে হইবে। নতুবা পিতামাতা কর্তৃক প্রতিপালনে স্বভাব-কোমলতা প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা।

৪। সন্তান বয়ঃস্থ হইলে, দীয়ানাদেবীর উৎসবে শারীরিক সামর্থ্য পরীক্ষার্থ অপরিমিত কশাঘাত সহ্য করিতে হইবে।

৫। পুরুষ ত্রিংশ বর্ষ, এবং স্ত্রীলোক বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে বিবাহ করিতে পাইবে না।

৬। পুরুষ বিবাহের পরও ষষ্টিবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত, সামাজিক হিতার্থে ও তৎসাধনের বশ্যতা হেতু, অবিচ্ছিন্ন আপন স্ত্রী সহ সহবাস করিতে পারিবে না; যে কিছু সহবাস তাহাও চুরি করিয়া, যেন অন্য কেহ তাহা জানিতে না পারে। ১

৭। স্ত্রীগণকে বিংশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত অবিকল পুরুষের ন্যায়, স্পার্টার

১। পুরুষেরা ইচ্ছামত আখড়া ছাড়িয়া গৃহে যাইতে ও স্ত্রীসহবাস করিতে না পারায়,তাহাদের কামিনীগণ পুরুষের বেশ ধরিয়া ছদ্মবেশে আখড়ায় আসিয়া স্বামী সহবাস করিয়া যাইত।

পুরুষোচিত কঠোর শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে হইবে ২; এবং তাহার পরে বিবাহ করিতে পাইবে। বীরপ্রসবিনী ও বীরসঙ্গিনী হইবার নিমিত্ত, স্ত্রীজনোচিত কোমলতা পরিত্যাগ করাইবার জন্য এবম্বিধ শিক্ষার আবশ্যকতা।

৮। কোন অপরিচিত ব্যক্তি গৃহে আসিলে, স্থান পাইবে না; যেহেতু তাহার আচার ব্যবহার বিধর্ম্মী হইলে, সংস্রব হেতু অতিথি-সৎকারকের আচার ব্যবহার কলুষিত হওয়ার সম্ভব।

৯। মদ্যপায়ী এবং যদৃচ্ছা-ব্যবহারকারীর উপর সমাজস্থ যুবকদিগের ঘৃণা উৎপাদন করাইবার নিমিত্ত দৃষ্টান্ত দেখাইতে, হিলটদিগকে মদ্যপানে উন্মত্ত করাইয়া সেই উন্মত্তভাবের প্রতীকার স্বরূপ তাহাদিগের উপর ক্রূরাচরণের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ৩

১০। সন্তান বিকলাঙ্গ হেতু পরিত্যক্ত এবং সামর্থ্য পরীক্ষায় বা রণে হত হইলে, তজ্জন্য পিতা মাতার চক্ষুজল মোচন লোকসমাজে নিন্দনীয় ও অযশস্কর বলিয়া পরিগণিত হইবে। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

২। এই শিক্ষা ও শিক্ষাকালীন বেশভূষা সম্বন্ধে, গ্রীসদেশের প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা গ্রোট সাহেব এরূপ লিখিয়াছেন ;—"The Spartan damsels underwent a bodily training analogous to that of the Spartan youth—being formally exercised, and contending with each other in running, wrestling and boxing, agreeably to the forms of the Grecian agones. They seem to have worn a tight tunic, cut open at the skirts, so as to leave the limbs both free and exposed to view—hence Plutarch speaks of them as completely uncovered, while other critics in different quarters of Greece heaped similar reproach upon the practice, as if it had been perfect nakedness."

৩। লাইকর্গসের আদত বিধান মালা কোথায়াও পাওয়া যায় না। কেবল পরবর্ত্তী ইতিহাসবিৎদিগের দ্বারা যাহা কিছু লাইকর্গসের বলিয়া উক্ত হইয়াছে, একমাত্র তাহাই ঐতিহাসিকদিগের সম্বল। অতএব কোন্ নীতি ঠিক লাইকর্গসের এবং কোন্‌টি প্রবাদমূলক, তাহা নিরূপণ করিবার সাধ্য নাই। এই ৯ম সংখ্যক নীতি প্রকৃত লাইকর্গস কর্ত্তৃক প্রকাশ্যরূপে প্রচারিত হইয়াছিল কি না, তৎপক্ষে কেহ কেহ সন্দেহ করেন। হইতে পারে উহা লাইকর্গসের নয়, কিন্তু এটা নিশ্চিত যে ঐরূপ নীতি স্পার্টায় প্রচলিত ছিল। আমাদেরও ইহা হইলেই যথেষ্ট, কারণ আমাদের উদ্দেশ্য লাইকর্গসের অনুসন্ধান লওয়া নহে, অনুসন্ধান লওয়া গ্রীক চরিত্রের।

এ সকল কিসের জন্য? সামাজিক স্বাধীনতা এবং লোকবুদ্ধিতে যাহা সৌভাগ্য ও সম্পদ বলিয়া ধারণা, তাহা যাহাতে অটুট থাকে, তাহারই উপায় সংসাধন জন্য। এখন দেখ, ব্যবহারনীতির নিকট ধর্ম্মনীতি এবং অধিক কথা কি, যে মনুষ্যত্বের জন্য ব্যবহারনীতির আবশ্যক, সেই মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত, কিরূপ নৃশংসভাবে বলি প্রদত্ত হইয়াছে। এই ব্যবস্থাদাতার ব্যবস্থামালায়, আমরা যাহাকে ধর্ম্মবুদ্ধি, বলি, তাহার সঙ্গে কোন কারবারই নাই; হইতে পারে তাহার নিজের বিকৃত ধর্ম্মবুদ্ধির সঙ্গে এ সকল সামঞ্জস্যযুক্ত ছিল। কথিত আছে, এই সকল ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া, লাইকর্গস ডেলফি নগরে আপলো দেবের সম্মতি গ্রহণ করেন। গ্রীকের দেবতারাও চতুর সংসারবিৎ, যখন যেরূপ ভক্ত দেখিতেন, তখন সেইরূপ অনুমোদন বা অননুমোদন করিতেন। এই ডেল্ফির দেবমন্দিরে, আলেক্জাণ্ডারের এক টিপ্পনে, কুদিন ঘুচাইয়া আলেক্জাণ্ডারের ইচ্ছামত সুদিন কৃত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, ভাবিয়াছিলাম, ভারতীয় নীতির সঙ্গে উদ্ধৃত গ্রীকনীতির দুই একটা তুলনা করিয়া দেখান যাইবে যে, পরস্পরের মধ্যে প্রভেদ কোথায়। কিন্তু ভারতীয় নীতিসমূহের মধ্যে এমন একটিও খুঁজিয়া পাই না, যাহা উহার কোন না কোনটির সহ তদ্রূপ তুলনায় আসিতে পারে।

গ্রীকদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ব্যবহারশাস্ত্র, যাহা মিনো কর্ত্তৃক ক্রীটদেশে প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা কিরূপ, তদর্থে অধিক পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই। এই পর্য্যন্ত বলিলে পর্য্যাপ্ত হইবে যে, লাইকর্গসপ্রণীত ব্যবহারশাস্ত্র উহাকেই অবলম্বন এবং ভিত্তি করিয়া তদুপরি নির্ম্মিত। গ্রীকদিগের মধ্যে আর এক জন মাননীয় ব্যবহারিক ছিলেন, উঁহার নাম সোলন। সোলনের বিধির প্রধান সুখ্যাতি এই যে, উহাতে মিনো এবং লাইকর্গসের ন্যায় মনুষ্যত্বকে একেবারে বলি দেওয়া হয় নাই; একটু মনুষ্যত্বের দিকে চক্ষুলজ্জা ছিল, এবং কথিত দুইটির ন্যায় ধর্ম্মনীতিতেও একেবারে দৃষ্টিশূন্য ছিল না। মোটের উপর ধরিতে গেলে, তাৎকালিক গ্রীক সমাজের পক্ষে, ইহাঁকে প্রায় সর্ব্বাংশে লোকহিতকর বলা যাইতে পারে।

সোলনের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বপ্রথম বিধি অধমর্ণের সপক্ষে। পূর্ব্বে আথিনীয়গণকে ধার করিতে হইলে, পুত্র, কন্যা, গৃহিণী, এবং আপনাকে পর্য্যন্ত বন্ধক দিয়া ধার করিতে হইত। নিয়মিত সময়ের মধ্যে সেই ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিলে, উত্তমর্ণ যদি ইচ্ছা করিত তবে ঐ ঋণী ব্যক্তির পুত্র কন্যা স্ত্রী বা তাহাকে, অথবা সর্ব্বমত সকলকেই, দাসরূপে চাই নিজে রাখিতে, চাই অন্যত্র বিক্রয় করিতে পারিত। উত্তমর্ণ ইচ্ছা করিলে অধমর্ণকে কয়েদ করিতে ও বেগার খাটাইয়াও লইতে পারিত। সোলন ইহা রহিত করিয়া এই নিয়ম করেন যে, অধমর্ণকে কয়েদ করা, তাহাকে বা তাহার কোন পরিজনকে দাসত্বে বিক্রয় করা, অথবা তাহার ভূসম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ করা, উত্তমর্ণ এ সকল কিছুই করিতে পারিবে না; ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিলে, কেবল তাহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিতে উত্তমর্ণের অধিকার থাকিবে। এই বিধি প্রদানের দ্বারা সোলন অত্যাচারী সম্ভ্রান্ত সমাজে নিতান্ত বিরাগভাজন হইয়াছিলেন; এ সম্ভ্রান্তবংশ অত্যাচার এবং নষ্টামি বিষয়ে বঙ্গীয় জমীদারের অনুরূপ ছিল। যাহা হউক, সোলন নিজে এই বিধানের ফলে আপন ঋণ শোধ বিষয়ে সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায়, তাঁহার নিস্বার্থভাব প্রমাণ হইবাতে ও সাধারণ লোক তাঁহার পৃষ্ঠপোষক থাকাতে, কেহ কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই।

ভারতে অধমর্ণের প্রতি, গ্রীসের প্রাচীন কালীয় কঠোরতা কখনই প্রচলিত ছিল না। অধমর্ণের নিকট ঋণ আদায় সম্বন্ধে, উত্তমর্ণের হস্তে মনু কেবল এই মাত্র ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন যে, উত্তমর্ণ ঋণ আদায়ের জন্য অধমর্ণকে বলাৎকার অর্থাৎ রজ্জু দ্বারা বাঁধিয়া, আপনার গৃহে আনাইয়া তাড়নাদি করিতে পারিবে। তাহাতেও যদি আদায় না হয়, তখন রাজদ্বারে অভিযোগ দ্বারা আদায় করিতে হইবে। ভারতে স্ত্রীপুত্রাদি বন্ধক দেওয়ার বিষয় কেহ কখন অবগত ছিল না এবং স্বপ্নেও কেহ কখন ভাবে নাই। তবে দ্রব্যাদি বন্ধক দেওয়ার রীতি এখন যেমন আছে, তখনও তেমনি ছিল। কিন্তু বন্ধকী দ্রব্য উত্তমর্ণ গচ্ছিত ধনের ন্যায় না রাখিয়া যদি কোন রূপে ব্যবহার করে, তবে তৎসম্বন্ধে মনু এরূপ শাসন

করিতেছেন যে, তেমন স্থলে উত্তমর্ণকে ঋণের বৃদ্ধি পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং ব্যবহারের দ্বারা বস্তুর যে মূল্য কমিয়া গিয়াছে তাহা পূরণ করিয়া দিতে হইবে; যদি সেরূপ পূরণ না করা হয়, তবে উত্তমর্ণ চোরের ন্যায় দণ্ডনীয় হইবে।৪

সোলনের দ্বিতীয় প্রধান বিধি দায় সম্বন্ধে। সোলনের পূর্ব্বে আথিনীয়দিগের মধ্যে দায় সম্বন্ধে বিশেষ কোন নিয়ম ছিল না; পিতৃ-সম্পত্তি সন্তান থাকিলে পাইত, নতুবা তদভাবে প্রায়ই জাতীয় কোষ ভুক্ত হইত। সোলন তাহা নিবারণ করিয়া নিয়ম করেন যে,

১ম। সন্তানাদি না থাকিলে, মৃত ব্যক্তি তাহার সম্পত্তি যাঁহাকে ইচ্ছা দিয়া যাইতে পারিবে।

২য়। সন্তান থাকিলে, পুত্র বিষয়াধিকারী হইবে বটে কিন্তু তাহাকে অবিবাহিত ভগ্নীদিগের বিবাহের ভার লইতে হইবে, তদনন্তর সম্পত্তি বংশ-পরম্পরা চলিয়া আসিবে।

৩য়। যদি মৃত ব্যক্তির সন্তান না থাকে ও উইল না করিয়া মরিয়া যায়, তবে উত্তরাধিকার এরূপে বর্ত্তিবে—প্রথমে মৃত ব্যক্তির পিতা, তদভাবে ভ্রাতা, তদভাবে ভ্রাতৃসন্তান, তদভাবে ভগ্নী, তদভাবে ভগ্নীসন্তান, তদভাবে পিতৃব্যের বংশ, এবং তদভাবে মাতুলের বংশে বর্ত্তিবে। এখানে মিলাইয়া দেখার জন্য হিন্দু দায়ের উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই, কারণ ঐ দায়তত্ত্ব হিন্দুসন্তান মাত্রেই অল্পবিস্তর জ্ঞাত আছেন।

সোলনের অপর বিধি এই যে, কন্যা বিবাহকালীন পরিধেয় ধুতি, বিছানা এবং অপর অপর তদ্রূপ দুই একটি সামান্য দ্রব্য ভিন্ন, অপর কোন সম্পত্তি বা অলঙ্কার যৌতুক স্বরূপ পিতৃগৃহ হইতে শ্বশুরগৃহে লইয়া যাইতে পারিবে না; এবং যাহাও বা লইয়া যাইবে, যদি সেই কন্যা পরে মৃত হয়, তবে জামাতাকে তাহা শ্বশুরগৃহে ফিরাইয়া দিতে হইবে। উহা প্রকৃত পক্ষে ইহলৌকিক ঐশ্বর্য্যভক্ত গ্রীক নীতি। এক্ষণে হিন্দু ঋষি কি বলেন দেখ। যাজ্ঞবল্ক্য কহিতেছেন, পিতা, ভ্রাতা, জ্ঞাতি, শ্বশুর, শ্বশ্রূ, স্বামী ও দেবর প্রভৃতি সতী স্ত্রীকে শক্ত্যনুসারে বসন, ভূষণ, ভোজনাদি

৪। মনু ৮। ১৪৪।

দ্বারা সম্মনযুক্তা করিবে।৫ মনুও ঐ কথা বলিয়া আরও বলিয়াছেন যে, যথায় বস্ত্র অলঙ্কারাদি দ্বারা স্ত্রী পূজিত হয়েন তথায় দেবতারা প্রসন্ন থাকেন, এবং যথায় তাহা না হইয়া স্ত্রীর অনাদর হয় তথায় সকল ক্রিয়া নিষ্ফল হইয়া থাকে। অন্যান্য ব্যবস্থা-কারেরাও অল্প ইতরবিশেষে ঐ একই কথা বলিয়া গিয়াছেন। স্ত্রী মৃত হইলে স্ত্রীকে দত্ত ধন যে জামাতাকে ফেরত দিতে হয়, এ কথা তাঁহাদের মনেও কখন প্রবেশ করে নাই।

কোন স্ত্রীর উপর কেহ বলাৎকার করিলে, সেরূপ স্থলে সোলন ব্যবস্থা করিয়াছেন,—যে স্ত্রী কখন দাসত্বে বিক্রয় হয় নাই, তাহাকে বলাৎকার করিলে ১০০ ড্রাম অর্থাৎ ৪০৸৶৹ টাকা; এবং ভুলাইয়া হরণ করিলে ২০ ড্রাম অর্থাৎ ৮৶৹ টাকা, অপরাধীকে দণ্ড দিতে হইবে। মনু এরূপ ব্যভিচার স্থলে, ভিন্ন ভিন্ন জাতি বিচারে ভিন্ন ভিন্ন রূপ দণ্ড বিধান করিয়াছেন, এবং সে সমস্ত দণ্ডই ইহা অপেক্ষা ঘোরতর কঠোরতাপূর্ণ। অকামা পরস্ত্রীগমনে লিঙ্গচ্ছেদনাদিরূপ বধদণ্ড; সকামাগমনে বধদণ্ড হইবে না বটে, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে বিবিধ প্রকার কঠোর শাস্তি বর্ণিত আছে। ব্যভিচার বিষয়ের শাস্তি সম্বন্ধে মনুর চূড়ান্ত বিধান, প্রজ্বলিত লৌহময় শয়নে শয়ন করাইয়া দাহ করা পর্য্যন্ত আছে। মনু যে কেন এখানে এত কঠোরতা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার কারণ মনুই বলিয়া গিয়াছেন,—"ব্যভিচার হেতু বর্ণশঙ্কর হয়, বর্ণশঙ্কর হইলে সকল ধর্ম্ম লোপ হইয়া উঠে"৬—অতএব ধর্ম্মপথে ব্যাঘাত হয় বলিয়া!

সোলনের অপর বিধি, যে কেহ রাজকীয় গোলযোগের অংশভাগী না হইবে, সে অসম্মানিত ও দেশমধ্য হইতে বহিষ্কৃত হইবে। হিন্দু ব্যবস্থা গ্রন্থে ইহার সহিত তুলনীয় বিধি কোথাও পাওয়া যায় না। কোন্ জাতি কিরূপ রাজনৈতিকতা ও সামাজিক জীবনে লিপ্ত ও আস্থাযুক্ত এবং কোথায় কি পরিমাণে লোকে তাহাতে অংশভাগী হইত, এই বিধি তাহার অন্যতর নির্দ্দেশক।

৫। সংহিতায় আচার অধ্যায়, ৮২।

৬। মনু ৮,৩৫৩।

মনুর বিধি, যদি কেহ কাণা, খোঁড়া, কুঁজোকে, কাণা খোঁড়াদি শব্দে ডাকে তবে তাহার এক কার্ষাপণ দণ্ড হইবে। মাতা পিতা পত্নী ভ্রাতা পুত্র অথবা গুরু ইহাদিগের যে গ্লানি করে, ও গুরুকে যে পথ না দেয়, তাহার একশত পণ দণ্ড হইবে। গ্রীক ব্যবস্থাগ্রন্থে ইত্যাদির তুলনীয় বিধি কোথাও পাওয়া যায় না। উপরের বিধি যেমন গ্রীক চরিত্রের, এই বিধি তেমনি হিন্দু চরিত্রের সৎ-নির্দ্দেশক।

সোলনের পূর্ব্বে লোক মৃত শত্রুর শরীর লইয়া নানা খণ্ড বিখণ্ড ও তাহার উপর নানাবিধ বীভৎস আচরণ করিত ও করিতে পাইত; এবং হত আত্মীয়ের জন্য রাজদ্বারে অভিযোগ না করিয়াই, হত্যাকারীকে প্রতিশোধ স্বরূপ হত করিতে পারিত। সোলনের সময়ে উহা রহিত হয়। হিন্দু ব্যবস্থায়, মৃত দেহ সর্ব্বদাই ধর্ম্মবিধানে অসদাচরণ হইতে সুরক্ষিত; এবং প্রায় যে কোন গুরুতর অপরাধস্থলে, রাজদ্বার ভিন্ন অন্য উপায়ে প্রতিশোধ লওয়ার নিয়ম ছিল না।

ব্যবহারজীবীদিগের দণ্ডবিষয়িণী শিক্ষা দেখা গেল, এক্ষণে নীতি-বিষয়িণী শিক্ষা কিঞ্চিৎ দেখা যাউক।

পিতা মাতা সম্বন্ধে সোলনের শিক্ষা, পিতা মাতা যদি সন্তানকে তাহার শিক্ষার বয়সে কোন ব্যবসায়, বা জীবননির্ব্বাহ-উপযোগী কোন বৃত্তিবিশেষ শিক্ষা দিতে ত্রুটি করেন; তাহা হইলে সেই পুত্র পিতা মাতার দুঃখ মোচন করিতে বা তাহাদের আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিতে বাধ্য নহে। মনুর এতদ্বিষয়ে শিক্ষা,—যদিও তাহাদিগের নিকট সুব্যবহার প্রাপ্ত না হইয়া থাকুক, তথাপি পিতা, মাতা, গুরু এবং জ্যেষ্ঠের প্রতি কোনরূপে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবে না। পুনশ্চ, পিতা, মাতা, গুরু যাহাতে সন্তুষ্ট থাকেন, পুত্র তৎপক্ষে সর্ব্বদা যত্নবান রহিবে, যেহেতু ইহাঁরা সন্তুষ্ট থাকিলে সকল তপস্যার ফল পাওয়া যায়; যিনি ইহাদের সৎকার করেন, তাঁহার সকল ধর্ম্মকর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করা হয়; আর যিনি ইহাদের অনাদর করেন, তাঁহার শ্রৌত স্মার্ত্ত সকল কর্ম্মই নিষ্ফল হইয়া যায়।

মনুর শিক্ষা, "কেহ কোন অপমানজনক বাক্য বলিলে সহ্য করিবে,

কাহাকেও অপমান দ্বারা পরিভব করিবে না, এই অস্থির ব্যাধিমন্দির দেহ ধারণ করিয়া কাহারও সহিত বৈর করিবে না। কেহ ক্রোধ করিলে তাহার প্রতি ক্রোধ না করিয়া বরং সন্তোষ প্রকাশ করিবে; কেহ নিন্দা করিলে তাহার নিন্দা না করিয়া ভদ্র ও উত্তম প্রভৃতি মিষ্ট সম্ভাষণ করিবে।"৭ থিওগনিসের নীতি সাধারণত বিশুদ্ধ শ্রেষ্ঠ এবং উচ্চনীতি বলিয়া গণিত হইয়া থাকে। সেই থিওগনিসের মধ্য হইতে মনুর কথিত নীতি-বিষয়িণী এই সমধর্ম্মী উদাহরণ পাওয়া যায়—"যে কেহ তোমার প্রতি শত্রুতাচরণ করিবে, মিষ্ট বাক্য দ্বারা ভুলাইয়া তাহাকে স্ববশে আনিতে চেষ্টা করিবে। এবং যেমনি সে তোমার বশ্যতায় আসিবে, অমনি তাহার আর কোন কথাই না শুনিয়া যথাসাধ্য তাহার উপর প্রতিশোধ লইতে ক্রটি করিবে না"।৮ ইহার সহিত হেসিওদের নীতি মিলাইয়া দেখ। হেসিওদ একজন ধর্ম্মশিক্ষক। এই ধর্ম্মগুরু এরূপ স্থলে সুধু প্রতিশোধ নহে, দ্বিগুণ প্রতিশোধ লইতে উপদেশ দিতেছেন।৯ পুনশ্চ মনু শিক্ষা দিতেছেন ;—"পার্থিব সৌভাগ্য বিষবৎ অস্পর্শনীয় জ্ঞানে পরিহার করিবে"। এখানে থিওগনিস নির্ধন এবং গৌরবশূন্য অবস্থার প্রতি বহুবিলাপের পর শেষ শিক্ষা দিতেছেন, "হে প্রিয় কির্ণস্, দরিদ্রতা তাপে তপ্ত হওয়া অপেক্ষা, নির্ধনের পক্ষে মৃত্যুই একান্ত শ্রেয়স্কর"। এখানে আর্য্যগুরু মনুর আর একটি শিক্ষার প্রতি অবলোকন কর। তুমি দরিদ্র হইলে হইলেই, তাহাতে কি যায়, আইসে? "যে কোন আরব্ধ কার্য্যের শুভ ফল, অদৃষ্ট এবং মানবীয় চেষ্টা উভয়ের উপর নির্ভর করিয়া থাকে; যাহা অদৃষ্টের কার্য্য তাহা মনুষ্যের আয়ত্তাতীত, অতএব তাহার প্রতি প্রতিনিয়ত লক্ষ্য রাখিতেছ কি জন্য; তোমার সাধ্য যাহা তুমি তাহাতে কৃতকার্য্যতা লাভে আত্মসার্থকতা সাধনে তৎপর হও।" অতঃপর বলিতে কি, আর গ্রীক নীতি ভারতীয় নীতির সঙ্গে তুলনা করিতে যাওয়া, ভারতীয় নীতির অপমান করা হয় মাত্র। ব্যবহারনীতি এবং ধর্ম্মনীতি ভারতীয়দিগের মধ্যে প্রভেদ

৭। মথুরানাথ তর্করত্নের অনুবাদ; মনু ৬।৪৭—৪৮।

৮। Theog. 160—363. ৯। Works and Days, 117.

করিয়া লওয়া দুষ্কর। ভারতীয়ের গর্ভবাস কালীন হইতে ধর্ম্মকার্য্য আরম্ভ হয়, আজীবন তাহাতেই বাহিত হইয়া যায়, তাহার পর বস্তুত পরত মৃত্যুর পরেও তাহা হইতে নিষ্কৃতি নাই।

গ্রীকদিগের অতিনীতি কোন্ বিষয়ে দেখিয়া আসিলে, এক্ষণে ভারতীয়দিগের অতিনীতির প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর। এই অতি-নীতির প্রাবল্য যদিও প্রায় সর্ব্ব বিষয়ে, কিন্তু উহার ঘটাটা পাপক্ষালনকর প্রায়শ্চিত্ত পর্ব্বেই কিছু অধিক। উহা কি অদ্ভুত হাস্যাস্পদ অতিসীমান্তেই আনীত হইয়াছে!—নিম্নোদ্ধৃত অংশ দ্রষ্টব্য।

১। চণ্ডাল দর্শনের প্রায়শ্চিত্ত সূর্য্যদর্শন, তাহার সহ সম্ভাষণের প্রায়শ্চিত্ত ব্রাহ্মণসম্ভাষণ, তাহার উচ্ছিষ্ট দর্শনে একরাত্র উপবাস, সংস্পর্শে ত্রিরাত্র, এবং গঙ্গে গমনে সবস্ত্র স্নান প্রায়শ্চিত্ত হয়।—বৌধায়ন।

২। স্নাতকের ব্রতলোপে উপবাস প্রায়শ্চিত্ত, অগ্নিতে পাদনিক্ষেপে অহোরাত্র উপবাস,দেবতাগৃহের ইষ্টকাদি লইয়া গৃহাদি করণে প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত হয়।—মনু।

৩। চণ্ডালাদির ভুক্ত-উচ্ছিষ্ট কিম্বা রজস্বলা স্ত্রী অজ্ঞান পূর্ব্বক স্পৃষ্ট হইলে, অষ্টোত্তর শত গায়ত্রী জপ পূর্ব্বক ত্রিরাত্র উপবাস এবং পঞ্চগব্য পানে প্রায়শ্চিত্ত হয়।—শাতাতপ।

৪। ক্রোধ হেতু ব্রাহ্মণ যদি ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত ছেদন করে, তবে মনস্তাপ, প্রাণায়ামত্রয় এবং উপবাস করিবে।—আপস্তম্ব।

৫। শূদ্রে যদি যজ্ঞোপবীত ছেদন করে, তবে ত্রিংশৎপণ দণ্ড দিয়া প্রাজাপত্য ব্রত করিবে।—বৃহস্পতি।

৬। দিবাভাগে,শ্রাদ্ধদিনে, পর্ব্বদিবসে, স্ত্রীসঙ্গ করিলে, অহোরাত্র উপবাস করিতে হয়।—মনু।

৭। যদি ভোজনোত্তর আচমন না করিয়া, কুকুর, শূকর, অন্ত্যজ ইত্যাদিকে স্পর্শ করে, তবে সান্তপন ব্রত করিবে। তাহার অনুকল্প ধেনুদ্বয়।—কশ্যপ।

৮। বিড়াল কাক নকুলাদির উচ্ছিষ্ট ভক্ষণে একরাত্র উপবাস হয়। জ্ঞান পূর্ব্বক হইলে ত্রিরাত্র উপবাস বিধি।—মনু।

৯। রোগাদি জন্য যে গো ক্ষীণ হইয়াছে, তাহা অনুভব করিতে না পারিয়া যদি রোধ করিয়া রাখে ও সেই রোধ নিমিত্ত সেই গো যদি মরে, তবে তাহার জন্য প্রাজাপত্যের এক পাদ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।—অঙ্গিরা।

১০। সর্পহত্যা করিলে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ব্রাহ্মণকে তীক্ষ্ণাগ্র এক লৌহদণ্ড দান করিবে।—মনু।

১১। শূকর বধ করিলে ঘৃতপূর্ণ ঘট ব্রাহ্মণকে দান করিবে। তিত্তির পক্ষীবধে চারি আঢ়ক পরিমিত তিল প্রদান করিবে। শুকপক্ষী বধে দ্বিবর্ষীয় বৎস এবং ক্রৌঞ্চনামক পক্ষীবধে ত্রিবর্ষীয় বৎস ব্রাহ্মণকে দান করিবে। হংস, বলাকা, বক, ময়ূর, বানর, শ্যেন ও ভাসপক্ষী, ইহার অন্যতম বধ করিলে, ব্রাহ্মণকে একটি গো প্রদান করিবে।—মনু।

১২। জ্ঞানত বিড়াল, নকুল, চাষপক্ষী, ভেক, কুকুর, গোধা, পেচক, কাক, ইহার যে কোন একটিকে হত্যা করিলে, শূদ্রবধোক্ত চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। অজ্ঞানত মার্জ্জারাদি বধে তিন দিন দুগ্ধ পান করিয়া থাকিবে, ইহাতে অসমর্থ হইলে ত্রিরাত্র এক যোজন পথ ভ্রমণ করিবে, তাহাতে অশক্ত হইলে ত্রিরাত্র নদীতে স্নান করিবে, এবং তাহাতেও অশক্ত হইলে, ত্রিরাত্র আপোহিষ্টাদি সূক্ত মন্ত্র জপ করিবে।—মনু।

১৩। আমমাংসভক্ষণশীল ব্যাঘ্রাদির হননে পয়স্বিনী ধেনুদান করিবে, হরিণাদি পশু হনন করিলে, বৎসতরী দান করিবে, উষ্ট্রবধে এক রতি স্বর্ণ দান করিবে।—মনু।

১৪। বাতকর্ম্মে, নিষ্ঠীবে, দন্তাশ্লিষ্টে, অনৃতে, ক্ষুতে, এবং পতিত সম্ভাষে জলস্পর্শ, তদভাবে দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ করিবে।—মনু।

এই সকল অপেক্ষা আর কি হাস্যাস্পদ অতিনীতি সম্ভবিতে পারে? অনেকের বিশ্বাস এবং অনেকে বলিয়া থাকে যে, উক্ত প্রায়শ্চিত্তবিধি আদি করিয়া যে সকল অতিনীতি, তাহার অধিকাংশই ব্রাহ্মণদিগের স্বার্থপরতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তাহাদের এই বিশ্বাস ও এই বলার মত, এমন মিথ্যা বিশ্বাস ও মিথ্যা বলা আর কিছুই হইতে পারে না।

যাহারা জানে যে মিথ্যা, কৌশল ও শঠতা অবলম্বন করিলেও সংসার নির্ব্বিঘ্নে চলিতে পারে, কেবল তাহাদিগেরই ওরূপ বিশ্বাস ও ওরূপ বলা সম্ভবিতে পারে। বস্তুত ঐ সকল অতিনীতি পূর্ণ বিশ্বাসেই স্থাপিত ও পূর্ণ বিশ্বাসেই প্রতিপালিত হইয়াছিল; তবে মনুষ্যের স্বভাবের আলোচনা করিলে, ঐ সকল নীতির সমস্তই যে অক্ষুণ্ণভাবে প্রতিপালিত হইয়াছিল, সে পক্ষে কিঞ্চিৎ সন্দেহ উপস্থিত হয়। সাধারণত সামাজিক ও রাজনৈতিক বিধি দ্বিবিধ রূপে উৎপন্ন হয়। প্রথম, সাময়িক চলিত লোকপ্রকৃতি, আচার এবং বিশ্বাস যাহা, তাহা লেখ্য এবং বিধিবদ্ধ করিয়া তাহাদের স্থায়িত্ব সাধন; দ্বিতীয়, তদ্রূপ লেখ্য এবং বিধিবদ্ধ করণ ও তদতিরিক্তে যে যে বিষয়ে ও যথায় অপূর্ণতা ও হীনতা দৃষ্ট বা অনুমান হইতেছে, তথায় তাহা প্রচলিত লৌকিকরুচি ও লোকপ্রকৃতির সহ সামঞ্জস্য যুক্ত হইতে পারে এরূপ ভাবে সংশোধন ও পূরণ করিয়া দেওন। এই দ্বিপ্রকারের অন্যতর যে কোন বিধি সমাজের পরিচালক; এবং অল্প বা অধিক যে পরিমাণেই হউক, সমাজের পক্ষে মঙ্গলদায়ক হইয়া থাকে। এই দুই রকমের অতীতে আর একটি তৃতীয় রকম বিধি আছে, উহা দেশ কাল পাত্র কিছুরই অপেক্ষা রাখে না; "এরূপ হইলে ভাল হয়" কেবল এই বিশ্বাসের উপর ভর করিয়া, উহা বুদ্ধি ও তর্ক খরচের সাহায্যে উদ্ভাবিত হয়, যেমন প্লেটোর সাধারণতন্ত্র, রুষোর সোসিয়াল কণ্ট্রাকট (সামাজিক সংস্থান), বেন্থাম ও মিল প্রভৃতির ইউটিলিটী (হিতবাদ), ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সকল সর্ব্বসময়েই অসার, অকার্য্যকর এবং ভ্রান্তিমরীচিকা স্বরূপ; কার্য্যে লাগাইতে গেলে, কেবল ঘূর্ণাবর্ত্ত-বিপ্লবের উপস্থিত হইয়া থাকে মাত্র। সে যাহা হউক, গ্রীকদিগের বিধি যাহা তাহা প্রথম রকমের; আর হিন্দু-দিগের বিধি যাহা তাহা দ্বিতীয় রকমের। হিন্দুঋষিরা, সামাজিকতায় অপূর্ণ ও হীন অংশ পূরণ করিতে কিছু বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছেন, এই জন্য তাঁহাদের অনেক বিধি লোক সকলের দ্বারা প্রতিপালিত হওয়া অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তথাপি, হিন্দুঋষিরা যে সীমা অতিক্রম করিয়া কথিত তৃতীয় রকম বিধিদাতাদিগের শ্রেণীতে আসিয়া

উপস্থিত হয়েন নাই তাহার প্রমাণ এই যে, হিন্দুরা সেই সকল অতিবিধি পালন করিতে না পারিলেও, তাহা অবশ্যপাল্য জ্ঞানে সেই সকল বিধির নিকটে ভক্তিসংযুত ছিল;—উহা অতিবিধি হইলেও দেশ কাল ও পাত্রের সীমা বহির্ভূত হইয়া যায় নাই, কেবল সামঞ্জস্য পরিত্যাগে তাহাদের চূড়ান্ত সীমায় গিয়াছিল মাত্র। লাইকর্গস এবং সোলনের বিধি দেখিলে আপাতত উহা দ্বিতীয় রকমের বিধি বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে বটে, কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। ঊর্দ্ধসংখ্যায় লাইকর্গসের বিধি কিয়দংশে দ্বিতীয় রকমে প্রসারিত বলিয়া ধরিয়া লইতে যদিও পারা যায়, কিন্তু সোলনের সম্বন্ধে তাহা কোন মতে খাটে না। উহা সম্পূর্ণভাবে দেশ কাল পাত্র অনুসারে রচিত ও স্থাপিত হইয়াছিল। সত্য বটে সোলনের বিধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ অনেক হইয়াছে, কিন্তু তাহা কেবল জনকয়েক স্বার্থসাধক লোকের দ্বারা; নতুবা সর্ব্বসাধারণে তাহার প্রতি আগ্রহাতিশয় অনুকূল ছিল। বলা বাহুল্য যে লাইকর্গস এবং সোলনের বিধিও, স্বশ্রেণীর অতিবিধিতে প্রসারিত।

গ্রীকদিগের ও হিন্দুদিগের ব্যবস্থাগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অংশ সকলের দ্বারা যে সকল অতিনীতি অনুভূত হইতেছে, তাহার মধ্যে গ্রীকদিগের অতিনীতি যাহা, তাহা লোকনীতির অযথা অনুসরণ ফলে উৎপন্ন;—উহা লোকনীতির বিকৃতি প্রাপ্তি এবং সংসারিকতার অতিসীমা। হিন্দুদিগের অতিনীতি যাহা, তাহা অযথা ধর্ম্মনীতির অনুসরণ ফলে উৎপন্ন; উহা ধর্ম্মনীতির বিকৃতি প্রাপ্তি এবং পারলৌকিক ভাবমুগ্ধতার অতিসীমা। উভয়েতেই, লোকনীতি এবং ধর্ম্মনীতি, এতদুভয়ের মধ্যে যথাপরিমাণ সহানুভূতি ও সামঞ্জস্য গুণের অভাব। প্রতি জাতিতে স্ব স্ব সীমামধ্যে একমাত্র স্বাবলম্বনে এবং অপরাপর জাতীয় সংস্রবশূন্য ভাবে পরিবর্দ্ধিত হওয়া ঐ বিকৃতি প্রাপ্তির অন্যতর কারণ। গ্রীকনীতি কর্কশ বা পৌরুষ গুণময়ী, এবং হিন্দুনীতি কোমল বা কমনীয় গুণময়ী। কিন্তু কি পৌরুষ গুণ কি কমনীয় গুণ, কেহই পরস্পর অসংমিলনে, সম্বন্ধশূন্য ভাবে ও একমাত্র স্বাবলম্বনে, সুফল প্রসবে অপটু। এই নিমিত্ত উভয় নীতিই, উভয় স্থানে, উভয় জাতির জাতীয় বিকৃতি ও অধঃপতনের অংশত

কারণ স্বরূপ। গ্রীকদিগের বাঞ্ছা, কেবল আত্মবলে, আমরা আত্ম-প্রাধান্য রক্ষা করিব। ইহাদিগের নিকট বল ও স্বার্থ এ জগতে সর্ব্বস্ব। কিন্তু ইহা জানিত না যে বল এবং স্বার্থেরও এ জগতে সীমা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা উভয়ই আছে। অন্য দিকে হিন্দুদিগের ইচ্ছা, কেবল কোমল মনুষ্যত্ব গুণে আমরা এ জগতে প্রধান হইয়া চলিব এবং মনুষত্ব গুণই এ জগতের উদ্দেশ্য; কিন্তু ইহা জানিত না যে কেবল কোমল গুণ, সহায়শূন্য হইলে, সর্ব্বদা আপন জালে আপনি জড়াইয়া হস্তপদবদ্ধ এবং নির্জীব সুতরাং যাহার ইচ্ছা তাহার আক্রমণীয় হইয়া থাকে। গ্রীকদিগের গৌরব-নিশান ততদিনই উড়িয়াছিল, যতদিন তাহাদের কেবল বলসর্ব্বস্ব ও স্বার্থভাবের বহিঃপ্রচার হয় নাই। পারসিকেরা যখন দেখিল যে তাহাদিগকে কেবল বলে পারিয়া উঠা দুষ্কর, তখন তাহাদের মধ্যে যে বিষয়ে নৈতিক হিতাহিতজ্ঞানের ন্যূনতা, তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, গ্রীকচরিত্র কলুষিত করণের দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। ফিলিপ এবং আলেকজাণ্ডারও, ক্রমান্বয়ে উৎকোচ এবং লোভ, উভয়ের দ্বারা তাহাদিগকে ভুলাইয়া আত্মবশে আনিয়াছিলেন। যে সমতায় সকল রক্ষা, যদ্দ্বারা নিজের পরিমাণ করিয়া ন্যায্য বল চালনায় সমর্থ হইতে পারা যায়, বলগর্ব্বে কখন ইহারা সে সমতার দেখা পায় নাই; সেইরূপ যে নীতিতে সকল স্থায়িত্ব, যদ্দ্বারা আত্মসাবধান করিয়া চলিতে পারা যায়, স্বার্থ-বশ্যতায় কখন ইহারা সে নীতির দেখা পায় নাই। ইহাদের বলগর্ব্ব হেতু ইহাদের বহিঃশত্রু আকর্ষিত; এবং স্বার্থপরতা হেতু বহিঃশত্রু কর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়াছিল। পুনশ্চ যাহা অযথা দাম্ভিক গৌরবের নিদানভূত, তাহাই সর্ব্বদা সেই দাম্ভিক জনের সর্ব্বনাশের কারণ হইয়া থাকে;—বিধাতার এই নিয়ম যেন পুনরভিনীত করণার্থেই, যে বলগর্ব্বে গ্রীক কাহাকে গ্রাহ্য করিত না এবং যে স্বার্থে মনুষ্যত্বের দিকে তাকাইত না, রোমক চাতুরীতে পড়িয়া, সেই বল ও সেই স্বার্থই আপন আপন মধ্যে পরস্পরের প্রতি প্রয়োগে, পরস্পরের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছিল;—মনুষ্যত্ব ও ধর্ম্মনীতি সহ সামঞ্জস্যপরিশূন্য একমাত্র পাশব বল পরিচালনের ফল কার্য্যে

পরিণত হইয়াছিল। আর হিন্দু? ইহাদের সৌভাগ্য ধ্বজা অনেকদিন উড়িয়াছিল; তাহার কারণ, প্রথমত, মনুষ্যত্ব ও ধর্ম্মমূল যতই অতি-নীতিবিশিষ্ট হউক, পাশব বল ও স্বার্থ বল অপেক্ষা তাহা অধিক স্থায়ী হইবার কথা; দ্বিতীয়ত, ভারতলোলুপ বিজাতীয় লোকনয়ন তখনও উন্মীলিত হয় নাই, যদি হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অতি মনুষ্যত্ব দোষে যে ভারত অল্পকালে ও অনায়াসে একেবারে ছারেখারে যাইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; এবং শেষে যে গিয়াছে তাহাও সেই জন্য। স্ত্রীলোক আত্মরক্ষণে অপটু; ভারত ধর্ম্মনীতিতে, কোমলগুণে, মায়াবাদে, অদৃষ্টবাদিত্বে স্ত্রী এবং জুজুবিশেষ; সুতরাং তাহার অধঃপতনের কারণ অংশত বলিতে যাওয়াও সময় অপব্যয় মাত্র। এ বিষয়ে রূপক ভাবে বলিতে গেলে, ভারত শিক্ষিতা রূপসী স্ত্রী; আর গ্রীক বর্ণ জ্ঞানশূন্য বোমবেটে। কেনা জানে সুগুণা সুরূপা স্ত্রীজীবন স্বত পরত অঘোর বোম্‌বেটে অপেক্ষা কিছু দীর্ঘস্থায়ী হইয়া থাকে।

ভারত সন্তান! একা পৌরুষ গুণ বা একা কমনীয় গুণ কখনও ফলপ্রসবী হইতে পারে না। এতদুভয়ের সংমিলনে জগত সংসার; এতদুভয়ের সংমিলনেই যে কিছু প্রকৃত পদার্থ প্রসবিত হয়। তুমি তোমার এ দীর্ঘ নিদ্রাভঙ্গে যদি জাতীয় জীবনে আবার গৌরব-নিশান উড়াইতে ইচ্ছাবান হও, তবে ঐ উভয় গুণের সমাবেশ বা বিবাহ দিতে শিখ, তাহাদের সংমিলন সাধন কর। বিকৃতি পরিত্যাগে গ্রীকের যে পৌরুষগুণ এবং বিকৃতি পরিত্যাগে হিন্দুর যে কমনীয় গুণ, তাহার সামঞ্জস্য সাধন করিতে শিক্ষা কর, এবং সেই সামঞ্জস্যের ফল যাহা তাহা অনুষ্ঠান কর, কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। কেবল মনুষ্যত্বেও কিছু হয় না, কেবল স্বার্থেও কিছু হয় না, বা কেবল বলেও কিছু হয় না।

আনুষ্ঠানিক বিদ্যাক্ষেত্রে অবতরণ করিলে, হিন্দুদিগের বিদ্যাক্ষেত্রে আর উল্লেখযোগ্য কোন শাস্ত্রই পাওয়া যায় না। সে যাহা হউক, অগ্রে পুঁথিগত অনুষ্ঠান বৃত্তি দেখার পূর্ব্বে, কার্য্যগত অনুষ্ঠান বৃত্তি দেখা কর্ত্তব্য। তজ্জন্য কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যই অগ্রে লক্ষ্যস্থলীয়।

কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য।

গ্রীকদিগের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের সবিস্তার আলোচনা করিতে যাওয়া অনাবশ্যক, কারণ তাহা শত মুখে শত জন আলোচনা করিয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। যে কোন বিস্তৃত গ্রীক ইতিহাস দৃষ্ট করিলে তাহা জ্ঞাত হইতে পারা যায়। অতএব একেবারে অনালোচিত যে ভারতীয় কৃষিশিল্পাদি, আমরা এখানে তাহারই বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া যাইব; এবং যেহেতু আমরা ভারতসন্তান, সুতরাং তাহা আমাদিগের পক্ষে কর্ত্তব্যও হইতেছে। বাঞ্ছারাম, যদি তুমি এ সঙ্কীর্ণ স্থানে কোন বিস্তৃত আলোচনার প্রত্যাশা কর, তাহা হইলে তোমার ভুল!

যে দেশে সপ্তসিন্ধু এবং পুণ্যসলিলা সরিদ্বরা গঙ্গা দুহিতৃগণ সহ হিমগিরি পরিত্যাগ করিয়া, শত মুখে সাগরগামিনী হইয়াছেন; যে দেশে কমলাসনা লক্ষ্মী দেবীর প্রভব ও জন্ম; সে দেশে যে অতি প্রাচীন কাল হইতে কৃষিবিষয়ে লোকের আগ্রহাধিক্য এবং তাহার সময়োচিত উন্নতিও সাধিত হইয়াছিল, তাহা বলিতে যাওয়া দ্বিরুক্তিমাত্র। আর্য্যজাতির অতি প্রাচীনতম এবং ঐতিহাসিক তত্ত্বময় ঋগ্বেদে ভূয়োভূয়ঃ কৃষিকার্য্যের উল্লেখ, তাহার শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপন, এবং কৃষির জন্য "কুল্যা"[১০] শব্দে জলপ্রণালীরও অস্তিত্ব সূচন হইয়াছে। তদ্ব্যতীত কৃত্রিম জলপ্রণালীরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকলের দ্বারা অনুমান হয় যে, বৈদিক সময়ে আশানুরূপ কৃষিকার্য্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধন হইয়াছিল, এবং আর্য্যগণ নানা উপায়ে ও পরিশ্রমে রত্নপ্রসবিনী বসুন্ধরা হইতে বহুরত্ন দোহন করিয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। রাজগণও কৃষিকার্য্যের পক্ষে যে নিতান্ত অমনোযোগী ছিলেন, এরূপ বোধ হয় না। অযোধ্যাকাণ্ডে (১০ম সর্গে) রাম ভরতকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"সীমন্তে ক্ষেত্রসকল হলকর্ষিত ও শস্য-সুপ্রচুর, যথা নদীজলেই কৃষিকর্ম্ম সম্পন্ন হইতেছে, সেই সুসমৃদ্ধ জনপদত এক্ষণে উপদ্রবশূন্য? কৃষক ও পশুপালকেরা ত তোমার প্রিয়পাত্র হইয়াছে? এবং উঁহারা স্ব স্ব কার্য্যে

১০। ঋঃ বেঃ ১০-৩৪-১৩। ১০-১১৭-৭। ১০-৪৩-৭ ইত্যাদি।

রত থাকিয়া সুখ সচ্ছন্দেত কাল যাপন করিতেছে? ইষ্ট সাধন ও অনিষ্ট নিবারণ পূর্ব্বক তুমিত উহাদিগকে প্রতিপালন করিয়া থাক?" ইত্যাদি। কৃষিকার্য্য, দেখিতে পাওয়া যায় যে, কেবল জাতি বা শ্রেণীবিশেষে আবদ্ধ ছিল না। সর্ব্বোচ্চজাতি ব্রাহ্মণেরা পর্য্যন্ত স্বহস্তে লাঙ্গল ধরিয়া কৃষিকার্য্যের অনুসরণ করিতেন।[১১] অতি সুন্দর ছবি! কিন্তু এই পর্য্যন্তই শেষ, ইহার অতিরিক্ত নহে। কি আশ্চর্য্য এবং কি পরিতাপের বিষয় যে, যে কৃষিপ্রণালী বৈদিক কালে অনুসৃত হইত, এখনও অল্প ইতর বিশেষে তাহাই হইয়া আসিতেছে; এবং তাহারও আবার অবনতি কোথায় থাকিলে হয়ত থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে উন্নতি কখন হয় নাই। সাংসারিক বিষয়ে অনাস্থাকেন্দ্রশয়নশায়ী এমন জাতি আর কি কোথায় উৎপন্ন হইয়াছে! ভারতক্ষেত্র যদি এরূপ দয়াশালী না হইয়া কিঞ্চিৎ বিমাতৃবৎ আচরণ করিতেন, তাহা হইলে ভাল হইত।

৫

কৃষিপ্রণালীর গুণেই হউক আর ভূমির গুণেই হউক, সেই প্রাচীন কালে যেরূপ অপরিমিত ধনশালিত্ব, সুশৃঙ্খল বিলাস এবং সুখ সচ্ছন্দতা দেখা যায়, তাহাতে তাহাকে, সে সময় বিবেচনা করিলে, নিঃসন্দেহ অতি আশ্চর্য্যজনক বলিতে হইবে। রামায়ণ দৃষ্টে দেখা যায় যে তখন ভারতে বহু ধনের সমাগম হইয়াছে, এবং ধনী জনের বিলাস জন্য বহুতর শিল্পী সকল নিরন্তর নিয়োজিত হইয়া থাকিত। ঋগ্বেদে স্বর্ণমুদ্রা, সুবর্ণ কোষ[১২], ধনাঢ্য অবস্থা[১৩], সামুদ্রিক বণিক[১৪], পান্থনিবাস[১৫], ইত্যাদির উল্লেখে, তৎকালে তৎ তৎ বিষয়ের অস্তিত্ব এবং তজ্জনিত সৌভাগ্য যথাপরিমাণ সূচিত হইতেছে। রামায়ণে মণিকার, তন্তুবায়, কুম্ভকার; শস্ত্রনির্ম্মাণব্যবসায়ী, মায়ূরক (ময়ূর পুচ্ছের দ্বারা নানাবিধ বস্তুর নির্ম্মাণকারক), ক্রাতি, বেধক (মণি মুক্তাদি বেধ করে যাহারা),

১১। তত্রাসীৎ পিঙ্গলো গার্গ্যস্ত্রিজটো নাম বৈ দ্বিজঃ।
ক্ষতবৃত্তির্বনে নিত্যং ফালকুদ্দাললাঙ্গলী।—রামায়ণ ২।৩২।২৯।

১২। ঋঃ বেঃ ৬।৪৭।২২।   ১৩। ঋঃ বেঃ ২।২৮।১১।

১৪। ঋঃ বেঃ ১।১১৬।৩—৪।   ১৫। ঋঃ বেঃ ১।১৬৬।৯।

দন্তকার (যাহারা গজদন্তের কার্য্য করিয়া থাকে), গন্ধোপজীবী (গন্ধ দ্রব্য যাহারা বিক্রয় করে), স্বর্ণকার, কম্বলকার, স্নাপক, অঙ্গমর্দ্দক, ধূপক (ধূপবিক্রয়কারী), শৌণ্ডিক, রজক, তুন্নবায় (দর্জি), সুধাকার (যে চূর্ণ লেপন করে), বাইজি ও ভেড়ো ১৬, ইত্যাদি শিল্পী ও ব্যবসায়ীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন, ভূমিপ্রদেশজ্ঞ, শিবির-নির্ম্মায়ক, খনক, যন্ত্রক, স্থপতি, যন্ত্রকোবিৎ, মার্গিণ, বৃক্ষতক্ষক ১৭, ইত্যাদি আরও অনেক প্রকার ব্যবসায়ীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সকল শিল্পী এবং ব্যবসায়ীর নাম করিলে, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পরিপোষক আনুষঙ্গিক অপরাপর অনেক শিল্পী ও ব্যবসায়ী আপনা হইতে আসিয়া পড়ে। এক্ষণে এই সমগ্র একত্র করিয়া দেখিলে অবশ্য বলিতে হয় যে, যে সমাজ এতগুলি শিল্পী ব্যবসায়দারকে খাটাইত তাহা অবশ্যই উন্নত সমাজ; এবং উন্নত সমাজ যে সকল শিল্প ও ব্যবসায়ের প্রশ্রয় বা উৎসাহ দেয়, তাহা অবশ্যই উন্নত এবং উৎকৃষ্ট শিল্প ও ব্যবসায় হইবার কথা। কিন্তু এই সকল শিল্প ও ব্যবসায় যতই উন্নত বা উৎকৃষ্ট হউক না কেন, তাহা ব্যক্তিবিশেষে, বিলাসীবিশেষের অভাব পূরণ করিত মাত্র; জাতীয় অভাব পূরণ করিতে কখন নিযুক্ত হইত কি না তাহার কোন চিহ্নও নাই, এবং তাহার উল্লেখও কোন গ্রন্থে কিছুই পাওয়া যায় না। দেশের অধিপতি যিনি, তিনিও তাহাদিগকে নিয়োগ করিতেন বটে, কিন্তু সেও ব্যক্তিবিশেষের বিলাস-কৌতূহল পরিপূরণ করিবার ন্যায়। গ্রীকের শিল্প ব্যবসায়ের ভাব এরূপ নহে, উহা প্রকৃত জাতীয় আকার ধারণ করিয়াছিল; এবং আজি পর্য্যন্ত তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন চতুর্দ্দিকে দেদীপ্যমান। এ সকল বিষয়ে, ভারতীয়ের জাতীয়ত্ব বোধ অতি প্রাচীন কালে যাহা ছিল, এখনও তাহাই আছে অথবা কমিয়াছে। বাবুজীর বাগানে, বৈটক খানায়, বিলাস উদ্দীপক অনঙ্গমঞ্জরী, রতিকাম, বা বিলাতি রসিক রসিকার ছবির অভাব নাই; কিন্তু একটা স্বদেশীয় খ্যাতনামা বা অভাবে যে কোন জাতীয় মহাপুরুষের ছবির সঙ্গে দেখা নাই। এইরূপ ভারতীয়

১৬। রামায়ণ ২।৮৩।১২—১৫। ১৭। রামায়ণ ২।৮০।

বিষয়ে। যেমন অতি আশ্চর্য্য, তেমনি অতি বিড়ম্বনার কথা বলিতে হইবে। যাউক, আর বাজে কথায় কাজ নাই।

পুনশ্চ রামায়ণ দৃষ্টে স্পষ্টত দেখা যায় যে, তখন ভারতবর্ষে বহু ধনের সমাগম ও বহু শিল্পের আবির্ভাব হইয়াছে। স্ফাটিক গবাক্ষ যুক্ত ১৮ ইন্দ্রভবনতুল্য অত্যুচ্চ অট্টালিকা, সুরম্য উদ্যানমালা, রথ শিবিকা প্রভৃতি যান, মণিমাণিক্যের ছড়া ছড়ি, দেশীয় ও বিদেশীয় শিল্পজাত বহুবিধ দ্রব্যসকল, বৃক্ষাবলী-শোভিত এবং কূপ ও পান্থনিবাসাদি যুক্ত কাঁকর দিয়া বাঁধা প্রশস্ত রাজপথ, ইত্যাদির ভূয়ঃ উল্লেখে কে না অনুমান করিবে যে রামায়ণের সময়ে উত্তর ভারত অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। কেবল রামায়ণের প্রমাণ যদি অত্যুক্তি বলিয়া, অভ্রান্তভাবে গ্রহণ করিতে না পারা যায়, তবে মনুসংহিতা দেখ; তথায় বাল্মীকির বর্ণিত সমাজের ন্যায় অনুরূপ উন্নত সমাজের চিহ্ন পাওয়া যাইবে, এবং বলা বাহুল্য যে সেই চিহ্ন কিয়দংশে রামায়ণের সমন্দের উপর বিনা আপত্তিতে বর্ত্তিতে পারে।

কিন্তু উপরের চিত্র যতই তৃপ্তিকর বা যতই মনোহর হউক, আক্ষেপের বিষয় এই যে তাহা সর্ব্বজনীন ছিল না। এ বিলাস, এ ধন, এ সচ্ছন্দতা কোথায় প্রবাহিত হইত?—ধনীর ঘরে, রাজার ঘরে; কিন্তু ধনী বা রাজা দেশশুদ্ধ লোক নহে। বিশ্বব্যাপী রোমরাজ্য রাজ্যের শেষাবস্থায় যেমন দুই সহস্র মাত্র পরিবারের সুখোৎপাদন করিত, এবং তথায় যেমন অপর লোক চীরমাত্র পরিয়া ও অখাদ্য খাইয়া জীবনকাল কাটাইত; ভারতেও তেমনি তাৎকালীন ঐশ্বর্য্য কেবল কয়েকটি মাত্র পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ ছিল বলিয়া বোধ হয়। যেখানে অধিক বাহ্য সৌভাগ্যের আড়ম্বর, সেই খানেই কি কাঙ্গালের দশা সকল কালে সমান! রাজকর ষষ্ঠাংশ, অতএব যেখানে ৬ টাকার দ্রব্য উপার্জ্জন করিয়া একটাকা রাজাকে দিতে হইবে, সেখানে তাহাদের সচ্ছন্দতার সম্ভাবনা কোথায়? এতদ্ব্যতীত অন্য কোনরূপ কর, যুদ্ধব্যয়, এবং

১৮। রামায়ণ ৪।১।৭৮। ইউরোপভূমে প্লিনীর সময়ে কাচের ব্যবহার আরম্ভ হইতে দেখা যায়।

মহাজনের দেনাও সম্ভবত ছিল; তাহার পর রাজকর্ম্মচারীর অত্যাচার, বা প্রজার অবশিষ্ট ধন রক্ষায় রাজার অমনোযোগিতা, ইত্যাদি ত্রুটি প্রজার নির্ধনতার অপর কারণ। এই শেষোক্ত কারণ বোধ হয় সময়ে সময়ে বিশেষরূপে প্রবল হইত; যেহেতু দেখিতে পাওয়া যায় যে কৃষক, আপন আবশ্যকের অতিরিক্ত কিছু বেশি ধন উপার্জ্জন করিলে, তাহা ভয় প্রযুক্ত ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখিত।১৯ সমাজের ইহা সুন্দর চিত্র নহে। তবে অপেক্ষায় সুন্দর বটে, এবং কালব্যবধানেও সৌন্দর্য্যের অভাব নাই।

বিপুল ধন রত্ন সংগ্রহ সত্ত্বেও সৌভাগ্য জনকয়েকের মধ্যে আবদ্ধ হওয়ায়, এবং যখন ভাল রাজা তখন সুখে থাকন ও যখন মন্দ রাজা তখন দুঃখ দৃষ্ট হওয়ায়, এরূপ অনুমান হইতেছে যে, সেই সৌভাগ্য বা সুখে থাকন অথবা দুঃখ সহন, যেরূপ মুসলমান রাজত্বকালে সেইরূপ, বা সেই প্রকার অন্য কোন রূপ ব্যক্তিগতি আকার ধারণ করিয়াছিল; উহা জাতীয় প্রকৃতির সম্পত্তি বা জাতীয় প্রকৃতি সহ সংমিলিত হইতে পারে নাই। জাতীয় প্রকৃতি ধর্ম্মবন্ধনে, পরলোকচেষ্টায়, মায়া ও অদৃষ্টবাদে বা তথাবিধ অপরাপর কারণে অবসন্ন হইয়া, সেই সকল সৌভাগ্য এবং রাজশাসনের সুখ ও দুঃখের প্রতি সম্পূর্ণরূপ অনাস্থাকেজ্রশয়নশায়ী হইয়াছিল। এই সুযোগে, তাহাদের মধ্যে জন কয়েক চতুর লোক, তাহাদের এই অবস্থা দর্শনে, সেই অবস্থা কৌশল পূর্ব্বক আপনার স্বার্থ বুদ্ধির দাসত্বে আনিয়া, সৌভাগ্য সঞ্চয় আদি যাহা ইচ্ছা তাহা করিয়া লইতে সক্ষম হইত এবং হইয়াছিল। সৌভাগ্যাদি যখন জাতিগত না হইয়া এরূপ ব্যক্তিগত হয়, তখন সেই সৌভাগ্য এবং শিল্পাদি, যতই উন্নতি প্রাপ্ত হউক না কেন, স্থায়ী কোন চিহ্ন এ জগতে রাখিয়া যাইতে পারে না। শিল্প সৌভাগ্যাদি জাতিগত হইলে, সাধারণত এরূপ হয় না; তখন তাহাদের

১৯। অযোধ্যাকাণ্ডে, রাম বনে যাইবেন বলিয়া, লোকে দুর্বৃত্তা কৈকেয়ীর পুত্রাদিগের রাজত্বে বাস করিতে হইবে এই ভয়ে কহিতেছে,

"সমুদ্ধৃতানি ধনানি পরিধস্তাজিরাণিচ।
উপাত্তধনধান্যানি হৃতসারাণি সর্ব্বশঃ॥"

ফল স্বরূপ জাতীয় কীর্ত্তি প্রায়ই নানা রূপে স্থায়ী হইয়া, জাতীয় মহা-প্রাণতার সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে। এই কারণে গ্রীক শিল্প ও সৌভাগ্যাদি, ভারতীয় শিল্প সৌভাগ্যাদির অপেক্ষা; কতই অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব কীর্ত্তি সকল কাল সমক্ষে দণ্ডায়মান রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। গ্রীকের ধনবত্তা ভারতের শতাংশের একাংশ নহে বটে, কিন্তু তথাপি গ্রীক তাহার ধনবত্তার যে মনোহর চিহ্ন সকল রাখিয়া গিয়াছে; ভারত তাহার শতাংশের একাংশ রাখিতেও সমর্থ হয় নাই। ভারত যাহা রাখিয়া গিয়াছে, তাহা কেবল পুঁথিগত খেয়ালপূর্ণ কতকগুলি বর্ণনাঘটা মাত্র। মিসরও ধর্ম্মোন্মত্ত ছিল, কিন্তু তথাপি ত অনেক কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছে? সত্য বটে, কিন্তু মিসরের রাখা আর ভারতের না রাখা, এ উভয়কে সমশ্রেণীর ও সম-কারণ-সম্ভূত বলিলে বলা যায়। মিসর কীর্ত্তি অনেক রাখিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু সে সকল জাতীয় কীর্ত্তি নহে, তাহাও ব্যক্তিগত, তাহাও ব্যক্তি বিশেষের ধর্ম্মোন্মাদ এবং তদ্দেশজ পরলোকবুদ্ধি হইতে উৎপন্ন। ভারতের ধর্ম্মবুদ্ধি এবং পরলোকবুদ্ধি স্বতন্ত্র। একে স্বতন্ত্র; তাহার পরে আবার যে পর্য্যায়ের ধর্ম্মোন্মাদে সেই সকল কীর্ত্তি উৎপন্ন হইতে পারে, ভারতের ভাগ্যে ভারত এ দিকে তাহাকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন—"জ্ঞানং বিমোক্ষায় ন কর্ম্মসাধনং।" তাহার পর, বাহুল্যায়, সকল স্থানেই যে এক প্রকারের ফল একই কারণ ভিন্ন উৎপন্ন হইতে পারে না, বা এক প্রকৃতির কারণ হইতে বিভিন্ন ফলের সম্ভব হয় না, এরূপ নহে। ধনী বা দরিদ্র অনেক হইতেছে, কিন্তু দেশ কাল পাত্র প্রভেদে কারণ সকলেরই পৃথক পৃথক; জাতীয় বিষয় সম্বন্ধেও ঐ কথা প্রযুক্ত হইতে পারে। এখন আসল কথা, যতই হউক, সৌভাগ্য বল, সামাজিকতা বল, রাজনীতি বল, বা যাহাই বল, যতক্ষণ তাহা সর্ব্বজনীন না হইবে এবং যতক্ষণ তাহাতে সর্ব্বসাধারণে অংশভাগী ও উৎসাহিত হইতে না পারিবে; ততক্ষণ তাহা উজ্জ্বল ও স্থায়ী চিত্র প্রদর্শনে ও জাতীয় জীবনের ভিত্তি দৃঢ় বন্ধনে কখন সমর্থ হইবে না। অন্যান্য স্থানে নিম্ন শ্রেণীর দরিদ্রতা সাধারণত জাতীয় জীবনের দৃঢ় বন্ধন পক্ষে অন্তরায় স্বরূপ হয়, কিন্তু ভারতের পক্ষে, বিশেষত আধুনিক ভারতের পক্ষে তাহাত আছেই, অধিকন্তু ভারতীয় মানব

প্রকৃতি তাহাতে সোণায় সোহাগা স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে! একের জালায় রক্ষা নাই, তাহার উপর এ যুগলসংযোগ! বাহ্‌'বাম, যদি আবার জাতীয় সৌভ গ্যের প্রার্থী হও, তবে এরূপ নির্ব্বিবাদী ঔদাস্যপূর্ণ প্রকৃতি অগ্রে সংশোধন কর, তাহার পর সর্ব্বজনীন ভাবের অন্তরায় যাহা যাহা তাহা কায়মনে নিপাত কর। সাধারণ লোককে অগ্রে উত্থান কর, নতুবা মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। তুমি একা উঠিলে ফল কি, তোমার পৃষ্ঠবল কোথায়?

কৃষি শিল্পাদি সম্বন্ধে যে চিত্র দেখা গেল, বাণিজ্য বিষয়ক চিত্র যে তাহা অপেক্ষা কিছু অধিক মনোহারী, তাহা নহে। ভাল দেখা যাউক। অন্তর্বাণিজ্য অর্থাৎ দেশমধ্যে যে বাণিজ্যের চলাচল হইয়া থাকে, তাহার বিষয় কিছু বলিবার আবশ্যক রাখে না। যখন দেখা যাইতেছে যে অসভ্য সমাজের মধ্যেও অন্তর্বাণিজ্যের চালনা রহিয়া থাকে, তখন এই সভ্য সমাজেও যে ছিল তাহা বুঝাইতে যাওয়া সময় অপব্যয় মাত্র। সমাজের সভ্যতা ও সৌভাগ্যাবস্থা, প্রচুর পরিমাণে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপত্তি, লোক এবং দ্রব্যাদি চলাচলের জন্য যান ও রাজপথাদি, এবং এরূপ নদীমাতৃক দেশে নৌকা গমনাগমনের বহুল উল্লেখ, এই সকল যদি সেকালের কালোচিত অন্তর্বাণিজ্যের বহুবিস্তৃতি পক্ষে বহিশ্চিহ্ন স্বরূপ ধরা যায়; তাহা হইলে তাহাদের অস্তিত্ব পক্ষে ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থাদিতে এতই উল্লেখ আছে যে, তাহাতে ভারতের তৎকালিক অন্তর্বাণিজ্য অতি সমৃদ্ধিশালী ছিল বলিয়াই বলিতে হয়। আমরাও এখানে তদ্রূপ বলিয়া ক্ষান্ত হইলাম। অতঃপর বহির্বাণিজ্যের বিষয় কিঞ্চিৎ দেখা যাউক।

ধনাগমের প্রধান উপায় স্বরূপ বৈদেশিক বাণিজ্যের অবস্থা, সেই প্রাচীন সময়ে কিরূপ বিস্তৃত ও উন্নতিশালী হইয়াছিল, তাহা আলোচনা করা যাইতেছে। এখানে প্রায়ই অন্ধকারে পদক্ষেপ করিতে হইবে। বিদেশ বাণিজ্য সম্বন্ধে "বণিজো দূরগামিনঃ" ইহা বাল্মীকি কর্ত্তৃক অসংখ্যবার উল্লিখিত হইয়াছে। পুনশ্চ, রামায়ণে দ্বীপবাসী এবং সামুদ্রিক বণিকের, তত অধিক পরিমাণে উল্লেখ না পাওয়া যাউক, কিন্তু পাওয়া

যায়। রামায়ণের এক স্থানে লিখিত আছে, "উত্তর পশ্চিম এবং দক্ষিণ দেশস্থ দ্বীপবাসী এবং সামুদ্রিক বণিকেরা রত্ন উপহার প্রদান করুক।"[২০]

এখানে দেখা যাইতেছে যে বহুদূরগামী বাণিজ্য কেবল স্থলপথে নহে, জলপথেও আছে। জলপথে গমন কেবল বাল্মীকির সময়ে নহে, বৈদিক আমলেও ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে (১-১১৬, ১-২৫,৭-৮৮) "নাব সামুদ্রীয়" বাক্যের উল্লেখে অবশ্যই সমুদ্রগামী জাহাজ বলিয়া প্রতীত হইবে। কিন্তু এখন কথা এই যে, এ সমুদ্র গমন আর্য্যেরা আপনারা করিতেন, না অন্যকে গমনাগমন করিতে দেখিয়া "নাব সামুদ্রীয়" শব্দ গানের ভিতর গাঁথিয়া রাখিয়া গিয়াছেন? যাহা হউক, এখানে একটী বিষয় কিন্তু নিশ্চয়রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আর্য্যেরাই জাহাজে চড়িয়া অন্যের দেশে যাউন বা অন্যেই জাহাজে চড়িয়া তাঁহাদের দেশে আসুক, এ দুয়ের যে কোন সূত্রে হউক, জাহাজী বাণিজ্যের তৎকালে দেশমধ্যে একেবারে অপ্রচার ছিল না। তাহার পর কথা এই, আর্য্যেরা যদি জাহাজে চড়িয়া না যাইতেন, তবে আসিত কাহারা? অথবা আর্য্যেরা যে সত্য সত্য একেবারে জাহাজে চড়িতেন না তাই বা বলি কি করিয়া। পরবর্ত্তী গ্রন্থ মনুতে ভূয়োভূয়ঃ সমুদ্রগামীর কথা উল্লেখ এবং তাহাদের সম্বন্ধে নানারূপ ব্যবহার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। আবার নারদীয়ে পর্য্যন্ত

"———সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ।

* * *

ইমান্ ধর্ম্মান কলিযুগে বর্জ্জ্যানাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥"

পূর্ব্বকালীন সমুদ্রযাত্রা প্রথা সূচনা করিয়া, কলিযুগে তাহা নিষিদ্ধ বলা হইয়াছে। সুতরাং মানিতে হইবে যে প্রাচীনকালে আর্য্যেরা, অল্প হউক বা অধিক হউক, সমুদ্রগমনে একবারে বিমুখ ছিলেন না। কিন্তু আবার ঐ মনুতে (২।২৩-২৩) দেখ, তথায় আর্য্যাবাসস্থান সম্বন্ধে শেষ নির্দ্দেশ এই করা হইয়াছে যে, কৃষ্ণসার মৃগ স্বভাবত যেখানে যেখানে বিচরণ করে তাহাই-যাজ্ঞিক দেশ, তাহাতেই আর্য্যেরা অধিবাস করিতে পারেন,

২০। রামায়ণ ২৮২৮।

অন্যত্র কদাপি নহে। কিন্তু শূদ্রের পক্ষে এ বিধান নাই, তাহারা জীবিকার্থে যথায় তথায় গমনে এবং বাসে সমর্থ।২১ এ কথা সম্ভবত বাল্মীকির সময়েও খাটে। আবার বাল্মীকির পরবর্ত্তী সময়ের ঘটনাবলী যদি ইহার কিছু মাত্র প্রতিপোষক হয়, তবে দেখা যায় যে Sarmancherja (সম্ভবত, শর্ম্মণাচার্য্য) নামে এক ব্রাহ্মণ গ্রীক ভূমে গমনান্তর, ম্লেচ্ছদেশে আগমনে আপনাকে পতিত জ্ঞান করিয়া, প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আথেন্স নগরে অগ্নি প্রবেশ করেন। ঐরূপ কল্যাণ নামে আর এক ব্রাহ্মণ আলেকজাণ্ডারের সহগামী হইয়া, ঐ একই কারণ হেতু Pasargada (পাসরগদা) নগরে অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিলেন। অতএব ধর্ম্মভীরু ভারতে, স্বদেশ পরিত্যাগ এবং ম্লেচ্ছদেশে গমন যখন এমন দূষণীয়, তখনই বা কিরূপে নির্ণয় করিতে পারা যায় যে, ইঁহারা সমুদ্রপথে পোতারোহণ পূর্ব্বক অতি দূরদেশে গমনাগমন এবং বিদেশ বাণিজ্য সম্পন্ন করিতেন। হিন্দু দাঁড়ি মাঝি লইয়া সমুদ্র যাত্রা যেন কোন মতে সমাধা হইল, কিন্তু যে দেশের সহ বাণিজ্য করিতে হইবে, সে দেশে ত সম্ভবত কতকগুলি লোককে আজীবন না হউক, কিছুদিনের জন্য বাস করিয়া থাকিতে হইবে। সে সময়ে সামুদ্রিক জলপথে গতিবিধি থাকিলেও, তাহা নিঃসন্দেহ উন্নত ভাবের ছিল না ; সুতরাং যাওয়া আসার সুবিধার অভাবে সে কিছুদিন, নেহাত কিছুদিন নহে। যদি এ কিছুদিনের বিদেশবাসে দোষ না পড়ে, তবে কাম্বোজ প্রভৃতি প্রদেশীয় লোকেরা কেন ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইল ? যদি বলা যায় শূদ্রেরা যদৃচ্ছা গমনে সক্ষম, সুতরাং তাহাদের দ্বারা বিদেশ বাণিজ্য সমাধা হইত ; তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য, শূদ্রেরা সমাজে এত হীন ও নির্ধন হইবার কারণ কি ? বিশেষ দেখা যায় শূদ্রেরা সমাজের মধ্যে সর্ব্বদাই সন্দেহের পাত্র, এমন কি মনু তাহাদের সঙ্গে একাকী পথ চলাচল পর্য্যন্ত নিষেধ করিয়াছেন। এরূপ শূদ্রের হাতে যে ধনাগমের উপায় স্বরূপ

২১। Hero: vii 65, 86. &c. গ্রীকদেশে যুদ্ধগামী সৈন্যমধ্যে ভারতীয় পদাতিক ও অশ্বারোহীর উল্লেখ পাওয়া যায়, ইহারা কিরূপ ভারতীয় তাহা জ্ঞাত নহি, হইতে পারে, ভারতস্থ পার্ব্বতীয় বা তদ্রূপ অপরাপর কোন নিকৃষ্ট জাতি হইবে।

বাণিজ্যভার অর্পণ করিয়া আর্য্যেরা নিশ্চিন্ত থাকিবেন, এরূপ বোধ হয় না। এই সকল কারণে বোধ হয় যে, আর্য্যেরা সমুদ্রযাত্রায় যে বাণিজ্য করিতেন, তাহা কৃষ্ণসার-বিচরিত দেশমধ্যেই আবদ্ধ ছিল, অর্থাৎ ভারতেরই অধিবেশিত উপকূলভাগে এবং সন্নিকটস্থ দ্বীপপুঞ্জ সহ তাঁহাদের সামুদ্রিক বাণিজ্য সমাধা হইত। এখানে বলিতে পারা যায় যে, যেন পরবর্ত্তী আর্য্যেরা স্বধর্ম্ম বিনাশ ভয়ে সহসা স্বদেশ পরিত্যাগ করিতেন না, কিন্তু বৈদিক সময়ে ত সে বাধা ছিল না? ইহা সত্য বটে, কিন্তু ভারতাতীত বিদেশ গমনে ইচ্ছা থাকিলেও, তখন যাইবেন কোথায়? যে সময়ে বৈদিক আর্য্যেরা সভ্যতা পদবীতে পদার্পণ করিয়া বিলাস কলা বিস্তার করিয়াছিলেন, সে সময়ে সমস্ত মেদিনী ঘোর মূর্খতা অন্ধকারে আচ্ছন্ন। মিসরীয় এবং ফিনিসীয় জাতিরা যদিও কিয়ৎ না হয় বহু পরিমাণে সভ্য হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা আয়ত্তাতীত দূরবর্ত্তী ছিল। অতএব বোধ হয় বৈদিক অর্য্যদেরও জলপথগমন, স্থলপথে অপরিচিত ও অগম্য এবং কেবল জলপথে পরিচিত ও গম্য, এরূপ বিদেশমূর্ত্তিধারী ভারতস্থ দেশসকলের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। বিশেষ দূরদেশ গমনের আর এক প্রতিবন্ধক এই যে, তখনকার জাহাজের গঠন নিঃসন্দেহ এরূপ ছিল না যে তাহা বহুদূর সমুদ্রে যাইতে সমর্থ হয়। এ পক্ষে অধিক অধ্যবসায়-শালী ও অধিক চতুর ও পারক গ্রীকদিগের জাহাজেই যখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা হোমারিক সময়ে উপকূল ভাগের অধিক দূরে যাইতে সমর্থ হইত না, এবং তাহাদের জাহাজের গঠনও অতি সামান্য ছিল, তখন আর হিন্দু জাহাজের পক্ষে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই।

আদিমকালীয় দক্ষ সমুদ্রগামী জাতি ফিনিসীয়দিগের ভারতে গতি-বিধি ছিল কি না, তাহা জ্ঞাত নহি। যদি বা ছিল, তাহা না থাকারই মধ্যে, নতুবা আরব ও ভারতের মধ্যে সমুদ্র অনাবিষ্কৃতের ন্যায় থাকিত না; এবং সিন্ধুনদ হইতে মিসর পর্য্যন্ত সমুদ্রপথ আবিষ্কারার্থে সাই-লাক্স দরায়ুস কর্ত্তৃক প্রেরিত হইতেন না। আবার দেখা যায় যে, ১৩০ খৃঃ পূঃ টলিমি এবারগিটিসের রাজত্বকালীন, এককদস ভারত এবং মিসর

দেশের মধ্যস্থ সমুদ্র পার হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া, অলৌকিক কার্য্য-সাধনের ন্যায় "ধন্য-ধন্য" রব প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। কিন্তু খ্রীষ্টের প্রথম শতাব্দীতে এ সমুদ্র পার হওয়া আর আশ্চর্য্যজনক ছিল না, তখন ইহা সাধারণ কার্য্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল।২২

দূরবর্ত্তী দেশ সকলের সহ অতি প্রাচীন কালে ভারতের জলপথে বাণিজ্য পক্ষে বহুলতা না থাকিলেও, দেখিতে পাওয়া যায় যে, পাশ্চাত্য ভূভাগের দূরতর দেশে পর্য্যন্ত ভারতের ধনবত্তার গৌরব ধ্বনিত হইত; এবং তাৎকালিক প্রায় সকল সভ্য দেশেই এরূপ সকল বস্তু ব্যবহৃত হইত, যাহার জন্ম কেবল একমাত্র ভারতবর্ষেই সম্ভব, এবং সম্ভবত কেবল ভারতবর্ষই তৎকালে তাহাদের জন্মভূমি ছিল। ইহা কিরূপে সম্ভবে? ভারতের বিদেশ গমন যথাযথ উপরে আলোচিত হইল। গ্রীকদিগেরও সে প্রাচীনকালে তদ্বিষয়ে বিশেষ উন্নতি দৃষ্ট হয় না। হোমরের সময়ে লিবিয়া এবং মিসর দেশ কেবল জনশ্রুতিতে পরিচিত ছিল। ইটালী একবারেই অপরিজ্ঞাত ছিল। এমন কি কৃষ্ণসাগরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত কেহ জ্ঞাত ছিল না। বিশেষত হেসিওদের গ্রন্থে সমুদ্রযাত্রা যেরূপ ভয়াবহ এবং জাহাজ-গঠন-প্রণালী যেরূপ কুৎসিত বলিয়া অনুমিত হয় ২৩, তাহাতে সে সময়ে দূরদেশাদিতে, কি স্থলপথে কি জলপথে, গমনাগমন অতি সংকীর্ণ ছিল বলিতে হইবে। তথাপি সেই গ্রীসে এমন অনেক বস্তুর ব্যবহার তৎকালে দেখা যায় যে, যাহার জন্মস্থান কেবল ভারতবর্ষ। ঐরূপ পুরাতন বাইবেল গ্রন্থের যবাধ্যায় অনুসারে, অফির দেশজ যে সকল দ্রব্য হিব্রু

২২। পেরিপ্লুসের লিখন অনুসারে ত্রিবিধ পথে, এই সমুদ্র গতায়াত ও সামুদ্রিক বাণিজ্য সমাধা হইত। প্রথম, আরব, কার্ম্মাণ ও গিড্রোসিয়ার উপকূল বাহিয়া বরোচের বন্দরে আসিত। দ্বিতীয়, আরবের দক্ষিণ উপকূলস্থ আধুনিক ফার্টাকুই নামক অন্তরীপ, এবং তৃতীয়, গার্ডাফিউ নামক অন্তরীপ হইতে যাত্রা করিয়া, সমুদ্র পাড়ি দিয়া মালাবার উপকূলে মুসিরি ও নিলকুণ্ডা নামক বন্দরদ্বয়ে উপনীত হইত। ভারতের যে সকল ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য লইয়া বাণিজ্য চলিত, পেরিপ্লুসে তাহার বহুল-তালিকা দেওয়া আছে।

(২৩) Grote's Greece I-491.

দেশে আমদানী হইত, তাহার অবস্থাগত বিবরণ দৃষ্টে পণ্ডিতবর মক্ষমুলর বিবেচনা করেন যে, সে সকল দ্রব্য ভারতজাত দ্রব্য এবং অফির দেশ সৌবীর দেশের নামের অপভ্রংশ মাত্র।২৪ বাইবেল গ্রন্থের আর একস্থলে২৫ টায়র নগরের ঐশ্বর্য্য বর্ণনে জানা যায় যে তদ্দেশে নীল, উত্তমোত্তম কার্পাস বস্ত্র, এবং নানাবিধ সূচের কাজ যুক্ত পট্টবস্ত্র, পলা, মুক্তা ইত্যাদি আমদানী হইত। ইহার সকলই যে ভারতের উৎপন্ন দ্রব্য এমন নহে, কিন্তু সে সমস্ত যে ভারতবর্ষস্থ বা তন্নিকটস্থ অন্যান্য পূর্ব্বদেশজাত দ্রব্য, তৎপক্ষে বোধ হয় সন্দেহ অতি অল্প। যদি সেই সকল দ্রব্য সত্য সত্য পূর্ব্বদেশজ হয়, তবে সেই সূত্রে ভারতবর্ষের সঙ্গে তাৎকালিক পাশ্চাত্য বাণিজ্যের সম্বন্ধ অপরিমিত ভাবে স্থাপিত হইতে পারে। নীল বহুপূর্ব্বকাল হইতে, এবং আমেরিকায় যতদিন পর্য্যন্ত তাহা আবিষ্কার না হইয়াছে তত দিন পর্য্যন্ত, কেবল ভারতবর্ষ হইতে যে আর সর্ব্বত্রে নীত হইত, তৎপক্ষে বহুতর প্রতিপোষক প্রমাণাদি পাওয়া যায়।২৬ বাইবেলে যে নীলের কথা আছে, সে নীলের সম্বন্ধেও এ বাক্য প্রযুক্ত হইতে পারে।

২৪। Max Muller's Science of Language, I-7a8.

২৫। Ezekiel: xxvii.

২৬। উপরে যে সকল বাণিজ্য দ্রব্যের কথার উল্লেখ হইয়াছে, অন্তত তাহাদের একটারও সম্বন্ধে দুচারি কথা বলিয়া দেখাইয়া দেওয়া উচিত যে, আমাদের এতদ্বিষয়ী অনুমানের সত্যাসত্য কতদূর। নীলের কথা বলা যাউক। নীল সম্বন্ধে অধ্যাপক বেক্‌মান বলেন যে অতি প্রাচীন কাল হইতে, আমেরিকা উপনিবেশিত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, ইউরোপে ব্যবহৃত সমস্ত নীল একা ভারতবর্ষ হইতে আমদানী হইত; এবং উত্তমাশা অন্তরীপ (Cape of Good-Hope) দিয়া ভারতবর্ষের পথ পরিষ্কার হওয়ার পূর্ব্বে, উহা ভারতীয় অন্যান্য দ্রব্যের সহ, পারস্য উপসাগর দিয়া স্থলপথে ব্যাবিলন বা আরবদেশের মধ্য দিয়া মিসরে নীত হইত, এবং তথা হইতে ইউরোপের অন্যান্য দেশে যাইত। নীলের জন্মভূমি এবং বাণিজ্য বিষয়ে উক্ত অধ্যাপক বলেন "The proper country of this production is India; that is to say, Gudseherat or Gutscherad, and Cambaye or Cambaya, from which it seems to have been brought to Europe since the earliest periods. It is found mentioned, from time to time, in every

টায়র নগরে নীত অন্যান্য দ্রব্যসমূহের পক্ষে ইংরাজ পণ্ডিত বিন্সেণ্ট কহেন যে, এজিকিয়েল অধ্যায়ে শিল্পজাত পট্টবস্ত্র প্রভৃতির যে উল্লেখ আছে; যৎসম্বন্ধে তৎস্থলে ইহাও কথিত হইয়াছে যে সেই সকল বস্তু ইউফ্রেটিস নদীর তীরস্থ হারাণ, কামেক প্রভৃতি নগর হইতে আমদানী হইত; সেই সকল দ্রব্য বাস্তবিক সেই সকল স্থান হইতে আমদানী হইত

century; it is never spoken of as a new article, and it has always retained its old name; which seems to be a proof that it has been used and employed in commerce without interruption." পুনশ্চ "I shall now prove what I have already asserted, that indigo was at all times used, and continued without interruption to be imported from India."—Johnston's Translation of Beckmann's History of Inventions and Discoveries, Vol. II, 260, 260. এখানে যত প্রমাণ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা খৃষ্টের পরস্থ এবং অল্প অংশে পূর্ব্বস্থ, সে সকল প্রায়ই অকাট্য। কিন্তু প্রাচীনতম প্রমাণ যত উদ্ধৃত করা উচিত ছিল, যদিও বেকমান সাহেব তাহা করেন নাই, তথাপি তিনি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, যত দিন তাহার বিরুদ্ধে কোন অটল প্রমাণ না পাওয়া যায় ততদিন সে মত অখণ্ডনীয়, এবং পাঠক চেষ্টা করিলে ঐ মত সমর্থনে যত সকল হইবেন, খণ্ডনে তত হইবেন না। নীলের উৎপাদন প্রাচীনকালে যে ভারতের একচেটিয়া ছিল, এবং ভারত উহার উৎপত্তিস্থানসমূহের মধ্যে যে নিতান্তই প্রধান, নীলের আমদানী রপ্তানির বর্ত্তমান সাময়িক তালিকাতেও সে কথা সমর্থন করিবে। ১৮৪৬ খৃঃ অঃ মুদ্রিত Waterson's Cyclopœdia of Commerce নামক পুস্তকে সমস্ত সভ্যতম দেশের নীলের খরচ এইরূপ দেওয়া আছে;—

বৃটনদ্বীপে	১১৫০০ বাক্স।
ফ্রান্স	৮০০০ ঐ
জর্ম্মানি এবং ইউরোপের অপরাপর সমস্ত দেশ	১৩৫০০ ঐ
পারস্য	৩৫০০ ঐ
ভারতবর্ষ	২৫০০ ঐ
ইউনাইটেডষ্টেট	২০০০ ঐ
অন্যান্য সমস্ত দেশ	২০০০ ঐ
সমুদয়ে	৪৩০০০ ঐ

ইহার মধ্যে উত্তর ভারতবর্ষ হইতে ৩৪৫০০, এবং মান্দ্রাজ, গোয়াটীমালা প্রভৃতি আমেরিক স্থান হইতে ৮৫০০ উৎপন্ন ও রপ্তানি হইয়া থাকে। Page 385, art: Indigo.

না। ইউফ্রেটিস তীরস্থ নাগরিকেরা সে সকল দ্রব্যোৎপাদক শিল্প-কৌশল বিন্দুমাত্র অবগত ছিল না। ঐ সকল দ্রব্য যে আসিয়া মহাদেশের পূর্ব্বখণ্ড হইতে আমদানী হইত, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। এবং ইহাতেও অল্প সন্দেহ আছে যে, সিডন ও ইডুমিয়া নগর হইয়া আরব দেশের মধ্য দিয়া যে বাণিজ্য চলিত এবং পট্টবস্ত্রাদি যাহার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য ছিল, সেই বাণিজ্য স্রোতের মূলস্থান ভারতবর্ষ। অপরঞ্চ পুরাতন বাইবেলের কোন স্থানে স্পষ্টত ভারতবর্ষের নামোল্লেখ নাই। বাইবেলের জ্ঞাতসারে ইউফ্রেটিস নদীই পৃথিবীর পূর্ব্বতম দেশের সীমা এবং তদ্রূপ বলিয়াই উক্ত হইয়াছে। কিন্তু ঐ বাইবেলেই আবার পূর্ব্বদেশজাত শিল্প দ্রব্যাদি পাশ্চাত্য ভূভাগে নীতার্থে, বহুপূর্ব্বকাল হইতে স্থাপিত বণিক্‌দিগের গতায়াতের পথের উল্লেখ আছে।২৭ এরূপ বিবেচনা করিতে পারা যায় যে এই বণিক গতায়াতের পথ নিঃসন্দেহ বহুপূর্ব্বতর দেশে প্রধাবিত এবং ইহার সঙ্গে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যের সম্পূর্ণ সম্বন্ধ ছিল। এই সম্বন্ধ বাল্মীকির বহু পূর্ব্ব হইতে স্থাপিত ও পরেও প্রচলিত, অতএব ইহা বাল্মীকির সময়ের উপরেও বর্ত্তে।

প্রাচীন কালের স্থলীয় বাণিজ্য কার্য্য আলোচনায় প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, দূরব্যবধানস্থিত দুই দেশের উৎপন্ন দ্রব্য পরস্পরের মধ্যে বিনিময় হইতেছে বটে, অথচ উভয় দেশের লোক সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরস্পরের মধ্যে বাণিজ্য করে না, এবং হয়ত কেহ কাহাকে চিনেও না, অথবা একে অপরের নাম পর্য্যন্ত শুনে নাই। এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, ব্যবধানের মধ্যস্থিত জাতিসমূহের দ্বারা হস্ত হইতে হস্তান্তরে ব্যবসায় দ্রব্য নীত হইয়া দেশবিদেশে বিকীর্ণ হইত। প্রাচীন কালে হিব্রু বা গ্রীক্‌ভূমে যদিও ভারতীয় দ্রব্যের বিস্তার দেখা যাইতেছে, কিন্তু ভারতীয় লোকের তথায় দেখা নাই; ঐরূপ আবার ভারতেও ঐ ঐ জাতির নাম কেহ শুনিয়াছে কেহ বা শুনে নাই। ভারতের প্রতিবেশী

২৭। "Murray's History of India" নামক পুস্তকে এই স্থানের অনুসন্ধান পাইয়া, পরীক্ষাপূর্ব্বক এস্থানে সঙ্কলিত হইল।

পহ্লব বা পারস্যবাসীদিগের ভারতে সমাগমের যথেষ্ট উল্লেখ ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়। উড়িষ্যার ঐতিহাসিক গ্রন্থাদিতে দৃষ্ট হয় যে, ৫৩৮ খৃঃ পূঃ যখন বজ্রদেব উড়িষ্যার সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তখন পারস্যবাসী ম্লেচ্ছরা উড়িষ্যা পর্য্যন্ত গমনাগমন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আমার বোধ হয় পহ্লবজাতিরাই ভারতবর্ষের সহ পাশ্চাত্য বাণিজ্যের মধ্যস্থলীয়। এখন দৃষ্ট হইবে যে, হিন্দুদিগের কৃষ্ণসার-বিচরিত দেশ পরিত্যাগ করিবার আবশ্যক হইত না, অথচ বৈদেশিক বাণিজ্যও সমাধা হইয়া যাইত।

দেখা যাইতেছে যে ভারতীয়েরা যদিও ম্লেচ্ছদেশে গমনবিমুখ ছিলেন, তথাপি ম্লেচ্ছদিগের ভারতে আগমনের দ্বারা বিদেশ বাণিজ্য সুন্দররূপে প্রবাহিত হইত। সত্য বটে তাহাতেও ধনবৃদ্ধি পক্ষে লাভ ভিন্ন লোকসান নাই, কিন্তু কথা এই বিদেশ গমনে স্বয়ং কৃতী হইলে যতদূর হইবার সম্ভব সেরূপ লাভ ইহাতে অবশ্যই হইবে না। আডাম স্মিথ বলেন যে, যখন স্বদেশ হইতে বিদেশস্থ দ্রব্য প্রেরণ এবং গ্রহণে স্বয়ং কৃতী না হইতে পারা যায়, সেস্থলে দেশজাত বস্তু সকলের অযথাভাবে নিয়োগাপেক্ষা, বৈদেশিক যত্নে বিদেশে নীত হইলেও যথেষ্ট লাভের সম্ভাবনা আছে; এবং তিনি দেখাইয়াছেন যে এই নিয়ম হেতু প্রাচীনকাল হইতে মিসর, চীন এবং ভারতবর্ষ স্বয়ং বৈদেশিক বাণিজ্যবিমুখ হইলেও, বিপুল ধনশালী হইয়াছিল। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে এই কারণেই, উত্তর আমেরিকা এবং পশ্চিম ভারতীয় উপনিবেশ সকলের ধনশালিত্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। হইতে পারে তাহাই, কিন্তু এখন আর ভারতের ভাগ্যে সে কথা খাটে না। যাহাদের উৎপন্ন, তাহারা স্বহস্তে সেই উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিলে এ কথা না খাটে, এমন নহে; কিন্তু যেখানে উৎপন্নকারক উদরান্ন মাত্র লইয়া উৎপন্ন দ্রব্য মাথায় বহিয়া অপরকে দিতেছে, এবং তাহাদের পরিবর্তে বিদেশীয়গণ সেই সকল বিক্রয় করিতেছে; সেখানে এ কথা কিরূপে খাটিবে? ঘরেও বিদেশীয় এবং বিদেশেও বিদেশীয় হইলে, কাজেই লাভের অঙ্ক বিদেশীয়ের হস্তে গমন করিয়া থাকে। ভারতলক্ষ্মী এখন জলধিতলে, আবার যদি কখন সমুদ্রমন্থনের

আয়োজন হয়, তবেই মঙ্গল। এখানে আমার রামা কৈবর্ত্তের কথা মনে পড়িয়া গেল। বাঞ্ছারাম, শুন একটা গল্প করা যাউক।

একদা এক উদরান্নশূন্য দরিদ্র ব্রাহ্মণের চাকর রাখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। উমেদার রামা কৈবর্ত্ত উপস্থিত হইয়া বলিল, "ঠাকুর তুমি নিজে খাইতে পাও না, তুমি চাকর রাখিবে কি দিয়া।"

ব্রা। "যা দিয়া হউক, বাপু তোমার বেতন লইয়া কথা, তোমার বেতন পাইলেই ত হইল। তুমি চাকর হও, বেতন নির্ভাবনায় পাইবে; আর বাপু আমি যাহা যাহা করিতে বলিব, তাহা বিনা আপত্তিতে করিতে হইবে।"

রা। "যে আজ্ঞে ঠাকুর, বেতন যদি ঠিকমত পাই, তবে না করিব কেন?"

ব্রাহ্মণের সঙ্গে রামার চুক্তি শেষ হইল। পরদিন রামা কার্য্যে হাজির হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুর কি করিতে হইবে।" ঠাকুর উত্তর করিলেন, "বাপু তোমাকে ভিক্ষায় যাইতে হইবে, এবং ভিক্ষায় রোজ রোজ যাহা পাইবে তাহা আমাকে আনিয়া দিতে হইবে।" রাম তাহাই করিতে লাগিল।

ক্রমে ভিক্ষার চাউল অনেক জমা হইল, এবং তাহাদের বিক্রয়ে ব্রাহ্মণের অনেক টাকা সংগ্রহ হইতে লাগিল, সুতরাং রামারও নিয়মিত সময়ে বেতন পাওয়ার পক্ষে কোন বাধা হয় না।

ব্রাহ্মণ ক্রমে বড় মানুষ হইয়া উঠিল; এবং রামাও ক্রমে পুরাতন চাকর হইবায় নেমকহালালির বৃদ্ধিতে, পুরা টানে ভিক্ষা করিয়া আনিয়া দিতে লাগিল।

ভিক্ষার পথ, বামনের চাকুরী স্বীকার করিলেও যেরূপ পরিষ্কার, না করিলেও সেইরূপ পরিষ্কার; তথাপি জন্ম, কর্ম্ম ও বুদ্ধি গুণে রামার এমন সাহস নাই যে স্বয়ং হইয়া ভিক্ষায় প্রবৃত্ত হয়।

ভারতসন্তান! আমাদিগের, আমাদিগের ব্যবসায়দারের, এবং পুঁজি পাটা দানে মুৎসুদ্দিগিরির জন্য উমেদার কলিকাতার পেটমোটা বাবুদিগের, অবিকল এই রামা কৈবর্ত্তের দশা। আমাদিগের পোড়া কপাল!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গ্রীকদিগের কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যাদির বিষয় বহু বিস্তারে এখানে আলোচনা করিব না, কারণ তাহাদের সেই সেই বিষয়ের আলোচনা শত শত রহিয়াছে। গ্রীকদিগের কৃষি বিষয়ে হেসিওদ্ হইতে বিধিবদ্ধ রূপে শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে; গ্রীকের শিল্পস্থাপত্যাদি জগদ্বিখ্যাত, আজি পর্য্যন্ত নানা চিহ্ন দেদীপ্যমান থাকিয়া তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে; বাণিজ্য দিগন্তব্যাপী, বাণিজ্যার্থে স্বদেশের অসংখ্য লোক বিদেশে যাইতেছে এবং বিদেশের অসংখ্য লোক স্বদেশে আসিতেছে। ফলত বাণিজ্যের উপরেই প্রধানত জীবনযাত্রার নির্ব্বাহ-উপযোগী দ্রব্যাদির প্রাপ্তি নির্ভর করিত। এই সকলের আবার গ্রীকদিগের মধ্যে পুরুষানুক্রমে উন্নতি হইয়া আসিয়াছে। ভারতে তাহা হয় নাই; একবার উদ্ভাবিত হইয়া আর তাহার উন্নতি সাধিত হয় নাই, বরং উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক, অনেকানেক বিষয়ের অধোগতিই সাধিত হইয়াছে, যেমন সামুদ্রিক বাণিজ্যাদি। হিন্দুচরিত্র যতদূর দেখিয়া আসা গেল, তাহাতে এইরূপই হইবার কথা। যে যে বিষয়ে লোকের বেশি আঁট, তাহারই পর পর উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে; আর যাহাতে তেমন আঁট নাই, এবং তদ্বিষয়ক অভাবও যথায় স্থির ভাবে থাকে, তথায় তাহার উন্নতি প্রায় চলিত আবশ্যক পূরণের অতিরিক্তে যায় না। অতএব, সংসার সুখে বিরত এবং উদাসীন ভারতে যে সেই সকল বিষয়ের আর বিশেষ উন্নতি হয় নাই, বরং কালের গতিবশে যে অধোগতিই হইয়াছিল, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। সন্ন্যাসভাবই এখানকার মানবীয় শ্রেষ্ঠ উন্নতি!

ভারতের সৌভাগ্য, সাধারণত সাধারণের মধ্যে যে ব্যক্তি চতুর, কৌশলী এবং কর্ম্মশীল অথচ সুখাভিলাষী, তাহারই অঙ্কগত হইয়াছিল; এজন্য অসহ্য বিলাসের আড়ম্বর ঘটাও অত্যন্ত অধিক। গ্রীসের চিত্র সেরূপ নহে। গ্রীসের সৌভাগ্য এবং সৌভাগ্য-বুদ্ধি কিরূপ সর্ব্বজনীন, তাহার একটী চিত্র প্রদর্শন করিব।—"যে জাতি বস্তুত এত মহৎ; এবং বলিতে কি, যাহাদের আরব্ধ কার্য্য এরূপ বহ্বায়তন; তাহাদের অন্যান্য বিষয়ে বাহ্যদৃশ্যের প্রতি দৃষ্টি করিলে কিন্তু, তাহার অনুরূপ কোনই বহ্বাড়ম্বর বা

অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদের ব্যক্তিগত গৃহস্থলীর প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাইবে যে, ইহাদের আহারীয়, পরিচ্ছদ, গৃহসজ্জা, বাসস্থান, বা নিজ নিজ গৃহস্থলীর যে কোন বিষয় বল, সমস্তই সামান্য, আবশ্যকের অনতিরিক্ত, পরিমিত এবং সমস্তই পরিমিতাচারের পরিচায়ক। কিন্তু, যখনই আবার ইহাদের জাতীয় এবং রাজ্যসম্বন্ধীয় বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে, দেখিবে যে তাহা এতই সমৃদ্ধি এবং জাঁকজমকযুক্ত যে তাহা সর্ব্বতোভাবে রাজ্যের গৌরববর্দ্ধক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। বারম্বার জয় লাভ, বিদেশাধিকার, ধনসম্পত্তি, এবং আসিয়ামাইনরের লোকদিগের সহ ঘনিষ্ঠতা সত্বেও, বিলাস, জুরাকাঙ্ক্ষা, আড়ম্বর বা বৃথা জাঁক ইহাদিগকে কখন স্পর্শ করিতে পারে নাই। বেশ ভূষা দেখিলে, কে নাগরিক কে দাস, এ চিনিবার যো ছিল না। বিপুলধনসম্পত্তিশালী এবং দিগন্তজয়ী বীর সেনানায়কেরাও স্বয়ং বাজার হাট করিতে কিছু মাত্র লজ্জা বোধ করিতেন না।"২৮ ইহা গ্রীকদিগের সৌভাগ্য সময়ের চিত্র,—অতি সুন্দর চিত্র; এরূপ চিত্র ভাবতে পাইবে না। কিন্তু গ্রীকের অধঃপাতে যাইবার দিনে আর এ চিত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; তখন স্বার্থ জাতীয়ভাব পরিত্যাগ করিয়া ব্যক্তিগত আকার ধারণ করিয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতীয় আনুষ্ঠানিক বিদ্যাক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে, আর উল্লেখযোগ্য কোন শাস্ত্রই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু গ্রীকদিগের তাহা নহে। সেই দূরতম কালেও ইহারা যে সকল ভূবিদ্যা, ইতিহাস, ভাস্কর্য্য,স্থাপত্যাদির উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছে,আজি পর্য্যন্ত তাহা আলোচনা করিলে,আশ্চর্য্যে স্তম্ভিত হইতে হয়। বিজ্ঞান বিষয়ে ইহারা যে সূত্রপাত করিয়া গিয়াছিল, তাহাই ধরিয়া এবং তাহাকেই ভিত্তি করিয়া, ইউরোপীয় এমন উজ্জ্বল আধুনিক বিজ্ঞানের উৎপত্তি; এবং তাহাই

২৮। Rollin's Ancient History, B. 10., C. 2. S. 5.

ধরিয়া আজি পর্য্যন্ত ইউরোপীয় বিজ্ঞানের উন্নতি সাধিত হইয়া আসিয়াছে। আর ভারত? ভারতীয় প্রাচীন বিজ্ঞানের ফলে আজি পর্য্যন্ত নবমীতে লাউ খাইলে গোমাংস ভক্ষণ হয়, অষ্টমীতে নারিকেল খাইলে মূর্খ হয়, ইত্যাদি, ইত্যাদি। আর চাই কি? •

কিন্তু তাহা ছাড়িয়া উপপাদ্য বিদ্যাক্ষেত্রে নামিলে, আর সে নবমীতে লাউ খাওয়ার বন্দোবস্ত নহে। আবার তোমাকে আর্য্যকীর্ত্তি ও আর্য্যবুদ্ধির অসাধারণ শক্তি দেখিয়া, আশ্চর্য্যে স্তম্ভিত হইতে হইবে। হোমার ও হেসিওদের সময়ে, যখন গ্রীকদিগের মধ্যে লিখন প্রণালীরও উৎপত্তি হয় নাই, তখন,সে দূরতম কালেরও পূর্ব্বে, আর্য্য বিদ্যাবুদ্ধি গগন স্পর্শ করিয়া ছুটিতেছে। আয়ুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ, এবং তদানুষঙ্গিক উচ্চ শ্রেণীস্থ গণিতশাস্ত্র সম্বন্ধে আর্য্যদিগের প্রাধান্য বিবেক সমালোচনা করিয়া দেখ। আয়ুর্ব্বেদ অংশতঃ আনুষ্ঠানিক বিদ্যা বটে, কিন্তু তথাপি উহার যে এতদূর উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহার কারণ, কি শুভক্ষণে বা কি ঘটনায় বলিতে পারি না, উহা ধর্ম্মনীতি এবং ধর্ম্মবুদ্ধির সংস্রবে আসিবায়। শারীরিক সচ্ছন্দতা ব্যতীত, হিন্দুদিগের ধর্ম্মকর্ম্ম সাধন হইতে পারিত না; তাহাতে আবার যে দেশ যত গ্রীষ্মপ্রধান, সে দেশ তত রোগের আকর; পরন্তু যেরূপ বৃত্তিবিশিষ্ট চিত্তই হউক, শারীরিক সচ্ছন্দতা কে না ভাল বাসে। এই সকল কারণে,হিন্দুরা প্রথম হইতেই আয়ুর্ব্বেদের উন্নতি করে,অতিশয় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন; এবং এরূপ তীক্ষ্ণধী মন যাহাতেই সম্পূর্ণ ভাবে নিবেশিত হইবে, তাহাতেই অপার শ্রী এবং উন্নতি হইবার কথা। আর্য্যবুদ্ধি কোন বিষয়ে অক্ষম ছিল না, যাহা ধরিবে তাহাই সাধন করিয়া তুলিবার উপযুক্ত; তবে যে বিষয়ভেদে ফলের তারতম্য ঘটিয়াছে, তাহা কেবল বিভিন্ন কারণাদি হেতু চিত্ত নিবেশিত হওন বা অনিবেশিত হওনের তারতম্যফলে। বলা বাহুল্য যে আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে অতি অল্প দিনেই ইহাঁরা,অন্যত্র যাহা সম্ভব, তাহার অপেক্ষা বহুগুণে অতিরিক্ত ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সূত্রে বহুবিধ রাসায়নিক, শারীর ও উদ্ভিৎ তত্ত্বাদি এই সময়ে খণ্ড খণ্ড ভাবে উদ্ভাবিত হয়। উহা এত প্রাচীন সময়ে সংসাধিত হইয়াছিল যে, গ্রীকেরা হয়ত তখন পশুবৎ

বনে বিচরণ করিয়া ফিরিত, অথবা মিসরীয়দিগের নিকট ভৈষজ্যবিদ্যা অর্জ্জন করিবে বলিয়া, তাহাদের মনে কেবল তাহার অস্ফুট কল্পনা মাত্র উদয় হইতেছিল। ভারতীয় এই আয়ুর্ব্বেদ ও ভৈষজ্যবিদ্যা, কালে আরও উৎকর্ষ প্রাপ্ত এবং অন্যান্য জাতি দ্বারা পরিগৃহীত হয়। গ্রীক-ভূমে ইহা একরূপ সর্ব্বাবয়বেই গৃহীত হইয়াছিল। যে দেশে যে যে রোগের উৎপত্তি, তাহার আরোগ্য উপায়ও বিধাতা তদ্দেশে নিহিত করিয়া থাকেন। হিন্দুদিগের এই আয়ুর্ব্বেদ, হিন্দুর হীনদশা সহ মধ্যপথে ভগ্নপদ না হইয়া, যদি কালের সঙ্গে সমান পদে চলিয়া আসিতে পারিত, তাহা হইলে আমাদিগের পক্ষে উপযোগিতায়, বোধ করি, আর যে কোন আয়ুর্ব্বেদ ইহার সমকক্ষতায় আসিতে পারিত না। হিন্দুচিত্তের যে কি অপরিমিত গভীর শক্তি, তাহার আর অধিক পরিচয় কি দিব, কেবল ইহাই দেখিলে যথেষ্ট হইবে যে, এই আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে সেই দূরতম কালেও যে সকল ঔষধতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে, আজি পর্য্যন্ত তাহা, নানা উন্নতি-শীল নানাবিধ ও নানা শ্রেণীর আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা অপেক্ষা, বহু-বিষয়ে শ্রেষ্ঠতা রক্ষা করিয়া চলিতে সক্ষম হইতেছে। আর তোমার রোমীয়, মিসরীয়, গ্রীক আয়ুর্ব্বেদ? কবে তাহা কালগর্ভে চিহ্নশূন্য হইয়া বিলীন হইয়া গিয়াছে!

জ্যোতিষ ও গণিত সম্বন্ধেও, ভারতীয়েরা বহুবিষয়ে শ্রেষ্ঠ; এবং অপরাপর অনেক জাতিকে তদ্বিষয়ে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। যে জাতি স্বভাবত ভাবুকতাপূর্ণ এবং কল্পনাপ্রিয়, এবং চিত্ত যাহার নিয়ত নিসর্গ সন্দর্শনে মুগ্ধ, তাহার নিকট অপূর্ব্ব জ্যোতিষ্কপিণ্ড পরিপূর্ণ অপার আকাশের ন্যায় দর্শনীয় পদার্থ আর কি হইতে পারে? যে কোন পদার্থ চিত্ত আগ্রহাতিশয্যে দর্শন করিয়া থাকে, তাহারই তত্ত্ব উদ্ভাবনের নিমিত্ত মানব একমনে নিবিষ্ট হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে। পুনশ্চ, এ কথা যদি সত্য হয় যে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহমণ্ডলীর অদৃষ্টপূর্ব্ব গতিবিধি এবং বিস্ময়কর প্রাকৃতিক কার্য্যকলাপ দর্শনে, আদি মানবের মনে যে বিস্ময় উৎপাদন হয় ও নৈসর্গিক শক্তির অস্তিত্ব বিষয়ে যে বোধ জন্মে, তাহা হইতে কালক্রমে দেবতত্ত্ব প্রধানত রূপ গ্রহণ করিয়া থাকে, এবং সেই সকল

চিত্তমোহকর পদার্থ দেবপদে বরিত হয়; তাহা হইলে, স্বচ্ছন্দতাযুক্ত মানবচিত্ত যে আপন অবসরকালের কিয়দংশ, সেই সেই দেবতত্ত্ব ভেদ ও দেবতার স্বভাব এবং গতিবিধি নিরূপণে ব্যয়িত করিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। এই নিমিত্ত আমরা দেখিতে পাই যে, প্রাচীন কালে যে যে দেশ স্বচ্ছন্দতাযুক্তে ধনসঞ্চয় করিয়া অল্প দিনেই সভ্যতার উদ্ভাবক অবসর লাভ করিয়াছে, সেইখানেই মানব জ্যোতিষ্কমণ্ডলের কোন না কোনরূপ চর্চ্চায় মনোনিবেশ এবং তাহাতে প্রতিপত্তি লাভে সিদ্ধকাম হইয়াছে। এ কারণে, প্রাচীন জ্যোতিষতত্ত্ব সমালোচনায় মিসর, ব্যাবিলন, চীন বা ভারতবর্ষের নাম যেরূপ অগ্রে গণনায় আসিবে; গ্রীস কি রোম কিম্বা তদ্রূপ অন্যান্য দেশের নাম সেরূপ গণনায় আসিবে না। ভাল, জ্যোতির্বিষয়ে প্রাচীন ইতিহাস কিঞ্চিৎ যথাযথ আলোচনা করিয়া দেখা যাউক যে, এ বিষয়ে কে, কোন কালে এবং কি প্রকার, সার্থকতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

মিসর দেশে এত প্রাচীন কালে জ্যোতিষিক তত্ত্ব উদ্ভাবিত হয় যে, কথিত আছে খৃষ্টীয় শকের ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে মিসরীয়েরা রাশিচক্র ও দ্বাদশ রাশি নিরূপণ এবং তাহাদের অবস্থান নির্দ্দিষ্ট করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এবং ইহাও কথিত আছে যে, ইহারাই পাশ্চাত্যভূমে সর্ব্বপ্রথম সপ্তাহ বিভাগ এবং গ্রহগণের নামানুসারে তদন্তর্গত দিবস সকলের নামকরণ করিয়াছিল। তদ্ভিন্ন অন্যান্য বহুবিধ তত্ত্বও তাহাদিগের দ্বারা আবিষ্কৃত ও উদ্ভূত হয়। ঐরূপ চীনদিগের জ্যোতিষিক তত্ত্ব নিরূপণের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কথিত হয় যে, খৃষ্টীয় শকের ২৬৯৭ বৎসর পূর্ব্বে হোয়ংসির রাজত্ব সময়ে, নক্ষত্রমণ্ডল পর্য্যবেক্ষিত ও তাহাদের অনেকের গতি নিরূপিত হইয়াছিল। ইহার দ্বারা এই সপ্রমাণ হইতেছে যে, যদিও ঐ তারিখ সন্দেহ স্থলীয় হয় এবং ঐ নক্ষত্রপর্য্যবেক্ষণ যদিও নামে মাত্র এবং সামান্য [আকারের] বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তথাপি ইহা নিশ্চয় যে চীনেরা অতি প্রাচীন কালেই জ্যোতির্ব্বিদ্যায় মনঃসংযোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ব্যাবিলনবাসী ও কাল্‌ডীয়াবাসীরাও জ্যোতির্ব্বিদ্যা-আলোচনায় প্রাচীনত্বে ন্যূন নহে।

তাহারাও বহু প্রাচীন কালে বহুবিধ নূতন তত্ত্বাদি আবিষ্কার করিয়াছিল। কোন কোন পুরাবৃত্তবিৎ পণ্ডিতগণ বিবেচনা করেন যে, যে জাতি অধিক পরিমাণে ভ্রমণশীল, তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্বদা স্থান পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা হেতু, দিক্ ও সময় নিরূপণ উপলক্ষে, অন্যান্য জাতি অপেক্ষা তাহাদের মধ্যে অধিক পরিমাণে জ্যোতিষ্কমণ্ডল পর্য্যবেক্ষিত হইয়া থাকে; এবং সেই সূত্র হইতে সর্ব্বপ্রথমে গ্রহনক্ষত্রাদি আবিষ্কৃত হইতে আরম্ভ হয়। একথা কিয়ৎ পরিমাণে সত্য বটে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাদের এরূপ ভ্রমণশীল অবস্থায় আবিষ্কৃত ও স্থিরীকৃত জ্যোতিষিক বিষয় সমস্ত, জ্যোতির্ব্বিদ্যা পক্ষে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যে কোন স্থায়ী ফল প্রসব করিতে পারে, এরূপ বোধ হয় না। পূর্ব্বস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক গ্রীকেরা যদ্রূপ অনাশ্রমী ভাবে বহুকাল ধরিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়াছিল, ভারতীয়দিগকে তাহার শতাংশের একাংশও ঘুরিতে হয় নাই; পুনশ্চ দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্কান্দিনেবীয়েরা আবার গ্রীকদিগের অপেক্ষা আরও অধিক পরিমাণে নিরাশ্রমী ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। এমন স্থলে বলিতে হইবে যে, স্কান্দিনেবীয়দিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে জ্যোতিষিক জ্ঞানের উৎপাদন ও উন্নতি এবং বিস্তার সাধন হওয়া উচিত। কিন্তু কোথায়? অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই স্কান্দিনেবীয়দিগের মধ্যে জ্যোতিষবিষয়ক গণনীয় জ্ঞান কিছুই ছিল না। গ্রীকদিগের মধ্যে খৃষ্টের পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে জ্যোতিষ-বিষয়ক জ্ঞান অতি সামান্য ও অগণনীয় ছিল। থেলিসের সময় উহা বিজ্ঞানরূপে অধীত হইতে আরম্ভ হয়। কথিত আছে যে থেলিস একটী সূর্য্য গ্রহণের আনুমানিক কাল গণনা করিয়া বলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ঠিক কোন সময়ে হইবে ইহা বলেন নাই, তবে অনুমান এই সময়ে হইবে ইহাই বলিয়াছিলেন। কথিত সময়ের অব্যবহিত পর হইতে গ্রীকেরা মিসরীয় ও কাল্‌ডীয় জাতিদিগের নিকট হইতে জ্যোতিষবিষয়ক জ্ঞান শিক্ষা করিতে আরম্ভ করে, এবং বলিতে হইবে যে খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে ইহারা গণনীয় জ্ঞান যথাকথঞ্চিৎ মাত্র লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ঐ সময়ে জ্যোতিষ বিষয়ে প্রথম গ্রহ-

প্রণেতা অতোলিক্ষ সচল গোলক, ও গ্রহগণের উদয়াস্ত সম্বন্ধে দুই খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তৎপরে খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে অরিস্তরিক্ষ এবং ইরতস্থিনিস্ ও আর্কিমিডিস্ জ্যোতিষের সমধিক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতীয়দের দেখ, তাঁহাদের ঋগ্বেদীক গাথা-সমূহ কোন দূরতমকালে প্রস্তুত ও গীত হইয়াছে তাহার স্থিরতা নাই, তথাপি তাহাতে জ্যোতির্ব্বিদ্যাবিষয়ক বহুতর সারতত্ত্বসমূহের বহুল উল্লেখ পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত সামবেদীয় গোভিলীয় নবগ্রহশান্তি-পরিশিষ্ট, এবং অথর্ব্ববেদীয় নক্ষত্রকল্প, গ্রহযুদ্ধ, নক্ষত্রগ্রহোৎপাত লক্ষণ, কেতুচার, রাহুচার, এবং ঋতুকেতুলক্ষণ, ইত্যাদি প্রাচীনতম গ্রন্থে সাক্ষ্য দিতেছে যে, অতি প্রাচীনকালেই জ্যোতির্ব্বিষয়ক জ্ঞান ভারতে অপরিমিত ভাবে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। তৎপরে অপেক্ষা-কৃত আধুনিক সময়ে অবতরণ করিয়া, আর্য্যভট্ট, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়গণ ইহার কতদূর উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, এখানে তাহার পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই।

ভারতীয়দের জ্যোতিষতত্ত্ব সর্ব্বপ্রকারে ধর্ম্মশাস্ত্রের সহ সম্বন্ধযুক্ত। কি প্রাচীনকালে, কি বর্ত্তমানকালে, ধর্ম্মবিষয়ক ক্রিয়াকলাপ এতৎ সাহায্যে নিরূপিত দিন ক্ষণের উপর এরূপ নির্ভর করে যে, একের অভাবে অপরটি হইতে পারে না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ফলত ধর্ম্মশাস্ত্র এবং জ্যোতিষশাস্ত্র, এতদুভয়ের উৎপাদনমূল কিয়দংশে পৃথক্ হইলেও, প্রাকৃতিক শক্তি-বিমোহিত প্রাচীন ভারতে উহারা অনতিবিলম্বে এরূপ সংমিলিত হইয়াছিল, যেন একই বস্তুর উহারা দুই বিভিন্ন অংশদ্বয়রূপে প্রতীয়মান হয়। ভারতে যখনই, জ্যোতিষ-বিষয়ক কোন নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবিত হইয়াছে, তখনই আর্য্য ঠাকুরেরা ইহাকে বিজ্ঞানবিষয়িণী জ্ঞানোন্নতি বলিয়া না ধরিয়া, দেবপ্রসাদে যেন ধর্ম্মবিষয়ক একটী নূতন জ্ঞান লাভ হইল বলিয়া ধরিয়া লইয়া-ছেন। এবং কেবল এই ধর্ম্মবোধের বশবর্ত্তী হইয়াই, ভারতে যত দিন উন্নতির কাল ছিল, ভারতসন্তানেরা ততদিন পর পর আরও নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবনে রত হইয়াছিলেন। ইহাদের উদ্ভাবিত জ্যোতির্ব্বিদ্যা

প্রথমে আরবদিগের কর্ত্তৃক দেশান্তরিত হয়; পরে কাল সহকারে উহা ইউরোপ প্রভৃতি দেশে নীত হইয়াছে;—অন্তত লোকে এইরূপ বলিয়া থাকে।

পরবর্ত্তী সময়ে যদিও সাহিত্যবিষয়ে ভারতীয়েরা অপরিমিত উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন; এবং এ পক্ষে তাঁহাদের সৃষ্ট বহু বিষয়, কালে যদিও অনেকের আদর্শ স্বরূপ হইয়াছিল; তথাপি অতি প্রাচীন কালীয় বৃত্তান্ত অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আর্য্যঠাকুরদিগের সাহিত্য, কল্পনাবহুল ও প্রায় ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থেই সমাহিত হইয়াছে। কেবল একমাত্র, এবং জগতের একখানি সর্ব্বপ্রধান মহাকাব্য, মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণ, ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে স্বতন্ত্র আকারে, ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য ভাবের পরিচয় প্রদান করিতেছে। কিন্তু তথাপি ঐ রামায়ণে ধর্ম্ম এবং দেব বিষয়ক প্রসঙ্গের আধিক্য এত অধিক পরিমাণে আছে যে, কেবল আমরাই উহার ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে স্বাতন্ত্র্যভাব নির্ব্বাচন করিলাম; কিন্তু প্রগাঢ় গোঁড়ামি-সম্পন্ন হিন্দু-ধর্ম্মাশ্রয়ী কোন ব্যক্তি কখনই তাহা করিবে না এবং অন্য কেহ করিলেও সহ্য করিতে পারিবে না। উহা তাহাদের মনে ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া এতদূর প্রতীত যে, কাব্য বলিয়া কখন নহে, কেবল পবিত্র ইতিহাস ও ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়াই উহাকে পাঠ ও সমাদর করিয়া থাকে; এবং তাহাদের বিশ্বাস এই যে উহা পাঠ করিলে, পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ হইয়া পুণ্যলোকে অবস্থান লাভ হয়। যাহা হউক আমরা রামায়ণকে কাব্য বলিয়াই ধরিলাম। বলা বাহুল্য যে এই রামায়ণ একখানি জগতের অতি অতুলনীয় কাব্য, মহৎ এবং সর্ব্বত্র রস-মাধুর্য্য ও রমণীয়তা ভাবে পরিপূর্ণ। এই কাব্যগ্রন্থ আমাদিগের বিদ্যাবুদ্ধি হইতে এতই উচ্চে অবস্থান করে যে, তৎসম্বন্ধে ভাল কি মন্দ যাহাই বলিতে যাই, যেন তাহাতে কেমন একটু লজ্জা লজ্জা বোধ হয় এবং আপনাপনি ধৃষ্টতা বোধে কুণ্ঠিত হই। ফলত এই গ্রন্থ কাব্য-বিষয়ে চরমোৎকর্ষ। অতঃপর এই কাব্য সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, তাহা অতি বিনীত ভাবে এবং অগ্রে আদিকবি বাল্মীকির পদে বহু শত প্রণিপাত পূর্ব্বক।

বাহ্য ও অন্তঃপদার্থ মাত্রের সুসন্নিবেশভাবের মাধুর্য্য-সন্দর্শনে হৃদয় উদ্বেলিত ও চিত্ত বিকম্পিত হইবায়, সেই মাধুর্য্য যখন বাক্য দ্বারা ব্যক্ত হয়, তাহা কাব্য। যে বিষয়ে কাব্য, কাব্য সেই বিষয়ের আদর্শ পদার্থ স্বরূপ। মাধুর্য্য অর্থে যে কেবল বাসন্ত দক্ষিণানিলের স্নিগ্ধস্পর্শ বা তথাবিধ বস্তু, তাহা নহে ; তমসাচ্ছন্ন নিশি, নিবিড় ঘনঘটা, বিদ্যুৎ, বজ্রাগ্নি বা কোন বীভৎস বস্তু, সকলেতেই এই মাধুর্য্য বিদ্যমান আছে। এ কথা শুনিয়া প্রাচীন আলঙ্কারিক পণ্ডিত হয় ত বলিবেন যে মধু হইতে যখন মাধুর্য্য, তখন বীভৎস, হিংসা প্রভৃতি ব্যাপারে, ভীষণ দৃশ্য বা ঘটনাবলীর মধ্যে, মাধুর্য্যের সম্ভবতা কোথায়? কিন্তু বাপুরাম! জানিবে যে, চিত্ত যখন যে রসের আকাঙ্ক্ষায় আকাঙ্ক্ষিত হয়, সেই আকাঙ্ক্ষা যাহা পূরণ করিয়া তৎস্থানে তদনুগামী অবশ্যম্ভাবী তৃপ্তির উৎপাদন করিয়া থাকে, তাহাকেই সেই আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ের মাধুর্য্য বলা যায়। যদি ইংরেজী নাটককারের য়িয়াগোর খলচরিত্রপাঠে, তোমার মন কখন খল-চরিত্রসম্বন্ধীয় আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হওয়ায় তৃপ্তি বোধ করিয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয় যে সে দুরন্ত খলচরিত্রও মাধুর্য্যশূন্য নহে; বরং তথায় খলচরিত্রের পূর্ণ প্রতিভাসে, মাধুর্য্যগুণ সাধারণ পরিমাণের অতীত। চিত্তের বস্তুবোধ যখন বহির্জগৎ সংযোগে প্রতিভাসিত হইয়া আত্মরূপ প্রকাশ করে, তখনই মাধুর্য্যের সঞ্চার হয়; অথবা সেই প্রতিভাসক্রিয়াই মাধুর্য্য; এবং এই প্রতিভাস যত পরিস্ফুট ও পূর্ণভাবে হইতে থাকে, বলা বাহুল্য যে, তথায় মাধুর্য্য সেই পরিমাণে পরিচ্ছিন্ন ও পূর্ণ এবং আদর্শস্থলীয় হয়। চিন্তা এবং কল্পনা-সাপেক্ষ বস্তুবোধ, যেরূপ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম দর্শনোপরি স্থাপিত হইয়া বহির্জগৎ সহ সংযোজিত হয়, এবং চিত্ত যখন যে ভাবে আপ্লুত হইয়া সেই দর্শনকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে; তদুৎপন্ন কাব্যও তখন সেই পরিমাণে বৈচিত্র্য ও অনুরূপ মাধুর্য্য প্রচুর অথবা তাহার স্বল্পতাযুক্ত, এবং সেই সেই ভাবে পরিপূরিত হইয়া অনুরূপ আকার ধারণ করিয়া থাকে।

সে যাহাহউক, চিন্তা এবং কল্পনাদক্ষ ও ধর্ম্মভাবপরিপূরিত ভারতভূমিতে যে রামায়ণের ন্যায় পূর্ণচিত্রযুক্ত এবং দেবধর্ম্মসম্পন্ন, বিবিধবৈচিত্র্যশালী ও নানারসবিশিষ্ট মহাকাব্যের উৎপত্তি হইবে ইহা একরূপ স্বতঃ-

সিদ্ধ বলিলে হয়। রামায়ণের সহ পার্শ্বাপার্শ্বিভাবে আর এক বিরাট-মূর্ত্তিধর মহাকাব্য গণনায় গণিত হইয়া থাকে। বলা বহুল্য ইহা মহা-ভারত। ইহার বিষয় এখানে আর অবতারণা করিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু ইহাও যে কিরূপ স্বভাবের কাব্য, তাহা হিন্দুসন্তানমাত্রেই ক্ষণেক চিন্তা করিলে দেখিতে পাইবেন। যে প্রাচীনকালে রামায়ণ প্রভৃতি কাব্যের উৎপত্তি হইয়াছিল, তখনকার অপর কোন শ্রেণীর কাব্য বা নাটক বা অপর কোন সাহিত্য পুস্তক কালের সঙ্গে এতদূর পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছিতে পারে নাই। তবে প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে ঐ সকলের ক্ষণিক উল্লেখসকল দৃষ্টে বোধ হয় যে, তাহাদেরও তখন নিতান্ত অপ্রচার ছিল না। সে যাহা হউক, আমাদের হাতে যাহা আসিয়া পৌছিয়াছে, তাহা সে প্রাচীন কালের তুলনায় অতি অল্প দিনের। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, ভারতীয় কাব্য নাটক প্রভৃতি প্রায় যাবতীয় সাহিত্য, প্রাচীনই হউক আর আধুনিকই হউক, তাহারা সকলেই পুরাণাদি যে কোন ধর্ম্মপুস্তকের কোন না কোন ঘটনা লইয়া নির্ম্মিত। যেখানে লেখকের ইচ্ছানুরূপ পৌরাণিক ঘটনা পুরাণাদিতে না মিলিয়াছে, লেখক সেখানে অভাবপক্ষে পৌরাণিক ঘটনাবলীর অনুরূপ ঘটনা কল্পনা করিয়া, আপনার অভাব পূরণ করিয়া লইয়াছেন।

এক্ষণে একবার গ্রীকদিগের সাহিত্যসংসারে প্রবেশ করিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে দিব্য একখানি বড়বাজারের মণিহারীর দোকান সাজান রহিয়াছে; ইহাতে না আছে এমন বস্তু নাই, অথচ ভিতরে কাহারও জন্য অনুসন্ধান করিতে হয় না; যাহা কিছু দেখাইবার ও দেখিবার, সকলই সম্মুখে থরে থরে সাজান আছে; সকলই দেখিতে চক্ চক্ ঝক্ ঝক্ করিয়া চক্ষু ঝলসাইয়া দিতেছে, দৃশ্য-প্রলোভনে বাহিরের খরিদদার ভিতরে টানিয়া আনে, অথচ সকলেরই দাম কম। আর ভারতীয় সাহিত্য সংসার? —উহা আমাদের দেশীয় অলঙ্কারব্যবসায়ী স্বর্ণকারের দোকান, নতুবা ঐ দেখ ব্যাকমল, পইচে, বাউটী, হাঁসুলি, এ সব উহার দোকানে ঐ সাজান রহিয়াছে কেন? মোটা-মোটা, ভারি ভারি, ঠসকশূন্য, চটকশূন্য, মণিহারীর দোকানের শতাংশের এক অংশও ত নয়নরঞ্জক নহে!

খরিদদার আপাতত দেখিবামাত্র হয়ত উপহাসে মুখ বাঁকাইয়া চলিয়া যায়। কিন্তু বাপু, আমি তোমাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, তোমার আমার উহা নয়নরঞ্জন না করুক,—বিশেষ আঙুর উচ্চ বৃক্ষের উপরে থাকায়, শৃগাল বাহাদুরের নিকট টক বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছিল,—তোমার আমার উহাতে দরকার থাকুক বা নাই থাকুক, কিন্তু যে সোণার মর্ম্ম বুঝে, সে ঐ দোকান ভিন্ন সোণার তল্লাসে অন্য দোকানে যাইবে না। ঐ গহনাগুলি নমুনামাত্র, উহা দেখিয়া যদি কেহ দোকান চিনিয়া লয়, তাহার পর খরিদদার বুঝিয়া তেমন তেমন গহনা সিন্ধুক হইতে বাহির করিয়া দেখান যাইবে। ভারত-সাহিত্যের ভাব এই যে চিন্তনীয়কে অবলম্বন মাত্র করিয়া, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত অনাবশ্যক বোধে, একেবারে অচিন্তনীয়তে লইয়া উপস্থিত করে, আর গ্রীকসাহিত্যের ভাব এই যে, যে চিন্তনীয় অপরের দ্বারা অনাবশ্যকবোধে বিনা দর্শনে পরিত্যক্ত হয়, উহা সেই চিন্তনীয়কে সর্ব্বতোভাবে দর্শনযোগ্য ও বৈচিত্র্যময়রূপে দেখাইয়া তৎপ্রতি তোমার মোহ উৎপাদন ও তাহাতে আকৃষ্ট করিয়া থাকে। ভারতে রামায়ণ যে শ্রেণীর মহাকাব্য, গ্রীকভূমে হোমারের ইলিয়দও সেই শ্রেণীর মহাকাব্য। উভয়েরই মূল ঘটনা প্রায় এক শ্রেণীর এবং উভয়েরই কর্ম্মক্ষেত্র স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল এই ত্রিভুবন ব্যাপিয়া। উভয়েরই ভাব ও রসবৈচিত্র অপরিসীম। উভয়ই নবরসাধার, উভয়েতেই অপার ঐশ্বর্য্য বিস্তার। এখন এ দুইখানি গ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখ চিত্তে কিরূপ ভাবের উদয় হয়। রামায়ণপাঠে, ক্রমান্বয়ে, বাসন্ত-সাংসারিক-সুখ-মাধুরীতে মোহিত হইলাম, আবার সহসা স্নেহ-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া হৃদয় শূন্য করিলাম; ক্রমে মুখে হাহাকার, হাহাকার করিতে করিতে দারুণ দুঃখ-তরঙ্গে ডুবিলাম;—কিন্তু সহসা এ কি শব্দ, এ রণশঙ্খ কোথায় বাজিতেছে! হৃদয় শব্দে শব্দে মাতিয়া উঠিল, তর তরে শিরায় শোণিত বহিল, চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিতে লাগিল, হুঙ্কারধ্বনিতে দিক নিনাদিত! মার—মার, ধর—ধর, রক্ষ!—'ভেদয় ভেদয়, ছেদয় ছেদয় হন হন, দহ দহ, মারয় মারয়—' একি প্রলয় কাল উপস্থিত, না রুদ্রদেব সংহার-শূল ধারণ করিয়াছেন? আবার ঐ দেখ, দেখিতে দেখিতে সেই

সকল কোথায় পলাইল, রৌদ্র মূর্ত্তি ছায়াবাজিপ্রায় কোথায় লুকাইয়া গেল। উহা লুকাইতেছে বটে, কিন্তু কেমন লুকাইতেছে, আবার উহার পার্শ্বে ঐ স্নিগ্ধ পূর্ণচন্দ্রবৎ ও কি উদয় হইতেছে?—আহা কি চিত্র, কি মধুর সুখ চিত্র, কি মধুর সংসার-সুখ চিত্র! কিন্তু হায়! উহার মাধুরীতে হৃদয় আপ্লুত হইতে না হইতেই আবার ঐ কাল মেঘ কোথা হইতে আসিয়া সকল আবরিত করিয়া ফেলিল, স্বপ্নবৎ সে মোহন দৃশ্যসকল কোথায় লুকাইল, কি দারুণ তিমির রাশি!—পতিদেবতা সীতা বনে? "রমা রমা সারমার," দিক শূন্য হইল, হৃদয় শূন্য হইল—কোথায় শান্তি! কোথায় শান্তি! এ কর্ম্মক্ষেত্রের কর্ম্ম ত দেখিতেছি ফুরাইয়া গেল, তবে আর আমার এ শান্তি কোথায় মিলিবে, কোথায় এ শূন্য হৃদয় পূর্ণ হইবে।—বাল্মীকি! বলিতে পার কোথায় পূর্ণ হইবে? সরযূনীরে? তাহাই হউক। তাই বলিতেছিলাম যে রামায়ণ পড়িয়া নানা রসে নানা ভাব তরঙ্গে দুলিলাম বটে, কিন্তু শেষে এমন অশান্তি জন্মাইয়া দিয়া গেল যে, শান্তির আশায় টুকনি হাতে বনে যাইতে হয়।

এক্ষণে হোমারের ইলিয়দ-সংসারে একবার প্রবেশ করিয়া দেখ, দ্বারদেশে সরক্ত খর্পরমুণ্ড ঝুলিতেছে; ভয় পাইও না, প্রবেশ কর। কিন্তু এ কি! সম্মুখেই এ কি, এ দারুণ প্রলয় অগ্নি ধক্ ধক্ করিয়া, লক্‌লক্ জিহ্বায় যেন জগৎ গ্রাস করিবার নিমিত্ত,আকাশ লেলিহান করিয়া ছুটিয়া ছুটিয়া উঠিতেছে। কি দেখিতেছ? উহা প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড;—গ্রীস-বাসিগণের দুরন্ত ক্রোধাগ্নি কালানলরূপে, দপ্ দপ্ করিয়া গম্ গম্ শব্দে, তাপে উত্তাপে, যাহা স্পর্শ করিতেছে তাহাই দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। উহা কি জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ? না, তাহা হইতেও উহা ভীষণতর। জন্মেজয়ের যজ্ঞে ইন্দ্র-সিংহাসনের আশ্রয়ে নাগরাজ তক্ষক পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন, কিন্তু এ দারুণ যজ্ঞে সে পরিত্রাণেরও আশা নাই। বীরবর্গের নিশ্বাসবায়ুতে সমর-ইন্ধনে এ দারুণ অগ্নি নিরন্তর দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে। হাস্য, বীভৎস, অদ্ভুত, শান্তি, যে কোন রস সে অগ্নি শান্ত্য করিতে ঢালিয়া দিতেছে; তাহাতে সাম্য হওয়া দূরে থাকুক, ক্ষণেক ম্লান হইতেছে বটে, কিন্তু পরক্ষণেই রৌদ্র হইতে রৌদ্রতর ভাবে

লক্ লক্ শিখায়, আকাশতল দহন করিয়া ছুটিয়া ছুটিয়া উঠিতেছে। একা রুদ্রমূর্ত্তি সংহারশূল হস্তে দণ্ডায়মান, যে কোন মূর্ত্তি নিকটে আসিতেছে, তাহাই সে রুদ্রতেজে মিলিয়া রুদ্রশূলের কলেবর বৃদ্ধি করিতেছে। ইলিয়দের রসমাধুর্য্য সর্ব্বত্র পূর্ণাবয়ব। কিন্তু এ প্রবল রৌদ্ররসের মধ্যে অপরাপর রসের সমাবেশ, ঠিক যেন কুসুম-কোমলা কামিনীগণকে দুরন্ত শার্দ্দূলগুহায় নিক্ষেপের ন্যায়। রাবণকে সংহারার্থে মৃত্যুশর সঞ্চালন কালীন, সেই শরকে অব্যর্থ করিবার জন্য, তাহার পর্ব্বে পর্ব্বে দেবতাবর্গের অধিষ্ঠান সাধন করা হইয়াছিল, ইলিয়দের দেববর্গ ও দেবশক্তির অবতারণাও তদ্রূপ। এই ইলিয়দ শিওরে করিয়া গ্রীকসন্তান জগৎজেতা হইয়াছিলেন; এই রামায়ণ শিওরে করিয়া ভারতসন্তান রামায়েৎ সন্ন্যাসী হইয়া ফিরিতেছেন।

যে কল্পনাশক্তি রামায়ণে নিরন্তর লৌকিককে অলৌকিকত্বে পরিণত করিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে, সেই কল্পনাশক্তিই ইলিয়দে সর্ব্বদা অলৌকিককে লৌকিকত্বে আনিবার চেষ্টা পাইয়াছে। যদিও শেষোক্তের সে চেষ্টার কোথাও ত্রুটি দেখা যায়, তাহা কল্পনা বা কবির দোষ নহে; লৌকিকের ন্যায় অলৌকিক সর্ব্বদাই আয়ত্তসাধ্য নহে সেই জন্য। রামায়ণে লোকের রুচি অরুচির প্রতি বড় একটা বিশেষ খাতির নাই; কবির বাঞ্ছার সহিত সংমিলিত হইয়া কল্পনা যতদূর ইচ্ছা ছুটিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইলিয়দে তাহা নহে, সকলেই সম্ভবের মধ্যে, সকলেই সীমার ভিতর, এবং সর্ব্বত্রই লোক-রুচির সহ সামঞ্জস্য পক্ষে যাহাতে ব্যতিক্রম না হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি পদে পদে। রামায়ণে নিহিত রত্নরাশি অমূল্য; কিন্তু গায় অনেক খনিজ আবরণ হেতু পূর্ণপ্রভ হইতে পারে নাই; পাণ্ডিত্য অদ্ভুত কিন্তু যেন বিশ্ব আয়ত্ত করিতে হস্ত প্রসারিত, সুতরাং গাঁজাখুরীর আভাসও অনেক। ইলিয়দের রত্নরাশিও বহুমূল্য; যদিও রামায়ণের ন্যায় অমূল্য নহে বটে, কিন্তু এমন চাক্‌চিক্যশালী যে তাহার কাছে অমূল্য রত্নও দাঁড়াইতে লজ্জা বোধ করে।—পাশ্চাত্যের পালিস চিরকালই চক্‌চকে; চিরকালই পাশ্চাত্যগণ পালিসসর্ব্বস্ব। পাণ্ডিত্যও অদ্ভুত, কিন্তু সীমান্তবর্ত্তী ও প্রকৃতি সহ সামঞ্জস্যযুক্ত, সুতরাং

গাঁতাখুরীও কম। বাল্মীকি রামায়ণ। এখন জিজ্ঞাসিতে পার, রামায়ণ বড় কি ইলিয়দ বড়?—কেহই বড় নহে, কেহই ছোট নহে। আপন আপন ঘরে উহারা আপনি আপনার রাজা। যে যখন যাহার ঘরে প্রজাভাবে যাইবে, সেই তখন তাহাকে বড়ভাবে দেখিতে পাইবে।

কিন্তু সে যাহা হউক, আমরা যাহা দেখিতে এখানে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তাহা ফেলিয়া অন্য কথায় সময় কাটাইতেছি। দেখ পুনর্ব্বার, ইলিয়দের অগ্নিকুণ্ডে কি দহিতেছে। ইলিয়দের বিংশ সর্গ বাহির কর। বহুতর রসপ্রক্ষেপ আহুতি স্বরূপে পরিণত হওয়ায়, অগ্নিকুণ্ড কি ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে, কেবল মানবীয় যুদ্ধে আর রণতৃষা পরিতৃপ্ত হইতেছে না। এক্ষণে যুদ্ধার্থে দেবদল দ্বিভাগে বিভক্ত হইয়া মানব-সহযোগে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। এইবার লক্ষবলি। আহুতিপাতরূপে মহাসর্পসকল ধড়ফড় করিয়া আসিয়া পড়িতেছে। বিশাল জিহ্বা প্রসারিত করিয়া, সধূম অগ্নিশিখা, উন্মত্ত অট্টহাসের ন্যায় অলোকাঙ্কারে গগন-ব্যাপ্ত করিয়া, যুগান্ত-মূর্ত্তিবৎ সমুপস্থিত। আকাশে অগ্নিবর্ষণ, ঘন বজ্রঘোষে দিগ্বলয় কম্পিত, জীবজগৎ চমকিত, ভার ভরে পৃথিবী টল্ মল্ করিয়া দুলিতেছে। সূর্য্য শশী কাল তিমিরে আচ্ছাদিত; থাকিয়া থাকিয়া প্রকৃতির চমকবৎ অগ্নিশিখায় জগৎ আমূলত ক্ষণে ক্ষণে লোহিত-নীলাভায় আলোকিত হইয়া উঠিতেছে। কি অদ্ভুত, কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য! এবার নাগরাজ তক্ষক পতন,—ত্রয়-ভরসা হেক্টরের পতন হইবে। হেক্টর পড়িল। অভাবনীয় আহুতি লাভে, অভাবনীয় বল প্রাপ্তে, অগ্নিশিখা বিপুল বেগে ধাবমান হইল। স্বর্গে দেবদল; মর্ত্তে মানব, সকলেই শঙ্কিত। কবি তখন সৃষ্টিনাশের আশঙ্কায়—আত্মনাশের আশঙ্কায়—অগ্নি নির্ব্বাপিত করিবার জন্য অন্দ্রমেকি, প্রিয়াম ও তৎপরিজনবর্গের করুণারস ঢালিতে লাগিলেন। অপরিমিত ভাবে ঢালিতে লাগিলেন। অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল বটে, কিন্তু একবারে নির্ব্বাপিত হইল না। উপরে শীতল হইল, কিন্তু ভিতরে এখনও অগ্নি ধিকি ধিকি করিয়া আস্ফালন করিতেছে। একটু বাতাস পাইলেই ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে। এখনও সেই চিতার মধ্য হইতে মার মার শব্দে

হেক্টর ও পারক্লসের আত্মা চীৎকার করিয়া, আপনাপন পক্ষকে প্রতিশোধ লইবার জন্য উৎসাহিত করিতেছে। এখনও চীৎকার করিয়া সাবধান করিতেছে, দেখিও যেন গ্রীকসুন্দরী হেলেনা ও স্পার্টার রত্নরাশি হস্তান্তরিত হইতে না পায়। সুতরাং এ অগ্নি একেবারে নির্ব্বাপিত হইল না, আবার জ্বলিয়া উঠিবার নিমিত্ত সময় প্রতীক্ষা করিতেছে মাত্র। ইলিয়দও কিয়ৎকাল ধর্ম্মপুস্তক ভাবে গৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু রামায়ণের তুলনায় তাহা দুই মুহূর্ত্তের জন্য বলিলে হয়।

হোমরের পর আর্কিলোকুস হইতে পরবর্ত্তী সময়ের যাবতীয় কবি ও নাটককারগণের আর কেহই প্রায় ধর্ম্মশাস্ত্র বা মনস্তত্ত্বহুল বিষয় লইয়া গ্রন্থ রচনা করেন নাই। যদিও বা কেহ কোথায় দেবতাদিগের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা প্রায় দেবতাদিগকে উপহাস করিবার উদ্দেশ্যতেই অধিক; এবং এই উপহাসের চূড়ান্ত আরিষ্টফানিসের গ্রন্থে সাধিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন এই সকল গ্রন্থকারের রচনা অধিকাংশই সামাজিক ও রাজনীতির, বা ব্যক্তি বিশেষের, দোষ-অংশ হউক বা গুণ-অংশ হউক, ইহা লইয়া রচিত। যথায়ই দোষাংশ-বাহুল্যের অস্তিত্ব, তাহা কি রাজদ্বারে হউক, কি আপন ঘরে হউক, কোথাও কবির কটাক্ষ হইতে নিস্তার পাইবার যো নাই। অর্কিলোকুসের প্রধান গ্রন্থ তাহার শ্বশুর লিকাম্বিসের বিপক্ষে। ঐ গ্রন্থ কটাক্ষ এবং ব্যঙ্গোক্তিতে এরূপ পরিপূর্ণ যে, লিকাম্বিস তজ্জন্য ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিল। রাজপুরুষ হইলেও যে কবির বাক্যবাণ হইতে নিস্তার নাই, তজ্জন্য কেবল অরিষ্টফানিসকৃত লিশিস্ত্রাতা নামক নাটকের নামমাত্র উল্লেখ করিলাম। এই অরিষ্টফানিসের, বাক্যবাণ হইতে মানবগুরু সক্রোতসেরও নিস্তার ছিল না। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য-সংসার বিলোড়ন করিলে, এতদ্রূপ শ্রেণীর কোন রূপ গ্রন্থ পাওয়া যায় কি না বলিতে পারি না। আধুনিক সংস্কৃতে থাকিলে থাকিতে পারে।

যে সকল গ্রীক কবিদিগের নাম উপরে করা হইল, তাহারা যে সময়ে গ্রীকভূমে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, তাহার সম-সময়ে সংস্কৃত সাহিত্য-সংসারে প্রাচীন রামায়ণ ও মহাভারত ভিন্ন অপর কোন প্রকার সাহিত্য গ্রন্থ ছিল কি না তাহা বলিতে পারা যায় না। যদি বলা যায় যে ছিল, তবে তাহা

নিঃসন্দেহ লোপ হইয়াছে এবং আমাদের হাতে আসিয়া পৌঁছে নাই বলিতে হইবে। আমার বিশ্বাসে গণনীয় কিছু না থাকারই কথা। রামায়ণ ও মহাভারত ছাড়িয়া দিলে, তাহাদের নিম্নে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সাহিত্য মৃচ্ছকটিককে ধরিতে হয়। এই মৃচ্ছকটিক কথিত গ্রীক লেখকদিগের অপেক্ষা অনেক আধুনিক। উহা খৃষ্টের শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হয়। এ গ্রন্থের অপর কোন উদ্দেশ্য নাই, প্রধান উদ্দেশ্য প্রেমবর্ণনা—গ্রীক কবিদিগের সাধারণ উদ্দেশ্যের সঙ্গে অনেক তফাত। সে যাহাহউক, যদিও সেকালে কথিত গ্রীক সাহিত্যগ্রন্থসকলের ন্যায় গ্রন্থ সকল না পাওয়া যাউক, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে অসংখ্য কূট-কৌশল ও মনীষা সম্পন্ন বেদ বেদান্ত ও তাহার ছায়াশ্রয়ী অপূর্ব্ব রত্নসমূহ পরিপূর্ণ অপরাপর বিষয়ক গ্রন্থ এত পাওয়া যায় যে, তাহাদের কি সংখ্যা, কি ওজন, কি পদার্থের তুলনে, গ্রীকের বিদ্যাগ্রন্থসকল বহুলাংশে অগণনীয়ের মধ্যে পড়িয়া যায়। গ্রীক বিদ্যাগ্রন্থ সকল সাধারণত রাজনীতি, সমাজনীতি, লোকযাত্রা বিষয়ে; আর হিন্দুর বিদ্যাগ্রন্থসকল সাধারণত ধর্ম্মনীতি বিষয়ে। এখানেও স্ব স্ব জাতীয় প্রকৃতির পরিচয়। যে কোন বিষয়ের সংশোধনে ব্যঙ্গোক্তি, রূপক, কটাক্ষপাত, দৃশ্যাভিনয় ইত্যাদি সামাজিক সুখপ্রিয় গ্রীকের প্রধান অস্ত্র। তৎ তৎ স্থলে, হিন্দুচরিত্র স্বতন্ত্র। হিন্দুর দৃক্‌পাতশূন্য নিষ্ঠা ও রুচি এমনিই কঠোর এবং খরতর যে, তিনি যাহা কিছু সাধন করিতে চাহিবেন, তাহা সমস্তই অনুশাসন—ধর্ম্মানুশাসন বাক্যে; ব্যঙ্গোক্তি প্রভৃতি খোষ-পোষাকী উপায়ের ধার ধারিতেন না। বাঙ্গারাম. কেবল আলো চাউল এবং কাঁচ কলার পোষাক আসিবেই বা কোথা হইতে!

যে সকল শাস্ত্র এবং বিজ্ঞান আনুষ্ঠানিক বা যাহার আশুফল পার্থিব সুখ ও সচ্ছন্দতা লাভ, এরূপ শাস্ত্র ও বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত সত্য, খণ্ড ভাবে ভারতে কখন কখন উদ্ভাবিত, এবং আবশ্যকতা অনুসারে নিযোজিতও দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহাদের পৃথক ভাবে শ্রেণীনির্ব্বাচন, ধারাবাহিকরূপে সংযোজন, ও তাহার উৎকর্ষসাধন, কোথাও দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্বেই এক স্থানে বলা গিয়াছে যে অন্যান্য বিষয়ানুসন্ধান

উপলক্ষে ভারতে কৃষিবিদ্যা, ভূতত্ত্ববিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, পাশবতত্ত্ব ইত্যাদি, যাহারা অধুনা উচ্চ-বিজ্ঞান শব্দে খ্যাত, তাহাদের বহুল তত্ত্ব, এমন কি গূঢ়তম সত্য পর্য্যন্ত, খণ্ড খণ্ড ভাবে উদ্ভাবিত ও কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিল; কিন্তু কোথাও তাহাদের কেহ ধারাবাহিকরূপে শ্রেণীবদ্ধ বা বিভিন্ন শাস্ত্র-পদে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কথিত শাস্ত্রাদি বিষয়ক সাধারণ জ্ঞানের যে অবশ্যম্ভাবী ফল, তল্লাভে ভারতীয়েরা হয়ত অনেক সময়ে গ্রীকদিগের অপেক্ষা জিতিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও, তত্তৎ বিষয়ে গ্রীকদিগকে অতিক্রম করিয়া, ভারতীয়-দিগকে জয় দিতে পারা যায় না। কারণ ভারতীয়েরা যাহা লাভ করি-তেন, তাহা অদৃষ্টপূর্ব্বের ন্যায়, এবং ভারতীয়েরা সে সকল সাজাইয়া একত্র করিতে জানিতেন না। ভারতীয়েরা এই সকল বিষয়ে, কি কারণ ধরিলে কোন ফল লাভ করিব এবং সেই ফল আমাদের কার্য্যে—কেবল উপস্থিত কার্য্যে নহে, অন্য কার্য্যেও—কতদূর আসিতে পারিবে, তৎ-পক্ষে এবং কেবল তাহারই নিমিত্ত, কখনও চেষ্টা বা চিন্তা করিতেন না। তাঁহাদের যাহা প্রিয় অনুসন্ধান ও প্রিয় আলোচনা, তাহারই উপলক্ষে যদি কোন তত্ত্ব অভাবনীয় ভাবে উদয় হইল, ভালই; কিন্তু তাহাকে যে আবার ভিত্তিস্বরূপ করিয়া তদবলম্বনে নূতন কোন তত্ত্বের আশায় হস্ত-প্রসারণ করিব, সে অভ্যাস বড় নাই। সুতরাং বলিতে হইবে যে, ইহারা যাহা কিছু এতদ্রূপ শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিতেন, সে জ্ঞান যতই উচ্চ হউক, তাহা দৈব-প্রেরিতবৎ এবং তাহা বিস্তারশূন্য রূঢ়ি জ্ঞান। বলা বাহুল্য যে দৈবের উপর যে যে বিষয়ের জন্য যাহাকে নির্ভর করিতে হয়, সেই সেই বিষয় সম্বন্ধে তাহাদের অপেক্ষা দুঃখী ও অসাব্যস্ত জীব আর পৃথিবীতে নাই। গ্রীকজীবনে এরূপ নহে; কর্ম্মসূত্রবশে কথিত বিষয় সমূহে যখন যে জ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ সাজাইয়া এবং যথোপযুক্ত তাহার শ্রেণী নির্দ্দিষ্ট করিয়া, তত্তৎ শ্রেণীভুক্ত করিয়াছে; এবং তাহাকে আবার অবলম্বন করিয়া নূতন তত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এবম্প্রকারে কার্য্য-কারণ নির্ব্বাচন সহ, উদ্ভাবিত তত্ত্ব সকল শ্রেণীবদ্ধ রূপে পরিণত

হওয়াতে; তাহা পৃথক শাস্ত্ররূপে গণিত ও অধীত এবং কার্য্যকালে তাহা অনুসৃত হওয়ায়, তত্তৎবিষয়ক যে কোন তত্ত্বের ফল তাহারা ইচ্ছা পূর্ব্বক, জ্ঞানপূর্ব্বক, এবং আত্মগণনার অভিমতরূপে লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। হিন্দুদিগের ন্যায় অদৃষ্টপূর্ব্ব নহে। সুতরাং ইহাদের দ্বারা উদ্ভাবিত ও শ্রেণীবদ্ধ তত্ত্বসমূহ অপেক্ষাকৃত সামান্য হইলেও তাহা সারবান্, এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়া তত্তৎ বিষয়ের অগ্র পশ্চাৎ দেখিতে পারা যায়, ও তাহার উপর তত্তৎ শাস্ত্রের অপার উন্নতি-বীজ বপন করিতে পারা যায়। হিন্দুদিগের উদ্ভাবিত তত্ত্বসকল পরিত্যক্তভাবে ইতস্তত নিক্ষিপ্ত থাকায় ও তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সংযোগ-রজ্জুর স্থাপনাভাব হেতু তাহাদের অবলম্বনে তত্তৎ বিষয়ের অগ্র পশ্চাৎ অবলোকন, বা তাহার উপর কোন প্রকার উন্নতি-বীজ বপন করিতে পারা যায় না। এমন স্থলে হিন্দুদিগের মধ্যে সেই সকল শাস্ত্রীয় তত্ত্ব থাকা বা না থাকা উভয়ই সমান; এবং সাংসারিক বোধে ধরিতে গেলে, একেবারে ছিল না বলিলে হয়। তাঁহাদের বোধ অনুরূপ যতদূর হইলে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে, তাহাই ধারাবাহিকরূপে সাধন করিয়া গিয়াছেন। তদতিরিক্ত বিষয়, ক্ষণিক ভিন্ন ধারাবাহিকরূপে, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য কখনও আবশ্যক হইত না। যদি হইত, তাহা হইলে জ্যোতিষাদির ন্যায় এ সকল শাস্ত্রেরও উদ্ভাবন, নিয়মবন্ধন এবং তাহাদের উন্নতিসাধন সুসম্পন্ন হইত। যে জাতির জগতের প্রতি বৈরাগ্য এত যে, পার্থিব জীবনের অনিত্যতা ও তৎপ্রতি তুচ্ছতা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত লোমশ মুনির উপাখ্যান কল্পিত হইয়াছে; সে জাতির মধ্যে যে এ সকল শাস্ত্রের বা বিজ্ঞানের উদ্ভাবন ও উৎকর্ষ সাধন হয় নাই কেন, তাহা বলিবার আবশ্যকতা রাখে না। পুরাণে এই লোমশ মুনির ইতিহাস বিষয়ে এরূপ কথিত আছে যে, ইহার সর্ব্বাঙ্গ মেষবৎ লোমে আচ্ছন্ন ছিল। ঐ লোম প্রতি ইন্দ্রপাতে এক একটী করিয়া খসিয়া যাইত। এই হিসাবে একটী একটী করিয়া খসিতে খসিতে সমস্ত অঙ্গ যে দিন একেবারে নির্লোম হইবে, সেই দিনই তাঁহার মৃত্যুদিন আসিয়া উপস্থিত হইবে। এ হিসাবে তাঁহার আয়ু ব্রহ্মার অপেক্ষাও অধিক হইয়া পড়ে। তথাপি

এই ঋষি, কেন যে আপনার আশ্রম কুটীরের উপরি জলবায়ুনিবারক আচ্ছাদন দিবেন, এবং এই অল্প কয়দিনের জন্য তাহার আবশ্যকতাই বা কি, তাহা নিরূপণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

ফলত ভারতীয়দিগের ভূ-বিদ্যার ধারাবাহিক জ্ঞান, স্বর্ণচূড় সুমেরু, কনকপদ্মশোভিত মানসসরোবর, লবণ ইক্ষু সুরা সর্পি প্রভৃতি সমুদ্র, ত্রিকোণময়ী পৃথিবী, ইত্যাদিতে আসিয়া সমাপ্ত হইয়াছে। ভূ-তত্ত্ববিদ্যার জ্ঞান—বাসুকীর মস্তকে পৃথিবীর অবস্থিতি, এবং তাহার মাথা নাড়াতেই ভূ-কম্পনের উপস্থিতি হইয়া থাকে। উদ্ভিদ্‌বিদ্যার ব্যুৎপত্তি—কোন গাছ ব্রাহ্মণ, কোন গাছ চণ্ডাল, কোন গাছ পুরুষ, কোন গাছ স্ত্রী, এবম্ভূত বিভাগবোধ। পাশবতত্ত্ববিদ্যা—আত্মার কর্ম্মসূত্রবশে ইতর হইতে ইতরতর অবস্থা প্রাপ্ত্যর্থে চৌরাশী লক্ষ যোনির সৃষ্টি, ইত্যাদি। কিন্তু এক কথা। হিন্দুরা চিরকাল আত্মদেশমধ্যে আবদ্ধপ্রায়, গ্রীকের তুলনায় কখনও অপারাপর দেশীয় জাতির সহিত সংস্রবে আইসে নাই বলিলেই হয়; অন্য দিকে গ্রীকেরা তদ্বিপরীতে অপরিমিত ভাবে অপরাপর দেশীয়-দিগের সংস্রবে আসিয়াছিল। সুতরাং ইহারা একই বিষয়ে পাঁচদেশীয় পাঁচরূপ বুদ্ধির সঙ্কলনে, ও তাহার সহিত নিজবুদ্ধির সামঞ্জস্য সাধনে, বিষয় বিশেষ লইয়া যে ভারতকে একেবারে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইবে, তাহাতে বিচিত্র কি? কারণ একে সেই সেই বিষয় হয়ত হিন্দু-দিগের প্রকৃতিযুজ্য নহে, তাহাতে আবার বাহ্য সাহায্য তাহাতে কিছু মাত্র নাই। কিন্তু আবার যে যে বিষয়, গ্রীক এবং হিন্দু উভয়েরই প্রকৃতি কর্ত্তৃক সর্ব্বাংশে অনুমোদিত, এবং যাহা উভয়কেই বিনা সাহায্যে অনুসরণ করিতে হইয়াছে, তথায় একবার সেই অনুসৃত বিষয়ের মধ্যে বিচার করিয়া দেখ, কে কতদূর দৌড় দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে; তাহা হইলে মনীষা-চালনায় কে উচ্চতর তাহা স্পষ্টত জানিতে পারিবে। তেমন স্থলে ভারতকে ঊর্দ্ধে ভিন্ন নিম্নে দেখিতে পাইবে না।

এক্ষণে পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আনু-ষ্ঠানিক বিদ্যাদিতে হিন্দুরা বিশেষ কিছুই উন্নতি সাধন করিতে পারেন নাই। ব্যবহারগ্রন্থাদি ধর্ম্মবিষয়ক অতিনীতিবহুল। সাহিত্য ধর্ম্মবুদ্ধিতে পরিপুষ্ট

ও অতি উচ্চ। কৃষি, বাণিজ্য, সমুদ্রযাত্রা, শিল্প প্রভৃতি বিদ্যার ভারতে আবশ্যক অনুরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইহারাও সর্ব্বাংশে অনুষ্ঠানপ্রধান বিষয় হইবায়, এবং উপপাদ্য জ্ঞানের সান্নিধ্যে ইহারা বহুলাংশে প্রকৃতিবিভিন্নতা-যুক্ত হওয়ায়, ইহাদের যতদূর উন্নতি সাময়িক জ্ঞানানুসারে হইতে পারে তাহা হয় নাই। অতিদূরন্তর কালেও, কৃষি, সমুদ্র-যাত্রা, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে গ্রীকভূমে যেরূপ উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, ও লোকের শিক্ষার্থ তাহা যেরূপ ও যত যত্ন এবং সাবধানতার সহিত বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা অলোচনা করিলে আশ্চর্য্যে স্তম্ভিত হইতে হয়। ভারতসন্তান, যে সময়ে তুমি কৃষ্ণসার মৃগের অবিচরিত দেশ অনার্য্য-নিবাস ভাবিয়া পুণ্যসলিলা গঙ্গার তটে ঘনীভূত হইয়া বসিতেছ; সেই একই সময়ে, দূরবিচরণকারী গ্রীকসন্তান তোমার সেই গঙ্গারই তট হইতে ধন রত্ন সঞ্চয় করিয়া, গৃহ এবং গৃহলক্ষ্মীকে সজ্জিত ও ইহলৌকিক সুখের চূড়ান্ত করিয়া তুলিতেছে। তোমার ধিক্কার বোধ হইত না! তখনও কি তোমার গৃহলক্ষ্মীগণ আদরিণী হইয়া সম্মার্জ্জনী ধরিতে শিখিয়াছিলেন? তুমি কি তখনও রাগ হইলে ভাতের হাঁড়ি ভাঙ্গিতে?

ইতি পঞ্চম প্রস্তাব।

ষষ্ঠ প্রস্তাব।

লোকনীতি।

প্লেটো হইতে রুষো পর্য্যন্ত, যুগে যুগে উদ্ভূত খ্যাতনামাবর্গ, কি জানি কি সূত্র ধরিয়া, বিশ্বাস করিতেন যে, যেমন কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ ও তর্কাদিযোগে ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রতিজ্ঞা এবং তথাবিধ বিষয় সকল স্থাপিত হইয়া থাকে; লোকসমাজ ও লোকনীতিও সেইরূপ প্রকরণে স্থাপিত ও বর্দ্ধিত করিতে পারা যায়। হইত, তাহা না হয় সম্ভবপরও ছিল; তদ্রূপ স্থাপিত লোকনীতি দ্বারা লোকযাত্রাও বর্দ্ধিত ও পরিচালিত হইতে পারিত, এবং আমরাও তাহাতে বিশেষ সন্দেহ করি না; কিন্তু এক কথা, যদি তাবৎ লোক প্লেটো বা রুষো হইত। দুর্ভাগ্যক্রমে এ জগতে তাবৎ লোক প্লেটো হইয়াও কখন জন্মায় না, বা রুষো হইয়াও কখন জন্মায় না। এ অবনী যেমন অনন্তবহুলা, মানবপ্রকৃতিও তেমনি অনন্ত-বহুল; সুতরাং কে একা প্রকৃতি তোমার বা একা-প্রকৃতি আমার তর্ক-প্রসূত আড্‌গড়ার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া স্বাধীনতা লোপ করিতে স্বীকৃত হইবে; এবং একা-প্রকৃতি তুমি আমিই বা কেমন করিয়া প্রত্যাশা করিতে পারি যে, মৎকৃত রজ্জুতে অনন্ত প্রকৃতি আবদ্ধ করিয়া মম বুদ্ধি-অনুরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ পূর্ব্বক তাহাদিগকে চালাইতে সমর্থ হইব? বিশেষত আমাতে যে দিব্য আত্মা, অন্যেতেও সেই দিব্য আত্মা বিরাজ করি-তেছে; সমান সমান সম্বন্ধ; তখন কেন অন্যে মৎকৃত সূত্রে বিনত হইয়া আবদ্ধ হইতে যাইবে? কোন মানব তাহা হয়ও না। শিষ্য অবশ্য গুরুর নিকট আবদ্ধ হয় বটে, কিন্তু সে গুরুকৃতপাশে নহে, গুরু কর্তৃক প্রদর্শিত পাশে। এ বিশ্বে কেবল একটীমাত্র সূত্র আছে যাহাতে সকলেই, ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, সর্ব্ব প্রকারে আবদ্ধ হয়, এবং সাত্ত্বিকপ্রকৃতি লোক হইলে আবার ভক্তি-ব্যাকুলতায় আবদ্ধ হয়; সে সূত্র তাঁহা, যাহাতে সকলেরই উৎপত্তি। কিন্তু এ সূত্র যেমন একতার সম্বন্ধ করে,

তেমনি আবার অন্য দিকে কিছুমাত্র বহুত্বের বিলোপ করে না। তোমার মনুষ্যকৃত সূত্রের ধর্ম তাহা নহে; একা-প্রকৃতি হইতে উৎপত্তি হেতু এক্ত্বই উহার সম্বল, অতএব কেন বা কেমন করিয়া উহাতে বহুত্বপূর্ণ লোকনীতি আবদ্ধ হইবে? হয়ও নাই কখন! সুতরাং আমরাও এখানে, যে লোকনীতি সূত্র কেবল বচনে মাত্র স্থিত, কার্য্যে কখনও আনীত হয় নাই, তাহা লইয়া বাক্‌বিতণ্ডায় আর অধিক সময় অপব্যয় করিব না।

দ্বিতীয়, আর কতকগুলি ক্ষুদ্রতর খ্যাতনামা আছে, যাহাদের বিশ্বাস "তোমার উপর যেরূপ কৃত হইতে অভিলাষ কর, অন্যের প্রতি সেইরূপ আচরণ করিও" এই নীতির উপর নির্ভর করিয়া সাধারণ লোক-নীতি নির্ম্মিত হইয়াছে। এ নীতিতে,অঙ্কশাস্ত্রের আর সমস্ত ফেলিয়া দিয়া, কেবল একমাত্র জমা খরচের বিপুল প্রয়োজন দৃষ্ট হয়;—যেমন দেবে তেমনি পাবে, যেমন পাবে তেমনি দেবে। ইহা হইলে এ জগতে আর নিঃস্বার্থ মহত্বের অস্তিত্ব এবং আবশ্যক থাকে না; কারণ মহত্বের এখানে অবলম্বন-স্থল কোথায়?—অবলম্বন ব্যতীত কোন পদার্থ এ স্থূল জগতে তিষ্ঠিতে পারে না। মহত্বের দরকার নাই! তাহা যেন হইল, কিন্তু তথাচ আমরা দেখিতেছি, মহত্ব ব্যতীত এ জগৎ একদিনও তিষ্ঠে না। সুতরাং কাজেই বলিতে হইবে যে, কথিত লোকনীতির মূল অলীক এবং অকিঞ্চিৎকর; অতএব উহা লইয়াও সময় অপব্যয় করিবার আবশ্যক নাই।

আমরা দেখিতে পাইতেছি, যে লোক যেমন অবস্থায় পতিত, তাহার লোকযাত্রা বিধানও সেইরূপ। যে কথা লোকবিশেষে প্রযুক্ত, জাতিবিশেষ এবং সমগ্র মানবজাতির পক্ষেও সেই কথা প্রযুক্ত হইতে পারে। যে যেমন কর্ম্মক্ষেত্রে পতিত হইয়াছে,তাহার লোকযাত্রাবিধান ও লোকনীতিও সেই কর্ম্মক্ষেত্রের উপযোগী হইবার জন্য, সেইরূপ আকার ধারণ করিয়াছে। সমগ্র মানব এক-প্রকৃতি, তাহার উপর আবার বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন-প্রকৃতি; আবার জাতির মধ্যেও বিভিন্ন সমাজ, বিভিন্ন মানব, আরও বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকৃতির দৃষ্ট হয়। ঐশ্বরিক একই কার্য্য-বিশেষ, এবং তাহার আবার পর্য্যায়, অংশ, কলা প্রভৃতি সাধনের নিমিত্ত,

মানব-সৃষ্টিতে একত্বের উপর এরূপ প্রকৃতি-বিভিন্নতা সৃষ্ট। এই নিমিত্ত মানবসাধারণ, জাতিবিশেষ, সমাজবিশেষ এবং ব্যক্তিবিশেষ, এরূপ সাধারণ এবং বিশেষ ভেদ অনুসারে, এ জগতে মূলনীতির একতা ও বিশেষ নীতির বিভিন্নতা সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বাঞ্ছারাম, দেখ এখানে, একত্ব এবং বহুত্বে কেমন চমৎকার সমাবেশ এবং কেমন চমৎকার সংমিলন! এখন বুঝিলে, লোকনীতি কেবল আমাদের মনের কল্পনা; কেবল আমাদের যুক্তি-সম্ভূত প্রয়োজন হইতে উৎপন্ন হয় নাই; উহাও সর্ব্ব-উৎসের উৎস-নিঃসৃত বিষয়, মানবের উহাতে কোন হাত নাই। উহাও কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মসূত্র বশে উদ্ভূত; আমাদের দ্বারা নির্ম্মিত হইবার বিষয় নহে, তবে মানবসহ সম্বন্ধযুক্ত অপরাপর বিষয়ের ন্যায় সংস্কার প্রাপ্ত হইবার বিষয় বটে।

যে কিছু আচরণসমূহ মানবকে ইহলোকে পরিবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে তৎতাবতেরই উন্নত অবনত, উৎকর্ষ অপকর্ষ ভাব, মানবীয় আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নত অবনত, উৎকর্ষ অপকর্ষ ভাবের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। এই লোকনীতিও সে নিয়মের বহির্ভূত নহে। কি ব্যক্তিগত কি জাতিগত, যখনকার আধ্যাত্মিক জীবন যেরূপ উৎকর্ষ বা অপকর্ষ ভাবযুক্ত, তাহাদের লোকনীতিও সেইরূপ উৎকর্ষ বা অপকর্ষ ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। আধ্যাত্মিক জীবন যে পর্য্যায়ে আছে, লোকনীতি যদি সে সময়ে নিম্ন পর্য্যায়ের দেওয়া যায়, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবে আধ্যাত্মিক জীবন তাহাকে সংস্কৃত করিয়া এবং স্বানুরূপ করিয়া লইয়া, নিজ পর্য্যায়ে উঠাইয়া লইবে; আবার লোকনীতি যদি উচ্চ পর্য্যায়ের দেওয়া যায়, তবে সেইরূপ নিশ্চয় ভাবে তাহার অপকর্ষ সাধন পূর্ব্বক আপন পর্য্যায়ে নামাইয়া লইবে। অতএব লোকনীতির উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে, কেবল বহিঃসংস্কার অবলম্বনে কোন ফল হয় না; সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃসংস্কার, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষই প্রধানত অবলম্বনীয়। লোকনীতির পবিত্রতা বা দুষ্টভাব, সুরুচির বা কুরুচির ভাব, ন্যূন বা অতিরেক ভাব, কর্ম্মক্ষম বা কর্ম্মধ্বংসী ভাব, উহাও আধ্যাত্মিক জীবনের তৎ তৎ ভাবের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। অতএব লোকনীতিও

সম্পূর্ণরূপে জাতীয় উৎকর্ষ অপকর্ষ, জাতি ও প্রকৃতির পরিচায়ক স্বরূপ হয়।

লোকনীতির নিয়ামক যাহা, তাহা আমরা যথাযথ দেখিয়া আসিলাম; এক্ষণে তাহার প্রবর্ত্তক যাহা তাহার অনুসন্ধান করা যাউক। আমাদের সমধিক নিকট সম্বন্ধ, যাহা প্রবর্ত্তক তাহার সঙ্গে; অতএব তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য, কারণ তাহার উপর আমাদিগের কি লৌকিক, কি পারলৌকিক, উভয়বিধ শুভ শুভ নির্ভর করিয়া থাকে। লোকনীতির ফলে সাংসারিক জীবন এবং লোকযাত্রা। যে লোকনীতি সাত্ত্বিক, যাহার কার্য্যফল প্রকৃতির অনুকূলে সুতরাং এ সংসারে কার্য্যকরী; এবং যাহার সেই কার্য্যফল ভূতকালকে পদস্থাপক করিয়া ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত শুভদায়করূপে প্রসারিত এবং অপর ভাবী কার্য্যফলের ভিত্তিস্বরূপ হইতে পারে; তাহা এই দ্বিবিধ মূল হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে;—এক ঈশ্বরকৃত কর্ম্ম নিয়োজন বোধ, অপর মনুষ্যকৃত কর্ম্ম নিয়োজন বোধ। ইহার অতীতে আরও একটী তৃতীয় আছে, উহা সারশূন্য মিথ্যা সামাজিক নিয়োজন। পূর্ব্বকথিত দুইটী নিয়োজনের বিষয় বলার পূর্ব্বে, তৃতীয়বিধ নিয়োজনের পক্ষে যাহা কিছু বলিবার আছে, তাহা আগে বলিয়া শেষ করিব।

পরগাছা স্বরূপ এই তৃতীয় নিয়োজন, বস্তুত পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ নিয়োজনের ছদ্ম ভাব হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে; অতএব এ মূলকে মিথ্যা সামাজিক নিয়োজন না বলিয়া, শয়তানী বা মহাপ্রলয়-নিয়োজন বলিলেই সঙ্গত হয়। এই শয়তানী তৃতীয় মূল, জাতীয় জীবনের অধঃপতন অবস্থা বা এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর পরিগ্রহের প্রাক্কালে অবলম্বিত হইয়া থাকে। এই সময়টী তদ্রূপ অধঃপতিত জাতীয় জীবনের পক্ষে কলিযুগ স্বরূপ। এ সময়ে ধর্ম্ম যথার্থতই ভগ্ন-ত্রিপদ, পয়স্বিনী বসুন্ধরা খিদ্যমানা, দেবদল নিদ্রিত; একমাত্র পাপাশয় কলি সমস্ত জগৎ মথিত করিয়া ফিরিয়া বেড়ায়। ঊর্দ্ধে অধে পার্শ্বে, চতুর্দ্দিকে মানবের স-আশ-দৃষ্টিস্থলে কেবল একমাত্র শূন্যপাত। প্রতি সহচর তখন মেফিষ্টফিলির অবতার। ফষ্টকে বিভ্রমপাতিত করিতে এক মেফিষ্টফিলিতে রক্ষা ছিল না; কিন্তু এখানে

প্রতি সামান্যপ্রাণ মানবকে ঘূর্ণাচক্রে ফেলিতে, শত শত মেফিষ্টফিলি নিয়ত দণ্ডায়মান। এ সময়ে দেবগুরুর প্রতি ভক্তি হ্রাস হয়, মানবসকল পরস্পরসমক্ষে জ্যেষ্ঠত্ব অবলম্বন করে, সর্ব্বপরিচালক জ্ঞান সন্দেহের বিষয়ীভূত হইয়া দাঁড়ায়, আভ্যন্তরীণ বিশ্বাস এবং অবলম্বন মানবের কোন বিষয়েই থাকে না; সুতরাং সমাজমধ্যে সাত্বিকবুদ্ধিযুক্ত সুপরিচালকের সর্ব্বত্র অভাব হইয়া থাকে। এ সময়ের পরিচালকস্থলে, একমাত্র বঙ্গসন্তানের চিরপ্রসিদ্ধ "পাঁচজন" আসিয়া দাঁড়ায়; লোকে একক কোন ব্যক্তিকে গুরু বলিতে অস্বীকার, অথচ "পাঁচ জনের" দাসানুদাস। সেই "পাঁচজনের" নিকট বাহিরে আত্মপ্রকৃতি বলিপ্রদান, অন্য দিকে ভিতরে আত্মতুষ্টির পূরণ, ইহাই পরম পুরুষার্থ রূপে স্থিরীকৃত হয়। "পাঁচজনের" যাহা রুচিকর তাহা কর্ত্তব্য, "পাঁচজনের" যাহা অরুচিকর তাহা অকর্ত্তব্য; অথচ এ বিবেচনাশূন্য যে, তাহাদেরই মত সারবান ব্যক্তি লইয়া সেই "পাঁচজন" সংঘটিত। একজন, বা একজন একজন লইয়া, পাঁচজন। কালধর্ম্মে সকলেরই নীতি কণ্ঠগত; সুতরাং দূরদর্শনশূন্য;—অন্তর্দর্শন দূরদর্শনের নিদান। দর্শন অভাবে মানব অন্ধ; এবং অন্ধ প্রায়ই খানা ডোবায় পড়িয়া প্রাণ হারাইয়া থাকে। আমাদের ভারতে এখন এই তৃতীয় মূল-প্রবর্ত্তিত লোকনীতির রাজত্ব।

প্রথমোক্ত অর্থাৎ ঈশ্বরকৃত নিয়োজন-বোধ-রূপী যে নীতিমূল, বলা বাহুল্য যে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ। ইহার মূলস্থানে দিব্য স্বার্থ, ইহার শাসনে মনুষ্যের সাত্বিক ভাবে আত্মপ্রকৃতিবান হওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। মনুষ্য ইহার শাসনে নীতিবান হইয়া থাকে এই ভাবিয়া যে, 'আমার এ নীতি ঈশ্বর কর্ত্তৃক আদিষ্ট; যে কার্য্যরাশি সম্পাদন করিবার নিমিত্ত আমার কর্ম্মভূমি পৃথিবীতে আগতি, ইহাও তাহার মধ্যে একটী অবশ্য করণীয়; সুতরাং ইহার সুসম্পাদন বা কুসম্পাদনের উপর আমার ভাবী জীবন প্রবাহ এবং তদূর্দ্ধে আমার ঈশ্বরের রোষ বা তোষ প্রাপ্তি নির্ভর করিয়া থাকে। লোক বা সমাজ প্রায় অনেক সময়েই অন্ধ, কখনও ন্যায়কে অন্যায়, অন্যায়কে ন্যায় করিয়া থাকে; অতএব তাহার সুখ্যাতি বা অখ্যাতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ফল কি? বিশেষ

সমাজের সঙ্গে কেবল জীবনান্ত মাত্র সম্বন্ধ, কিন্তু আদিষ্ট কার্য্য যাহার তাহার সহ সম্বন্ধ অনন্ত; পুনশ্চ কার্যসাধনে জীবনান্ত যথায় পণ, এবং জীবনই যথন তদুদ্দেশে, তথন সমাজের সুখ্যাতি বা অখ্যাতি দৃষ্টে রতি বা বিরতির বিষয় কি? সমাজ যথন আমার ন্যায় অনুরূপ বুদ্ধিযুক্ত হইবে, তথন সমাজের সঙ্গে আমার আপনা হইতেই মিলিবে; বা যে পরিমাণে হইবে, সেই পরিমাণে মিলিবে।' সুপথে ত্যাগস্বীকারের আবশ্যক হয় না। সমাজও কর্ত্তব্যবুদ্ধিযুক্ত সাত্ত্বিকপ্রকৃতি হইলে সমাজস্থগণের পরস্পরের মধ্যে অমিল ঘটে না। এই জগৎ যাহাদিগের দ্বারা এ পর্য্যন্ত স্থায়ী ভাবে উপকৃত হইয়া আসিয়াছে, সেই সমস্ত মহামহোপাধ্যায়েরই নীতি এবং কর্ম্ম মূল এই ঈশ্বরকৃত নিয়োজন বোধ। খৃষ্ট, বুদ্ধ, মহম্মদাদি ইহার উচ্চতম আদর্শ। মানবমণ্ডলীতে ইহাদের অপেক্ষা উচ্চতম আদর্শ আজি পর্য্যন্ত প্রদত্ত হয় নাই।

দ্বিতীয় মনুষ্য বা সমাজকৃত নিয়োজন বোধ। ইহার মূল স্থানে পার্থিব স্বার্থ। এই স্বার্থকে যতদূর ফাঁপাইতে পারা যায় তাহা ফাঁপাইয়া ছত্রাকার রূপে বিস্তীর্ণ করায় এত সূক্ষ্ম হইয়া গিয়াছে যে, তাহার আবরণ ভেদ করিয়া সামাজিকতা প্রকৃষ্টরূপে দৃষ্ট হইতে থাকায়, সে স্বার্থ সহসা আর স্বার্থরূপে অনুভূত হয় না; সহজ দৃষ্টিতে লোকে তাহাকে শুদ্ধ-সামাজিকতা জ্ঞানে, ভ্রমে পতিত হয় ও তদ্রূপ উল্লেখে আপন কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্যের ন্যায় ও নিঃস্বার্থতা পক্ষে কৈফিয়ৎ দিয়া থাকে। প্রথমোক্ত মূলের নিয়ম ঈশ্বরপ্রীতি এবং সেই প্রীতিবর্দ্ধক পদার্থ জন্য যে স্বার্থ তাহা ব্যতীত অন্য তাবৎ নীচ পার্থিব স্বার্থত্যাগ। কিন্তু এ দ্বিতীয় মূলের নিয়মে পার্থিব স্বার্থই সর্ব্বস্ব। "যদি তোমার আপনাতে হিত ব্যবহারের বাঞ্ছা থাকে, তবে যথাসাধ্য পরহিত সাধনে ব্রতী হও;"—অথবা "যেরূপ আপনাতে কৃত হইতে বাঞ্ছা কর, সেইরূপ অন্যের প্রতি করিও;"—এ নীতিগুলির প্রভুত্বও এখানে বিপুল। এই দ্বিতীয় প্রকারের নিয়োজনে, সাত্ত্বিকতার অভাব না হইলেও, মূল স্থানে সদাসঙ্গের বহুল অভাব; এই জন্য ইহার ধারণা বিস্তৃত হইলেও উদ্দেশ্য পক্ষে অপেক্ষাকৃত অসম্পূর্ণ ও অপরিণামদর্শী, এবং ফলেও সর্ব্বদা সুফলপ্রদ হয় না,

প্রভৃত অধিক বাড়াবাড়িতে সমাজ উচ্ছৃঙ্খলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পার্থিব স্বার্থ সর্ব্ব অনর্থের মূল: সমাজও ঐশ্বরিক সত্তার প্রতিভাসে যদিও নির্ম্মিত, তথাপি তাহা কখন ঐশ্বরিক সত্তার অনুরূপ শুদ্ধ-ভাবাপন্ন হইতে পারে না। এমন স্থলে, মানব সুমতিযুক্ত হইলেও, যদি সে এই পার্থিব স্বার্থের প্রভূত পরিমাণে সংস্রবে আইসে, এবং কেবলমাত্র সমাজকে সংসারস্থলে যদি নিজের নিয়োজক করিয়া মানে, তবে কখনই তাহার সে নীতিতে সর্ব্বদা সুফল প্রসব করিবে না; বরং তাহার অধিক বাড়াবাড়িতে সমাজ বিশৃঙ্খল হইয়া যাইবে। যাহা হউক তথাপি ইহার মধ্যে, সুমতি এবং সমাজনিহিত ঐশ্বরিক সত্তা-প্রতিভাসের শাসন থাকায়, এ মূলোৎপন্ন নীতি এবং কার্য্য একেবারে বিফলে যায় না। এ নীতিমূল প্রথমোক্ত নীতিমূলের নিম্ন পর্য্যায়ে। বেশী বাড়াবাড়ি না করিলে, এ মূল ধরিয়াও একরূপ মন্দ চলে না; ইহা অন্তত মন্দের ভাল, —উপরে কথিত তৃতীয় নীতিমূল অপেক্ষা ভাল। ইহার শাসনে লোকে কার্য্য করিয়া থাকে এই ভাবিয়া যে, 'এ কার্য্য সামাজিক হিতে আরব্ধ; সামাজিক হিতে আমার হিত, সুতরাং ইহার সুসম্পাদন বা কুসম্পাদনের উপর আমার হিতাহিত সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকে।' এক্ষণে উপরোক্ত ত্রিবিধ নীতিমূলের প্রভেদ এই:—প্রথম মূলের লক্ষণ, সাত্ত্বিক মতি, ঈশ্বরপ্রীতি, দিব্য স্বার্থ বা চলিত কথায় নিঃস্বার্থ ভাব; দ্বিতীয় মূলের লক্ষণ, সাত্ত্বিকমতি, সমাজপ্রীতি, পার্থিব স্বার্থ; তৃতীয় মূলের লক্ষণ, অসাত্ত্বিকমতি, পাঁচজনপ্রীতি, নীচ পার্থিব স্বার্থ বা চলিত কথায় আত্মম্ভরিতা। এক্ষণে আমরা গ্রীক এবং হিন্দুর নীতিমূল, সাংসারিক জীবন এবং লোকযাত্রার বিষয় যথাযথ আলোচনা করিব।

লোকনীতির প্রথমোক্ত যে দ্বিবিধ মূলের বিষয় কথিত হইল, তাহার মধ্যে প্রথমটী, অর্থাৎ যাহা ঈশ্বরকৃত নিয়োজন বলিয়া উক্ত, তাহা প্রাচীন হিন্দুদিগের অবলম্বন; আর দ্বিতীয়টী, যাহা সমাজকৃত নিয়োজন বলিয়া উক্ত, তাহা গ্রীকদিগের। উভয়েরই এই এই নিয়োজন স্ব স্ব কর্ম্মক্ষেত্রস্থ তাৎকালিকী কর্ম্মরাশি সমুৎপাদনের উপযোগী। কোন একটী উদ্দেশ্যভূত বিষয় নির্ম্মাণ করিতে হইলে, অগ্রে তাহার এক একটী উপকরণ পদার্থ

পৃথক রূপে আয়োজন ও নির্ম্মাণ করিয়া আনিতে হয়। উত্তর কালীন মহত্তর জাতীয় সমিতির উপকরণ পদার্থস্বরূপ হিন্দু এবং গ্রীক চরিত্র, সেইরূপ পৃথক রূপে এবং পৃথক ভাবে নির্ম্মিত হইবার আবশ্যকতা হেতুই, বোধ করি তাহাদের তৎ তৎ নিয়োজন তাহাদের পক্ষে উপযোগী স্বরূপ হইয়াছিল। হিন্দুর লোকনীতির উদ্দেশ্য ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করণ, লোকেও যদি তাহাতে সন্তুষ্ট হইল ভালই; যদি না হয় তবে লোকের দোষ, এবং সেই দোষে সন্তোষ উৎপাদন করিতে প্রয়াস পাওয়া দুষ্টের কার্য্য। গ্রীকের লোকনীতির উদ্দেশ্য লোককে সন্তুষ্ট করণ, ইহাতে যদি দেবতারা কোন অংশে সন্তুষ্ট না হন, তবে সে দেবতাদের দোষ; সে দোষে সন্তোষ উৎপাদন করিতে যাওয়া বাতুলের কার্য্য, যেহেতু দেবকর্তৃক অহিত অনিশ্চিত, কিন্তু লোক কর্তৃক যে অহিত তাহা নিশ্চিত এবং হাতে হাতে তাহার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাংসারিক জীবনে হিন্দু সভয় সভক্তিচিত্ত, যাহা কিছু আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ দেখিতেছেন তাহারই সন্তোষার্থে বিনত হইয়া পড়িতেছেন; এবং উন্নত বিনতই জগতের নিয়ম দেখিয়া, অন্য দিকে আবার বিনতের উপর তেমনি বিষম আধিপত্য করিতেছেন। আর গ্রীক আত্মবোধবিশিষ্ট সমত্ব-বিকশিত-উদারচিত্ত, সকলকেই সমকক্ষরূপে গ্রহণ করিয়া, সপ্রেম ব্যবহার বা সমশাত্রবভাব প্রদর্শন করিতেছেন। হিন্দুর যেখানে ভক্তি, গ্রীকের সেখানে ভদ্রতা; হিন্দুর যেখানে বিনয়, গ্রীকের সেখানে মিষ্টভাব; হিন্দুর যেখানে ক্ষমা, গ্রীকের সেখানে নিষ্ঠুরতা; হিন্দুর যেখানে নৈতিকতা, গ্রীকের সেখানে পাষণ্ডতা; হিন্দু যেখানে বুদ্ধিমান, গ্রীক সেখানে গোঁয়ার; হিন্দুর যেখানে করুণা, গ্রীকের সেখানে ঘৃণা; হিন্দু যেখানে সঙ্কুচিত, গ্রীক সেখানে স্ফূর্ত্তিমান; হিন্দুর যেখানে অত্যাচার, গ্রীকের সেখানে শত্রুতা; হিন্দু যেখানে হস্তপ্রসারণে কুণ্ঠিত, গ্রীক সেখানে সপ্রতিভ রাজরাজেশ্বর গৃহপতি সদৃশ। ইহাই হিন্দু এবং গ্রীকের সাংসারিক বা লোকনীতি বিষয়ে ভাবপ্রভেদ।

হিন্দুর কর্ম্মমূল ও নিয়োজনবোধ ভাল বটে সন্দেহ নাই, কিন্তু সাংসারিক ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধিতে দেখিতে গেলে ফল তেমন লোভনীয় নহে, যেমন

গ্রীকের নিয়োজনবোধের অপকর্ষতা সত্ত্বেও লোভনীয় হইয়াছে। তাহার কারণ আছে। নিয়োজনবোধে অনেক করিয়া তুলিতে পারে বটে, কিন্তু সকল নহে। নিয়োজনবোধ সৎ হইলে কেবল এই পর্য্যন্ত করিতে পারে যে, কার্য্যটী সৎ ও সাত্ত্বিক ভাবে তাহা সম্পাদিত হইয়াছে। কিন্তু কার্য্যটী কিরূপ প্রকৃতির, মহৎ কি ক্ষুদ্র, ও তাহার ব্যাপকতা কতদূর, তাহা নিয়োজনবোধের বিষয়ীভূত নহে; তাহা আত্মজ্ঞানের বিষয়ীভূত। সেই আত্মজ্ঞান যাহার যে প্রকারের হইবে, তাহার কার্য্য-ধারণাও সেই প্রকারের হইয়া থাকে। হিন্দু ভুলিয়াছিলেন যে তাঁহার জীবাত্মাও যে ঈশ্বরের সৃষ্টি, সেই জীবাত্মার পালক এই লোকসমাজও সেই ঈশ্বরের সৃষ্টি; সুতরাং উভয়ই সমান যত্নের এবং উভয়েরই প্রতি সমান আগ্রহ হওয়া উচিত। এই নিমিত্ত ইহাঁরা আত্মিক নীতিতে যদিও নিপুণতাশূন্য নহেন কিন্তু লোকনীতিতে ইহাদের চিন্তাশূন্য খেয়ালের ভাগ বেশী; অযথা ক্ষমাবান ও বিনীতস্বভাব হেতু ইহাঁদের সংসারধর্ম্ম পরিমাণের অতিরিক্ত হিতরত ও বিনয়পূর্ণ এবং এতদুভয়ের ফলস্বরূপ সঙ্কীর্ণতাময়। গ্রীক আত্মিকনীতি বড় একটা বুঝিতেন না ও তাহার ধার ধারিতেন না; লোকনীতি বুঝিতেন ভাল। মূল দুষ্ট হইলেও, লোকনীতির ফল প্রত্যক্ষ হওয়ায়, অনুসৃত বিষয়ে কতকটা ভালরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন। ইহাঁদের লোক-নীতি সঙ্কীর্ণতা দূরে থাকুক, সীমা ছাড়াইয়া অতিরেক ভাবে গিয়া পৌঁছিয়াছে। একের অতিরেক ভাব, অপরের ন্যূনতা, সুতরাং উভয়েই অংশত দুষ্ট। হিন্দুর দুষ্ট ভাব ধারণার সঙ্কীর্ণতা হেতু; গ্রীকের দুষ্ট ভাব মূলের দুষ্টতা ও ধারণার অতিরেক ভাব হেতু। যথায় দুষ্ট ভাবের এই সকল কারণ বিদূরিত হইয়া সামঞ্জস্য সাধন হইবে, তথায়ই জানিবে লোকনীতি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়া জগতে শোভা বিস্তার করিতে থাকিবে। ভারতসন্তান, এই উভয় জাতীয় সংমিলনে তোমার পক্ষে তাহাই কর্ত্তব্য হইতেছে; ইহাতেই তুমি প্রতিষ্ঠা-লাভে সমর্থ হইতে পারিবে।

পুনশ্চ দ্বিতীয় প্রকার নিয়োজনবোধের অনুসরণে লোকহিত এই

দ্বিবিধ প্রকার প্রবৃত্তিমার্গে সুসাধিত হইয়া থাকে; এক এই, জাতীয় হিতে সমাজের হিত ও সমাজের হিতে আমার হিত; অপর এই, আমার হিতে সমাজের হিত, সমাজের হিতে জাতীয় হিত। প্রথমটীর জাতীয় হিতই নিকট-সম্বন্ধ, অপরটীর তদ্বিপরীতে আত্মহিত নিকট-সম্বন্ধ হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে এই দ্বিবিধ প্রবৃত্তিমার্গের মধ্যে, প্রথমটীই প্রশস্ত ও শ্রদ্ধার জিনিস; দ্বিতীয়টী সেরূপ নহে। গ্রীকের অবলম্বন এই প্রথম প্রকারের প্রবৃত্তিমার্গ,—জাতীয় হিতে তাহার হিত। এই জন্য গ্রীকের নিকট জাতীয় হিত এবং গৌরব এ সংসারে কণ্ঠহার, সর্ব্বাপেক্ষা লোভনীয় পদার্থ, যে কোন বায়ে হউক তাহার সংসাধন কর্ত্তব্য; এবং এই জন্যই গ্রীকদিগের জাতীয়ত্বে সৌভাগ্য গৌরব এত অধিক। হিন্দুর নিয়োজনবোধ যাহা, তাহার আর প্রবৃত্তিমার্গ দ্বিবিধ হইতে পারে না; যেহেতু উহা ঐশ্বরিক নিয়মের সত্তা, সুতরাং উহার একই প্রবৃত্তিমার্গ নিত্য নিয়ম। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, কর্ম্ম-ধারণাভাবের সঙ্কীর্ণতা হেতু তাহা প্রস্ফুটিত হইতে পায় নাই, ও শোভাও সুতরাং তাদৃক বাহির হয় নাই। তবে যে ইঁহারা স্বীয় বুদ্ধির দৌড় অনুসারে কতদূর ধাবিত হইতে সমর্থ ছিলেন, এবং কতদূর ফলাকাঙ্ক্ষা ও স্বার্থ ত্যাগী, তাহা একবার ভিক্ষোপজীবী অরণ্যবাসী ব্রাহ্মণদিগের প্রতি দৃষ্টি করিয়া অনুভব করিয়া লও। ইঁহারা অরণ্যমধ্যে পর্ণকুটীরে বাস করিয়া, গাছের বল্কল পরিয়া, মুষ্টিভিক্ষালব্ধ অন্নে উদর পালিয়া, যাহা করিয়া গিয়াছেন; স্মৃতি-বহির্ভূত সময় হইতে এ পর্য্যন্ত তাহারই প্রভাবে হিন্দুসমাজ পরিচালিত হইয়া আসিয়াছে। এবং আজি পর্য্যন্ত যে আমরা সিংহের বংশ বলিয়া বিজাতীয়দিগের নিকট গৌরব করিয়া থাকি, এবং বিজাতীয়েরাও যে আমাদের প্রাচীন অবস্থার খাতিরে এখন আমাদিগকে গৌরব করিতে শিখাইতেছেন, তাহাও সেই ভিক্ষুকদিগের প্রসাদাৎ। অনেকে মুখে বলিয়া থাকে, ব্রাহ্মণেরা অযথা আপন গণ্ডা চাহিয়া আত্মস্বার্থে দেশ উৎসন্ন দিয়া গিয়াছেন; এবং আপন স্বার্থ ধনের জন্য অযথা ক্রিয়াকলাপের বিস্তার করিয়াছেন। বস্তুতই মূর্খ ভিন্ন, জ্ঞান-অন্ধ ভিন্ন, আর কেহ এরূপ বলে না। ব্রাহ্মণে বিলাসপ্রিয়

হইলে পতিত হইবে বলিয়া যথায় বিধানিত; এবং ক্রিয়াকলাপ সহস্র গুণে বৃদ্ধি হইলেও যাহাদের প্রাপ্য অংশ কেবল কিঞ্চিৎ আতপ চাউল ও দুই কাঁচকলা ভিন্ন কিছুই নহে, বাপু বাঞ্ছারাম, বলিতে পার তথায় আত্মস্বার্থের অস্তিত্ব কোন জায়গায়? মুষ্টি ভিক্ষা, গাছের বল্কল এবং গাছের তলায় এমন কোন স্বার্থ যাইয়া আশ্রয় লইতে পারে, যাহাতে তোমার, তোমার বংশাবলীর এবং তোমার জাতির সর্ব্বস্ব হৃত হওয়ার সম্ভব?

"কোধর্ম্মঃ কশ্চ দেবেতি কিং কর্ম্মেতি তথাপরে,
বদন্তি দুর্জ্জনা মূঢ়াঃ ব্রহ্মহিংসাপরায়ণাঃ।"

মহতের অবমাননাই শয়তানী সময়ের প্রথম লক্ষণ। পিতৃপুরুষগণ, তোমাদিগের প্রতি ভক্তির দিন এখনও অনেক দূরে! ব্রাহ্মণগণ আত্মকৃত সমাজের প্রতি আপনি এক সময়ে অনিষ্টকর হইয়াছিলেন বটে কিন্তু সে কেবল অর্থাদি স্বার্থবশে নহে, শাস্ত্রজ্ঞানের সঙ্কীর্ণতা ও তদুৎপন্ন ভ্রমান্ধতা হেতু; এবং তাহাও, যখন পার্শ্বস্থ মানবগণের অবাধ্যভাবোৎপন্ন মূর্খতার স্পর্শে ভ্রমান্ধকার আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। যাহা হউক, তথাপি ব্রাহ্মণেরা যাহা করিয়া গিয়াছেন, বাঞ্ছারাম, তন্নিমিত্ত তাঁহাদিগের নিকট এখনও সভক্তি-বিনত হও; এবং কৃতজ্ঞতা ধর্ম্ম এখনও যদি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া না থাকে, তাহা হইলে তোমার ইংরাজীনবিশী ক্ষণকালের নিমিত্ত তফাৎ করিয়া, সেই ব্রাহ্মণের সন্ততিবর্গকে তাহাদের উত্তরাধিকার স্বরূপে সেই ভক্তির অংশ এখনও কিঞ্চিৎ প্রদান করিও;—ব্রাহ্মণ-দেবত্বের প্রতি নহে, ব্রাহ্মণ-মনুষ্যত্বের প্রতি। ভারতে ব্রাহ্মণেরা যাহা করিয়া গিয়াছেন, জাগতিক ইতিহাসের কোন অংশেই তাহার তুলনা নাই।

যাহা হউক, হিন্দুদিগের নিঃস্বার্থ লোকহিতকর কার্য্য যাহা কিছু কৃত, তাহা যে কোন বিশেষ উদ্দিষ্ট হিতের ধারাবাহিক পর পর ক্রম সংসাধন করিয়া আসিবে বলিয়া কৃত, তাহা নহে। ধারণার সঙ্কীর্ণতা ইহার প্রধান কারণ। ইহাঁদের ধারণার প্রধান ত্রুটি এই যে, সমগ্রের সহিত ইহাঁরা আপন সম্বন্ধ দেখিতে পাইতেন না; সমগ্র বিশ্লেষণ করিলে খণ্ড এবং খণ্ড সমষ্টি করিলে সমগ্র, এ কথা তাঁহারা বুঝিতেন না;

সুতরাং স্বয়ং খণ্ড ভাবে কার্য্য করিব অথচ সে কার্য্য সমগ্র সহ বাঁধিবে, ইহা ঘটিয়া উঠে নাই। তাবৎ বিষয়কে ইহাঁরা খণ্ডমূর্ত্তিরূপে অবলোকন করিতেন। ইহাঁরা যেমন ভাবিতেন যে, এই যে হিত কার্য্য আমি করিতেছি তাহা ঔর্দ্ধদেশিক নিয়োজন অনুসারে; তেমনি ইহাও ভাবিতেন যে, আমার নিয়োজন মত কার্য্য আমি করিয়া যাই, তাহাতে তোমার ধারাবাহিক কোন শ্রেণী বা গঠন নিবদ্ধ হয় ভালই, না হয় নাই। অতএব ইহাঁরা খণ্ড মূর্ত্তিকেই সর্ব্বস্ব ভাবিতেন, সমাজের ভিতরে থাকিয়াও সমাজকে দেখিতে পাইতেন না, দেখিতে পাইতেন কেবল আপনাকে ও ঈশ্বরকে। হায়! সত্য সত্যই হস্তী আপন অবয়ব দেখিতে পায় না! দেখিতে পাইলে কি না করিতে পারিত! অতঃপর হিন্দু এবং গ্রীকের সাংসারিক কার্য্য ও লোকনীতি বিশ্লেষণ করিলে, এরূপ রূপক রচনা করিতে পারা যায়। একজন মুক্তারাশি উপার্জ্জন করিয়াছে মালা গাঁথিবার খাতিরে এবং মালা গাঁথিয়াছে; আর সেই উপার্জ্জন আর একজন করিয়াছে কেবল সেই মুক্তারই খাতিরে, আসবাবের ন্যায় বা সেকেলে গল্পের বাদসাহি চুর্ণ করিবার খাতিরে, সুতরাং উপার্জ্জনান্তে তাহা পরিত্যক্ত বা পতিত রহিয়াছে। কেনা বলিবে যে যদৃচ্ছাবিক্ষপ্ত মুক্তারাশি হইতে মুক্তার মালা অধিক শোভাকর। গ্রীকের লোকহিত সেই মুক্তামালায় দাঁড়াইয়াছে; আর হিন্দুর তদ্রূপ শত শত মালার উপযুক্ত মুক্তারাশি, এমন কি অপেক্ষাকৃত বহুমূল্য মুক্তারাশি, স্তূপীকৃত পড়িয়া রহিয়াছে, সুযোগ পাইলেই এক একটী করিয়া ইন্দুর ছুঁচো আদিতে হরণ করিয়া লইয়া যাইবে। কি পরিতাপ! ভারতসন্তান, দেখ দেখি তোমার মুক্তা দাঁতে ধরিয়া, ছুঁচোর ছুঁচোমি-আস্ফালন কি অসহনীয় হইয়া উঠিতেছে! আর তুমি? হেলায় রত্নরাশি হারাইয়া, মাথায় হাত দিয়া পথে বসিয়া কাঁদিতেছ!

হিন্দুসন্তান জানিতেন যে, ব্যক্তিগত হউক আর জাতিগতই হউক, মানবের যে সাংসারিক জীবন, তাহা যখন এত ক্ষণস্থায়ী, তখন আবার তাহার মূল্যই বা কি; তাহার হিসাব রাখা রাখিই বা কি। কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়াছি, কর্ম্ম করিতেছি; ইহা বিদেশ ও বাসা বাড়ী। কর্ম্ম শেষ

হইলেই যখন বাড়ী যাইতে হইবে, তখন বাসাবাড়ীকে বালাখানা, ও বিদেশীয়কে প্রাণের কুটুম্ব কে করিয়া থাকে, ও তাহার জন্য পাগলই বা কে হয়?—সেই কেবল করিতে পারে, যাহার অর্থ রাখিবার আর জায়গা নাই, বা যে উপার্জ্জনের উদ্দেশ্য ভুলিয়া কেবল লোকের কথায় মজিয়া বেড়ায়। বিশেষ বিদেশে মান কেনার অপেক্ষা, দেশে মান কেনা শ্রেয়ঃ; সুতরাং দেশে যাইয়া যাহাতে তাহা সিদ্ধ হইতে পারে, এজন্য যতদিন বিদেশে থাকিতে হইবে, ততদিন এদিক ওদিক না ভুলিয়া, কোন-রূপে শরীর ধারণ পূর্ব্বক সেইরূপ উপার্জ্জন করাই শ্রেয়ঃ। হিন্দুসন্তান, পৃথিবী-প্রবাস দূরে থাকুক, সামান্য বিষয় কার্য্যোপলক্ষে সামান্য বিদেশ-প্রবাসী হইলেও, প্রবাস স্থান সম্বন্ধে, জাতীয় আত্মিক স্বভাবের ছায়ায় আজি পর্য্যন্ত অবিকল এইরূপ ভাবিয়া থাকেন; এবং মলমূত্র মধ্যে কুঁড়ে ঘরে কোন রকমে ছেঁড়া কাঁথা জড়াইয়া কাল কাটাইয়া দেন। প্রবাস-ক্ষেত্রেও, প্রাচ্য প্রবাসী ও পাশ্চাত্য প্রবাসীর কত প্রভেদ; পাশ্চাত্য প্রবাসী যেখানে যায় সেখানেই আড়ম্বর ও আসবাবের ঘটা, যেন কত কালের ঘর বাড়ী এবং কত পুরুষ তথায় কাটিয়া যাইবে;—অথচ কিন্তু একটু রসদের রস ঘুচিলেই, ভিক্ষার ঝুলি হাতে করিতে হয়। ছি, এটী নিতান্ত অপরিণামদর্শিতা হইলেও, তবু ছেঁড়া কাঁথা জড়ানর চেয়ে দেখায় ভাল! আরিষ্টটলের ধরণে বলিতে গেলে, যথার্থ ভাল তখন হয় যখন ছেঁড়া কাঁথা ও আড়ম্বর এতদুভয়ের মধ্য পথ অবলম্বিত হইয়া থাকে। হিন্দুসন্তানের মুখ্য উদ্দেশ্য যাহা, এবং কর্ম্মধারণা যতদূর, তদনুসারে সংসার মদে না মাতিয়া ধর্ম্মচর্য্যা দ্বারা পরলোকের পথ পরিষ্কার করা কেবল মাত্র যুক্তিসিদ্ধ। যে জাতি মানবীয় ইহ জীবনের মূল্য যখন এই রূপ ভাবে অবধারণা করে, চিন্তা এবং কল্পনাপ্রসূত বিষয় যাহার নিকট প্রধানত পরম আদরের বস্তু, সে জাতির মধ্যে জাতীয় ইতিহাস বা লোককীর্ত্তিগানও থাকিবার বড় একটা সম্ভাবনা নাই। অন্যান্য জাতির কথা কি বলিব, মেক্‌সিকোর নরমাংসভোজী আদিম অধিবাসীরাও এ জগতে আপনাদের প্রাচীন পুরাবৃত্ত প্রদান করিয়া গিয়াছে, কিন্তু হিন্দুসন্তান এত সুসভ্য, ধর্ম্মশীল এবং বিদ্যাশীল হইয়াও

তাহা পারিয়া উঠেন নাই। হিন্দু পণ্ডিতেরা ইতিহাস লিখিতে বসিলে যে লিখিতে পারিতেন না, তাহা নহে; বরং উৎকৃষ্টরূপেই লিখিতে পারিতেন;—কিন্তু আদৌ ইতিহাস বলিয়া যে একটা বস্তুর অস্তিত্ব সম্ভব হইতে পারে, ইহা কখনও তাঁহাদের ধারণার ভিতরে আইসে নাই। আসিবার কথাও নহে। ইহারা যেরূপ ইতিহাস লিখিতে পটু এবং ভাল বাসিতেন, তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন, যথা;—অষ্টাদশ পুরাণাদির গাদা।

এক্ষণে গ্রীকজাতির প্রতি নিরীক্ষণ কর, ইহার বিপরীত ভাব দেখিতে পাইবে। গ্রীকেরা যেন মানবীয় আত্মিক-পরিবারচ্যুত ভেকধারী সাংসারিক ষণ্ডা। যেখানে থাকি সেইই বাড়ী। পিছুটানের মমতা নাই; কাহার জন্য সঞ্চয় করিব? এই পৃথিবীই স্বর্গ, এই পৃথিবীই মর্ত্ত; এইখানেই নাম, এইখানেই পরিণাম; অতএব যাহা পাই, যতদূর সাধ্য খাইয়া পরিয়া আমোদ করিয়া লই, পরে আমার তা কে খাইবে! দেশের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই, অথচ দেশের কথা এক একবার মনে হইলে হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠে, অথচ সে উদ্বেলন ও তদুৎপন্ন কার্য্যফল ধারণা করিয়া রাখিতে পারে না,—পরলোক ও পারলৌকিক সুখের সম্বন্ধে গ্রীকদিগের ঠিক এইরূপ ভাব। যেমন করিয়াই দেখ, দেখিতে পাইবে ইহারা সর্ব্বতোভাবে সংসারী, বা সংসার-সামাজিক। উহাতে পূর্ণভাবে মগ্ন। তাহা না হইলে দেশহিতার্থে, সমাজের প্রতি স্নেহে, আপন সন্তানকে ইঙ্গিত মাত্রে বলি দিতে পারিত না; স্পার্টান জননী প্রকৃতিদত্ত পুত্রস্নেহ ত্যাগে, বিকলাঙ্গ পুত্র পরিত্যাগ বা ক্ষীণাঙ্গ পুত্রের শরীর নাশে, কান্নার বদলে হাঁসির লহর উঠাইতে পারিত না। ইহারা সন্তান রণে হত হইয়াছে শুনিলে, শোকাশ্রুর পরিবর্ত্তে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিত।১ সামাজিকতার খাতিরে এখানে সামান্য কামিনী যেরূপ আগ্রহ ও নির্ম্মায়িকতা দেখাইত, বীরপিতা দশরথও তাহা পারেন নাই। ব্রহ্মদ্বেষিণী তারকা রাক্ষসীর বিনাশার্থে বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণকে লইয়া যাইতে চাহিলে,

---

১। Cecero Lib. I.

দশরথ কাঁদিয়াই আকুল।২ সামাজিকতাকে গ্রীসে এত দূরই প্রাধান্যে উঠান হইয়াছিল যে, এই সামাজিকতার প্রতি আসক্তিগুণ হইতে, আরিষ্ট-ফানিস সামান্য সামাজিক ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ রহস্যলেখক হইয়াও, এতদূর সমাজের পরিচালক-পদ প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, তাহা পারস্যরাজের কাণে পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। এই সামাজিকতার প্রতি স্নেহ হেতুই হেক্তরজননী, হেক্তরকে সহসা রণস্থল হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে দেখিয়া, আশ্চর্য্য জ্ঞানে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—

"হেক্তর। কেমনে বৎস, কোন গূঢ় হেতু,
মম পুত্র এবে এথা ত্যজি রণস্থল,
ঘেরিছে সসৈন্যে গ্রীস পুরদ্বার যবে?" ৩

পুনশ্চ, যে পারিসকে হেলেন জগতের লোভনীয় পুরুষ জ্ঞানে, স্বামী, সন্তান, ঐশ্বর্য্য এবং রাজভোগ পরিত্যাগ ও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তাহার সঙ্গে আসিয়াছিল, সেই পারিসকেই সেই হেলেন, যখন তাহার ভীরুতা দৃষ্টি করিল, তখন রতিদেবীর নিকট ভর্ৎসনা বাক্যে এরূপ তীব্রভাবে নিগৃহীত করিয়া, আপনার অসীম ও জ্বলন্ত মনঃকষ্ট জ্ঞাপন করিয়াছিল। রতিদেবী হেলেনকে মোহিত করিয়া পারিসের অঙ্কগত করিবার জন্য লইতে আসিয়াছিলেন। হেলেন ঘাড় বাঁকাইয়া রতিদেবীর কথাবার্ত্তা শুনিয়া, উত্তর করিল,—

ধিক্ সে বর্ব্বর। ঘৃণি তারে, ঘৃণি আমি
তার আলিঙ্গন। নহে যদি, কে বহিবে
শিরে,—কে বহিবে শিরে চির অখ্যাতির
ডালি, কে সহিবে পুনঃ, ফ্রাইজিয়াব্যাপী
রমণীমণ্ডলে যবে দিবে টিটকারী? •

২। রামায়ণ ১।২০।১—১৪।

৩। "O Hector! Say, what great occasion calls
My son from fight, when Greece surrounds our walls?"
Pope's Homer's Iliad, VI, 318-19.

দহিতেছে দেহ যবে, দহে চিত্ত তাপে,
সময় কি, হ্যালা! এই প্রেম আলাপনে।৪

এক কথা। ইহার পর কি আর বলিতে হইবে যে কি কারণে হিন্দুর ঘরে, বা অপর যে কোন জাতির ঘরে ইতিহাসবিদ্যার জন্ম না হইয়া, গ্রীকের ঘরে সর্ব্বাগ্রে হইয়াছে? পুনশ্চ, এই স্থলে, গ্রীকের বীরপ্রকৃতি কিরূপ, এবং কি মেয়ে কি পুরুষ উভয়েতেই কেমন তাহার বিকাশ, তাহাও এক বার এই সুযোগে দেখিয়া লও। আর হিন্দুর ঘরে? দশরথের কান্নার কথাত উপরে বলিয়াছি; পাণ্ডবদলের পাশায় স্ত্রী হারাণর কথা বলিতে বাকি আছে। কবির ইচ্ছা, পাণ্ডবদিগকে বড় বীর করিয়া দেখান, কিন্তু বীরপুরুষেরা বড় বীর হইবার আগে দ্যূতচুক্তির খাতিরে স্ত্রী হারাইয়া বসিয়া আছেন! আবার এদিকে অর্জ্জুন ধনুর্ব্বাণ ফেলিয়া রণস্থলে বসিয়া যোগের কথা শুনিতেছেন। গ্রীক বুদ্ধিতে যাহা বীরত্ব বলিয়া আদরের জিনিস, হিন্দু বুদ্ধির নিকট তাহাই ঠিক নিন্দা এবং ঘৃণার পদার্থ; যে রাবণাদিকে হিন্দুকবি পাষণ্ডতা পক্ষে নিম্নতম উদাহরণ রূপে চিত্রিত এবং তাহাদের আচরণকে পাষণ্ডতারূপে বর্ণিত করিয়াছেন, গ্রীক চক্ষে দেখিতে গেলে, ঠিক সেই সকল লোকই বীরপুরুষ ও সেই সকল আচরণই বীরাচরণ বলিয়া দৃষ্ট হয়। হিন্দুর বীরেরা ধীর বীর, ধর্ম্মবীর; আর গ্রীকের বীরেরা, রৌদ্রবীর, অসুরবীর। এ উভয় বীরত্বই গত কালের; আগত কালের বীরত্বেও আবশ্যক নাই; দেখিতে বাঞ্ছা বড় অনাগত বীরত্ব। বিধাতঃ, সে বীরত্বে যেন ধীর বীর, রৌদ্রবীর; ধর্ম্মবীর অসুরবীর; উভয়ে উভয়ে আসিয়া সামঞ্জস্য-সংমিলিত হয়। ভারত-সন্তান! সে বীরত্ব?—রাম রাম! মিছা জল্পনে সময় ব্যয়। ইতিহাসের কথাটা সারিয়া লই।

৪। I scorn the coward, and detest his bed:
Else should I merit everlasting shame,
And keen reproach from every Phrygian dame,
Ill suits it now the joys of love to know
Too deep my anguish, and too wild my woe.
Pope's Homer's Illiad, III, 508-512.

যেখানে লোকচরিত্র এরূপ, যে জাতি এতদূর সাংসারিক সৌভাগ্যপ্রিয় যে যুদ্ধে স্ত্রীলোকেরও তেজ এত প্রখর ; সে জাতি যে সাংসারিকতার মর্ম্ম পূর্ণভাবে বুঝিবে এবং তাহা তাহাদের জীবনের প্রধান-ক্রিয়া-পদস্থ ভাবিয়া, তাহার অনুসরণ ও তাহার বিভব রক্ষা করিবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। যেমন উপপাদ্য বিষয়সমূহ অনুসরণ করিতে হইলে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব উপপাদক জ্ঞান সংগ্রহ আবশ্যক ; তেমনি আনুষ্ঠানিক ব্যাপার অনুসরণ করিতে গেলে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনুষ্ঠানের অবগতি ভিন্ন, তাহা সুশৃঙ্খলে বা পূর্ণাবয়বে সম্পন্ন হয় না। অতএব ইতিহাসবিদ্যার চর্চ্চা গ্রীকদিগের মধ্যে যদৃচ্ছা উৎপন্ন হয় নাই। তথায় উহা উৎপন্ন না হইলে চলে না, এই জন্য হইয়াছিল। ভারতীয় জীবনক্রিয়ায় তদ্রূপ আবশ্যকতার প্রয়োজন অভাব। আদিমকাল হইতে আরম্ভ করিয়া, মুসলমানাধিকার পর্য্যন্ত, ভারতীয়েরা যেমন এ জগতে একাদিক্রমে ধারাবাহিকরূপে ও বহুকাল ব্যাপিয়া স্বাধীনত্ব ভোগ করিয়া আসিয়াছে, তেমন আর কোন জাতির ভাগ্যে ঘটে নাই। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ধারাবাহিক রূপে সজ্জিত ঘটনাবলীর সত্য ইতিহাসের একটুও টুকরা পাওয়া যায় না বলিলে নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু গ্রীকদিগের ইতিহাসের বাজারের প্রতি একবার লক্ষ্য করিয়া দেখ,—কেমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সম্পূর্ণ-আকার! ফলত গ্রীকেরা মানবীয় ইহ জীবনের এরূপ স্থির মর্ম্মজ্ঞ ও তাহাতে এত মমতাশীল যে, অতি প্রাচীন কাল হইতে ইহারা, এমন কি প্রস্তরফলকের সাহায্যেও, তাহার স্মৃতি-রক্ষণের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিল,৫ ও তাহাতে যত্নশীল হইয়াছিল। কোন প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থে এরূপ অনুষ্ঠানের কথা বা উল্লেখ আছে কি না তাহা শুনিতে পাই না। বোধ হয় নাই।

অতঃপর ইচ্ছা জাতিদ্বয়ের লোকাচার, দেশাচার, লোকব্যবহার, ইত্যাদির আলোচনা করি ; কিন্তু আরম্ভস্থলেই দেখিতেছি যে, উদাহরণ

৫। The stone shall tell your vanquished heroes' name,
And distant ages learn the victors' fame.
Pope's Homer's Illiad, VIII 103-104. পুনশ্চ *Odyssey* XI.

উদ্ধৃত করিয়া তাহাদের তুলনায় চিত্র প্রদর্শন করিতে যাওয়া, একরূপ পণ্ডশ্রম ও স্থানের অপব্যয়মাত্র। সেরূপ ক্ষুদ্র তুলনায় এরূপ বৃহৎ জাতীয় জ্ঞান কখন পর্য্যাপ্ত, সম্পূর্ণ বা তৃপ্তিকর হইতে পারে না। তৎ তৎ বিষয় পরিজ্ঞাত এবং হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, তৎ তৎ জাতীয় ইতিহাস মনঃসংযোগ পূর্ব্বক পাঠ সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম সদুপায়। যাহা হউক, তথাপি, এই উভয় জাতি, যে পুস্তককে ধর্ম্মপুস্তক এবং যাহা যাহা লোকনীতিবিধায়ক বলিয়া গ্রহণ করিত, সেই সেই পুস্তক হইতে দুই একটী নীতিমূলরূপী বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব। উহাতে আর কিছু না করুক, অন্তত তৎ তৎ জাতির সেই সেই বিষয়ে চিত্ত গঠন এবং চিন্তন প্রণালী কিরূপ ছিল, তাহার কিঞ্চিৎ পরিমাণে পরিচয় প্রদান করিতে পারিবে। হেসিওড হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে৬।

"নির্ব্বোধ পার্সেস, এক্ষণে আমি সদুদ্দেশ-পরতন্ত্র হইয়া এই উপদেশগুলি প্রদান করিব। অসৎ সংগ্রহ তুমি অনায়াসে রাশি রাশি করিতে পার, যেহেতু তাহার পথও সহজ এবং সে পথ অনায়াসে অবলম্বনযোগ্যও বটে। সত্য বটে সতের অগ্রে অমর দেবগণ অধ্যবসায়ের স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন, এ নিমিত্ত ইহার পথ আপাতত অতি উন্নত ও দুরারোহ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে; কিন্তু যে একবার ইহার সীমায় উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছে সে দেখিতে পাইবে যে, যদিও ইহা আগে এত কঠিন বোধ হইয়াছিল, কিন্তু এখন ইহা কত সরল।"

"সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ যে নিজে নিজের উপায় করিয়া লয়, এবং যাহার সেই উপায় ভবিষ্যতে এবং শেষ পর্য্যন্ত মঙ্গলদায়ক হয়; এবং সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ যে সুপরামর্শদাতার পরামর্শ শুনিয়া থাকে। কিন্তু অসার ও হেয় সেই ব্যক্তি, যাহার নিজেরও কোন বুদ্ধি নাই অথচ অপরের সুপরামর্শেও কখন কর্ণপাত করে না।' অতএব হে পার্সেস, আমার সদুপদেশের প্রতি চিত্ত স্থির রাখিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হও এবং ভাণ্ডার পূরণ কর, যাহাতে দুর্ভিক্ষ আসিয়া তোমাকে দলিত করিতে না পারে; তাহা হইলে সুকেশা দেমিতুর দেবীও তোমার প্রতি অনুগ্রহ-পরবশ হইয়া, তোমার ভাণ্ডার

৬। Hesiod, *Works & Days.*

পূরণে সহায়তা করিবেন। জানিও, দুর্ভিক্ষ কেবল অলস ব্যক্তির সহচর হইয়া থাকে।

"যে ব্যক্তি অলস ভাবে, অপরের গলগ্রহ হয়, কি দেবতা কি মানুষ, উভয়েতেই তাহার প্রতি রোষযুক্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু তোমার যে কেবল কার্য্য এবং শ্রমেই তৃপ্তি এরূপ দেখাও, যেহেতু তাহা হইলে তোমার ভাণ্ডার যখনকার যে দ্রব্য তাহাতে পরিপূরিত হইয়া উঠিবে। শ্রম হইতে লোকে ধনধান্য-পরিপূর্ণ হইয়া থাকে; এবং যে ব্যক্তি শ্রমশীল, মানব এবং দেব উভয়েরই নিকট সে প্রিয়পাত্র হয়। শ্রমে মানব হতমান হয় না, আলস্যেই হতমান হইয়া থাকে। তুমি যদি শ্রমরত হও, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে অলস ব্যক্তিরা তোমাকে ধনী হইতে দেখিয়া হিংসারত হইতেছে, কারণ সম্মান এবং শ্রেষ্ঠতা এ দুই সৌভাগ্যের অনুগমন করে।

"যে ব্যক্তি শরণাগত বা অতিথির প্রতি অসদাচরণ করে; ৭ আত্মীয় স্বজনের স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার-পরায়ণ হয়; জ্ঞানমূঢ় হইয়া পিতৃমাতৃহীনের অনিষ্ট করিয়া থাকে; এবং যাহারা বৃদ্ধ পিতা মাতার প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করে, দেবরাজ তাহাদের প্রতি ক্রোধ-পরায়ণ হইয়া শাস্তি প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব তুমি ঐ সকল কার্য্য হইতে আপনার চিত্তকে অন্তরে রাখিবে। যথাসাধ্য সুভাবে ও পবিত্র মনে উপহার দানে

৭। কিন্তু ইচ্ছা পূর্ব্বক গ্রীক মহাশয়েরা অতিথি গ্রহণ করিতেন না, তবে নিতান্ত কেহ যদি আসিয়া পড়িত তাহা হইলেও তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতেন না। কোন লোকপাল কোন অতিথি গ্রহণ করিলে, বা তাহাকে কোন উপহার দিলে, লোকবর্গের নিকট হইতে বাজে আদায়ের দ্বারা তাহার ক্ষতিপূরণ করিয়া লইতেন। গ্রোট সাহেব ইহার প্রমাণস্থলে Odyss. xiii 14; xix 197; xvii 383 উদ্ধৃত করিয়াছেন। গ্রীকের আতিথ্য এইরূপ। পরবর্ত্তী সময়ে ইহার ভাল মন্দ উভয় দিকেই অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। আটিকা প্রদেশের লোকে আতিথ্য-পরায়ণ হইয়াছিল, কিন্তু তেমনি অন্যদিকে আবার স্পার্টায় ভিন্নস্থানীয় লোক একদণ্ড তিষ্ঠিতে পারিত না। তবে আমাদের দেশের ন্যায় মুষ্টিভিক্ষা, পয়সা ভিক্ষা, উদর ভিক্ষা, বাসভিক্ষা, এরূপ ভয়ঙ্কর যে ভিক্ষা বা আতিথ্য, গ্রীসে তাহার নাম গন্ধও জানিত না।

দেবতাদিগের অর্চ্চনা করিবে; এবং সকালে ও সন্ধ্যায় ধূপাদিদানে, তাঁহাদিগের সন্তোষ সাধন করিবে; কারণ তাহা হইলে তোমার উপর তাঁহারা এরূপ সন্তুষ্টচিত্ত থাকিবেন যে, তুমি অনায়াসে অন্যের ভূসম্পত্তি ক্রয় করিতে পারিবে; অন্যে কেহ তোমার তা ক্রয় করিতে পারিবে না। যে তোমাকে ভাল বাসে তাহাকে তোমার ভোজস্থলে নিমন্ত্রণ করিবে, কিন্তু যাহারা তোমার হিতকারী নহে তাহারা যেন তফাতেই থাকে। বিশেষ যে লোক তোমার আত্মীয় তাহাদিগকে আগে নিমন্ত্রণ করিবে, কারণ জানিও, তোমার বাড়ীতে কোন বিপদ পড়িলে, প্রতিবেশীরা আগে বদ্ধ-পরিকর হয় না, আগে আত্মীয় স্বজনেই হয়। অসৎ প্রতিবেশী কষ্টের কারণ হইয়া থাকে, কিন্তু সৎ প্রতিবেশী পাওয়া সৌভাগ্য স্বরূপ বলিয়া জানিও। যখন প্রতিবেশীর নিকট হইতে ঋণ করিবে, শোধ দিবার সময় যে মাপে লইয়াছিলে যেন ঠিক সেই মাপে শোধ দেওয়া হয়, বরং কিছু বেশী দিয়াও দিবে; কারণ তাহা হইলে ভবিষ্যতে আবার যদি অভাব হয়, তবে চাহিলেই যে পাও এরূপ আশা থাকিবে।

"নীচ প্রবৃত্তি দ্বারা যে লাভ হয়, তাহার দিকে যাইও না; নীচ প্রবৃত্তি হইতে যে লাভ তাহাকে লোকসান বলিয়া জানিও। যে তোমাকে ভালবাসে, তাহাকে ভালবাসিবে; যে তোমাতে অনুরক্ত তাহার প্রতি অনুরক্ত হইও। যে দান করিয়া থাকে, তাহাকে দান করিবে; যে দান করে না, তাহাকে দান করিবে না। যে ব্যক্তি দান করিয়া থাকে, সে অবশ্য অন্যত্র দান পাইয়া থাকে; যে দান করে না, সে কোথাও দান পায় না। * * * * বন্ধুবর্গের প্রতি প্রতিদান যেন অপর্য্যাপ্ত হয়। ভাইয়ে ভাইয়ে কোন কাজ করিতে হইলেও যেন, উপহাসচ্ছলে এবং প্রকারান্তরে, তাহার সাক্ষ্য রাখা হয়; কারণ নিশ্চয় জানিও, 'বিশ্বাস' এবং 'অবিশ্বাস,' এ দুইটী বিষয় অনেক লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। (এবং এই অপূর্ব্ব মূল পাশ্চাত্য নীতি আজিকে আর এক বেশে সোণার ভারতে প্রবেশ করিয়া, আইন-আদালত মূর্ত্তিতে নিত্য লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছে। ভারতের আধুনিক অপূর্ব্ব সাক্ষ্য আইন এবং তদুৎপন্ন মিথ্যা মোকদ্দমাদি এ সকলের উৎপত্তিমূল এই পাশ্চাত্য নীতিটীর ভিতর,

নিহিত।) বেশভূষাশালী স্ত্রীলোকে যেন তোমার মন ভুলাইতে না পারে; স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করা আর দারুণ শঠ জুয়াচোরকে বিশ্বাস করা, এ উভয়ই সমান। একটী মাত্র পুত্রকে পিতৃগৃহের রক্ষণাদি করিতে দিও, তাহা হইলে অর্থ বিভাগ না হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। স্মরণ রাখিও. অনেক সন্তান থাকিলে অনেক যন্ত্রণা, ও অনেক উপার্জ্জনের আবশ্যক হয়। (ভিটামাটি বিক্রয়ে বিবাহ এবং পুত্রপ্রার্থী হিন্দু এ কথায় কি বলেন? সন্তান ভূমিষ্ঠের অন্য নাম যেখানে 'গোলামের সংখ্যা বৃদ্ধি;' সেখানে উপায়শূন্য অবস্থায় এ অজস্র গোলাম গোলামী—শেয়ালের বংশবৃদ্ধির ফল?) এক্ষণে তোমার অন্তঃকরণ ও চিত্ত যদি সৌভাগ্য লাভ করিতে চাহে, তবে কেবল শ্রম করিবে, শ্রমের উপর শ্রম করিবে।"

ইহার পর কিরূপে কৃষিকার্য্যাদি সমাধা করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে, হেসিওদ তাহার সবিস্তার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। এই উপদেশের মধ্যে, যে কোন প্রকারে আত্মস্বার্থ যাহাতে সর্ব্বতোভাবে পূরণ হয়, সেইরূপ উপদেশেরই প্রাধান্য। তাহাদিগের কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া আর মিছামিছি প্রস্তাবের কলেবর বৃদ্ধি করিব না। অতঃপর, সেই সকল উপদেশ অনুসারে অর্থ সংগ্রহ হইলে, হেসিওদ বিবাহ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। বিবাহের পর, আরও নিয়মমত কয়েকটী উপদেশ প্রদান করিয়া গৃহধর্ম্মের সমস্ত কর্ত্তব্য দেখানর শেষ করিয়াছেন।

"দেবতারা যাহাতে শত্রু না হয়েন, সর্ব্বদা সেরূপ কার্য্য করিবে। বন্ধু ব্যক্তির সঙ্গে যেন ভ্রাতার ন্যায় সমান ব্যবহার করিও না; এবং যদি কর, আগে যেন তুমি তাহার অনিষ্টে রত হইও না, ও তাহার প্রতি বাক্যচ্ছলেও মিথ্যা কহিও না। কিন্তু যদি সেই বন্ধু তোমার অরুচিকর কোন কথা বলে, বা তোমার বিরুদ্ধে কিছু করে; তবে তুমি দুনাদুনি সেইরূপ করিয়া তাহাকে তাহার প্রতিশোধ দিবে। কিন্তু যদি সে ব্যক্তি আবার তোমাকে সন্তুষ্ট করিয়া বন্ধুত্ব পুনঃস্থাপন করিতে চাহে, তবে তাহাতে তুমি সন্তুষ্ট হইও ও বন্ধুত্বস্থাপনে অসম্মত হইও না। সেই ব্যক্তি নিতান্তই অসুখী, যে, এখন একজনের সঙ্গে, তখন আর এক

জনের সঙ্গে, বন্ধুত্ব করিয়া থাকে। মনের কথা যেন মুখের ভাবে প্রকাশ না পায়। অধিক লোকের কখন ভোজদাতা হইও না; কাহাকে একেবারে ভোজ দিবে না, যেন এমনও হইও না। অসতের সঙ্গী হইও না, বা সতের অবমাননা করিও না। যে ব্যক্তি দুর্দ্দশাপন্ন, নিষ্ঠুর ভাবে তাহাকে ঐ দুর্দ্দশার জন্য তাড়না করিও না, যেহেতু ঐ দুর্দ্দশা তাহার উপর দেবতাদের কর্ত্তৃক নিয়োজিত। সেই সকলের অপেক্ষা প্রধান সম্পত্তি, যাহা লোকের মধ্যে আপন জিহ্বাকে স্ববশে রাখা বলে; এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান সৌন্দর্য্য তাহা, যাহাকে আগু পাছু ভাবিয়া চলা বলিয়া থাকে। যদি তুমি কাহাকে মন্দ কহ, তাহাহইলে হয়ত তোমাকে একদিন সেইরূপ মন্দ শুনিতে হইবে। যেথানে চাঁদা করিয়া বহুলোকে সমবেত হইয়া আমোদ করিতেছে, তথায় অভদ্রতা করিও না; কারণ এরূপ স্থানে, যথায় খরচের ভাগ কম ও আমোদের ভাগ বেশী, তথায় সেরূপ করা অন্যায়।"

উপরে গ্রীক গৃহস্থের গৃহধর্ম্ম ব্যবস্থা দেখা গেল। এক্ষণে হিন্দুর গৃহধর্ম্ম ব্যবস্থা দেখা যাউক; কিন্তু অসংখ্য গ্রন্থের মধ্যে কোন গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব, তাহা ঠিক করিতে পারিতেছি না। মহাভারত, যাহা সমগ্র হিন্দুনীতির রত্নাগার বিশেষ, তাহা হইতেই কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাউক। গৃহস্থলে চারি বর্ণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এরূপ লিখিত হইয়াছে ৮;—

"দম অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহ, তপঃক্লেশসহিষ্ণুতা এবং যাহাতে অপর সাংসারিক কার্য্যসকলের সমাপ্তি হয়, এতাদৃশ বেদাধ্যয়ন করাই ব্রাহ্মণগণের সনাতন ধর্ম্ম। এইরূপ শান্তপ্রকৃতি, প্রাজ্ঞ, ব্রাহ্মণ দুষ্কর্ম্ম-রত না হইয়া স্বীয় কর্ম্মে রত থাকিলে, যদি অর্থ সকল স্বয়ং তাঁহার নিকটে উপস্থিত হয়, তাহাহইলে তিনি সন্তানোৎপাদন বাসনায় দার পরিগ্রহ পূর্ব্বক নিয়ত দান এবং যজ্ঞাদি সৎকর্ম্ম করিবেন। অপিচ পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন যে, সেই অর্থ স্বজনগণের সহিত সমভাগে ভোগ করিবেন। বেদাধ্যয়নের সঙ্গেই ব্রাহ্মণের সমস্ত কার্য্য সমাপ্ত হয়, অতঃপর তিনি

৮। মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৬০ অধ্যায়।

আর কোন কর্ম্ম করুন বা নাই করুন, সর্ব্বভূতের প্রিয় ব্রাহ্মণ বলিয়া অভিহিত হয়েন।

"হে ভারত! ক্ষত্রিয়গণের যে সকল পৃথক ধর্ম্ম আছে, তাহাও তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। মহারাজ! ক্ষত্রিয় দান করিবেন, কিন্তু কাহারও নিকট প্রার্থনা করিবেন না; যজ্ঞাদি করিবেন, কিন্তু যাজকতা করিবেন না, অধ্যয়ন করিবেন, কিন্তু কাহাকেও অধ্যাপনা করাইবেন না, প্রকৃতিপুঞ্জকে সর্ব্বতোভাবে প্রতিপালন করিবেন; নিয়ত দস্যুবধে নিযুক্ত থাকিবেন, এবং রণভূমিতে পরাক্রম প্রকাশ করিবেন। যে ভূপতি অশ্বমেধাদি যজ্ঞসমূহের দ্বারা ভূমণ্ডলে মহতী কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন এবং যাঁহারা সমরক্ষেত্রে জয় লাভ করিয়া থাকেন, তাঁহারাই ত্রিলোকবাসী লোকসকলকে বশীভূত করিতে পারেন। ক্ষত্রিয় অক্ষত শরীরে সমর হইতে নিবৃত্ত হইলে দীর্ঘদর্শী পণ্ডিতগণ তাঁহার সেই কার্য্যের প্রশংসা করেন না, সুতরাং ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী নৃপতি বিশেষ যত্ন সহকারে যুদ্ধ করিবেন। ক্ষত্রবন্ধু অর্থাৎ অধম ক্ষত্রিয়গণের প্রধানত এই পথই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, পরন্তু দস্যু নিবর্হণ ভিন্ন আর কোন কর্ম্মই ইহাদের কর্ত্তব্যতম বলিয়া অভিহিত হয় না। (বাপু নীতিবিৎ, কেবল হীন সম্প্রদায়কে প্রাণ বিসর্জ্জনের কর্ত্তব্য বুঝাইয়া, উচ্চ সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্য আরাম ভোগ স্থির করিলে, কে তোমার নীতিতে কর্ণপাত করিবে।) দান, অধ্যয়ন এবং যজ্ঞই রাজগণের মঙ্গল বিধান করিয়া থাকে। ভূপতি প্রকৃতিপুঞ্জকে স্বীয় ধর্ম্মে অবস্থাপিত করিয়া ধর্ম্মানুসারে সমভাবে সকল কার্য্য সম্পাদন করিবেন। এইরূপ প্রজাপালন দ্বারাই ভূপতির সমস্ত কার্য্য সমাপ্ত হয়, অতঃপর তিনি আর কোন কার্য্য করুন বা নাই করুন, সর্ব্বভূতের প্রধান রাজন্য বলিয়া অভিহিত হয়েন।

"যুধিষ্ঠির! বৈশ্যেরও যে সকল শাশ্বতধর্ম্ম আছে, তাহা তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। বৈশ্য দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ, বিশুদ্ধ উপায় অবলম্বন দ্বারা ধনসঞ্চয় এবং অনুরাগ সহকারে পিতার ন্যায় পশুগণ পালন করিবে, অপর কোন কার্য্য করিবে না। কারণ ইহা ভিন্ন অপর সমস্ত কার্য্যই তাহার অকর্ত্তব্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রজাপতি সৃষ্টির পর ব্রাহ্মণ এবং

রাজন্যগণকে সর্ব্বজাতীয় প্রজা ও বৈশ্যগণকে পশুসকল প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং বৈশ্য তদনুসারে পশুরক্ষায় নিযুক্ত থাকিলেই সুমহৎ সুখ প্রাপ্ত হয়। অতঃপর ইহারা যে বৃত্তি অবলম্বন করিবে, এবং যে উপায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, তাহাও বলিতেছি। যে বৈশ্য ছয়টি ধেনু পালন করে, সে স্বীয় বেতন রূপ একটী ধেনুর দুগ্ধ পান করিবে, শত-গো-রক্ষক স্বীয় বার্ষিক বেতন রূপ একটী গোমিথুন প্রাপ্ত হইবে। শৃঙ্গ ও ক্ষুর ভিন্ন দ্রব্যের বাণিজ্যে লব্ধ এবং সর্ব্বপ্রকার শস্য ও বীজের সপ্তম ভাগ তাহার অংশ বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং ইহাই তাহার সাংবৎসরিক বেতন। বৈশ্য পশুপালনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিবে না এবং তাহারা ইচ্ছা করিলে, অপর কোন বর্ণেরই পশুসকল রক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে।

"হে ভারত! শূদ্রগণেরও যে সকল পৃথক ধর্ম্ম আছে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রজাপতি শূদ্রগণকে অপর বর্ণ সকলের দাস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সুতরাং সকল বর্ণের পরিচর্য্যা করাই শূদ্রের কর্ত্তব্য, তাহাদের শুশ্রূষা করিলেই শূদ্র সুমহৎ সুখ প্রাপ্ত হয়। শূদ্র পর্য্যায়ক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের পরিচর্য্যাতেই নিযুক্ত থাকিবে, কিন্তু কখনই ধনসঞ্চয় করিবে না, কারণ তাহারা ধনবান হইলে আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠগণকে বশীভূত, ও অকার্য্য সকল করিতে প্রবৃত্ত হইবে; কিন্তু নৃপতির আদেশ অনুসারে লোভপরবশ না হইয়া ধর্ম্মপ্রধান কার্য্যসকল করিবার নিমিত্ত সামান্য ধনসঞ্চয় করিতে পারিবে। শূদ্র যে বৃত্তি অবলম্বন করিবে এবং যে উপায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, তাহাও বলিতেছি। শূদ্র, ব্রাহ্মণ আদি বর্ণত্রয়ের অবশ্যভরণীয়; উষ্ণীষ-বেষ্টন জীর্ণ ছত্র, উপানহ এবং ব্যজন সকল পরিচারক শূদ্রকে প্রদান করিবে। অপরি-ধেয়, বিশীর্ণ বসন সকল শূদ্রকে প্রদান করা কর্ত্তব্য, কারণ তাহা তাহাদেরই ধর্ম্মধন। ধার্ম্মিক মনুষ্যগণ বলিয়া থাকেন যে, শূদ্র শুশ্রূষু হইয়া দ্বিজাতিগণের মধ্যে কাহারও নিকট গমন করিলে তিনি তাহার উপযুক্ত বৃত্তিকল্পনা করিয়া দিবেন। প্রতিপালক দ্বিজাতি অপত্যবিহীন

হইলে, শূদ্র তাহাকে পিণ্ড প্রদান করিবে এবং বৃদ্ধ অথবা দুর্ব্বল হইলে, তাঁহার ভরণাদিও করিবে। অধিকন্তু যে কোন বিপদ উপস্থিত হউক না কেন, কোন অবস্থাতেই ভর্ত্তাকে পরিত্যাগ করা শূদ্রের কর্ত্তব্য নহে। প্রভুর দীনদশা উপস্থিত হইলে স্বীয় কুটুম্বগণ অপেক্ষা অধিকরূপে তাঁহার ভরণাদি করা শূদ্রের কর্ত্তব্য, কারণ শূদ্রের যে কিছু ধনাদি থাকে, তৎসমস্তই প্রভুর, তাহাতে তাহার কোন স্বত্ব নাই।"—বর্দ্ধমানের রাজখরচে অনুবাদিত মহাভারত হইতে উদ্ধৃত।

শূদ্রের প্রতি আর্য্যদিগের এরূপ আচরণ, আর্য্যদিগের চির-অনপনেয় কলঙ্ক। শূদ্রদিগকে এখনও ভাল করিয়া বশ্যতায় না আনিতে পারার জন্যই বোধ হয় তাহাদের উপর এরূপ কঠোর আচরণ করিতেন: মনু দৃষ্টে অনুমান হয় যে এখনও তাঁহারা তাহাদের উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই, কারণ মনু এক স্থানে বলিতেছেন,—অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির সহিত কোথাও যাইবে না, একাকী কোথাও যাইবে না, অথব শূদ্রের সহিতও কোথাও যাইবে না ৯। সত্য সত্যই যদি শূদ্র একটা অবিশ্বাসের স্থল থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে আর উপরি উক্ত কঠোর বিধি গুলিকে নিতান্ত দূষণীয় বলা যায় না। তবে গ্রীকদিগের সঙ্গে তুলনায় মন্দের ভাল এই যে, গ্রীকশূদ্রের ন্যায় ইহাদিগকে পালে পালে পশুবৎ শিকার স্বরূপ বিনাশ করা হইত না ১০। পুনশ্চ গৃহস্থের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে—

"অপর-বল-পীড়িত শরণাগত জীবগণকে পরিত্রাণ করিলে গার্হস্থ্য-লভ্য পদ লাভ হইয়া থাকে। চরাচর ভূতগণের সর্ব্বপ্রকার রক্ষা এবং

৯। মনু ৪।১৪০।

১০। Plutarch, Lycurg. C. 28., Myron of Prieno, Af. Ath. xiv., Plato Leg. I. গ্রীকদিগের মধ্যে অধমদিগকে যে পশুবৎ বিনাশ বা কঠোর শাসনে শাসিত করা হইত, তদর্থে এই সকল গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। হিন্দুদিগের মধ্যে শূদ্র যদিও অতি নিকৃষ্ট ও প্রপীড়িত জাতি ছিল, তথাপি তাহাদের মধ্যে কেহ গুণবিশিষ্ট হইলে, উচ্চ জাতিত্ব প্রাপ্ত হইতে পারিত। তদর্থে আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্রে,—"ধর্ম্মচর্য্যয়া জঘন্যো বর্ণঃ পূর্ব্বং পূর্ব্বং বর্ণমাপদ্যেত জাতিপরিবৃত্তৌ, অধর্ম্মচর্য্যয়া পূর্ব্বো বর্ণো জঘন্যং জঘন্যং বর্ণমাপদ্যেত জাতিপরিবৃত্তৌ।"

যথাযোগ্য পূজাদ্বারা গার্হস্থ্য পদ লাভ হয়। জ্যেষ্ঠানুজ্যেষ্ঠ পত্নী, ভ্রাতা, পুত্র এবং নপ্তৃগণের সময়ানুরূপ নিগ্রহ বা অনুগ্রহ রূপ কার্য্যই গার্হস্থ্যগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। হে পুরুষশার্দ্দূল! বিদিতাত্মা অর্চ্চনীয় সাধুগণের পূজা প্রভৃতি নির্ব্বাহ করাই গার্হস্থ্য কর্ম্ম। হে ভারত যুধিষ্ঠির! আশ্রমস্থ ভূতগণকে স্বগৃহে আহ্বান করিয়া ভোজ্যাদি দান করাই গৃহস্থগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যে পুরুষ বিধাতৃসৃষ্ট ধর্ম্মে রীতিমত অবস্থান করেন, তিনি সর্ব্বাশ্রমলভ্য মঙ্গলময় স্থান লাভ করিয়া থাকেন।" ১১ পুনশ্চ,

"আচার্য্য, পিতা, সখা, আপ্তজন ও অতিথিকে 'আমার গৃহে অদ্য এই খাদ্য দ্রব্য আছে' গৃহস্থ ব্যক্তি প্রত্যহ এইরূপ নিবেদন করিবেন। তাঁহারা যাহা বলিবেন, গৃহস্থ ব্যক্তি তাহাই করিবেন, এইরূপ ধর্ম্মবিহিত আছে। হে কৃষ্ণ! গৃহস্থ মানব সতত সকলের অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিবেন। রাজা, ঋত্বিক, স্নাতক, গুরু ও শ্বশুর সম্বৎসরকাল গৃহে বাস করিলেও তাঁহাদিগকে মধুপর্ক দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। কুকুর, শ্বপচ ও পক্ষিগণকে সায়ংকালে এবং প্রাতঃকালে ভূতলে অন্নদান করিবে। যিনি অসূয়াশূন্য হইয়া এই সমস্ত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তিনি ইহলোকে বরলাভ করিয়া পরলোকে সুরপুরে বসতি করেন।" ১২

এক্ষণে লোকনীতি কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দেখা যাউক। গ্রীকের নীতি,—"তাহাকেই ভালবাসিও যে তোমাকে ভাল বাসিয়া থাকে; এবং তাহারই প্রতি অনুরক্ত হইও, যে তোমাতে অনুরক্ত। সেইখানেই দান করিবে যেখানে প্রতিদান পাইবার প্রত্যাশা আছে; এবং সেখানে দান হইতে হস্ত গুটাইও, যেখানে প্রতিদানের সম্ভাবনা নাই।"—হেসিওদ।

"তোমার শত্রুকে মিষ্টবাক্য দ্বারা ভুলাইবে, এবং যখন সে তোমার কথায় ভুলিয়া হাতে আসিবে, তখন আর কোন কথা না শুনিয়া উপযুক্তরূপে তাহার উপর প্রতিশোধ লইবে।

"হে কীর্ণো, তোমার বন্ধু বা পরিচিতবর্গের মধ্যে যাহাকে যেরূপ

১১। মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব ১৬৬।

১২। মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব ৯৭।

প্রকৃতির দেখিবে, তোমার আত্মস্বভাবকেও সেইরূপ স্বভাবের দেখাইয়া, তোমার সহ যাহাতে তাহাদের সহানুভূতি হয়, সেইরূপ করিবে।

"সামুদ্রিক পলিপের যেরূপ ধর্ম্ম,—আশ্রয়ের নিমিত্ত উদ্দিষ্ট শৈলকে বহুদিকে বিক্ষিপ্ত বহুহস্তে এরূপ আকর্ষণ করিয়া সংলগ্ন হয় যে, আর তাহার পৃথকত্ব অনুভূত হয় না, তুমিও সেইরূপ হইও।" যখন যেমন দেখিবে তখন সেইরূপ ভাব পরিবর্ত্তন করিবে।

"হে কীর্ণো, প্রত্যাগত নির্ব্বাসিত প্রভৃতির এখনও আশা আছে, ইহা ভাবিয়া যেন কখনও তাহাদিগের প্রতি সকরুণভাবে ব্যবহার করিও না; কারণ সে প্রত্যাগত হইলেও সে যেরূপ ব্যক্তি তাহার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই।"—থিওগনিস।

এক্ষণে সমানার্থবোধক হিন্দুর নীতি দেখা যাউক,—

"দানশূন্যকে দানের দ্বারা, অসত্যবাদীকে সত্যের দ্বারা, ক্রোধান্ধকে ক্ষমার দ্বারা, এবং অসৎকে সাধুতা দ্বারা, এইরূপে যে যে ব্যক্তি দুষ্ট, তাহার দোষরাশিকে পরাজয় করিবে।

"শ্রেষ্ঠ এবং সৎ যাঁহারা তাঁহাদের নীতি এরূপ। ইহাঁরা বাক্য মন কার্য্যে কাহারই অনিষ্টে রত হয়েন না, এবং সর্ব্বভূতেই ইহাঁদের দয়া ও দাক্ষিণ্য প্রচুর। ইহাঁরা আত্মস্বার্থের প্রতি লক্ষ্যশূন্য, অপরের শুভতেই আনন্দিত হইয়া থাকেন। ইহাঁরা যাঁহার প্রতি যে দয়া ও যাহার যে উপকার করিয়া থাকেন, তাহার জন্য কিছুমাত্র প্রতিদানের প্রত্যাশা রাখেন না।

"যদি সমস্ত সংসার তোমার বিপরীতাচরণ করে, তথাপি যথার্থ পথ হইতে কখনও স্খলিতপদ হইও না।"—মহাভারত, বনপর্ব্ব।

"কোন ব্যক্তি একান্ত পীড়িত হইলেও, কাহারও মর্ম্মপীড়াদায়ক কোন দোষ উল্লেখ করিবে না; যাহাতে পরানিষ্ট হয় এমন কর্ম্ম বা তাহার চিন্তা করিবে না, অথবা যে কথা বলিলে অন্য ব্যক্তি মনে ব্যথা পায় এমন মর্ম্মপীড়াকর স্বর্গলাভের বিরোধী কোন কথা বলিবে না।

"যে ব্যক্তি অঙ্গহীন, যাহার অধিকাঙ্গ, যে একান্ত মূর্খ, প্রাচীন, কুরূপ,

নির্ধন ও কুৎসিত-জাতি, তাহাদিগকে কাণা বুদ্ধ ইত্যাদি শব্দ দ্বারা নিন্দা করিবে না।"—মনু।

গ্রীক জাতির স্বভাবসুলভ স্বার্থপরতার ভাগ পরিত্যাগ করিলে, ফেসিওদ, থিওগ্‌নিস্ প্রভৃতিকে মোটের উপর বাস্তবিক সুনীতিবিৎ বলিতে হয়, কারণ ইহাদের সৎশিক্ষার ভাগও বিস্তর,—যদিও সেই সকল সংশিক্ষা কথিত স্বার্থপরতা প্রভৃতির সহিত জড়িত হওয়ায় কখন প্রস্ফুটিত হইতে পার নাই। লোকচরিত্রেও ইহারা প্রভূত দূরদর্শন-সম্পন্ন ছিল; এবং তৎপক্ষে ইহাদের শিক্ষাসমস্তও অতি সুন্দর।

লোকাচারের বিষয় এই পর্যন্তই পর্য্যাপ্ত হউক ১৩। গৃহাচার কিরূপ তাহা একটু দেখা য উক। এই গৃহাচারের সর্ব্বপ্রধান মূল ও মোহমন্ত্র স্ত্রী-সতীত্ব, যেহেতু উহারই উপর গৃহধর্ম্মের স্থায়িত্ব নির্ভর করিয়া থাকে। এখন দেখ, এই স্ত্রী-সতীত্ব উভয় জাতির মধ্যে কিরূপ এবং কিজন্য ও তাহা কতদূর আদরের পদার্থ ছিল। হিন্দু ভাবিয়া ভাবিয়া ঠিক

১৩। গ্রোট সাহেব ঐতিহাসিক সময়ের প্রারম্ভে বা হোমারিক সময়ে গ্রীকচরিত্র-সম্বন্ধে এরূপ লিখিয়াছেন, "When however among the Homeric men we pass beyond the influence of the private ties above enumerated, we find scarcely any other moralising forces in operation. The acts and adventures commemorated imply a community wherein neither the protection nor the restraints of law are practically felt, and wherein ferocity, rapine, and the aggressive propensities generally, seem restrained by no internal counterbalancing scruples Homicide, especially, is of frequent occurrence, sometimes by open violence, sometimes by fraud expatriation for homicide is among the most constantly recurring acts of the Homeric Poems · and savage brutalities are often ascribed even to admired heroes, with apparent indifference * * * * Moreover, celebrity of Autolykus, the maternal grandfather of Odysseus, in the career of wholesale robberry and perjury, and the wealth which it enabled him to acquire, are described with the same unaffected admiration as the wisdom of Nestor, or the strength of Ajax. * * * * The vocation of a pirate is recognised and honorable, so that a host, when he asks his guest what is the purpose of his voyage, enumerates enrichment by indiscriminate maritime plunder as among those projects which may naturally enter into his contemplation." &c. *Grotes' History of Greece* II. বলা বাহুল্য যে কি প্রাচীন কি মধ্যসাময়িক সময় হিন্দুসংসারে খুঁজিয়া এরূপ ছবি পাইবার সম্ভাবনা নাই।

করিলেন, পুত্রপ্রদত্ত জল পিণ্ড ভিন্ন পরলোকে দুঃখনিবৃত্তির আর কোন সম্ভাবনা দেখি না। সুতরাং যে সন্তানের উদ্দেশ্য এত গুরুতর, তথায় সে সন্তান যাহাতে যথার্থত তাহার হয়, তাহার উৎপাদন কার্য্য কোন রূপে দুষ্ট হইতে না পায়, বা তাহার ক্ষেত্র দুষ্ট না হয়, তদর্থে সর্ব্বতোভাবে যত্ন করা উচিত ১৪; এবং যেহেতু তাহা কেবল এক অক্ষুণ্ণ স্ত্রী-সতীত্বেই সম্ভব হইতে পারে, অতএব সেই স্ত্রী-সতীত্ব যে কোন উপায়ে হউক, রক্ষা করিতে হইবে। ইহার পর, প্রণয়িনী বা সহধর্ম্মিণী ভাবাদির যে কিছু খাতির তাহা পরের কথা;—বাহ্যারাম, বামনগুলা যে নিতান্ত কাঁচকলাভাতে ও আলোচাউলখেগো ছিল, ইহাই তাহার প্রমাণ! মনু স্পষ্ট বিধি প্রদান করিলেন "ব্রত, জপ, হোম, বা শত শত উপবাস, ইহার কিছুই কোন কার্য্যে আসিবে না, কেবল একমাত্র পতি-শুশ্রূষা যে করিবে, সেই স্বর্গে যাইতে পারিবে"১৫। উক্ত কারণ পরম্পরায়

১৪। মনু. ৯। ৭ ও কল্লুকভট্ট-কৃত তাহার টীকা। পুনশ্চ যাজ্ঞবল্ক্য,

"লোকানন্ত্যং দিবঃ প্রাপ্তিঃ পুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রকৈঃ।
যস্মাত্তস্মাৎ স্ত্রিয়ঃ সেব্যাঃ কর্ত্তব্যাশ্চ সুরক্ষিতাঃ॥"

পুনশ্চ ভগবান মনু বলিতেছেন,

"প্রজনার্থং মহাভাগা পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়া শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন॥
উৎপাদনমপত্যস্য জাতস্য পরিপালনং।
প্রত্যহং লোকযাত্রায়াঃ প্রত্যক্ষং স্ত্রীনিবন্ধনং॥
অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৄণামাত্মনশ্চ হ॥"

স্কন্দপুরাণীয় কাশীখণ্ডে এরূপ লিখিত আছে,

"ভার্য্যা ধর্ম্মফলাবাপ্তৌ ভার্য্যা সন্তানবৃদ্ধয়ে।
পরলোকস্ত্বয়ং লোকো জীয়তে ভার্য্যয়া দ্বয়ং।
দেবপিত্রতিথীজ্যাদি নাভার্য্যঃ কর্ম্মার্হতি॥"

১৫। প্রায় সকল স্মৃতিকার ও সকল শাস্ত্রকারই এতদর্থে কিছু না কিছু বচন ঝাড়িয়া গিয়াছেন;—

"নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্‌যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতং।
পতিং শুশ্রূষতে যত্তু তেন স্বর্গে মহীয়তে॥"—বিষ্ণুসংহিতা।

এবং বিষয়টিরও নিজগুণে, এই স্ত্রী-সতীত্ব ক্রমে এ সংসারক্ষেত্রে হিন্দু-চিত্তের নিকটে অমূল্য রত্নস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহা প্রার্থনীয় ; গ্রীকের সেরূপ নহে। এখানে স্ত্রী-সতীত্ব বিষয়ের শাসন, সংসারিক শুভাশুভ এবং পরস্পর আত্মস্বার্থ ও তদতিরিক্তে ইহলোকদৃষ্টি, এই সকলে যতদূর করিয়া তুলিতে পারে, তাহাই। স্বামী ভাবিতেছে আমি যখন খাইতে পরিতে দিতেছি, তখন কেন অন্যের সহবাসে সতীত্ব ভঙ্গ করিবে ; স্ত্রী ভাবিতেছে যে, যখন এই ব্যক্তি আমার সমস্ত অভাব পূরণ করিতেছে, তখন প্রতিদানে তজ্জন্য সতীত্বটা রক্ষা করা উচিত ; এ ভাবনাটুকুরও আবার, আরও একটু প্রাচীন কালে, তত আঁটা আঁটি ছিল না, সুতরাং ভাবনার বিষয়ীভূত পদার্থও সেই পরিমাণে তখন শিথিল ছিল বলিতে হইবে। হিন্দুর নিকট সতীত্ব ভাল, ধর্ম্মবুদ্ধিতে ; গ্রীকের নিকট সতীত্ব ভাল, দানপ্রতিদানের বাঁধাবাঁধিতে। ইহার পরেও যদি গ্রীক রমণীর সতীত্ব ভঙ্গ হইত, তাহা কিয়ৎপরিমাণে সমাজে অযশস্কর হইত বটে তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু তাই বলিয়া সে যে একেবারে হেয় হইয়া যাইত, বা মিটাইয়া দিলে মিটিত না, তাহা নহে। হয় স্বামী স্বচ্ছন্দে তাহাকে পুনর্গ্রহণ করিতে পারিত, তাহাতে কিছুমাত্র উপহাসের বিষয় হইত না ; নতুবা সে স্ত্রী আবার পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারিত, তাহাতে সে বিবাহে কিছুমাত্র বাধকতা জন্মিত না। পুনশ্চ স্বামী, যখন ইচ্ছা, আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ

"পতিপ্রিয়হিতে যুক্তা স্বাচারা সংযতেন্দ্রিয়া।
ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানুত্তমাং গতিম্॥"—যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।
"ভর্ত্তা দেবো গুরুর্ভর্ত্তা ভর্ত্তা তীর্থব্রতানি চ।
তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য পতিমেকং সমার্চ্চয়েৎ॥"—
বৃদ্ধ ভারতীয় কর্ম্মবিপাকে।
"গয়াদীনাং সুতীর্থানাং যাত্রাং কৃত্বা হি যদ্ভবেৎ।
তৎ ফলং সমবাপ্নোতি ভর্ত্তৃশুশ্রূষণাদপি॥"—পদ্মপুরাণে ভূমিখণ্ডে।

বেদেও পতিব্রতার বহুশ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অগ্নি কিরূপ শুদ্ধ হয়েন, তাহার উপমাস্থলে কথিত হইয়াছে, "অনবদ্যা পতিজুষ্টেব নারী"—ঋঃ বেঃ।

করিতে পারিত; এবং সেরূপ ত্যাগ করিতে হইলে, যথাসম্ভব কিছু অর্থ দিয়া সেই কামিনীকে তাহার পিতার নিকট পাঠাইয়া দিত ১৬। মানিলস স্বচ্ছন্দে হেলেনকে পুনর্গ্রহণ করিয়াছিল; হেলেনও যে আপন সতীত্ব ভঙ্গে ও বহুকাল পরসহবাসে কিছু বিশেষ অপ্রতিভ হইয়াছিল তাহা নহে। ওডিসী কাব্যের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমে, যেখানে টেলিমেকসের নিকট হেলেন ট্রয়বৃত্ত স্বের উল্লেখ করিতেছে, তথায় তাহার ভাবভঙ্গি অনুধাবন করিলে বড় একটা সেরূপ অপ্রতিভ ভাবের চিহ্ন পাওয়া যায় না। ইউলিসিস্‌পত্নী পেনিলোপিকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত ইথেকাদ্বীপে বহু প্রণয়প্রার্থীর সমাগম বিখ্যাত। গ্রীকেরা এ বিষয়ে সময়ে সময়ে এতই উদারতা দেখাইয়াছে, যে আত্ম হইতে অপর বীরপুরুষের প্রতি অনুরাগ দেখিলে, স্ত্রীকে স্বচ্ছন্দে তাহার সহবাস করিতে অনুমতি দিয়াছে; ইহাতে কোন সন্তান জন্মিলে, সেই সন্তানকে তাহার জনকের বাড়ী পৌঁছাইয়া দিলেই সে ঘটনার সকল চিহ্ন লোপ হইল; স্বামি-স্ত্রী সম্বন্ধে অতঃপর ইহাতে আর কিছুমাত্র প্রতিবন্ধকতা করিল না। দুই ঘর গৃহস্থের এক গৃহিণী, দুই বংশের বংশধরের একই জননী হইতে উৎপত্তি, ইহা প্রায় সর্ব্বদাই ঘটিত ১৭। এরূপ ঘটনার ঘটনাস্থলী স্পার্টা নগর, ফলত তথায় সতীত্ব কাহাকে বলে, তাহা বড় একটা জ্ঞাত ছিল না। গ্রীক দেবমণ্ডলে প্রণয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যিনি আফ্রোদিতি, তিনি ব্যভিচারিণীর শিরোমণি।

১৬। Odyssey II. 131—131. এণ্টিনৌস কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া টেলিমেকস বলিতেছেন,—"সন্তান হইয়া কিরূপে পুনর্ব্বার বিবাহার্থে স্বাধীনতা দিয়া, মাতাকে পিতৃভবনে পাঠাইয়া দিব।" বিশেষত তাহার মাতাকে তদ্রূপ ফেরত পাঠাইলে যে অর্থদণ্ড দিতে হয়, মাতামহ ইকারিয়সকে তদ্রূপ অর্থদণ্ড দেওয়া তাঁহার সামর্থ্যের অতীত বলিয়া টেলিমেকস্ প্রকাশ করিতেছেন। এতদ্দৃষ্টে পণ্ডিতদিগের মতে এরূপ কথিত যে, গ্রীসীয় নিয়ম মতে, স্ত্রী পরিত্যাগ করিতে হইলে, স্ত্রীর পিতাকে অর্থদণ্ড দিয়া স্বামীকে স্ত্রী পরিত্যাগ করিতে হয়।

১৭। Grote's History of Greece, II 520. "No personal feeling or jealousy on the part of the husband found sympathy from any one—and he permitted without difficulty, sometimes actively encouraged, compliances on the part of his wife," &c. &c.

সতীত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবী যিনি দীয়ানা,তাঁহার ক্রমান্বয়ে এণ্ডিমিয়ন, প্যান, এবং ওরিওনের প্রতি আসক্তি ও রতি! ইহার পরে আর অন্য কথা কি আছে! সীতা সাবিত্রী প্রভৃতির ন্যায় সতী, বা বন গমন কালীন সঙ্গে লইবার জন্য রামের অমত হেতু তৎপ্রতি সীতার বাক্য১৮, সমস্ত গ্রীক সংসার খুঁজিয়া কোথাও পাইবার সম্ভাবনা নাই; অন্তত আমার চক্ষে কোথাও পড়ে নাই। যে সতীত্ব বুদ্ধি গ্রীকমণ্ডলীতে ছিল, অল্প ইতর বিশেষে পাশ্চাত্য ভূমিতে আজিও প্রায় সেই বুদ্ধি বিরাজ করিতেছে; তথাপি জাঁক কত! গায়ে বল থাকিলে সকল কথাই দাঁড়ায়, তদভাবে সকল কথাই ভাসিয়া যায়।

স্ত্রী-স্বাধীনতা গ্রীসে অপরিমিত ছিল১৯, স্ত্রীপুরুষে কুস্তিকুন্দন আদি

১৮। রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড ২৭ হইতে ৩০ সর্গ, রাম ও সীতার উক্তি প্রত্যুক্তিতে সীতা বলিতেছেন;—

"ন পিতা নাত্মজো নাত্মা ন মাতা ন সখীজনঃ,
ইহ প্রেত্য চ নারীণাং পতিরেকো গতিঃ সদা।
যদি ত্বং প্রস্থিতো দুর্গং বনমদ্যৈব রাঘব,
অগ্রতস্তে গমিষ্যামি মৃদ্নন্তী কুশকণ্টকান্।"

কি অপূর্ব্ব! কি অপূর্ব্ব! বিধাতঃ যে রত্নগর্ভাগর্ভে এবম্ভূত সাধ্বীগণ, যে রত্নগর্ভাগর্ভে এবম্ভূত সাধ্বীমুখনিঃসৃত বাক্য, উৎপাদন করিয়াছিলে, বলিতে পার কোন প্রাণে আবার তাহাকে এরূপ বিড়ম্বনা করিতে সক্ষম হইয়াছ! মাতঃ ভারতবর্ষি, মা কোন পাপে তোমার এ বিড়ম্বনা? তোমার এ কুসন্তান মহলে যে, 'তপশ্চারণে তোমার প্রায়শ্চিত্ত করিব' এ সান্ত্বনাবাক্য বলি, সে সাহসও আমাদিগের নাই। এ টিকটিকীর বংশ নিপাত হইবে কবে?

১৯। হোমারিক সময়ের স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে গ্রোট সাহেব লিখিতেছেন; "She even seems to live less secluded and to enjoy a wider sphere of action than was allotted to her in historical Greece."—Grote's Greece, II. ইংরাজচিত্ত বলিয়াই ইহা আপেক্ষিক স্বাধীনতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা কতদূর আপেক্ষিক তাহা ঐ পুস্তকের ৫১৬ হইতে ৫২৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দৃষ্টে বিবেচ্য। উদ্ধৃত অংশে "Secluded" শব্দ দৃষ্টে যেন এরূপ বিবেচিত না হয় যে, ঐতিহাসিক সময়ে গ্রীসে জেনানা বা অবরোধ প্রথা প্রচলিত ছিল। তাহা নহে। স্ত্রীগণ সচ্ছন্দে বাহির হইত, প্রায় সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পাইত, পর্দ্দাহে মাতামাতিও প্রায় সমান ছিল এবং তদুৎপন্ন

পর্য্যন্ত করিত; আবার পর্ব্বাহস্থলে, স্বাধীনতা ছাড়াইয়া, স্বাধীন প্রেমভেরিরও চলাচলি পক্ষে ত্রুটি হইত না। ভারতে তাহা ছিল না; অন্য ইতর বিশেষে ভারতললনা চিরকালই 'অসূর্য্যম্পশ্যরূপা', তবে স্থানবিশেষে এবং ধর্ম্মকর্ম্মকালে পতি পুত্র বা তদ্রূপ আত্মীয়াদির সহযোগে কখনও কখনও বাহির হইতেন; মুখাবরণের ঘটা তাদৃক ছিল না, সুতরাং, স্ত্রীলোকে কিছু দেখিতে পায় না বলিয়া স্ত্রী-স্বাধীনতার স্বপক্ষে এখন যাহা কারণ স্বরূপ দর্শিত হইয়া থাকে, সে কারণের অস্তিত্ব তখন বড় একটা ছিল না। গুরু, ঋষি, আত্মীয়বর্গ, ইহাঁদের সহিত স্বচ্ছন্দ কথা কহিবার অধিকার ছিল। ইহার অতিরিক্ত আর কোন স্বাধীনতা ছিল না। বাঞ্ছারাম, ভাল না মন্দ? এখন একবার ভারত-কন্যাদিগের কথা পাড়া যাউক।

ভারতকন্যা আজি কালি এল, এ, হইতেছেন; বি, এ, হইতেছেন; মন্দ কি? ঘর করিতে সকল রকমই থাকা ভাল। গ্রামের মধ্যে একজন বা খুব খাইয়ে থাকে, একজন বা খুব পলোয়ান থাকে, একজন বা খুব নকুলে থাকে, হলো বা একজন বিদ্যাবাগীশও থাকিয়া থাকে। এ সকলে বিশেষ কাহারও কোন কাজ হউক বা না হউক, কিন্তু ইহারা গ্রামের শোভা, গ্রামের আসবাব; ঘর করিতে গুমরের স্থল। এল, এ ভারতকন্যা, বি, এ ভারতকন্যা, ইহারাও সেইরূপ দেশের আসবাবের স্বরূপ; বহুজনকে গুমর করিয়া দেখাইবার পদার্থ! সুতরাং ইহাদের স্বাধীনতাও অনেক, স্বাধীনতার আবশ্যকও অনেক। কিন্তু সংসার শুদ্ধ সকলেই আসবাব হইলে বিধাতার সৃষ্টি চলে না; বা সবাই যদি গুমরের স্থল হয়, তবে গুমরের গুমরত্ব থাকে না। সুতরাং গুমর ও আসবাবের স্বাধীনতাও অপর সকলে প্রযুক্ত হইতে পারে না। গৃহকামিনীগণ, স্বামী সন্তানাদি লইয়া গৃহকার্য্য যাহাদিগের নিত্য ব্রত, দেখাযাউক তাহাদিগের স্বাধীনতা কি পরিমাণে উপযুক্ত এবং আবশ্যক হইতে পারে। ইংরেজেরা করিতে বলে

ক্রিয়াসক্তিরও ন্যূনতা ছিল না। অতএব ঐ "Secluded" শব্দ পুরুষাবস্থার তুলনে কেবল আপেক্ষিক অর্থবোধক মাত্র।

এবং ইয়ংবেঙ্গলেরা করিতে উদ্যত,—আয়া! ইয়ংবেঙ্গলদিগের ইহাতে কি বিশেষ লাভ আছে, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু ইংরেজদিগের লাভ ইহাতে অনেক;—স্বামী গোলাম, স্ত্রী আয়া, ইহা অপেক্ষা সুখের প্রভুত্ব আর কি হইতে পারে? সেদিন একটী ইংরাজ মেয়েমানুষের সঙ্গে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটী বাঙ্গালী স্ত্রী দেখিলাম। গোলাম কেরাণী স্বামীর মত, বাঁদী আয়াবৎ স্ত্রীলোকটীর অবনত মস্তক দেখিয়া আমার চক্ষুকে মনের খেদে বলিয়া ছিলাম, বলি তুমি একটু জল ফেল; এবং বলিতে কি বাপ্পারাম, রাগে সে রাত্রিতে আমার ঘুম হয় নাই। এ পরভাগ্যোপজীবী গোলামের জাতির ঘৃণাপিত্তি কিছুই নাই। স্ত্রীমহলেও যদি গোলামী বুদ্ধি প্রবেশ করে, তবে আমাদের আশা আর ভরসা বা উপায় রহিল কি?—মান অপমান ত দূরের কথা!

শাসনফলে জগৎ, শাসনময় জগৎ। উদ্দেশ্য শুদ্ধ সত্তা। এ জগতে বা এ বিশ্বে পর পর সকলেই শাসনের অধীন, স্বাধীন কেহ নাই; অথচ অধীনতাতেই স্বাধীনতা। বিনা অধীনতায় স্বাধীনতা অসম্ভব। ভূত আত্মার, লঘু গুরুর, নীচ উচ্চের, ছোট বড়র, অজ্ঞানী জ্ঞানীর, অধীনতা স্বীকার করিয়া থাকে। উদ্দেশ্য, অধম যে সে শক্তিন্যূনতায় বিপথে বিচলিত না হয়; শ্রেষ্ঠ যে সে আপন শক্তির ভার দানে সেই শক্তিন্যূনতার সমতা করে। ইহা দ্বারাই অধমের শুদ্ধসত্তা রক্ষা হয়। ন্যূন শক্তির সমতা সাধিত হইলে, তখন সে শ্রেষ্ঠ শক্তির সহ সংমিলনে পাবক হয়, ও সংমিলিত হইয়া থাকে। এই সংমিলনে ফলের উৎপত্তি; ঐ ফলও একটী বিধাতৃবিহিত সৃষ্টি বিশেষ। আবার সেই সমতার যখন অভাব হয়, তখন ন্যূন শক্তি শক্তির ন্যূনতা হেতু মতিভ্রান্ত; এবং শ্রেষ্ঠ শক্তি শক্তির আধিক্য হেতু উন্মাদদৃপ্ত হইয়া থাকে, এবং তখন শ্রেষ্ঠ শক্তির সেই উন্মাদ-ঘূর্ণিতে ন্যূনশক্তি আহুতি হইবার, উচ্ছৃঙ্খলতা বা প্রলয়-ভাবের সমুপস্থিতি হয়।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই স্ত্রী এবং পুরুষ, ইহার মধ্যে ন্যূন শক্তিই বা কে, আর শ্রেষ্ঠ শক্তিই বা কে? যুগধর্ম্মে ইহাও জিজ্ঞাসা করিতে হইতেছে, নতুবা ইহা নিত্য স্থিরীকৃত হইয়া রহিয়াছে। আমেরিক ও

ইউরোপভূমের অনেক ললনা, কখনও বা ভারতললনাহৃদীয় দুই একটী অনুকরণকারী অতিগামী পুরুষ, বলিয়া থাকে যে, পুরুষ এবং স্ত্রী ইহাদের মধ্যে শক্তির প্রভেদ কোথায়, এবং কেনইবা স্ত্রী সমাজমধ্যে পুরুষের সহ সমানরূপ ক্ষমতাভূষিত ও ক্ষমতা ভূষায় গণনীয় ও মাননীয় না হইবে? বাঞ্ছারাম, আরও কি অবিশ্বাস আছে যে, কলিযুগে তাবৎ বিষয় উল্টা হইয়া দাঁড়াইবে?

বিধাতা রমণীগণকে ক্ষীণশক্তি ও কোমলপ্রকৃতি করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কি বাহুচালনে কি বুদ্ধিচালনে, পুরুষের তাহারা সমকক্ষ নহে। ইহাও প্রাকৃতিক নিয়ম যে, তৎ তৎ বিষয়ে এবং রমণীজনোচিত যাবতীয় বিষয়ে, তাহারা পুরুষের মুখাপেক্ষী। যাবতীয় প্রাণিসৃষ্টিতেও ইহাই অভিনীত। এই নিমিত্ত ইহারা শ্রেষ্ঠশক্তি পুরুষের অধীন থাকিবে, ইহাই বিধাতার নিয়ম; ইহার অতিরিক্তে যাহারা যায়, 'প্রকৃতির বিরুদ্ধে তাহাদের সংগ্রাম করা' ভিন্ন তাহার অন্য কোন নাম প্রদান করিতে পারা যায় না; এবং আমরা জানি প্রকৃতির বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম তাহা কখনও সুফলপ্রদ হয় না, কুফলেরই প্রভূতরূপে উৎপত্তি করিয়া থাকে। স্ত্রী পুরুষের অধীন হইবায়, পুরুষের এক্ষণে কর্ত্তব্য হইতেছে এই যে, তাহার শক্তিপরিচালনে স্ত্রীর শুদ্ধসত্তা সর্ব্বতোভাবে পরিরক্ষণ; এবং স্ত্রীশক্তি সহ স্বীয় শক্তি মিশাইয়া, শক্তির সমতা সাধন। এতদুভয়ের মধ্যে শুদ্ধসত্তা রক্ষা যাহা তাহা গুরুতর। এক্ষণে বিবেচ্য, সেই শুদ্ধসত্তা কি ও কিভাবে পরিরক্ষণীয় হওয়া উচিত।

স্ত্রীলোকের এ সংসারে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বপ্রধান কার্য্য, কোন উপযুক্ত পুরুষের গৃহলক্ষ্মী হইয়া সন্তানাদি পালন ও আভ্যন্তরিক গৃহধর্ম্ম সংসাধন। পুত্র ষষ্ঠীদাস, স্বয়ং ষষ্ঠীদাসী এবং স্বামীকে ষষ্ঠীর চেলা না করিয়া; অথবা পুত্র ক্রীড়াপুতুল, স্বয়ং কার্পেট-লক্ষ্মী এবং স্বামীকে ভেড়ো না বানাইয়া; যে স্ত্রী স্বয়ং শক্তিস্বরূপা এবং সেই শক্তির উত্তেজনে পুত্রকে যে মানুষ এবং স্বামীকে যে কর্ম্মবীর করিয়া তুলিতে পারে, সেই স্ত্রীই এ জগতে সার্থকজন্মা; সেই কামিনীই এ জগতে যথার্থ কামিনীপদবাচ্য; —"যা সৌন্দর্য্যগুণান্বিতা পতিরতা সা কামিনী কামিনী।" এ জগতের

প্রত্যেক কামিনীর পক্ষে ইহাই কর্ত্তব্য বলিয়া জানিবে এবং এই পথ অবলম্বন করাই উচিত; না করিলে প্রত্যবায় আছে। কেবল বৈধব্য হেতু যাহার সে পথ রুদ্ধ হইয়াছে, বা যাহার যত্ন সত্বেও স্বামী পুত্র সংশ্রব অপ্রাপ্য, তাহারই জন্য অন্য ব্যবস্থা বা অন্য পথ। যাহাহউক, অতঃপর স্ত্রীলোকের সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া যাহা কথিত হইল, দেখা যাউক তাহা কিরূপ প্রকরণ ও আচরণ যোগে সুভাবে ও সর্ব্বাবয়বসম্পন্নরূপে সুসাধিত হইতে পারে। প্রকরণ ও আচরণের মধ্যে মূল বস্তু যাহা তাহা স্বামীর প্রতি প্রণয় ও আসক্তি। স্ত্রী প্রণয় ও আসক্তির দ্বারা স্বামীকে আকর্ষণ করিবে; স্বামীও তাহাকে যথোপযুক্তরূপে পরিচালন দ্বারা সেই প্রণয় পরিপোষণ করিবে এবং তাহার গৃহকার্য্য সংসাধনাদি ও তাহাতে সুমতি সংস্থাপনের পক্ষে প্রতিকূল কারণ সমূহের নিরসন করিয়া দিবে। ইহা দ্বারা উভয় শক্তির সমতা সম্পাদিত হইবায়, সুসংমিলন হেতু ফলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। যে হতভাগ্য স্ত্রী বা পুরুষের ভাগ্যে এরূপ স্ত্রীত্ব বা স্বামিত্ব ঘটে নাই, তাহার পক্ষে স্বতন্ত্র বা সময়ানুরূপ যে কোন ব্যবস্থা। তাহারা বিধাতৃনিয়মভঙ্গ হেতু তদ্বিষয়ক বিধাতৃনিয়ম অনুসারে দণ্ডযোগ্য, অতএব তাহাদের পক্ষে কোন ব্যবস্থাই একেবারে সুখের বা শুভকরী হইতে পারে না। বলা বাহুল্য যে, পূর্ব্বোক্ত কথা অনুসারে, যে সকল বালবিধবার সন্তানোৎপত্তি হয় নাই ও যাহারা গৃহধর্ম্মে স্থাপিত হইতে পারে নাই, বিবাহযোগে তাহাদের নব পুরুষ সহ সংযোজিত হওয়া সর্ব্বতোভাবে একান্ত কর্ত্তব্য, নতুবা এখানেও প্রত্যবায় আছে। কিন্তু যেখানে বিধবা, বয়স হেতু হউক বা যে কোন কারণে, পুরুষান্তরে প্রতিকূলমনা, সেখানে তদ্রূপ বিবাহসংযোগ অকর্ত্তব্য; কারণ অননুকূল ও পথান্তরগামী শক্তির সংমিলনে বিকৃত ফলের উৎপত্তি হয়। পুনশ্চ, শ্রেষ্ঠশক্তি এবং ন্যূনশক্তি হইলেই যে সংশ্রবমাত্রে তাহাদের সমতাসাধন ও সংমিলন রক্ষা হয় এমন নহে; সমধর্ম্মী বা সদৃশপ্রকৃতি হইলেই কেবল তাহা রক্ষা হওয়ার সম্ভাবনা। এতদর্থে, সংমিলনের পূর্ব্বে, যথাসম্ভব পরস্পর পরস্পরের প্রকৃতি জ্ঞাত হওন একান্ত আবশ্যক। মনুষ্য পক্ষে যে ইহা কেবল বহুকালব্যাপী কোর্টসীপের দ্বারা সম্পন্ন হয় তাহা নহে; বরং যেখানে

সেরূপ দীর্ঘকাল লাগে সেখানে সুসম্পন্ন হয় না, এবং যদি হয় তাহা ভাক্ত। সমধর্ম্মী প্রকৃতির এমনিই একটী আকর্ষণশক্তি আছে যে, তাহারা পরস্পর সম্মুখীন হইবামাত্র উভয়ে উভয়ের প্রতি আনত হইয়া থাকে। সুতরাং পরস্পরের এই সম্মুখীনটুকু হইতে দেওয়া আবশ্যক; এবং সেই আকর্ষণী শক্তিটুকু যাহাতে পরস্পরে অনুভব করিতে সমর্থ হয়, তদর্থে তাহাদের বুদ্ধি উদ্ভিন্ন হওয়ার কাল পর্য্যন্তও অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু স্ত্রীপুরুষ উভয় পক্ষের বাল্যবিবাহ দ্বারা তাহা সর্ব্বদা ঘটিতে পায় না, অতএব মোটের উপর ধরিতে গেলে বাল্যবিবাহ দূষিত। প্রাচীন আর্য্যেরা এই নিয়মের বশবর্ত্তী না হওয়াতেই, তাঁহাদিগকে স্ত্রীর প্রতি এতটা কঠোর শাসন; এবং 'স্বামীই স্ত্রীর পক্ষে ধর্ম্ম অর্থ কাম' ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যের সৃজন করিতে হইয়াছিল। স্ত্রীর প্রতি পুরুষের ব্যবহার কি তাহা ইহাঁরা বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন; কিন্তু স্ত্রী কিরূপ হইলে ও কিরূপে সেই ব্যবহার গ্রহণ করিতে পারিলে, ব্যবহারে সুফল উৎপন্ন হয়, তাহা বুঝেন নাই। স্বয়ম্বরাদি প্রথা ছিল বটে, কিন্তু তাহা নামে মাত্র ও অতি বিরল। পাপে পাপ টানিয়া আনে; বিবাহযোগ্যাকে বালিকা করিতে গিয়া, পুরুষকেও আখেরে বালক হইতে হইয়াছে! অতঃপর চরিত্র বিষয়ে যে যে নিয়ম স্ত্রীর পক্ষে সৎ বলিয়া উক্ত, পুরুষের পক্ষেও তাহা অবিকল প্রযুক্ত; এবং তাহার অন্যথায় পাপের ভরাও উভয় পক্ষে সমান।

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য কি, এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য কি, তাহা উপরে যথাযথ উক্ত হইয়াছে। স্ত্রীতে সেই কর্ত্তব্য করিবে, স্বামীতে কর্ত্তব্যের প্রতিদান দিবে ও সেই কর্ত্তব্য করাইবে; আবার সাধারণ কর্ম্মক্ষেত্রে উভয়ে একমিল হইয়া কর্ম্মপথের অনুসরণ করিবে। যাহা হউক, এক্ষণে পরস্পর সম্বন্ধে, স্ত্রীর সেই কর্ত্তব্য পালনে কতদূর সক্ষমতা ও স্থিরশক্তি, তাহা অবধারিত হইলে, স্বামীর শাসন কিরূপ ও কি পরিমাণে হওয়া উচিত তাহা অনায়াসে উপলব্ধি হইতে পারিবে।

ইতর জীব হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত, কি শারীরিক কি মানসিক উভয়ত, স্ত্রীর প্রকৃতি, পুরুষের প্রকৃতি অপেক্ষা, স্বভাবত অনেক ক্ষীণ। মনঃপ্রকৃতির অনুসরণ করিয়া থাকে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, পুরুষের চিত্ত কিরূপ ও কত

পরিমাণে পাপবিরক্ত ও নীতিপথগামী এবং কি পরিমাণে নিষ্ঠা ও কর্ত্তব্য সম্পন্ন। ফরাসিস্ মণ্টেইন কহিয়া গিয়াছেন যে, 'প্রত্যেক মানব যদি সরলভাবে আপন আপন মনের কথা প্রকাশ করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পৃথিবীর প্রত্যেক মানবকে জীবনে অন্তত পাঁচ ছয় বার করিয়া ফাঁশি কাঠে ঝুলিতে হয়।' ঠিক কথা! পাষণ্ডপণা, কদাচরণের অভিলাষ, বা নানাবিধ কুচিন্তা আদি যে মন দিয়া প্রতিনিয়ত কত গতায়াত করিয়া থাকে, তাহা সকলেই সতর্কভাবে আপন মনকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। উত্তম, মধ্যম, অধম, সকল চিত্তেই ইহা সমান। সেই কুচিন্তা প্রভৃতির রাশিকে অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখিতে আত্মিক শক্তি প্রয়োগের যে ন্যূনাধিক্য ভাব, তাহা হইতে মানবের জ্ঞানসংসারে উত্তম, মধ্যম, অধম প্রভৃতি পর্য্যায় ভেদ হইয়া থাকে। পুরুষের প্রকৃতি সবল; পুরুষের চিত্তশক্তি সবল, পুরুষের আত্মিক শক্তি সবল দেখ তথাপি জগতে পুরুষ এত দুষ্কর্ম্মশীল! এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, ক্ষীণ-প্রকৃতি, ক্ষীণচিত্ত ও ক্ষীণ-আত্মিক-শক্তি স্ত্রী যদি পুরুষের সহ সমস্বাধীনতা পায়, তবে তাহাদের পুরুষ অপেক্ষা কত অধিক পরিমাণে দুষ্কর্ম্মশীল হওয়ার সম্ভাবনা? বিশেষ পুরুষে, পতন হইলেও, সবলপ্রকৃতি হেতু সহসা পুনরুত্থান করিতে পারে ও করিয়া থাকে; কিন্তু স্ত্রীতে, একবার পতন হইলে, ক্ষীণ প্রকৃতি হেতু হউক বা যে কোন কারণেই হউক, আর প্রায় পুনরুত্থান করিতে পারে না, অন্তত কখন করিতে দেখি নাই বা শুনি নাই; পরন্তু তাহারা যখন যাহাতে আনত হয়, তাহাতে তাহারা পর পর আরও আনত হইয়া থাকে। তাহার পর, স্বার্থ ধরিয়া দেখিতে গেলে সে পথেও অনর্থ দৃষ্ট হয়; পুরুষ দুষ্ট হইলে অপরের ঘরে জঞ্জাল উৎপাদন করে, কিন্তু স্ত্রী দুষ্টা হইলে আপন ঘরে জঞ্জাল উৎপাদন করিয়া থাকে। কথিত ক্ষীণতা স্থলে স্ত্রীর শুদ্ধসত্তা যাহা তাহার রক্ষা এবং শুদ্ধসত্তার অভিপ্রেত কর্ত্তব্যসাধন উপযুক্ত ভাবে হইতে পারে না। সুতরাং পুরুষের অপেক্ষা যে পরিমাণে স্ত্রীর প্রকৃতি, চিত্ত ও আত্মিক শক্তি ক্ষীণ, সেই পরিমাণে তাহার সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনতা লোপ করা কর্ত্তব্য। পুনশ্চ অন্য দিকে যে প্রণয় ও আসক্তি স্বামীকে আকর্ষণ করিবার

সূত্র ও যদ্দ্বারা যুগলসংযোগ সাধনে ফলের উৎপত্তি হয়, স্ত্রীসতীত্ব প্রধানতঃ তাহার মূল; অতএব সেই স্ত্রীসতীত্ব যে কোন উপায়ে রক্ষা করা শ্রেয়ঃ। ইয়ংবেঙ্গলদিগের প্রার্থিত স্ত্রীস্বাধীনতা কখনই অবলম্বনীয় নহে, বিশেষতঃ আমাদিগের এই পরাধীন অবস্থায়! এ পরাধীন অবস্থায় তাহা বিড়ম্বনা ও নানা ভাবী দুঃখের কারণ স্বরূপ হইবে। বাঞ্ছারাম, যে দিন তুমি নিজে সাহেবের রোষকষায়িত নেত্র উপেক্ষা করিতে পারিবে, তখন আবার এ কথা তুলিও, তোমার সঙ্গে বিচার করা যাইবে। অতঃপর বলা বাহুল্য যে, স্ত্রীস্বাধীনতা বলিয়া কোন পদার্থ নাই, স্ত্রী-অধীনতাই বস্তুত পদার্থ। তাহার মধ্যে কেবল এই টুকু প্রভেদ যে এ অধীনতা, স্ত্রীর, শিক্ষা ও শক্তির আত্মিক উৎকর্ষ অপকর্ষ অনুসারে, সরল বা কূট ভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ও হওয়া উচিত।

উপরে যে স্ত্রী-স্বাধীনতা বা স্ত্রী-অধীনতার বিষয় বিবেচিত হইল, অধুনাতন ইউরোপ ও আমেরিক ভূমে তাহা, তাহার সীমা অনেক অতিক্রম করিয়া গিয়াছে; এবং অধুনাতন ভারতে আবার তাহা সেই সীমার অনেক নিম্নে পড়িয়া রহিয়াছে, স্ত্রীর উৎকর্ষ সহ সমতা রাখা হইতেছে না। কিন্তু এ সকল বিষয় নিম্নে থাকা বরং ভাল, তথাপি সীমার উপরে উঠিয়া যাওয়া কোন রকমে ভাল নহে। গ্রীকসিমন্তিনীবর্গে স্বাধীনতা সাধারণতঃ সেই সীমার উপরে ছিল। কিন্তু যেমন এ দিকে সীমা অতিক্রমী স্বাধীনতা ছিল, তেমনি আবার অন্য দিকে ভগিনী কন্যাদিগকে দাসীত্বে বিক্রীতও হইতে হইত। স্ত্রীগণকে দাসত্বে বিক্রয়শক্তি সোলনের বিধি ২০ দ্বারা নিবারিত হয়।

মন্বাদি ব্যবস্থাগ্রন্থে যে অষ্ট প্রকার বিবাহ বিধানিত আছে ও হিন্দু সমাজে যাহা চলিয়া আসিয়াছে, তাহার মধ্যে কেবল একমাত্র আসুর বিবাহে শুল্ক লইয়া কন্যা সম্প্রদান ভিন্ন আর কোন বিবাহে সেরূপ হইত না; এবং সেই শুল্ক লইয়া কন্যাদান সাধারণত ইতর শ্রেণীস্থ লোকের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইত ২১। গ্রীক ভূমে তাহা নহে;

২০। Grote's Greece, Vol. III, P. 188.

২১। কন্যাদানের শুল্কগ্রাহকের প্রতি মনু এরূপ উক্তি করিয়াছেন—

হিন্দুর মত এরূপ নানা বিবাহ ছিল না, বিবাহ করিতে হইলে কেবল মাত্র শুল্ক দ্বারা কন্যা গ্রহণ করিতে হইবে ২২। সোলনের বিধি অনুসারে আবার বিবাহিত কন্যা, এক বিবাহ যৌতুক ভিন্ন, অপর কোন অর্থ পদার্থ বা অলঙ্কার লইয়া স্বামিগৃহে যাইতে পারিত না। বিবাহ-যৌতুকও, স্ত্রী যদি মৃত হইত, তবে পুনর্ব্বার স্ত্রীর পিতাকে তাহা কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া ফেরত দিতে হইত। হিন্দুর ব্রহ্মাদি বিবাহে ধনরত্নাদি অলঙ্কার সহ কন্যাদান করিতে হইত, এবং স্ত্রীর মৃত্যুতে তাহা ফেরত দিতে হইত না। প্রাচীন হিন্দুর কিন্তু বহুবিবাহ পক্ষে কোন প্রতিবন্ধক ছিল না। গ্রীকের মধ্যে বহুবিবাহ ছিল না। সমস্ত গ্রীক ইতিহাস খুঁজিয়া কেবল ট্রয়রাজ প্রিয়াম ২৩ ও স্পার্টার অধিপতি অনক্ষন্দ্রিদিস ২৪ এই দুই জনের বহু বিবাহ দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাও ঘটনাচক্রে পড়িয়া ঘটিয়াছিল। হিন্দুর বিবাহ জীবনের একটী প্রধান ধর্ম্মসংস্কার; গ্রীকের বিবাহের সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সংস্রব ছিল কি না তাহা স্মরণ হয় না। হিন্দুর গৃহিণী ধর্ম্মপত্নী ও সহধর্ম্মিণী; আর গ্রীকের গৃহিণী গৃহ-পত্নী ও গৃহসঙ্গিনী।

হিন্দু রমণীগণ প্রভূতরূপে শিক্ষিতা হইতেন। গার্গি ও বিশ্ববারা বেদসূক্ত বিশেষের রচয়িত্রী; এবং মনু বলিয়া গিয়াছেন কন্যাগণ, "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ" পুত্রের ন্যায় পালনীয়া ও শিক্ষণীয়া হইবে। এরূপ আরও শিক্ষা ও শিক্ষিত স্ত্রীলোকের অনেক

"ন কন্যায়াঃ পিতা বিদ্বান গৃহ্ণীয়াচ্ছুল্কমণ্বপি।
গৃহ্নন্ শুল্কং হি লোভেন স্যান্নরোঽপত্যবিক্রয়ী॥"

২২। Grote's Greece, Vol. II, P. 113.

২৩। Illiad, XXI.

২৪। Herodotus, V, 39-40. আরও কথিত আছে যে এক সময়ে বহুতর লোকে এবং সক্রেটিসও দুই স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছিলেন, কারণ সেই সময়ে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আথেন্স নগরে পত্ন্যন্তর গ্রহণের একটী বিধি প্রচারিত হয়। Deog. Laert. Socrates x. কিন্তু ইহা কতদূর সত্য, তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। এমনতর উল্লেখ আরও দু এক স্থলে দু একটী দেখা যায়।

উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু এই স্ত্রীশিক্ষা যে সর্ব্বজনীন ছিল, তাহা বলিতে পারি না; তবে এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে এখনকার ভদ্রকুলোদ্ভবা স্ত্রীগণ অপেক্ষা অনেক অধিক শিক্ষিত হইতেন, অথচ ঘরেও আটক থাকিতে আপত্তি করিতেন না। গ্রীকদিগের সম্বন্ধে অতি প্রাচীন কালে তাহারা কিরূপ শিক্ষিত হইত বলিতে পারি না; কিন্তু ঐতিহাসিক সময়ে শিক্ষিত স্ত্রীলোকের অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়। আরিষ্টিপুসের কন্যা ও শিষ্যা আরিতে, প্লেটোর শিষ্যা লাস্থিনিয়া ও অক্সিওথিয়া, পীথাগোরাসের শিষ্যা থিয়ানো ও পীথাগোরাসের কন্যা দামো, ইত্যাদি স্ত্রীগণ কেবল শিক্ষিতা ছিল না, বহুশ্রমসাধ্য তত্ত্ববিদ্যারও অনুশীলন করিত। সে যাহা হউক, গ্রীককামিনীগণ সামাজিক তত্ত্বাদিতে সাধারণত প্রভূতরূপে শিক্ষিত ছিল, এবং সামাজিক বিষয়সকল বহুপরিমাণে তাহাদের দ্বারা উত্তেজিত ও উৎসাহিত হইত। স্পার্টার রমণীগণের সাহস, দেশহিতৈষিতা, ও তদর্থে তাহারা স্বামিসন্তানগণের প্রতি যেরূপ উত্তেজনা করিত, তাহা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অল্প বিস্তর জ্ঞাত আছেন। লিউক্ট্রার যুদ্ধে যাহাদের যাহাদের স্বামিসন্তানাদি বিনষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের আর আনন্দের সীমা ছিল না; কিন্তু যাহাদের স্বামিসন্তানাদি সেই স্পার্টার পরাজয়কারী যুদ্ধ হইতে জীবন লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, সুতরাং রণে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছিল, তাহারা খেদে অধীর হইয়া গিয়াছিল এবং সমাজে লজ্জায় মুখ তুলিতে পারে নাই। ভারতের মধ্যযুগে রাজপুতবংশে, স্পার্টার রমণীগণের সহ সাদৃশ্যযুক্ত জলন্ত দৃষ্টান্ত অনেক দেখিতে পাওয়া যায়; আবার সেরূপ দৃষ্টান্তস্থলীর এখন নবোৎপত্তি হওয়াই মঙ্গল এবং একান্ত প্রার্থনীয়। আথিনীয় কামিনীগণও, যদিও স্পার্টার রমণীগণের ন্যায় বীরা ও পুরুষপ্রকৃতি ছিল না বটে, কিন্তু সংসার, সমাজ ও লোকচরিত্রজ্ঞতায় নিতান্ত সামান্যা ছিল না। এমন কি, তত্ত্ববিৎ থিওফ্রাস্তস্ বহু যত্ন করিয়াও, নিজে যে মূলে বিদেশী, তাহা একটা সামান্য মেছুনীর নিকটেও ছাপাইয়া রাখিতে পারেন নাই; দৃষ্টিমাত্র ব্যবহারেই তাঁহাকে ধরা পড়িতে হইয়াছিল ২৫। স্পার্টার রমনীগণ

২৫। Quint I. 8 c 5. থিওফ্রাস্তস্ নিজে তত্ত্ববিৎ ও চতুরচূড়া এবং অনেক দিন

বড় একটা গৃহকার্য্যের ধার ধারিতেন না। "সূতা কাটা, কাপড় বোনা গৃহকার্য্য করা, এ সকল কার্য্যের (এই সকল গ্রীক রমণীদিগের গৃহকার্য্যের মধ্যে প্রধান ছিল।) পক্ষে ক্রীতদাসীগণের নিয়োজনই যথেষ্ট। স্পার্টানেরা ভাবিত যে রমণীগণ যদি তদ্রূপ হীন কার্য্যে নিয়োজিত ও পালিত হয়, তবে কেমন করিয়া তদ্রূপ হীনকার্য্যচেতা জননী হইতে সমাজের হিত ও শোভাকর পুত্রোৎপাদনের আশা করা যাইতে পারে? স্পার্টার রমণীগণের বিশেষ কার্য্যই হইতেছে কেবল তদ্রূপ সন্তান উৎপাদন করা মাত্র" ২৬। হোমারিক সময়ের রমণীগণ খুব বস্ত্রবয়ন, রন্ধন, গৃহকার্য্য সাধন ইত্যাদি কার্য্য স্বহস্তে নির্ব্বাহ করিত। হেলেন, পেনিলোপি, ইহারা রাজকুমারী বা রাজগৃহিণী হইয়াও, কখন তদ্রূপ কোন কার্য্যে কাতর হয়েন নাই। ভারত রমণীগণের কি পূর্ব্বে কি পরে, চিরকালই গৃহকার্য্য একচেটিয়া; কিন্তু আজি কালি তাঁহাদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ এই যে যেন ষষ্ঠীপূজার ঘটাটা কিঞ্চিৎ কম হয়, যদি তাহাতেই কিঞ্চিৎ এ ভীরু দুর্ব্বল কাপুরুষের পাল কুসন্তান উৎপাদনের হ্রাসতা হয়।

পিতা মাতার প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে, হিন্দুর জ্ঞান "পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।" আর গ্রীকের, "পিতামাতা যদি বাল্যে সুশিক্ষা দিয়া থাকেন, তবেই সন্তান পিতামাতার বৃদ্ধাবস্থায় পালন করিতে বাধ্য, নতুবা নহে।" ইহা আথিনীয় ব্যবস্থাপক সোলনের বিধি।

সেই প্রাচীনকাল আমূলত পর্য্যালোচনায়, হিন্দু এবং গ্রীক, এতদুভয় জাতির লোকনীতির পরিবর্ত্তনে ও পরিবর্দ্ধনে, বিজাতীয় সংস্রব কতদূর আসিয়া উত্তেজক রূপে সংযোজিত হইয়াছিল; তাহার অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, হিমাদ্রিবেষ্টন এবং সমুদ্রপরিখায় হিন্দুগণ বহিঃস্থ জাতিসমূহ হইতে আত্মরক্ষণ ও আত্মগোপন করিয়া

হইতে আথেন্সবাসী হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার বিদেশজাতজনিত অজ্ঞতা মেহুলীর নিকট ছাপাইতে পারেন নাই।

২৬। Xenoph Rep. Lac I.

স্বাগসম্ভব জীবনাতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। কোন বহিঃস্থ জাতিই, সে কালে প্রবল হয় নাই; এবং কোন শত্রুই সাহস পায় নাই যে, সেই প্রাকৃতিক দুর্গ পরিখাদি ভেদ করিয়া, তাঁহাদিগের শান্তি ভঙ্গ করিতে পারে। বিদেশ হইতে দেশমধ্যে লোক গতাগতির বন্দোবস্ত এরূপ। তাহার পর স্বদেশ হইতে বিদেশ গতাগতির বন্দোবস্ত কতদূর তাহা দেখা যাউক। অতি প্রাচীন কালের হিন্দুরা যখন তুখারা এবং গান্ধারের পরপার ও উত্তরকুরু হইতে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন; তখন সত্য বটে, ভারত ব্যতীত আরও যে দেশ আছে ও স্থান আছে, এ জ্ঞান তাঁহাদের মনোমধ্য হইতে একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই এবং তাঁহারা, আবশ্যক হইলে, ভারত বহির্ভূত স্থানে গতায়াত করিতেন। সত্য বটে যে সমুদ্রযাত্রা তাঁহাদের নিকট একেবারে অপরিচিত ছিল না, এবং বেদাদি বহুতর গ্রন্থে তাহার বহুতর উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সে সমস্তই ক্ষণিক, ও অতি প্রাচীন কালেই সে সমস্ত ঘটিয়াছিল ও ঘটিত। তাহার অব্যবহিত পরেই আর সেরূপ রহিল না; কেবল একমাত্র বিদেশগমন নহে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও বহুতর বিষয়ের লোপাপত্তি ঘটিয়া উঠিল। তাহারও আবার অব্যবহিত পরে বিধান উঠিল যে কলিযুগে সমুদ্রযাত্রা নিষেধ; ভারতই একমাত্র পুণ্যভূমি; যথায় যথায় কৃষ্ণসারমৃগ বিচরণ করে তাহাই পবিত্র যাজ্ঞিক দেশ, আর সমস্ত অপবিত্র ও অনার্য্যনিবাস; এবং যেখানে যেখানে ব্রাহ্মণের দর্শন না পাইবে, তথায় লোক বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইবে। এমন শাসনে আর হিন্দুসন্তান বিদেশে যাইবেন কেমন করিয়া; বাহিরে যাওয়া দূরে থাকুক, আরও ভিতর দিকে সরিয়া আসিয়া গা ঘেঁসিয়া বসিতে লাগিলেন। বহিঃসংস্রবের সমস্ত সম্ভব মিটিয়া গেল। কথা আছে, কার্য্য না থাকিলে খুড়াকে গঙ্গা যাত্রা করিতে হয়; হিন্দুসন্তানও এখন যথাসাধ্য আপনার অমিশ্রিত লোকনীতির পরিচালন ও তাহার আতিশয্য সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

গ্রীকের ভাগ্য অন্যরূপ। অতি দূরতম কাল হইতেই বিবিধ জাতীয় সংস্রবে আসিতে হইয়াছে। ইও, ইউরোপা, মিডিয়া প্রভৃতি প্রাচীন কালীয়

গ্রীক কামিনীর হরণবৃত্তান্ত, এবং আর্গনটিক সমুদ্রযাত্রাদির বিষয় তাহার যথেষ্টরূপে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। পুনশ্চ গ্রীকেরা যাহাদের সহ এই প্রাচীন সংস্রবে আসিয়াছিল, তাহারা আবার কিরূপ স্বভাব ও কিরূপ প্রকৃতির লোক, তাহা এই পর্য্যন্ত বলিলে পর্য্যাপ্ত হইবে যে, উক্ত কামিনীত্রয়ের হরণবৃত্তান্ত এবং তাহার আনুষঙ্গিক দৌরাত্ম্যের গল্পই তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছে। মিসরীয়, ফিনিসীয়, ইত্যাদি জাতীয় লোক সকল সর্ব্বদা সমুদ্রপথে গ্রীসে আসিয়া উপস্থিত হইত, এবং ইহাদেরই দ্বারা ঐ সকল কামিনীহরণ কৃত হয়। ঐ ঐ সকল জাতীর ব্যবসায়, বাণিজ্য, বোম্বেটেগিরি ও লুট পাট। ইহাদের সঙ্গে সংস্রব, ছুটে ছুটে কোলাকুলির ন্যায়। ভারতেও প্রাচীন কালে, ভারতীয়েরা কোথাও না যাউন, কিন্তু অপরাপর কোন কোন জাতি বাণিজ্যসূত্রে ভারতে আগমন না করিত এমন নহে কিন্তু তাহা গ্রীক ভূমির তুলনায় গণনার অযোগ্য। বিশেষত তাহাদের এই গতায়াত, ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতাসূর্য্যের নিম্নগমন সময়ের আরম্ভেই বেশীর ভাগ গণিত হইয়া থাকে; সুতরাং মোটের উপর তাহাদের সংস্রবফল তুলনায় শূন্যস্থলীয় বলা যায়। গ্রীকেরা অতি দূরতম কাল হইতেই, স্বয়ং যাওয়ায় বা অপরের আসায়, উভয় প্রকারে অপরিমিত জাতীয় সংস্রবে আসিয়াছিল। কিন্তু কিরূপ জাতির? সকলেই তাহাদের ন্যায় প্রায় সমধর্ম্মী লোকনীতিবিশিষ্ট। পৃথিবীর সেই খণ্ডে আরও এক অদ্ভুত লোকনীতি সেই সময়ে উপস্থিত এবং জীবিত ছিল; কিন্তু তাহা সঙ্কীর্ণ স্থানে আবদ্ধ এবং বিজাতীয় বিপাকে পতিত হইবায়, তাহা কাহারও দৃষ্টিতে পতিত বা গণনায় গণিত হইত না! উহা হিব্রু লোকনীতির কথা বলিতেছি। যে একমাত্র অসমধর্ম্মী লোকনীতি সেই সময়ে সে প্রান্তে বর্ত্তমান ছিল, কিরূপ কর্ম্মসূত্রবশে বলিতে পারি না, তাহা গ্রীকদিগের নয়নে পতিত হয় নাই; এবং গ্রীকেরাও কখন তাহার অতর্কিত সংস্রবে আসিয়া পড়ে নাই। সুতরাং গ্রীকদিগের যাহা কিছু সংস্রবে আইসন এবং সংমিলন, তাহা সমধর্ম্মী লোকনীতির সহ; এবং কেবল সমধর্ম্মী লোকনীতি নহে, বরং অধিকাংশই তাহার অপকৃষ্ট অংশের সহ। এই সকল হইতে, গ্রীকলোকনীতি যেমন

একদিকে আবশ্যক অনু বিধৰ্ম্মী পদার্থের সংমিলনের স্বপক্ষে অযথা পরিচালিত হইতে লাগিল, যেহেতু যে কোন বস্তুর অযথা পরিচালন একমাত্র বিধৰ্ম্মী পদার্থ সংমিলনেই বাহিত হয়; সেই-রূপ অন্য দিকে আবার সমধর্ম্মী অথচ বিকৃত পদার্থ সংযোগে অযথা কূট বিস্তার ও কূট পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হইতে লাগিল। ইহাতেই গ্রীকচরিত্র ক্রমে দূষিত হইয়া, বহুসরূপে ছয়পারলৌকিকসম্বন্ধ হয় এবং দুষ্টলৌকিক ভাবে পরিণত হইয়া আইসে। গ্রীকচরিত্রের এতাদৃক যে দুষ্ট ভাব, হিন্দুচরিত্রে উপরি-উক্ত স্বীয় লোকনীতির বহিঃসম্বন্ধশূন্য ভাবে পরিচালন জনিত দুষ্টতার অপেক্ষা, পূর্ব্বসমালোচিত বাক্য অনুসারে, অবশ্যই গুরুতর তাহাতে সন্দেহ নাই।

এক্ষণে একবার পূর্ব্বাপর আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

শাস্ত্র, ইতিহাস বা পুরাণাদি বিলোড়ন দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভারতীয়েরা আত্মদেশ বহির্ভাগে পরধনলোলুপ হইয়া, কখনও অনধিকারপ্রবেশে উদ্যত হয়েন নাই; এবং তদ্বিষয়িণী দুরাকাঙ্ক্ষাও বোধ হয় তাঁহাদের মনোমধ্যে কখনও স্থান পায় নাই। ইহারা আপনাদের স্বদেশকেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যখণ্ডে বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেকে আপনাপন অধিকার মধ্যে সন্তুষ্ট থাকিতেন। ইহা দেখিতে পাওয়া যায় বটে যে, সময়ে সময়ে ভারতের মধ্যে কোন কোন রাজা কখনও কখনও প্রবল দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া, পার্শ্বস্থ বিভিন্ন অধিকারসকল আত্মবশে আনিতে চেষ্টা করিতেন; কিন্তু এতদ্রূপ দৃষ্টান্ত অতি বিরল। যাহা হউক এরূপ কোন ঘটনা ঘটিলে, এবং দস্যুদিগকে কখনও কখনও দমন করিতে হইলে, কেবল সেই সময়ে যে কিছু অস্ত্র চালনা করিতে হইত। সে সকল বস্তুত গণনার সামান্য নহে, তবে যে স্থলে যে ভাবে ও যাহার তুলনায় তাহাদের অবতারণা করা যাইতেছে, তাহাতে তাহা গণনায় অতি সামান্যই বলিতে হইবে। সে যাহা হউক, এক্ষণে সমগ্রত একদৃষ্টিতে অবলোকন করিলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেশাধিপতিগণ সকলেই একধর্ম্ম এবং একজাতিষ

নিবন্ধন, জাতীয় স্বভাবের মাধুর্য্য হেতু, পরস্পর সুখ সংমিলনে বসতি করিতেন। বিশেষত দেশ যেরূপ প্রাকৃতিক দুর্গ দ্বারা বেষ্টিত এবং সুরক্ষিত—উত্তরে অভেদ্য হিমাদ্রি,পশ্চিমে পরিখারূপে শত শাখাময় সিন্ধু, পূর্ব্বে অগম্য বনভূমি, দক্ষিণে তরঙ্গসঙ্কুল দুর্দ্দমনীয় সমুদ্র; তাহাতে আবার সেই দূরতম কালে তৎকালীন অসভ্যতা এবং বর্ব্বরতাজনিত পশুবৎ পার্শ্বস্থ জাতি সকল হইতেও স্বদেশের স্বাধীনতা লোপ, বা কোন বিপৎপাতের সম্ভাবনা না থাকায়, বহিঃশত্রু প্রভাব ও তন্নিমিত্ত অস্ত্রধারণের পাঠ একেবারে ছিল না। এই সকল কারণ বশত ভারতবর্ষীয়দের রাজনীতি এরূপ শান্তপ্রকৃতি এবং ঘাত প্রতিঘাতে পরিবর্ত্তন বিরহিত; এই জন্যই ইহারা কখনও যুদ্ধপ্রিয় জাতি ছিল না, এবং বোধ হয় এই কারণেই তাহাদের বীরকীর্ত্তি বিপুল হইলেও, অন্যান্য পুরাতন জাতির সমকক্ষতায় আসিতে পারে নাই। ভারতীয় বীরকীর্ত্তি সম্বন্ধে আমার প্রণীত বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত গ্রন্থ 'সামরিক ব্যাপার' নামক প্রস্তাব দ্রষ্টব্য।

তাহার পর যে জাতি এক পা হাঁটে,আর একবার আকাশ পানে তাকাইয়া থাকে; যে জাতি জাগতিক ব্যাপার দেখিয়া আপনাতে আপনি শূন্য হয় এবং তাহার সূত্র অনবগতে সতত,চিন্তাকুল; তাহার পক্ষে কোনরূপে উদর পোষণ ও কলেবর ধারণ হইলেই সাংসারিক ব্যাপার যথেষ্ট সাধিত হইল। সুতরাং ইহারা কেন রাজনীতির ধার ধারিবে? তুমি রাজা হইতে চাও, হও,আমি তাহাতে সম্মত আছি; কিন্তু দেখিও,আমি যে শান্তি চাই,তাহার হানি করিও না, তাহা হইলে আর কোন গোল হইবে না, নতুবা গোল-মাল বাধিতে পারে। এরূপ গোলমাল পরিহার করা সহজ। সুতরাং হিন্দু রাজারা মোটের উপর আবহমান কাল যথেচ্ছাচার এবং একাধিপত্য নিরুদ্বেগে করিয়া আসিয়াছেন। গ্রীকদিগের ঘরে তাহার বিপরীত। যখন যেমন লোকের মনের ভাব, শাসনতন্ত্রও তখন তেমনি পরিবর্ত্তিত ও প্রচলিত হইয়াছে।

হিন্দুদিগের এই সহায়শূন্য ও আস্থাশূন্য এবং পরলোকে দৃষ্টিবদ্ধ ভাব ও নশ্বরবাদ, যাহা আবহমান কাল চলিয়া আসিয়া, সাংসারিক

ব্যাপারে তাহাদিগকে জড়ের ন্যায় করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা এক সময়ে একবার মাত্র কিয়ৎ পরিমাণে ভঙ্গ হয়। ঐ সময় বৌদ্ধদিগের প্রাদুর্ভাব-কাল। এই সময়েই ভারতবর্ষ জগতিক জাতীয় পুরাবৃত্তমধ্যে যে কিছু সাংসারিক ব্যাপারে গৌরবলাভ করিয়াছিল। এই সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম দ্বারা লোকের মনে নূতন প্রকারের তেজ নিক্ষিপ্ত হয়। এবং হিন্দুধর্ম্মের বিকার অবস্থার প্রভাবে লোকের মন যে পারলৌকিক এবং মায়াবাদ ও তথাবিধ তত্ত্বে মোহাভিভূত হইয়া জড়ভবতপ্রায় হইয়াছিল; এই নবোদিত বৌদ্ধধর্ম্মপ্রভাবে তাহার বহুলাংশ অপনীত, এবং পার্থিব বিষয়ে লোকের সেই পরিমাণে চিত্ত আকৃষ্ট হয়। এই সময়ের রাজা অশোক, সমগ্র পরিজ্ঞাত ভারতের অধীশ্বর। লোক সকল এখন সাংসারিক আত্মোৎকর্ষ অবধারণ ও তাহা রক্ষণে সমর্থ। বিদেশ বাণিজ্যের অভ্যুদয় হওয়ায়, ও ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যের বহুলতা বশতঃ, স্থলপথ ও জলপথে বহুস্থানে যাতায়াত আরম্ভ হইয়াছিল। এই সময়ে শুধু সমুদ্র-যাত্রা ও বিদেশভ্রমণেই মানবীয় শক্তি পর্য্যাপ্ত হয় নাই, তদতীত ফলস্বরূপ ভূগোল এবং রসায়ন প্রভৃতি বিজ্ঞানেরও বহুল আলোচনা হইয়াছিল। এই সময়ে কৃষি ও বাণিজ্য উভয়বিধ উপায় দ্বারা বহুধন সঞ্চয় এবং শিল্প-বিদ্যারও বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। এই সময়ে আর্য্য-জননী ভারতের নাম পৃথিবীর দিগ্‌দিগন্তে ধ্বনিত হয়, ধর্ম্মবীর বৌদ্ধ প্রচারক-গণ না গিয়াছিল, এমন স্থান প্রায় বিরল। লৌকিক সুখ স্বচ্ছন্দতা ধরিলে, সে বিষয়েতেও ভারতের এই সময়ের মূর্ত্তি অতি মনোহর। কিন্তু পরি-তাপের বিষয় এই যে এ মূর্ত্তি ক্ষণস্থায়ী,—ফলত ইহার প্রকৃতিও বহুক্ষণ স্থায়ী হইবার নহে। যাহা হউক, ভারতের পূর্ব্বাপর ধরিতে গেলে, এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বৌদ্ধদিগের প্রাদুর্ভাব কাল পুলকবৎ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

উপরি-উক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হইবে যে লৌকিক, সাংসারিক বা আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে হিন্দুরা গণনার উপযুক্ত কোন প্রকার উন্নতি সাধন করিতে পারেন নাই। জীবনযাত্রা যাহাতে আপাততঃ সুখে অতি-বাহিত হয়, তৎপক্ষে কিয়ৎ পরিমাণে উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন মাত্র;

এবং সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীতে তুলনীয়ের অভাবহেতু তাহা অতুলনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্য দিকে, এরূপ জাতির স্বভাব হইতে যাহা প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, সেই নৈতিক উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল। আজি পর্য্যন্ত সেই প্রাচীন নৈতিক উন্নতির মোহিনী শক্তি, বহু বিপ্লব গতেও অস্তিত্বশূন্য না হইয়া, বরং পূর্ণভাবে দর্শকের চমৎকারিত্ব উৎপাদন করিতেছে। প্রাচীন হিন্দুর জীবন আমূলত পর্য্যালোচনা করিলে, স্পষ্টত দৃষ্ট হইবে যে, উপপাদ্য এবং নৈতিক বিষয়ে এরূপ শ্রেষ্ঠ জাতি আর নাই। কাল আবর্ত্তনে সে সকল বিষয় যদিও বহুতর বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং যদিও সেই পূর্ব্বতন নৈতিক জীবন এক্ষণে ফসিল (Fossil) ভাব প্রাপ্ত হইয়া অকর্ম্মণের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে, এবং তদুপরি অজস্র মলরাশি জমিয়াছে, তথাপি তাহাদের জ্যোতি ও মাধুর্য্যশক্তি এখনও অপরিসীম। যে বল অন্যত্র দুরাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করণার্থে ব্যয়িত হইত, সে বল এখানে অপরের বিপদোদ্ধারে নিযুক্ত। যে অর্থ অন্যত্র খেয়াল পরিপূরণ ও বিলাস বিস্তারার্থে নিয়োজিত হইত, এখানে তাহা সাধারণত দরিদ্রের দারিদ্র্য নিবারণ এবং বিধবার চক্ষুজল মোচনের নিমিত্ত পর্য্যবসিত হইত। যে বুদ্ধি অন্যত্র দুরাকাঙ্ক্ষা-পূর্ণ, এবং বিভব ও বিলাস বিস্তারের উপায় উদ্ভাবনে নিযুক্ত, এখানে তাহা ধর্ম্ম মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি তত্ত্বানুসন্ধানে নিয়োজিত। ইহাদের জাতীয় জীবন আমূলত নৈতিক। ইহা কেবল পৃথিবীর প্রথম অবস্থাতেই শোভা পাইয়াছিল,—যে সময়ে লোক সরল, লোক সাধু, এবং লোক সত্যরত; যে সময়ে লোকের ভিতর বাহিরের প্রভেদপরিবর্দ্ধক কাপট্য ছিল না, ইহা কেবল সেই সময়েই শোভা পাইয়াছিল। আবার যখন এই পৃথিবী, ইহার দুরাকাঙ্ক্ষা, দ্বেষ, হিংসা, প্রভৃতি পাপরাশি বিনিবারিত হইবায়, নৈতিক ও আর্য্য আকৃতি ধারণ করিবে, তখনই আবার ভারত গৌরবের সর্ব্ব উচ্চ গগনে শোভা পাইতে থাকিবে, তদ্ভিন্ন অন্য সময়ে নহে। লৌকিক বিষয়ে চিত্তনিয়োগকারী ও তদ্বিষয়ে উন্নতিশীল এবং আনুষ্ঠানিক চিত্তক্রিয়াযুক্ত জাতির যখনই এমন জাতির পার্শ্বে উদ্ভব হইবে, তখনই ইহাদের লৌকিক গরিমা ও প্রভুত্ব

নগণ্যের মধ্যে পড়িয়া যাইবে, হয়ত প্রায় লোপও হইতে পারে। ভারতের ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছে। এই জন্যই গ্রীকদিগের সভ্যতা পরে উদিত ও অল্পস্থায়ী হইলেও, লৌকিক দর্শনে বলিতে হইবে যে তাহা ভারতীয় সভ্যতার অপেক্ষা অনেক বিষয় উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। এবং এই জন্যই অধুনাতন কালে, ভারতসন্তান বহু বর্ষ ব্যাপিয়া পরের জুতা মাথায় বহিয়া আসিতেছে।

এক একটী নদীর অববাহিকা মধ্যে, একটী করিয়া মূল প্রবাহ থাকে। ঐ মূল প্রবাহ প্রথমে মূল উৎস হইতে উৎপন্ন হইয়া তথা হইতে জল সংগ্রহ পূর্ব্বক যেমন গন্তব্য পথে গমন করে, এবং গমন করিতে করিতে যেমন শাখা নদী সমূহের দ্বারা পুষ্টি প্রাপ্ত হয়, শাখানদীরাও আবার তদ্রূপ; ইহারাও আবার তদনুরূপ নিয়ম পারিপার্শ্বিক নদী দ্বারা পুষ্টি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পারিপার্শ্বিক নদী আবার খাল বা নালার দ্বারা; নালা আবার ঘাট মাঠের জলধারা, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এইরূপে, যতই নগণ্য হউক, যেখানকার যাহা, সমস্ত জল আসিয়া যখন মূল প্রবাহে নিপতিত হয়, তখন উহা শাখা প্রশাখার সাহায্যোপী পুষ্ট কলেবরে, গণনীয় ভাবে, পথমধ্যে বালুকালুপ্ত হইবার ভয়শূন্য হইয়া, যথাস্থানে গমন করিতে থাকে। বাঙ্গালায়! বাঁশবাগানে বাঁশপাতা বহিয়া ঝির ঝির করিয়া জল চলিয়া যাইতেছে, তাহা অনেকবার দেখিয়াছ; কিন্তু ইহা কি কখনও তোমার মনোমধ্যে চটক লাগিয়াছিল যে, এই জলই শেষে যাইয়া গঙ্গা বা তোমার পদ্মার কলেবরপুষ্টতা সাধন করিবে, এবং এই জলই শেষে আসিয়া হয়ত তোমার দেশ ভাঙ্গিয়া ঘর ভাসাইয়া লইয়া যাইবে? বোধ করি পদ্মা বা গঙ্গার বিষম কলেবর, এবং ইহার এই ক্ষুদ্র প্রাণ এতদুভয়ের বৈষম্য তুলনে, সে ভাব তোমার মনে কখন উদয় হইলেও তাহাকে দাঁড়াইতে দেও নাই। কিন্তু তুমি দাঁড়াইতে দেও বা না দেও, কার্য্য যাহা হইবার তাহা হইতেছে; এবং ঐ যে সামান্য জলের ধারাটী, উহাই আখেরে পারিপার্শ্বিক নদী, শাখানদী, বা যে কোন সূত্রে যাইয়া, তোমার পদ্মা বা গঙ্গার পুষ্টতা সাধন করিবে। এখন দেখ, তোমার বৃহৎ গঙ্গা কোথাকার ও কত দূরের সামান্য সামান্য কারণ হইতে

বৃহৎ হইয়া আসিতেছে। মানবের বা মানবীয় জাতির জীবনপ্রবাহও তদ্রূপ। তাহারও কারণ, উপাদান, আয়োজন, উপকরণ ও প্রতিষ্ঠা অবিকল তদ্রূপ; একমুখে অনন্ত সূত্রে বিচ্ছুরিত, অপর মুখে একত্রে আসিয়া পরিণত। কি মানবীয়, কি মানবের জাতীয় জীবন; কায়িক, বাচিক, মানসিক; অদৃষ্টপূর্ব্ব, অজ্ঞাতপূর্ব্ব, বা যে কোন প্রকারে, নিরন্তর গতিরত; তাহাতে তিলার্দ্ধের জন্য বিরাম নাই। অতএব মানবীয় বা মানবের জাতীয় জীবনকে একরূপ সেই গতিসমষ্টি বলিলে হয়। কর্ম্ম উহার উদ্দেশ্য। কর্ম্মক্ষেত্ররূপ অববাহিকামধ্যে সাধারণ জীবন-ক্রিয়া মূল প্রবাহ। বৃত্তি, প্রবৃত্তি, মনীষা, দর্শন, দেশ, কাল ইত্যাদি শাখা প্রশাখা। শাখা প্রশাখার জন্য আবার কোন্ বাঁশপাতা ঝরিয়া জল আসিতেছে, তাহা যাহার চক্ষু আছে সে দেখিয়া লইবে। আমরা এতদুভয় জাতীয় জীবনের সেই মূল প্রবাহমাত্র ধরিয়া, যথা কথঞ্চিৎ পরিদর্শন করিয়া আসিলাম। এবং কোন্ উৎস হইতে উৎপন্ন হইয়া, কোন্ দেশ দিয়া বহিয়া আসিতে আসিতে,কোথাকার স্থানের গুণে কিরূপ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে, কেবল তাহাই কিয়ৎপরিমাণে দেখিয়া লইলাম। কিন্তু আবার তাহার কোন্ শাখা প্রশাখা এবং তাহাদের আবার শাখা প্রশাখা এবং তাহাদের আবার মূলস্রোতঃ, কিরূপে স্বয়ং পুষ্ট হইয়া আসিয়া; এবং কিরূপে গন্তব্য পথের গুণে গুণবিশিষ্ট হইয়া; মূলপ্রবাহের কলেবর বাড়াইতে, ও তাহাদের নিজ এবং প্রাপ্ত গুণ-সমষ্টি দ্বারা তাহাকে তৎ তৎ গুণবিশিষ্ট করিতে, তাহাতে আসিয়া মিশিয়াছে, তদ্বিষয়ে আমরা কোন কথা বলি নাই। কেবলমাত্র দুই একটী শাখা প্রশাখার উপর অমনস্ক দৃষ্টিপাত করিয়া, তাহারা কিরূপ গুণে গুণ বিশিষ্ট, এবং মূল প্রবাহের স্বভাব সহ তাহাদের মিলনে সামঞ্জস্য সাধন হইবার মূল প্রবাহের সহ কেমন একধর্ম্মী হইয়াছে; এবং কেমন বা আপন গুণ মিলনে মূল প্রবাহকে অংশত রূপান্তর করিয়াছে, তাহাই যথাযথ পর্য্যালোচনা করা গিয়াছে। যিনি শাখা প্রশাখা এবং তাহাদেরও আবার পরিপোষকদের আমূলত দৃশ্য দেখিতে চাহেন, তিনি আত্মযত্নসম্ভূত দৃশ্যে দেখিয়া লইবেন। যে নিয়মে মূল প্রবাহ অবলোকিত হইতে পারে, শাখা প্রশাখাও সেই

নিয়মে অবলোকিত হয়, কেবল সূক্ষ্মেতর ভেদ মাত্র। কিন্তু ইহাও মনে থাকে যেন যে, যে বস্তু যত অধিক সূক্ষ্ম হয়, ততই তাহা দৃশ্যের অতীত হইয়া থাকে; অধিক যত্নে চক্ষের বাত্যয়ে স্থূল দৃষ্টি পর্য্যন্ত রহিত হয়। সূক্ষ্ম পদার্থ মাত্রে অনুভব শক্তির বিষয়ীভূত।

এ জগতে গ্রীক এবং হিন্দুদিগের বিভিন্ন জাতীয় জীবন-প্রবাহ, এক উৎস হইতে বিনির্গত দুই বিভিন্ন পথগামী দুইটা ধারাস্রোতোনদীর ন্যায়। যখন উৎস হইতে বাহির হইতেছে তখন উহাদের জল একই রূপ, কিছুমাত্র প্রভেদ থাকিবার সম্ভবও নাই, ছিলও না। পরে যখন ইহারা উৎপত্তিস্থান অতিক্রম করিয়া, আপনাপন নির্দ্দিষ্ট পথ বাহিয়া গন্তব্য স্থানাভিমুখে যাইতে লাগিল, তখনই ইহারা স্ব স্ব গম্য পথের দেশ কাল ও স্বভাবের সংলগ্নে আসিবায়, তাহাদের গুণযোগে তৎ তৎ গুণ-রূপান্তরিত ভাব প্রাপ্ত হইয়া আসিল। যতঃ পথ অতিক্রম করিয়া দূরপথে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল, ততই তাহাদের গুণান্তর প্রাপ্তি ক্রমে এত বৃদ্ধি হইতে চলিল যে, তখন স্থূল দৃশ্যে তাহাদিগকে দেখিলে ও তদুভয়ের মধ্যে তুলনা করিলে, তাহাদিগকে আর সমজাতীয় নদী বলিয়া বোধ হয় না। সম্পূর্ণই পৃথক প্রকৃতির বলিয়া বোধ হয়, এবং উহা তখন পৃথক প্রকৃতিরই বটে। যাহা হউক তথাপি, তদ্রূপ হইলেও, যাহার চক্ষু আছে, যাহার অনুসন্ধান আছে, সে স্বচ্ছন্দে দেখিয়া লইবে যে, উহা আপাততঃ যতই বিভিন্ন প্রকৃতির বলিয়া বোধ হউক না কেন; উহাদের অন্তরে অন্তরে মূল-উৎস-জনিত একতা,—সেই ঐশ্বরিক অভিপ্রায়ের একতা, আজি পর্য্যন্ত সমভাবে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে, এবং যাইবে। পুনশ্চ এখন যতই গুণান্তর ও রূপান্তর বিশিষ্ট দেখ না কেন, এবং এ কর্ম্মসংসারে যদিও তাহাদের আর কখন এক হইবার সম্ভাবনা নাই; কিন্তু আবার যখন, যতই বিভিন্ন পথ বাহিয়া হউক, তাহারা মহাসমুদ্রে যাইয়া উভয়ে পড়িবে, তখন উভয়েই উভয়ের সংমিলনে এক-গুণ-বিশিষ্ট হইয়া সেই মহাসমুদ্রজলে মিশিবে এবং একজলে, একতা প্রাপ্ত হইয়া যাইবে। বিশ্বনিয়ন্তা! তোমার উদ্দেশে কোটি কোটি নমস্কার!

গ্রীক এবং হিন্দু এ উভয় জাতিই, পৃথিবীর প্রথমকালে মনুষ্যবর্গকে শিক্ষা দিবার জন্য অবতীর্ণ। উভয়ই বিশ্বনিয়ন্তার নিকট হইতে শিক্ষকতা পদ প্রাপ্ত হইয়া উদিত হইয়াছিল। সুতরাং উভয় জাতিই পূজ্য। হিন্দুরা পারলৌকিক, অধ্যাত্মিক, এবং উপপাদ্য তত্ত্বসমূহ শিক্ষা দিবার জন্য নিযুক্ত। ঐরূপ গ্রীকেরা আবার ইহলৌকিক, আধিভৌতিক, এবং আনুষ্ঠানিক তত্ত্ব সমূহ শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ভার প্রাপ্ত। অতএব সাংসারিক বোধে ধরিতে গেলে, এ পৃথিবীতে প্রাচীন হিন্দুরা জাতিতে ব্রাহ্মণ, এবং গ্রীকেরা ক্ষত্রিয়। এ উভয় প্রাচীন জাতিই এক্ষণে পৃথিবী হইতে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাদের বংশধরেরা আছে বটে, কিন্তু তাহারা আচারভ্রষ্ট, ধর্ম্মভ্রষ্ট, যবনত্ব প্রাপ্ত হইয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতিরূপে পরিণত হইয়াছে; সুতরাং থাকিতেও নাই। ওদিকে আগে যাহারা শিষ্য পদবীতে ছিল, এখন তাহারা আবার জ্যোতিষ্মান্ হইয়াছে; তাহারা নিজ তেজে তাহাদের প্রাচীন আচার্য্যবর্গেরও তেজ একান্ত মলিন করিয়া ফেলিয়াছে; এমন কি লোপ পর্য্যন্ত করিবার উপক্রম করিয়া তুলিয়াছে। কেবল রক্ষা এই যে, অনন্ত পুস্তকে যখন তাহাদের সেই কর্ম্মসমূহ জমা করা আছে, তখন মনুষ্যনয়ন তাহা আপাতত লোপ করিলেও, অনন্তগর্ভ হইতে তাহাকে লোপ করিবার আশঙ্কা নাই। বর্ত্তমান একজন দক্ষ ক্ষেত্রতত্ত্ববিদ্যাবিৎ ও প্রাচীন পীথাগোরাসে যে সম্বন্ধ, বর্ত্তমান প্রতিভাযুক্ত নব অভ্যুদয়শালী জাতিসমূহের সহ প্রাচীন গ্রীক ও হিন্দুদিগেরও সেই সম্বন্ধ জানিবে। বর্ত্তমান পৃথিবী আনুষ্ঠানিক ও বৈজ্ঞানিক, সেই জন্যই গ্রীক বিদ্যা এখনকার মানব জ্ঞানের ভিত্তি স্বরূপ হইয়া দণ্ডায়মান আছে এবং সেই জন্যই এখন উহার এত আদর। কিন্তু যেমন চৈতন্য ব্যতীত শরীরী জীবের অবস্থান অসম্ভব; সেইরূপ মনস্তত্ত্ব, নীতিজ্ঞান ও উপপাদ্য শাস্ত্র ব্যতীতও পৃথিবীর গতি ও পরিণতি অসম্ভব। অতএব এমন একদিন এই পৃথিবীতে অবশ্যই আবার আসিবে, অথবা সে দিনের হয়ত সূত্রপাতও হইয়াছে, যে দিন এই ভারতবিদ্যা আবার নূতন শ্রী ধারণ করিয়া নূতন জগতে অভূতপূর্ব্ব নূতনতর শোভার বিস্তার করিতে থাকিবে। আবার ভারত

গৌরবের উচ্চ গগনে সমুদ্ভাসিত হইবে, আবার গায়ত্রীশক্তি প্রণবপ্রাণা ভারত জগতে মহালক্ষ্মীরূপে শুভ বিতরণ করিতে থাকিবে, ইহা আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি। ইদমস্তু।

ইতি ষষ্ঠ প্রস্তাব।

উপসংহার।

১। কর্ম্মক্ষেত্র।

হিন্দুও এখন আর সে হিন্দু নাই; গ্রীকও এখন আর সে গ্রীক নাই। যে ভারত বিধাতার পুণ্যভূমি, জগতের গৌরব, আর্য্যের মাতৃদেবতা, ভবরঙ্গভূমে নৈতিক মনুষ্যত্বের যে একমাত্র রঙ্গগৃহ, আজি তাহা নির্ব্বাণ-দীপ; আজি তাহা কুটিল অন্ধকারে আচ্ছন্ন, বিষাদভরায় চতুর্দ্দিক হাহাকার মূর্ত্তিতে প্রতীয়মান। আর ইহার অদৃষ্টক্ষেত্রে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র আদি বিশ্বপূজনীয় প্রজাপতিগণ উজ্জ্বল তারকারূপে আলোক দান করেন না; জ্ঞান-গগন তমসাবৃত, সপ্ত-ঋষি অস্তমিত, বুদ্ধদেবও আর পাতকীর পাতকে অশ্রুজল বর্ষণ করিতে আইসেন না। শঙ্করের বেদগান নীরব, উজ্জয়িনীর কলকণ্ঠ নিস্তব্ধ, সকলেই বিগত; সকলেই যাই-তেছে,—একে একে, ধীরে ধীরে, নষ্ট স্বপ্নবৎ, নৈশ তিমিরজালে মিশাইয়া ভূতসাগরগর্ভে বিলীন হইয়া যাইতেছে। ভারত এখন কঙ্কালদৃশ্য, প্রেতনিবাসিত চিতাভস্ম-বিলিপ্ত শ্মশানভূমি, নির্ব্বাক, নিস্তব্ধ; কেবল নষ্টসুপ্তির উন্মত্ত অস্ফুট আরাববৎ, শান্তিশূন্য, ক্লেদমথিত, নিরাশতপ্ত, উদ্দাম, বন্ধুরপদ পিশাচকুলের কিলি কিলি শব্দমাত্র শ্রুতিবিষয়ীভূত হইতেছে। সে দিন নাই, সে ভারত নাই; বেদমহাভারতগীত ভারতে ভারতসন্তানেরা এখন পশ্চিম-সাগর-পার-নিবাসী বিধর্ম্মী ধর্ম্মযাজক বা কৌশলী জুয়াচোরের হস্তে ধর্ম্মশিক্ষা গ্রহণে উদ্যত! আর গ্রীক? সে থার্ম্মাপিলি, সে মারাথন ক্ষেত্র, সে হোমার, সে কদ্রোস্, সে পেরিক্লিস্, সে লিওনিদা, সে সক্রেটস্, সে প্লেটো, সে আরিষ্টটল্, তাহারা কোথায়? কাল—কাল! সর্ব্বনাশক, সর্ব্বসংহারক, কুটীলকালিমাময় কালকন্দরে প্রবেশ করিয়াছে। বনপর্ব্বতনিবাসী, নরশোণিত-লোলুপ যে নরপশু-দিগকে বর্ব্বর জ্ঞানে গ্রীক স্পর্শ করিত না, গ্রীক এখন তাঁহাদেরই পদলেহন

করিতেছে। যে দিব্যবিভূতি ভারত বিভবে জগতমোহিনী,আজি তাহাকে পথের ভিখারিণী হইতে হইয়াছে। হা দিবা! হা সংবৎসর। হা যুগ! সে সকল কোথায় রাখিয়া আসিয়াছ? সূর্য্য তুমিত ত্রিকালসাক্ষী, কালের মানদণ্ডরূপে তুমি দণ্ডায়মান, বলিতে পার কি,সর্ব্বনাশীর দল সে সকল কোথায় ফেলিয়া আসিয়াছে? আর তুমি —তুমি তাহাই আছ, তোমার সেই বাসগৃহও ত তাহাই রহিয়াছে, কিন্তু সে দিন,সে সকল মহার্হ রত্ন তুমিই বা কোথায় ফেলিয়া আসিলে। কালগর্ভে? তুমিও তথায় না যাইতেছ কেন?

এ পৃথিবীর, এ বিশ্বের, এইই গতি,—এক যায়, আর উঠে; আর পড়ে, আর হয়। এ জগতে কোন অবস্থাই স্থায়ী নহে। বাসন্তী শোভা, প্রিয়মুখ, প্রণয়সম্ভাষণ, সুন্দর দিবা, চাঁদের আলো, সকলেই থরে থরে সজ্জিত, ঝলসে ঝকঝক্ করিতেছে, এমন সময় দপ করিয়া দীপ নির্ব্বাণ; অমনি কে কোথায় লুকাইল, সকল ফুরাইল, সবাই রহিল, আমিই চলিলাম! অথবা আমি রহিলাম, সবাই চলিল! আজি যেখানে বিজন কানন, কালি তথায় বিলাসভবন, পরশ্ব আবার চিতার আগুনে দগ্ধ-ভূমি, গগন অন্ধকার করিযা ঘন গম্বুজে ধূঁয়াব ঘটা উঠিয়াছে। হায় হায়! কেবল আসে যায়, যায় আসে। সকলেই সেই শক্তিস্রোতে উঠিতে পড়িতে অনন্ত হইতে আসিতেছে, আবার উলটি পালটি অনন্তমুখে অবি-শ্রান্ত গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে; স্রোতে বেগে পাথর গলিয়া বালি, আবার বালি জমিয়া পাথর বাঁধিতেছে। নৈসর্গিক নিয়মের একতা এবং অখণ্ড-নীয়ত্বে, হিন্দু এবং গ্রীকও এই মহাস্রোতে স্রোতায়মান।

গতি যথায় যাহার যেরূপের হউক, পথ কিন্তু সকলের এক, পরি-ণামও তাহাই। এই দৃষ্ট এই অদৃষ্ট, এই এক এই আর; কিন্তু সৌভাগ্য এই ধ্বংস কাহারই হইতেছে না, অথচ তথায় আত্ম-সহায় ও আত্ম-সর্ব্বস্ব হইয়াও কেহ চলিতে পারিতেছে না। মূলে বিধর্ম্মী পদার্থের যে সামঞ্জস্যপূর্ণ সংযোগক্রিয়া সৃষ্টি সঞ্চারের কারণ, সৃষ্টির উত্তরগতি বা উত্তরবৃদ্ধিতেও আজি পর্য্যন্ত সেই একই কারণ অভিনীত হইয়া আসি-তেছে, এবং এইরূপ অভিনয় আবহমান কাল পর্য্যন্ত হইয়া যাইতে

থাকিবে। পদার্থনিকরের গুরু হইতে গুরুতর মিশ্রণ, গুরুতর হইতে গুরুতম মিশ্রণ,এবং তাহাদের যথোচিত সামঞ্জস্য সংযোগ বশে পূর্ব্ব পদার্থ হইতে পদার্থান্তর বিরচন; পুনশ্চ সেইরূপ প্রক্রিয়া ক্রমে পদার্থান্তর হইতে আবার গুরুতর, এবং সেই গুরুতর হইতে আবার গুরুতম পদার্থান্তরের ক্রমোত্তর সম্ভাবন, এতদ্দ্বারা এই সৃষ্টির অগ্রসরত্ব, সৃষ্ট পদার্থের ক্রমোত্তর অভিনব ভাব, বিপুলতা এবং উৎকর্ষ, সাধিত হইয়া আসিতেছে; এবং এইরূপ হইয়া যাইতেও থাকিবে। কিন্তু মিশ্রণ এবং সামঞ্জস্য সংযোগে যোজনীয় পদার্থনিচয়ের মধ্যে, পরস্পর-সংযোজন-উপযোগী গুণ-বিনিময়, এবং সামঞ্জস্য-সাধন-উপযোগী অনেক ভাগের বিকার, আবশ্যক। বাহ্যারাম, মিশ্রণ এবং সামঞ্জস্য সংযোগে যোজনীয় মনুস্য-পদার্থনিচয়ের মধ্যেও, সেইরূপ পরস্পর গুণ-বিনিময় এবং সামঞ্জস্য-সাধক ত্যাগস্বীকার উদ্দেশে, গুণবিকার ভাবের সমুপস্থিতির প্রয়োজন। কালস্রোতে হিন্দু এবং গ্রীক্ এমন স্থানে এখন আনীত হইয়াছে, যথায় তাহাদেব পূর্ব্বমূর্ত্তির লোপ এবং নব সংযোগে নবমূর্ত্তি ধারণ এ বিশ্বরঙ্গগৃহে একান্ত আবশ্যক। সুতরাং হিন্দু এবং গ্রীকের এখন সেই গুণবিকার-প্রাপ্ত অবস্থা; এবং এই জন্যই ইহাদের অবস্থা আমাদের চক্ষে এমন অসৎ, অধঃপাতিত, হীন ও শোচনীয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়:—বিকার অবস্থা কবে কোথায় চক্ষুতৃপ্তিকর বা চিত্তের তৃপ্তিদায়ক হইয়া থাকে? গ্রীকদিগের অবস্থা, গুণবিকারের পূর্ণতা প্রাপ্তিব অব্যবহিত পরবর্ত্তী; অর্থাৎ যথায় গুণবিকাব পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে, পদার্থান্তরের নির্ম্মাণক্রিয়া আবস্ত হয়। আব হিন্দুদিগের অবস্থা এখনও গুণবিকারের পূর্ণতা প্রাপ্তির অভিমুখে।

যখন দেখিতেছি যে এই সৃষ্টি, এইসৃষ্টিস্থিত বস্তুনিকর, ক্রমাগতই অগ্রসর হইতেছে, পশ্চাৎ হইতেছে না; সকলেই সম্মুখ গতিতে ছুটিতেছে, নিম্ন হইতে উর্দ্ধ মুখে যাইতেছে, নিম্নে কেহ পতিত হইতেছে না; তখন অবশ্যই একদিন এমন আশা করিতে পারি যে, এই জাতি-দ্বয়েরও যখন গুণবিকার ও গুণবিনিময় ভাব শেষ হওনান্তে উদ্দেশ্যভূত ইহাদের অবস্থান্তর নির্ম্মাণ প্রাপ্ত হইবে, তখন ইহাদের সেই অবস্থান্তর

উৎকৃষ্ট, উন্নত, পূর্ব্ব হইতে শোভনীয় ও সুন্দর হইবে; এবং তদ্রূপ হওন পক্ষে সন্দেহ অতি অল্প। কিন্তু এক কথা, পদার্থ মাত্রের উন্নত গতি অবশ্যম্ভাবী হইলেই যে প্রতি পদার্থ উন্নত মূর্ত্তিতে অথচ স্বীয় পৃথকত্ব রক্ষিয়া দৃষ্টিপথের পথিক হইয়া থাকে, তাহা নহে। উন্নত গতিতে পদার্থের এই দ্বিবিধ পরিণাম; এক বহু পদার্থ সহ সংমিলনে স্বয়ং বিলুপ্তে পদার্থান্তর রচন,অপর তদ্রূপ সংমিলন সত্বেও স্বয়ং অবিলুপ্তে নবরূপ গ্রহণ করিতে হয়। অর্থাৎ কোথাতে পদার্থ বিশেষের পূর্ব্বরূপ,সামান্য প্রাণ হইলে, উন্নতি সত্বেও বহুসংযোগে বিলুপ্ত-স্বাতন্ত্র্য হইয়া, সাধারণ দৃষ্টিপথ হইতে অদৃশ্য হইয়া থাকে; এবং সংযোজনীয় পদার্থগুলিই আয়তন গুরুতা হেতু বিশেষ এবং দৃশ্যমানরূপে ভাসমান হয়। কিন্তু যথায় মূল পদার্থ বিশেষ গুরু এবং সংযোজনীয় পদার্থ লঘু, সেখানে বহুসংযোগেও মূল পদার্থের পূর্ব্বরূপ,সংরক্ষিত উজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্য সহ,উন্নত ভাবে এবং দিব্য প্রভায় পরিলক্ষিত হইতে থাকে। উত্তর কালীয় গ্রীস এবং উত্তরকালীয় ভারতের দৃশ্যও এদুয়ের দুইতর বলিয়া দৃষ্ট হইতেছে। গ্রীকভাগ্য এখন সমগ্র ইউরোপীয় স্রোতে মিশিযা গিয়াছে; সুতরাং ক্ষেত্রবহুলতায়, তাহার ভাবী মূর্ত্তি শ্রেষ্ঠ মোহকরী হইলেও,আপাতত দৃশ্যে নগণ্য মধ্যে নিক্ষেপিত হইবার কথা। রোম গ্রীস হইতে মানুষ হইয়াছে, এবং সমগ্র ইউরোপ রোম ও গ্রীস উভয় হইতে মানুষ হইয়াছে; অতএব প্রকৃত পক্ষে উত্তরকালীন গ্রীস দেখিতে হইলে, সমগ্র ইউরোপের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হয়। ভারতের ক্ষেত্রভূমি পরিসর প্রাপ্ত হইতে পায় নাই; পূর্ব্বে যাহা ছিল এখনও তাহাই আছে; অথচ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে গুণবিনিময়ের পূরা বাজার বসিয়াছে। যদি এই সময়ে আমরা সেই বিনিময় কার্য্য যথাযোগ্য পরিমাণে সংসাধন, এবং তাহার সুব্যবহার করিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও এই জগৎক্ষেত্রে ভারতের জন্য গৌরবের এক অনাগত অপূর্ব্ব মহাদিন আগতপ্রায়। ভারতের আত্মলোপ বা আত্মস্বাতন্ত্র্য রক্ষা, এ উভয়ই ভারতসন্তানের নিজ কার্য্যের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে।

ভারতসন্তান, এই সময়ে কয়েকটা কথা আছে। বিকার বা বিপদের সময় চিরকালই শোচনীয়; সে দিনে বোধ হয় না যে আবার এদিন কখনও ফুরাইবে; চিরকালই তাহাতে নিরাশা প্রবাহ ঢালিয়া দেয়; কিন্তু ইহাও নিশ্চয় যে চিরকাল কখন বিকার বা বিপদ তিষ্ঠে না, এবং যত চেষ্টা ততই তাহা ত্বরিত পদে তিরোহিত হইয়া থাকে। অতএব নিরাশা প্রবাহে ডুবিও না; অথবা যাহা হইবার, তাহা কর্ম্মসূত্র বশে প্রাকৃতিক ক্রিয়ায় আপনা হইতে হইতেছে এবং হইবে, ইহা বলিয়াও স্রোতে গা ঢালিয়া থাকিও না। নিরাশা এবং অদৃষ্টবাদিত্ব, উভয়ে অনেক দিন ধরিয়া ভারতের সর্ব্বনাশ করিয়াছে; তাহার এই বিষময় ফল দেখিয়াও, আর কেন তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে যাও। তুমি যদিও জড়প্রকৃতি-সম্ভূত বটে, কিন্তু তুমি নিজে জড় নহ। স্বেচ্ছাশক্তি, কর্ম্মশক্তি, উভয় শক্তিতে তুমি শক্তিমান; সুতরাং তুমিও স্বয়ং প্রাকৃতিক কর্ম্মসূত্রের উপর আর এক কর্ম্মসূত্র, এবং নিরাশার উপর আর এক আশা-নির্ম্মায়ক বলিয়া আপনাকে জানিও। প্রাকৃতিক কর্ম্মসূত্র এবং তুমি কর্ম্মসূত্র, উভয়েরই কর্ম্মগতি যদিও একই মুখে, তথাপি তাহা স্ব স্ব কর্ম্ম-ক্ষেত্র মধ্যে কার্য্যস্বাধীনতাশূন্য নহে। ভারতসন্তান, এ কথা আমি তোমাকে কেমন করিয়া বুঝাইব?

কেমন করিয়া বুঝাইব? তুমি যদি সামঞ্জস্য-সমুৎপন্ন মধ্যম গতি কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে, তাহা হইলেও কতকটা বুঝাইবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু, তুমি হয় হুজুকে হাটের নেড়া, নতুবা চেষ্টাশূন্য চাল কুমড়া, বাদসাই আলিসে। তোমার কর্ম্মবুদ্ধির আবির্ভাব হইল যদি, কর্ম্ম যত হউক না হউক, চীৎকারে দেশ তোল পাড়; আবার কর্ম্মবুদ্ধির ন্যূনতা হইল যদি, তবে একেবারে অস্তিত্বশূন্য, জীবনীর চিহ্নমাত্রেরও চিহ্ন পাইবার সম্ভাবনা নাই। তোমার ধর্ম্মবুদ্ধি হইল যদি, তবে একেবারে সন্ন্যাসী, বৈরাগ্যের আধার অথবা অন্য দিকে ঘেঁটু মনসা পর্য্যন্ত পূজিয়াও তোমার ক্ষান্তি নাই; আবার ধর্ম্মবুদ্ধি না হইল যদি, তবে একেবারে কাঠ-নাস্তিক, ওরফে ঘোর বৈজ্ঞানিক বা 'ফিলোজফার।' কোন দিকেরই ভাব পাওয়া কঠিন। তাহার পর আর যেমন হউক, সকল অবস্থাতেই কিন্তু অদৃষ্ট-

বাদিত্বের উপরে নির্ভরতা কিছু অধিক। বাঞ্ছারাম, তুমি কি জন্য এমন বদ্ধমূল অদৃষ্টবাদী, তোমার এ অদৃষ্টবাদিত্ব কোথা হইতে উঠিয়াছে বলিতে পার? আমি যতদূর দেখিতে পাই তাহাতে তোমার অদৃষ্ট-বাদিত্বের এই দ্বিবিধ কারণ লক্ষিত হয়, এক তোমার শাস্ত্রীয় শিক্ষার 'অনিত্য' বুদ্ধি, তাহার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি; অপর প্রাকৃত শক্তি এবং স্বেচ্ছাশক্তি এতদুভয় শক্তির সন্ধিস্থল দেখিয়া, সুতরাং তাহাদের পৃথকত্ব অনুভব করিতে না পারিয়া, প্রাকৃতিক শক্তির প্রাবল্য হেতু তাহার মোহে, তোমার এই অদৃষ্টবাদিত্বের উৎপত্তি হইয়াছে। সন্ধিস্থল মাত্রে, সংমিলিত বস্তুদ্বয়কে সাধারণত পৃথক করিয়া বাছিয়া লওয়া দুষ্কর। কিন্তু বাপু, তোমার চক্ষু কেবল সন্ধিস্থল দেখিবার জন্য নহে; যদি তাহাকে অতিক্রম করিয়া, উভয়ের দিগন্ত ভাগাভিমুখে দৃষ্টি সঞ্চালন কর, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, প্রাকৃতিক শক্তি পৃথক এবং স্বেচ্ছাশক্তি পৃথক। যে অংশ একমাত্র প্রকৃতির ক্রিয়া, তাহাতে তুমি অবশ্যই স্বেচ্ছাশূন্য এবং তাহাকে তুমি 'অদৃষ্ট' বা যে নামে ইচ্ছা ডাকিতে চাও ডাকিতে পার; সেরূপ স্থলে যে কিছু কার্য্য উৎপন্ন, তাহাতেও অবশ্য তুমি নির্দ্দোষ। কিন্তু তোমার জবাবদিহী সেইখানে, যথায় ক্রিয়া তোমার মনীষা এবং স্বেচ্ছাশক্তি সম্ভূত। মানবীয় স্বেচ্ছাশক্তি হইতে সম্ভূত যে সকল কার্য্য, তাহা যখন প্রকৃতির অনুসারী এবং প্রকৃতির সহায়বর্দ্ধক হয়, তখনই সেই কার্য্যের সার্থকতা, তখনই সেই কার্য্য সতের অভিপ্রেত হইয়া থাকে, এবং তাহাতে মঙ্গলের উৎপাদন হয়। তদ্বিপরীতে তদ্বিপরীত ফল। নিয়ন্তার কর্ম্মহানি, নিজের কর্ম্মহানি, উভয় হানি, একত্র সমবেত হইয়া, কর্ম্মকারককে ব্যাকুলিত এবং ধ্বংসপথে অগ্রসর করাইয়া থাকে। প্রথমোক্ত যে কার্য্য এবং তদর্থে যে অনুষ্ঠান, তাহাই এ জগতে মানবের আত্ম সম্বন্ধে সৎ, তদ্বিপরীত অসৎ। অতএব দেখ, তুমি যে আপনাকে অদৃষ্টের অধীন, পরাধীন বলিয়া জানিতে তাহাও অলীক নহে; তুমি পরাধীন; কিন্তু, আবার ইহাও দেখিলে যে তুমি পরাধীন হইয়াও স্বাধীন। তুমি বা তোমার কামনা, অদৃষ্ট বা মহান্ কামনার নিকট পরাধীন হইয়াও স্বাধীন,—

একথা কোন দার্শনিক শুনিলে হয়ত হাঁসিয়াই অকুঞ্চিত হইবে। কিন্তু ছয় হউক, তথাপি উহা তাহাই। স্বাধীন ও পরাধীন ভাবের কার্য্য একটা উপমা যোগে একটু আলোচনা করা যাউক।

বাপু বাঞ্ছারাম, কি আশ্চর্য্য! প্রতিক্ষণে, তিলে তিলে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, মানব কার্য্য করিয়া যাইতেছে; অথচ দেখিতে গেলে তাহার একটাও নূতন নহে। নূতনত্ব সত্বেও অনুকরণ মাত্র; নূতন পুরাতন একাধারে। আমরা যাহা কিছু করিয়া থাকি, অগ্রে তাহার আভাস বাহ্যজগৎ হইতে সংগ্রহ করিয়া লই, তাহারই অনুমোদন সাপেক্ষ হই, নতুবা তাহা সুসম্পন্ন হইবার নহে। তুমি বলিতে পার যে, আমি যে এই সুন্দর বাড়ীটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছি, ইহা কি নূতন নহে?—তোমার প্রাকৃতিক মূর্ত্তির কোন মূর্ত্তি এরূপ আছে যে আমার এই বাড়ী তাহার প্রতিরূপ স্বরূপ হইতে পারে, এবং যাহা দেখিয়া আমি এই বাড়ী নির্ম্মাণের আভাস প্রাপ্ত হইয়াছি? মিথ্যা নহে, তুমি যে কথাগুলি বলিতেছ তাহা সত্য বটে, বিশেষত তুমি যেরূপ মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া, যত বাটপাড়ি করিয়া এই বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছ, তাহাতে তাহার নূতনত্ব-হানিকর কোন বিরূপ কথা বলিতে যাওয়াও নিষ্ঠুরের কার্য্য। সে যাহা হউক, তুমি যে কথা গুলি বলিতেছ তাহা সত্য বটে, অথচ আবার আর এক অর্থে সত্যও নহে, একটু ভাবিয়া দেখ। ভাবিয়া দেখ দেখি তোমার পাকা-বাড়ীর বুদ্ধি কি দেখিয়া হইয়াছিল,—কাঁচাবাড়ী! কাঁচাবাড়ী দৃষ্টে যে বাড়ী বিষয়ক জ্ঞান জন্মিয়া ছিল, তাহার উপর মনীষা যোগে অপরাপর নব-সংযোগের আরোপ হওয়ায়, পাকা বাড়ীর উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব পাকা বাড়ীর মূল আভাস যাহা তাহা কাঁচাবাড়ী হইতে প্রাপ্ত। আবার কাঁচাবাড়ী?—টাটীর ঘর দেখিয়া। টাটীর ঘর?—লতা পাতার ঘর দেখিয়া। লতা পাতার ঘর?—সংগৃহীত তালপাতার নির্ম্মিত আবরণ দেখিয়া। সেই তালপাতার আবরণ আবার কি দেখিয়া হইয়াছে?—বিশ্বাস করিবে কি, গাছতলা বা বৃক্ষ কোটর দেখিয়া! গাছতলা বা বৃক্ষকোটর কি দেখিয়া বা কাহার?—উহা কিছু দেখিয়াও নহে, এবং উহা তোমারও নহে আমারও নহে। 'তুমি' 'আমি' বহির্ভূত পরিচালিকা মহাশক্তির কার্য্য-

খণ্ডে উৎপন্ন। গাছতলা হইতে যেমন পাকাবাড়ীর উৎপত্তি সেইরূপ জগতের আবৎ বিষয়, সহজ হইতে কূটতায়, লঘু হইত গুরুতায়, একক হইতে মিশ্ররাশি মুখে ; আভাস হইতে রূপ, রূপ হইতে আভাস, এরূপ প্রণালীক্রমে ; উত্তরোত্তর নানাবিধ আকৃতি গ্রহণ করিয়া ছুটিতেছে।

সে যাহা হউক, এখন দেখিলে তোমার পাকাবাড়ীর মূল কোথায় ? তুমি বাড়ীর যে আকার প্রকার দিয়াছ তাহা নূতন ; কিন্তু তাহার যে আভাস গ্রহণ করিয়াছ,তাহা মূলে গাছতলা বা বৃক্ষকোটর হইতে,সুতরাং এখানে অনুকরণ বা অনুসরণ। একটী তোমার স্বাধীনতার পরিচয়, অপরটী তোমার পরাধীনতার পরিচয়। একটী তোমার স্বেচ্ছাশক্তি এবং মনীষাশক্তির সম্পত্তি, অপরটী খাস প্রকৃতির সম্পত্তি। এইরূপই আমাদের সকল কার্য্য, সকল বিষয় ও সকল বস্তু সম্বন্ধে ; এবং এই রূপেই ঐশ্বরিক মহান্ কামনার নিকট, মানবীয় কামনা স্বাধীন হইয়াও পরাধীন। বাড়ীটী যেখানে ও যে যে পদার্থে নির্ম্মিত, তাহা সমস্তই পৃথিবীতে বর্ত্তমান ছিল ; এইরূপ বস্তু এই সঙ্গে এরূপে যোগ করিলে এরূপ বস্তু হয়, তাহারও নিয়ম এই পৃথিবীতে বর্ত্তমান ছিল, তাহাদের আভাস যাহা, তাহাও এই পৃথিবীতে বর্ত্তমান ছিল : এখন, সেই সকল যে ছিল এবং তাহাদের না হইলে যে তোমার অবস্থায় চলে না, এবং তুমি তাহাদের অবহেলা করিলে যে অনর্থের বিষয়ীভূত হও, এই পর্য্যন্ত তোমার পরাধীনতা ; কিন্তু তুমি যে সেই গুলির যোগাযোগ সাধন করিয়া এরূপ আকৃতি সংঘটন করিয়াছ,এবং তদ্দ্বারা অনর্থের পরিবর্ত্তে যে অর্থকে উপার্জ্জন ও অগ্রসারিত করিতে পারিয়াছ, ইহাই তোমার স্বাধীনতার পরিচয়। আমরা কি আত্মিক কি ভৌতিক, সর্ব্ব বিষয়ে, এইরূপ স্বাধীন পরাধীন ভাবে কার্য্য করিয়া থাকি। তুমি বলিবে,প্রকৃতির নিকট যে দেশ,পদার্থ ও আভাসের বশ্যতায় সৎকার্য্য করিতে হয় ; অসৎ কার্য্যেও ত অবিকল সেই বশ্যতা, এবং সে অসৎ কার্য্যও ত প্রকৃতিবক্ষে বৃথা যায় না ; তবে সে কার্য্য অসৎ হয় কেন ? অসৎ অনর্থের উৎপত্তি হেতু। এ কথায় দুইটী বিষয় মাত্র এখানে প্রতিভাসিত হইতেছে, এক তোমার বিকৃতশক্তিমত্ত্ব, অপর প্রকৃতির সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব। তোমার বিকৃতশক্তিমত্তাতে তুমি জগতের

উৎপত্তি করিতেছ; প্রকৃতি তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তাতে সে অসৎও কাজে লাগাইয়া লইতেছেন। কিন্তু ইহা এখানে, প্রকৃতির জমাখরচ বহিতে, নিশ্চয়রূপে তোমার বিপক্ষে লিখিত হইয়া রহিল যে, তোমা দ্বারা প্রকৃতির যতদূর সহায়তা হওয়া উচিত ছিল তাহা হইল না। অতঃপর বাঞ্ছারাম, আরও কি বলিয়া দিতে হইবে যে, যে অদৃষ্ট ভয়ে তুমি নিরন্তর ভীত হইয়া থাক, তুমি নিজেই অনেক সময়ে সেই অদৃষ্টের সৃষ্টিকর্ত্তা। যে কর্ম্ম জন্য প্রকৃতি কার্য্য করিতেছে, এবং তোমার কার্য্যসহায়তা যে কর্ম্ম জন্য প্রকৃতি গ্রহণ করিতেছে, সেই কর্ম্ম যাঁহার উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য প্রধাবিত হইয়াছে, তুমি নিশ্চয় জানিও তোমার এ কর্ম্মক্ষেত্রে নিয়োগও তাঁহারই। তাঁহারই অভিপ্রায় সুসিদ্ধ করিতে তোমাকে স্বেচ্ছাশক্তি প্রদত্ত হইয়াছে। তুমি কেবল যন্ত্র নহ, যন্ত্রপরিচালকও তুমি। অতএব এই কর্ম্মক্ষেত্র মধ্যে তুমিও কর্ম্মকারক; স্রোতে গা ঢালিয়া বসিয়া থাকিবার জন্য, অথবা যদৃচ্ছা স্বেচ্ছাকিঙ্কর হইয়া বিচরণ করিবার জন্য, সংসারক্ষেত্রে আইস নাই।

বাপু বাঞ্ছারাম, তুমি তর্কে ন্যায়পঞ্চানন, এবং বুদ্ধিতে দেবগুরু বৃহস্পতি তোমার কাছে হার মানিয়া থাকেন। তুমি বলিবে কর্ম্মই বা কি, কর্ম্মক্ষেত্রই বা কি, তাহার জন্য এত আড়ম্বর, এত মাথাব্যথা কেন? কর্ম্মক্ষেত্র যাহা তাহা চাকুরী ক্ষেত্রে, কর্ম্ম যাহা তাহা উদরপূর্ত্তিতে, এবং পরম পুরুষার্থ যাহা তাহা সুখ-শয়নে। ইহা ভিন্ন আবার কি কর্ম্ম আছে? যদি কিছু থাকে, এই কর্ম্ম সাধন করিতে করিতে তাহারা আপনা হইতে আসিয়া পড়ে পড়ুক; পৃথক চেষ্টার আবশ্যক নাই। বাপু, আমার তর্কশক্তি নাই, বারেক মানস-নেত্র প্রসারিত করিয়া দেখিয়াছ কি?—

এই পরিদৃশ্যমান, অথচ ধারণার অতীত, অনন্ত গগনসমুদ্রে যে অসংখ্য জ্যোতিষ্কপিণ্ড নিরন্তর ভাসমান হইয়া ফিরিতেছে; এবং আমরা এই কণিকাবৎ যে ক্ষুদ্র পৃথিবীর উপর অবস্থান করিয়া মোহ প্রমাদে বিশ্বের ঈশ্বরত্বে পর্য্যন্ত হস্ত প্রসারণ করিতে উদ্যত হইয়াছি; সেই পৃথিবীতে আবার কীট হইতে কীটাণু, অণু হইতে পরমাণু, ক্ষুদ্র হইতে

ক্ষুদ্রতম, যে সকল জীবন বা জড় পরমাণু লক্ষিত বা লক্ষ্যাতীত ভাবে অবস্থান করিতেছে; সেই সমগ্র দৃশ্য, সে দৃশ্য যদি কাহারও একদা দেখিবার, ধারণা করিবার, বা অনুভব করিবার শক্তি থাকে, সে দেখিতে পাইবে যে তাহা কি মহান্, কি অপার, কি অচিন্তনীয়! ঊর্দ্ধ হইতে ঊর্দ্ধতম, বৃহৎ হইতে বৃহত্তম; অথবা নিম্ন হইতে নিম্নতম, ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম; যে দিকে দেখিতে চাও, সকল দিকই অনন্তপ্রসারিণী হইয়া বিলীন হইয়া গিয়াছে। যে দিকে দৃষ্টি প্রসারিত কর, কোন দিকেই কোন বস্তুর অন্ত পাইবার সাধ্য নাই। মনুষ্য-জীবনেও যাহা কৃত, কথিত, কল্পিত; আমাদেরই দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইয়াছে এবং হইতেছে, অথচ আমরাই তাহার অন্ত পাইয়া উঠি না। আমরা আপনাদের অন্তই আপনারা পাই না। আশ্চর্য্য! অতঃপর এই নিবিড় অনন্ত পরিবেষ্টিত ও তাহাতেই বর্দ্ধিত ও জীবিত হইয়াও, যাহারা আপনাকে অন্তানুবর্ত্তী রূপে কল্পনা করিয়া, আত্ম-অভিহিত করিয়া থাকে; এবং বিশ্ব-আত্মা সহ আত্মিক নৈকট্য বা ঘনিষ্ঠতা দেখিতে না পায়, তাহারা কি ভ্রান্ত!

এখন বিশ্বাস করিবে কি, এই অনন্ত দেশ লইয়া তোমার কর্ম্মক্ষেত্র ব্যাপ্ত; এবং তোমার কর্ম্ম অনন্তপ্রসূত কর্ম্মরাশি সহ সম্বন্ধবান? এই নিবিড় অনন্ত সাগরদেশে বৃহৎ এবং দূরতম জ্যোতিষ্ক হইতে ক্ষুদ্রতম পরমাণু পর্য্যন্ত, জীবিত অজীবিত, যে যাবতীয় পদার্থনিকর, আমূলান্ত কালবক্ষ বাহিয়া, কখন ডুবিয়া কখন ভাসিয়া, ভাসমান হইয়া চলিয়াছে; তাহাদের আভ্যন্তরীণ পরিচালিকা-মহাশক্তি রূপী যে ঐশ্বরিক নিয়ম, তাহা সর্ব্বত্র এক। ঐশ্বরিক নিয়ম এবং ঐশ্বরিক সত্তা, ইহারা নিত্য পদার্থ; সুতরাং সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে একই রূপে অবস্থান করিতেছে। তবে যে আমরা তাহাতে নানারূপে বিভিন্নতা অবলোকন করি, বা বিভিন্ন জনে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপে তাহাদের ব্যাখ্যা করে, তাহা তৎ তৎ পদার্থের দোষ নহে; দোষ যদি কিছু থাকে তাহা আমাদের। মানব তাহাকে সহসা ধারণা করিতে বা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। সে কথা দূরে যাউক, দেখ এক টা দর কদম বুঝিতে মানব, বুড়ির কদম তলার কাটনা কাটা হইতে অত্যন্ত গভীর গুহা পর্য্যন্ত, কত কথাই বলিয়া আসিতেছে!

এখানেও সেইরূপ। ঐশ্বরিক নিয়ম ও ঐশ্বরিক সত্তা সেইরূপ, এক ভাবে চিরকালই সমান থাকিয়া দৃষ্টিগোচর হইতেছে; কেবলমাত্র মানব তাহা বুঝিতে না পারিয়া এবং বুঝিবার চেষ্টা করিতে করিতে, নানা দেশজ নানা প্রকৃতি এবং স্বীয় জ্ঞানোন্নতির বিভিন্ন পর্য্যায় অনুসারে, নানা স্থানে, নানা সময়ে, নানা রূপে ব্যাখ্যা প্রকটন করিয়া ফিরিতেছে। সে চেষ্টায় এই নানাদেশজ প্রকৃতি, জ্ঞানোন্নতির ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যায়, ইত্যাদি অনুসারে; নানা স্থানে, নানা সময়ে; অবনত বা উন্নত; ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র, ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বশাস্ত্র, নানা মত, নানা ব্যাখ্যা, নানা কথা, এ জগতে ক্ষণে উদয় ক্ষণে বিলয় হইয়া যাইতেছে। সেই সেই ধর্ম্ম এবং তত্ত্ব শাস্ত্রাদি, কোথায় বা কিরূপে এবং কোন সময়ে ও কি পরিমাণে মানব সেই সেই নিত্য পদার্থগুলি বুঝিতে চেষ্টা ও তাহাতে কতদূর সফলতা লাভ করিয়াছিল, তাহার নিদর্শক স্বরূপ। পুনশ্চ সেই সকল শাস্ত্র, যে দেশে যে প্রকৃতির লোক ও যে জ্ঞানপর্য্যায় হইতে সম্ভূত, সেই দেশে সে প্রকৃতির লোক অথচ যাহারা সে জ্ঞান পর্য্যায়ে এখনও উঠে নাই, তাহাদের পক্ষে অবশ্য তাহা পরিচালকরূপ হয়। এ হিসাবে সকল দেশেরই ধর্ম্মশাস্ত্রাদি, যে পর্য্যন্ত তাহারা উন্নত জ্ঞানের উদয়ে অর্থশূন্য না হয়, তাবৎকাল তৎতৎ দেশের লোকের পক্ষে উপ-যোগী ও তাহার বিধানাদি তাহাদের পক্ষে পালনীয় বলিতে হইবে। অনেক উন্নত ধর্ম্মশাস্ত্রাবলম্বী অথবা প্রায় সকল ধর্ম্মশাস্ত্রাবলম্বীই ভাবিয়া থাকে যে, তাহাদের হইতে বিধর্ম্মী যাহারা তাহারা নরকে ডুবিবে ও যে কোন রূপে অধঃপাতে যাইবে। অবিকল এইরূপ, যাহারা ডাক্তারের সাহায্য পাইয়া থাকে, তাহারা ভাবে যে এমন ডাক্তার যেখানে নাই, সেখানকার লোক বাঁচে কি করিয়া। অথচ ঈশ্বরের কৃপায় যেখানে ডাক্তার আছে সেখানেও যেমন, যেখানে নাই সেখানেও তেমনি জীবন স্রোত প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। তোমার অবস্থায় ডাক্তার না হইলে চলে না, তাহার অবস্থায় গোবেদে হইলে চলে, এই হিসাবে মোটের উপর হরণ পূরণ সাধন হইয়া থাকে। বাহ্যাবাম, ধর্ম্মশাস্ত্রাবলম্বনও, তাবৎ গূঢ় পদার্থের ন্যায়, বাহির হইতে আইসে

না, ভিতর হইতে আইসে; হৃদয়ের পূর্ণ বিশ্বাস এবং পূর্ণভক্তি, এই দুইকে তাবৎ ধর্ম্মশাস্ত্রাবলম্বনের উপাদান বলিয়া জানিবে। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি কেবল জ্ঞানের উন্নতিক্রম অনুসারে আসে যায় মাত্র। আর এক কথা, নিত্য পদার্থগুলির যখন অন্ত নাই, এবং মহিমা যখন তাহাদের অপার, তখন ধর্ম্মশাস্ত্রাদিরও এ জগতে উদয় বিলয়ের অন্ত থাকিবে না।

পুনশ্চ ঐশ্বরিক নিয়ম, যাহা সত্ত্বরজস্তমঃ-ত্রিগুণবিশিষ্ট ও যাহা বিশ্ব পরিচালনা হেতু সাধারণত বিশ্ব-নিয়ম নামে খ্যাত তাহা, দেশ, কাল এবং পরিচালনীয় উপকরণ পদার্থাদি ভেদে, তদ্বৎ বাহ্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ হেতু, লোকনয়নে আপাতত বিভিন্ন বিভিন্ন রূপে যেন তত গুলি বিভিন্ন নিয়ম বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। কিন্তু বস্তুত বিভিন্ন নহে। অর্দ্ধ-শিত অর্দ্ধ-কৃষ্ণ নেমিবিশিষ্ট নিয়মচক্র, 'আহ্নিক' এবং 'বার্ষিক' গতিতে আবর্ত্তমান হইয়া; জগৎ সংসার সমস্তকেই, নিত্য শুভাশুভ, নৈমিত্তিক শুভাশুভ, উভয় শুভাশুভের সমান অধীনে ফেলিয়া; তাহাদের নিত্য রূপান্তর এবং নৈমিত্তিক রূপান্তরের উৎপাদন করিতে করিতে, অগ্রসর হইয়া ধাবিত হইতেছে।—যে নিয়মে কেন্দ্রবাহী বায়ু-দ্বয় উপশমিত এবং অপশমিত হইয়া থাকে, বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ সেই একই নিয়মে উপশমিত এবং অপশমিত হয়। যে শক্তিস্রোতের স্বাভাবিকী গতিবশে নদীস্রোত আঁকা বাঁকা হইয়া চলিয়াছে, রেখাকৃতি সাপও তাহার বশে হিলি বিলি করিয়া যাইতেছে, আবার মানবও পর পর দক্ষিণ ও বাম পদদ্বয় বিক্ষেপে সেই আঁকা বাঁকা গতিরই অনুকরণ করিতেছে; অথবা যে নিয়মে অসীম আকাশে মহীয়ান্ সূর্য্যদেব ঘুরিয়া ফিরিয়া আপন কক্ষে আবর্ত্তন করিতেছেন, তোমার হস্ত-নিক্ষেপিত ঢিলটীও অবিকল সেইরূপ ঘুরিয়া ফিরিয়া আবর্ত্তন করিতে করিতে ছুটিতেছে; অথবা যে নিয়মে মনুষ্যনর মনুষ্যনারী সংযোজিত হইয়া সন্তান উৎপাদন করিতেছে, সেই একই নিয়মে বায়বীয় তাড়িত ও ভূমিজ তাড়িত একত্র হইয়া বজ্রাগ্নির উপস্থিতি করিতেছে; পুনশ্চ যে তাপ ও শৈত্য যৌগিকার্ষণের ন্যূনাতিরেকে জড় জগতকে শিথীল-

যখন বা জমাটযুক্ত করিয়া থাকে, সেই তাপ শৈত্যই স্থানভেদে রাগ বা বিরাগ আকারে মানবকে অসার বা গভীরতা যুক্ত করিয়া দেয়। পুনশ্চ, তোমার আঁকা বাঁকা, দক্ষিণ বাম, পুরুষগুণ নারীগুণ, তাপ শৈত্য, ইহারা আবার কি পদার্থ? এখানে এ পৃথক পৃথক পদার্থ মূর্ত্তিধারী গুণগুলি কাহারা? ইহারাও পৃথক নহে; আলোক এবং অন্ধকার, সৎ এবং অসৎ, চিৎ এবং অচিৎ যাহা, ইহারাও তাহাই। এই চিৎ এবং অচিৎ আবার কি? পূর্ণত্ব এবং ন্যূনতা, স্বভাব এবং বিকার, শক্তিস্রোতের গতির দুই বিভিন্ন দিকের দুইটী সংজ্ঞা মাত্র; একই বস্তুর উভয় দিক। শক্তিস্রোত, ঈশ্বরের কামনা প্রবাহ। কামনা প্রবাহ এক এবং অখণ্ডিত, এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড সেই কামনা প্রবাহের আশু উদ্দেশ্য ফল, এবং গৌণ উদ্দেশ্য ফলের সংসাধক উপকরণ, উভয়ই। এই কামনা-প্রবাহ-প্রবর্ত্তিত নিয়মের নিবৃত্তিতে, আমরা যাহাকে অসৎ বা বিকার বলি, তাহার নিবৃত্তি হয়। বোধ করি, হিন্দু ঋষি এই হেতুই 'নিষ্কাম মোক্ষ' এবং 'নির্ব্বাণ' আদির কল্পনা করিয়াছেন, এবং করিতে গিয়া নিজেও কামনাশূন্য জড়পিণ্ড হইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু অনন্ত-উৎসপ্রসূত কামনার কি নিবৃত্তি আছে? অথবা এ অসৎ, এ বিকারে ভয়ই বা কিসের? যাহা উন্নতিপথে অগ্রসর করিয়া দিবার সোপান, তাহা বস্তুত যতটা মন্দ বলিয়া আমরা ভাবি, ততটা মন্দ হইতে পারে না। কথায় কথায় আমরা অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি।

ফলত একই নিয়ম সর্ব্বত্র সর্ব্বপদার্থকে পরিচালনা করিয়া, একই উদ্দেশ্য মুখে, যথাগতিতে নিয়ন্তার অভিপ্রায় সুসিদ্ধ করিতে চলিয়াছে। একই নিয়মে যথায় আবদ্ধ করা যায়, তথায় উদ্দেশ্য সিদ্ধি কখন এক ভিন্ন দ্বিতীয় প্রকার হইতে পারে না, এবং সেই একই উদ্দেশ্যসিদ্ধি সাধন করিতে যাহারা নিযুক্ত, তাহারাও সুতরাং সকলেই এক সম্বন্ধ সূত্রে গ্রথিত; তবে দেশ কাল পাত্র অনুসারে অর্পিত ভারের পৃথকত্ব হেতু, তাহাদের যে কিছু বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় এই মাত্র। ঐ যে আকাশস্থিত ঘূর্ণায়মান জ্যোতিষ্কপিণ্ড, এবং তাহাদের অভ্যন্তরে আবার বৃহৎ হইতে ক্ষুদ্র এবং

সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম যে সকল কার্য্য হইয়া যাইতেছে, তাহারা যে নিয়মবশে এবং বিশ্বনিয়ন্তার যে অভিপ্রায় সিদ্ধ্যর্থে; আমি যে এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতলে সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া যে সমস্ত কার্য্যরাশির সমুৎপাদন করিতেছি, বা আমার দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে, তাহাও সেই একই নিয়মের পরিপোষণার্থে; সেই একই নিয়মের এবং নিয়ন্তার সেই একই অভিপ্রায়ের সুসিদ্ধির জন্য ইহা জানিও। পর্ব্বত ভাঙ্গিতেছে, সাগর উথলিতেছে, মেদিনী কাঁপিতেছে, পিপীলিকা হাটিতেছে, কীটাণু খেলা করিতেছে, এবং তুমি যে ঐ মাথামুণ্ড তর্ক করিতে বসিয়াছ (কৃতকার্য্য তাহাতে কতটা হইতেছে বা না হইতেছে, সে স্বতন্ত্র কথা), তাহাও সেই একই অভিপ্রায়ের সুসিদ্ধির জন্য। সকলেই আত্ম-উপযোগিতা ও শক্তি অনুসারে, সেই মহান্ উদ্দেশ্যভূত কার্য্যের অংশরাশি অনুষ্ঠান ও সম্পাদন করিয়া যাইতেছে। কিন্তু সেই সকল এখন কি দূরস্থানে, কি দূর অন্তস্থায়ী পৃথক্ পৃথক্ ভাবে! যেন কেহ কাহার সহিত কোন সংস্রবযুক্ত নহে, সকলই সম্বন্ধশূন্য পৃথক্ পৃথক্, দূরতম দেশ ও কাল ব্যাপিয়া অবস্থিত;—কে বলিবে যে ইহারা এক সংসারের, কে বলিবে যে ইহাদের একাগ্রমুখে গতি, এবং কখনও ইহারা একতায় আসিয়া সংমিলিত হইবে কি না। ইহা বুদ্ধির অতীত, দর্শনের অতীত, এবং ধারণারও অতীত। কিন্তু ইহারা আসিবে। অদৃষ্টচক্র সকল সময়েতেই এইরূপ দূর-অন্তবাহী হইয়া আবর্ত্তিত হইয়া থাকে; সময় পূর্ণ হইলে, আয়োজন পূর্ণ হইলে, ঘনীভূত হইয়া এবং একতায় আসিয়া, যথাকালে ফলকার্য্যের সমুৎপাদনে দৃষ্টিপথে সমাগত হয়। আয়োজন মাত্রেরই আদি মূল আদি-নিহিত, তথা হইতে অদৃষ্টভাবে দৃষ্ট মুখে, কার্য্যকারণ যোগে, ধীরে ধীরে, তিল তিল করিয়া বর্দ্ধিত হইয়া, কাল বুঝিয়া রাক্ষস বা দেব মূর্ত্তিতে আদিষ্ট ফলের সংঘটন করিয়া দেয়। আজিকে যাহা হইতেছে, যুগযুগান্ত হইতে তাহার আয়োজন এবং পূর্ণতা প্রাপ্তি হইয়া আসিয়াছে; এবং যুগযুগান্ত বাদে যাহা হইবে, আজিকে তাহার আয়োজন হইতেছে। এখন যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ দেখিতেছ না, বা এখন যাহা একেবারে লক্ষ্যাতীত রহিয়াছে, কালে তাহাই আবার একতায় আসিবে, সংমিলিত

হইবে; এবং সেই সংমিলিত মূর্ত্তি আবার আপন পালার আগতিতে কর্ম্মপথে নব সংমিলনে নব কার্য্য সম্পাদনার্থে কারণরূপে কর্ম্মক্ষেত্রে পুনঃ প্রবেশ করিবে। ঐ যে ব্যক্তি বজ্রপতনে আহত হইল, মনে করিও না যে হঠাৎ বা দৈবাৎ ঐ ঘটনার উপস্থিতি হইয়াছে। বহুকাল হইতে চৈতন্য এবং জড় উভয় জগতে যুগ যুগান্ত বাহিয়া উহার জন্য, হন্তা এবং হত উভয় দিকেই, আয়োজন হইয়া আসিতেছিল; আজিকে তাহার পূর্ণতা প্রাপ্তি হওয়াতে, তাহাদের ঐ একতা বা ঐ ঘটনার উপস্থিতি হইয়াছে। হঠাৎ বা দৈবাতের নাম মাত্রও উহাতে নাই।

অতএব বাঞ্ছারাম, ঐ যে আকাশক্ষেত্রে নীহারিকাপুঞ্জ, অথবা সংসারক্ষেত্রে অলক্ষিত বা পরিত্যক্ত পদার্থনিকর, যাহা দেখিয়া ভাবিতেছ যে তোমাদের সঙ্গে পরস্পরের কোন সম্বন্ধ নাই; তোমাদের সঙ্গে কোন কালে সংস্রবে আসিবারও সম্ভাবনা নাই; তাহা তোমার ভ্রম। উহাদের সঙ্গে তোমাদের সকল সম্বন্ধই আছে, এবং এক সময়ে অবশ্যই সকলে একতায় এবং ঘনিষ্ঠতায় আসিবে। সকলেই তোমরা এক ক্রিয়াবাটীর কর্ম্মকারক, এখন বিভিন্ন সহরে বিভিন্ন বাজারে বাজার করিয়া ফিরিতেছ মাত্র। যখন বাজার পূর্ণ হইবে, বহির্ভ্রমণের আবশ্যক শেষ হইবে, তখন ক্রিয়াবাড়ী না যাইয়া, কোন গোভাগাড়ে গিয়া উপস্থিত হইবে? এখন তোমার বাজার সে জানিতেছে না, বা তাহার বাজার তুমি জানিতেছ না; কিন্তু সকল বাজার যখন কর্ম্ম-কর্ত্তার বাড়ী আসিয়া একত্র মিলিবে, তখন যদি উপযুক্ত হও দেখিতে পাইবে কাহার বাজার কি জন্য, কাহার বাজার কি জিনিস লইয়া, এবং সেই বাজার সমষ্টি কি পূর্ণ কি অপূর্ণ! এই বিশ্বদেশে তোমরা জড় অজড় সকলে সেই একই কর্ম্মকর্ত্তার একই কর্ম্মকারক, এবং একই কর্ম্মের অংশ ও পর্য্যায়াদি সুসম্পাদনের নিমিত্ত এই বৈচিত্র্যময়ী সৃষ্টিতে তোমাদের উৎপত্তি; তোমরা সকলে এক পরিবারস্থ, কার্য্যবশে বিভিন্ন দেশে বাস করিতেছ এই মাত্র বিভিন্নতা।

এখন দেখ, মানবীয় কর্ম্মক্ষেত্র কি অনন্ত-প্রবাহী, কিরূপ দিগন্ত-প্রসারিত, এবং বৃহত্তম হইতে ক্ষুদ্রতমের মধ্যেও কি সম্বন্ধনৈকট্য; এবং

আমরা যে বৃহত্তমের নিকট ক্ষুদ্রতমকে বসাইতে বা সংশ্রবে আনিতে লজ্জা বোধ করিয়া থাকি, তাহাই বা কি ভ্রম প্রমাদের কার্য্য। যে আবর্ত্তনে সামান্য কীটাণু এই মুহূর্ত্তে এই পৃথিবীতলে শক্তি সঞ্চালন করিয়া গমন করিতেছে, জানিও, বৈজ্ঞানিক বিবিধ প্রকরণেও জানিতে পারিবে, সেই আবর্ত্তনবেগ কেবল কীটাণু পার্শ্বে পর্য্যবসিত নহে; তাহা সমস্ত পৃথিবী, সৌরমণ্ডল, এবং তদতীতে ঐ দূর আকাশস্থ নীহারিকা, এবং তাহার পরেও যাহা কিছু আছে, তাহাকে পর্য্যন্ত যথা পরিমাণে শক্তি-বিকম্পিত করিতেছে। তারে তারে আকাশপিণ্ডগণ এবং পিণ্ডস্থগণ কি সুদৃঢ় গ্রন্থনেই গ্রথিত। এই অপার অপরিসীম অথচ এক সূত্রে গ্রথিত বিরাট বিশ্বক্ষেত্র, যাহা বিরাট পুরুষ কর্ত্তৃক নিয়োজিত কর্ম্মক্ষেত্র, ইহা কি আশ্চর্য্য, কি অচিন্তনীয়! সমগ্রত মহাশক্তি এবং তদংশ অবতার তাবৎ খণ্ড শক্তি, মহাকর্ম্ম এবং তাহার কর্ম্মাংশ সম্পাদনে নিয়োজিত; যে যেরূপ কালে ও যেরূপ ক্ষেত্রদেশে পতিত, সে সেইরূপ আত্ম-সার্থকতা করিতেছে। তুমিও সেই শক্তিখণ্ড সমূহের মধ্যে একটী খণ্ড অবতার স্বরূপ, সুতরাং তোমারও এই কর্ম্মক্ষেত্রের কর্ম্মাংশ সম্পাদন হেতু উদ্ভব। অনন্ত কালের এই খণ্ডে তোমার আবশ্যক, এই জন্য তুমি এখন উদিত; এখানে গত আয়োজন বিশেষে আহুতি প্রদান ভিন্ন, তোমার উদয়ের আর কি উদ্দেশ্য বলিয়া ধরিব? বস্তুত তাহাই। যেমন অনন্ত আয়োজন ফলে তোমার উৎপত্তি, তেমনি আবার অনাগত অনন্ত উৎপত্তি তোমার আয়োজন ফলের উপর নির্ভর করিতেছে। তুমি তাবৎ বিগত কালের অবতার স্বরূপ, এবং তাবৎ অনাগত কালের জনক স্বরূপ; যুগদ্বয়ের সন্ধিস্থলে তোমার অবস্থিতি। এখন ভাবিয়া দেখ, এই গুরুভার যাহার উপর ন্যস্ত, তাহার আত্ম-জীবনের উপর কতটা অনুধ্যান করিয়া, ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিয়া লওয়া উচিত। এরূপ অপরিমিত নির্ভর যাহার উপরে, সে যদি মিথ্যাকে অবলম্বন ও কর্ম্মহানি দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় লয়, তাহার পুরস্কার বা তিরস্কারের জন্য ঈশ্বর যে কি তুলিয়া রাখিয়াছেন, তাহা তিনিই জানেন। মিথ্যার অর্থ, শূন্যতা—অসৎ বা পাপ। প্রাকৃতিক অসৎ যাহা, তাহা হইতে এ অসৎ

স্বতন্ত্র, যেহেতু ইহা স্বেচ্ছাশক্তিসম্ভূত, সুতরাং স্বেচ্ছাবান অবশ্য ইহার নিমিত্ত দায়ী। প্রাকৃতিক অসৎ যাহা তাহা কার্য্য-অগ্রসারক, আর স্বেচ্ছাসম্ভূত অসৎ যাহা তাহা কার্য্যের হানিকারক। এই মিথ্যা, শূন্যতা বা অসৎকে আশ্রয় করিলে, কর্ম্মপথে অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা নাই। যে পরিমাণে আশ্রয় করা যায়, সেই পরিমাণে কর্ম্ম পণ্ড হইয়া থাকে মাত্র :—"না বস্তুনা বস্তুসিদ্ধি।" সেই পরিমাণে জীবনের উদ্দেশ্য, সুতরাং জীবনও পণ্ড।

কিন্তু বাঞ্ছারাম, তাই বলিয়া মনে ভাবিও না এবং কীট, কীটাণু, ডিম, পার্টিকেল দর্শাইয়া বলিও না যে, আমি মিথ্যার আশ্রয় লইলেও, নিঃসন্দেহ তাহাদের অপেক্ষা, আমার দ্বারা জ্ঞানত বা অজ্ঞানত অনেক অধিক পরিমাণে কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে; সুতরাং আমার জীবনও যে একেবারে বৃথা, তাহা কেমন করিয়া বলিব; অতএব কেন আমাকে স্বচ্ছন্দ আহার বিহার হইতে অপসারিত করিবার চেষ্টা পাইতেছ? রাম, রাম, বাঞ্ছারাম! সে চেষ্টা যেন কেহ না পায়। তুমি স্বচ্ছন্দে আহার বিহার কর, কিছুমাত্র তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু তাহার পরিমাণ করিও, পরিমাণ অন্তে অবসর কাল অপব্যয় করিও না। এ কর্ম্মক্ষেত্রে কে কত কর্ম্মরাশি সমুৎপাদন করিল, তাহা লইয়া কর্ম্মের পরিমাণ নহে; কে কর্ম্মার্থে কত খানি নিজ নিজ প্রাপ্ত শক্তির সদ্ব্যয় করিল, তাহা লইয়া পরিমাণ। কণ্ট্রাক্টের বন্দোবস্ত এখানে নাই; মুনিবে যতটা দেয় তাহারই হিসাব লইয়া থাকে, এবং চাকরেও সে হিসাব দিতে বাধ্য, নহিলে শাস্তি আছে।

তোমার আরও এক অতি প্রিয়তম এবং চিরপোষিত কুতর্ক আছে। তুমি বলিয়া থাক, এরূপ না করিয়া, আমাদিগকে এরূপ ছাঁদে বাঁধে না ফেলিয়া, এরূপ দীর্ঘকাল সাপেক্ষতার অপেক্ষা না রাখিয়া, এরূপ এরূপ করিলেই, ঈশ্বর ত তাঁহার কার্য্য অনায়াসে সুসিদ্ধ করিতে পারিতেন; এবং তিনি যখন সর্ব্বশক্তিমান্, তখন তাঁহার তাহা করিবারও ত কোন বাধা ছিল না; বাড়ার ভাগ আমাদিগের এই ক্লেশময় সংসারে হাবু ডুবু খাওয়া হইতে অব্যাহতি হইতে পারিত। বাঞ্ছারাম, ইংরেজীতে

একটী প্রবাদবাক্য আছে যে মন্দ কারিগর যাহারা, তাহারাই আপন আপন অস্ত্রের সঙ্গে কন্দোল করিয়া থাকে। যাহারা আলস্য-পরায়ণ এবং অকর্ম্মা, তাহারা পার্শ্বস্থ সকল পদার্থই অকার্য্যকর, এবং পার্শ্বস্থ সকল পদার্থই অসুবিধাপূর্ণ বলিয়া দেখিয়া থাকে; ইহ জন্মে তাহাদের সুবিধা এবং সুখের দিন একদিনও আইসে না। প্রকৃত কর্ম্মক্ষমের স্বভাব ওরূপ নহে। কর্ম্ম শব্দের প্রকৃত অর্থই অনিয়ম স্থলে নিয়ম প্রকটন, অসুবিধায় সুবিধা স্থাপন, অপূর্ণতায় পূর্ণতা সাধন। সুতরাং প্রকৃত কর্ম্মক্ষম যে, সে অনিয়ম, অসুবিধা, অপূর্ণতা দেখিয়া, কন্দোল করিবে কি জন্য? বরং অনিয়ম, অসুবিধা, অপূর্ণতা যে পরিমাণে অধিক হয়, সে সেই পরিমাণে স্রষ্টার নিকট এতদর্থে কৃতজ্ঞ হইয়া থাকে যে, তাহাকে এতদ্রূপ সুমহৎ কর্ম্ম সম্পাদনার্থ উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত এবং নিয়োজিত করা হইয়াছে। ইহা তাহার দুঃখ প্রলাপের স্থল না হইয়া আত্মগরিমার স্থল হয়,—যদি কখন এরূপ লোকের আত্মগরিমায় প্রবৃত্তি হয়। সাধারণত প্রকৃতি যেখানে যত উচ্চ, আত্মগরিমার সেখানে তত অভাব।

সে যাহা হউক, এক্ষণে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, সৃষ্টি যদি এরূপ না হইত এবং তোমার সম্পাদ্য কর্ম্ম যদি কিছু না থাকিত, তাহা হইলে তুমি থাকিতে কোথায়?—অকারণ কিছু তোমার সৃষ্টি প্রত্যাশা করিতে পার না। তাহার পর, কে বলিল যে কেবল হাবুডুবু খাইতে সৃষ্টি? যদি হাবুডুবু খাও, তবে সে আপন দোষে। কোথায় দেখিয়াছ নিষ্কর্ম্মা আলস্য-পরায়ণের নিমিত্ত সুবিধা এবং সুখরাশি সঞ্চিত রহিয়াছে? তাহার পর বলি, ঈশ্বর অনায়াসে সেইরূপ, তোমার মতলব মত, সৃষ্টি করিতে পারিতেন, তাহা সত্য; এবং পারেনও তিনি সকলই, তাহাও সত্য; তবে করেন নাই কি জন্য? করিতেছেন না কি জন্য? এখানে একই উত্তর, তাঁহার ইচ্ছা। তাহার পর বোধ করি, ইহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবে না যে তুমি সৃষ্ট, তোমার ইচ্ছা অপেক্ষা, তোমার সৃষ্টিকর্ত্তা যিনি তাঁহার ইচ্ছা, অবশ্য সেই পরিমাণে উন্নত এবং পরিণামদর্শী। ভাল, তাহাই না হউক। "এরূপ এরূপ করিলে ভাল হইত, ইহা তোমার বিজ্ঞ

এবং ইচ্ছা; সেরূপ সেরূপ করিলে যাহা হয়, হইতেছে এবং হইবে, ইহা তাঁহার ইচ্ছা। অতএব প্রভেদ কেবল ইচ্ছা স্বাতন্ত্র্যে। এখানে তোমার প্রধান ভুল, সৃষ্টির সময় ঈশ্বরকে পরামর্শ দিবার জন্য উপস্থিত ছিলে না। তুমি সৃষ্ট এবং তিনি স্রষ্টা, অতএব তোমাকে এখন কাজেই তাঁর ইচ্ছামত চলিতে হইবে। অথবা বলিতে পার, এমন কোন কালে কখন তোমার সঙ্গে কোন লেখা পড়া ছিল কি না যে তোমার যুক্তি এবং ইচ্ছা অনুসারে, ঐশ্বরিক যুক্তি এবং ইচ্ছা শাসিত ও কার্য্যে পরিণত হইবে? মূর্খ! যদি না থাকে, তবে ক্ষান্ত হও, তোমার তর্কদর্শন দূরে ফেলিয়া দেও। লম্ফযোগে ঊর্দ্ধগমন শক্তি আছে বলিয়াই, চন্দ্রলোকে যাইতে সমর্থ নহি; আত্মকর্ম্ম বুঝিতে যে যুক্তিশক্তি পাইয়াছি, তদ্দ্বারা ঐশ্বরিক কর্ম্মও যে বুঝিতে সমর্থ হইব, তাহা সম্ভব হইতে পারে কিরূপে? অতএব ঐশ্বরিক উদ্দেশ্য লইয়া বাকবিতণ্ডায় রত হইও না। আত্ম-শক্তির পরিমাণ কি এবং তাহার সার্থকতা কোথায়, তাহারই অবধারণে রত হও। তুমি কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মকারক মজুর, মজুরের সঙ্গে কর্ম্ম উদ্দেশ্যের সম্বন্ধ থাকিয়া থাকে কবে? যদি অনাহারে ধ্বংস পাইতে না চাহ, যদি বেতন বা খোরাকীর প্রত্যাশা রাখ, তবে কার্য্যরত হও; তোমারও উদর-পূর্ত্তি হইবে, কার্য্যস্বামীরও কার্য্য সম্পন্ন হইবে, এবং প্রতিবেশিবর্গও তোমার জ্বালাতন হইতে রক্ষা পাইবে। পরন্তু খুব ভাল কার্য্য করিতে পার, কার্য্য-স্বামীর প্রিয় হইতে পার, তাহা হইলে একদিন এমনও আশা করিতে পার যে, কার্য্য-স্বামী কোন কালে আদর করিয়া তাঁহার মন্ত্রণা মধ্যে কখন কখন তোমাকে লইলেও লইতে পারেন।

আর এক কথা! সংস্কৃত কবি যথার্থই বলিয়াছেন যে, পৃথিবীতে যত প্রকারের কর্ম্মভোগ আছে, তাহার মধ্যে অবুঝকে বুঝাইতে যাওয়ার তুল্য ক্লেশকর কর্ম্মভোগ আর নাই। অবুঝের জ্ঞান এবং দর্শন সমস্তই কাল্পনিক, মূলের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই; এবং কুতর্কের অস্ত্রশস্ত্র যাহা তাহাও হাতের উপর, অনুসন্ধান করিতে বড় একটা হয় না। তুমি আজীবন শ্রম এবং জীবন ব্যয়ে তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া একটা কথা বল; সে মুহূর্ত্তমাত্রের খেয়ালী তর্কে তাহা উড়াইতে অগ্রসর হইবে, মুহূর্ত্তমাত্রও

তাহা অনুধাবন করিয়া দেখিবে না। চুরি করিও না;—অবুঝ বলিল উহা পাপ নহে, যেহেতু অভাব হইতে চুরি, সমাজ কেন তাহার সে অভাব দূর করে নাই? উচ্চ নিসর্গতত্ত্ব পরিত্যাগ করিয়া, সাধারণতত্ত্বে তুমি উত্তর দেও—'যে লোকধর্ম্ম আপত্তিহীন ভাবে সর্ব্বসাধারণত গৃহীত হইতে না পারে, যাহা ব্যক্তিবিশেষের উপকারক হইলেও সাধারণত অপকারক, তাহা পাপ।' অবুঝ হাঁসিয়া উড়াইল,—'উহা কেবল কথার রাশি মাত্র'। যে নিরক্ষর ব্যক্তি অক্ষরকে কেবল ক্ষুদ্রাবয়ব কয়লার আঁচড় মাত্র বলিয়া দেখিয়া থাকে, তাহাকে বেদ-লিখনের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে। বাপু বুদ্ধিমান, এ বিশ্বসংসার ক্রীড়ার বস্তু নহে; মূর্ত্তিমান অচিন্তনীয় ঈশ্বর-প্রতিরূপ। তর্ক করিও না, সেই গুহ্য দর্শনীয় দেখিতে তাঁহারই উপযুক্ত মানসিক ভাবে দর্শন ও অনুধ্যান করিতে চেষ্টা কর; তাহাতেই কেবল জ্ঞানপথে সফলতার সম্ভব, নতুবা নহে। আধ্যাত্মিক আদি ত্রিবিধ জগতের কোথাও, কি ধনে কি জ্ঞানে, ভাগ্যলক্ষ্মী আপনা হইতে স্বয়ম্বরা হয়েন না; তাহা হইলে ভাবনা ছিল কি? এ সংসারের বিনা প্রায়শ্চিত্তে কোন বস্তুই লাভের সম্ভাবনা নাই।

বাপু বাঞ্ছারাম, এক্ষণে তোমার সঙ্গে বক্রেশ্বরী ক্ষণেকের জন্য ক্ষান্ত হউক, আমি মূল প্রস্তাবের অনুসরণ করি।

আমরা ভারতসন্তান, গ্রীকভাগ্য পর্য্যবেক্ষণে আমাদিগের আর তত আবশ্যকতা দেখিতেছি না। ভারতভাগ্য সমালোচন এবং পর্য্যবেক্ষণ আমাদিগের আপাতত উদ্দেশ্য, এবং লোকত ধর্ম্মত উভয়ত কর্ত্তব্য। সুতরাং তাহারই যথা কথঞ্চিৎ অনুসরণ করা যাউক। তাহাতে ফল আছে।

আমরা যথাযথ সমালোচনা করিয়া দেখিয়া আসিয়াছি যে, ইহ সংসারে গ্রীক্ এবং হিন্দু, স্ব স্ব সীমান্ত মধ্যে, তজ্জাতীয় বিবিধ কারণ-সমূহের সমবায়ে, কিরূপ বিভিন্ন স্বভাবে গঠিত, বর্দ্ধিত এবং পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। হিন্দুজাতি পারলৌকিক-গুণ-প্রধান হইয়া নৈতিক মনুষ্যত্বে, সুতরাং প্রকৃতির কোমলতাতেও, শ্রেষ্ঠতা এবং পূর্ণতা লাভ করিয়াছে;

সেইরূপ গ্রীকেরা ঠিক তাহার বিপরীত দিকে লৌকিক-গুণ-প্রধান হইয়া, বীরমনুষ্যত্বে সুতরাং প্রকৃতির কাঠিন্যেও, শ্রেষ্ঠতা এবং পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। হিন্দু স্বভাব পারলৌকিক-গুণ-প্রধান, গ্রীক স্বভাব লৌকিক-গুণ-প্রধান। হিন্দু ব্রাহ্মণ, গ্রীক ক্ষত্রিয়। কালবিপ্লব, রাষ্ট্রবিপ্লব, অবস্থাবিপ্লবেও, তাহাদিগের এই স্ব স্ব স্বভাবের অপলোপ হয় নাই; এবং নিস্তেজও একেবারে হইয়া যাইতে পায় নাই। ইহারা তৎতৎ বিষয়ে এতদূর শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিল যে, এখনও, পতিত হইয়াও, জগতকে স্বভাসে প্রতিভাসিত করিতে ক্ষান্ত হইতেছে না। গ্রীক ভূপতিত হইয়াও সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিক খণ্ডকে জ্ঞান বিজ্ঞানাদির সূত্র ধরাইয়া দিয়াছে, এবং দিতেছে; এবং সাময়িক প্রভুরা গ্রীককে পদদলিত করিলেও, গ্রীকের শিক্ষা-পদার্থকে মস্তকে স্থাপিয়া বেড়াইয়াছে। আর ভারত? ঘৃণিত, নিন্দিত, উৎপীড়িত, দীর্ঘকাল পরপদে দলিত; তথাপি ভারত আজি পর্য্যন্ত জগতের এক তৃতীয়াংশ মানববর্গকে ধর্ম্ম-শিক্ষায় দীক্ষিত করিতেছে। ভারতের গৃহলক্ষ্মীগণ একাদশী করিতেছে বটে; কিন্তু স্বার্থত্যাগী পরহিতকারী ভারতের মহিঃশিষ্যগণ আজি পর্য্যন্ত জগতের যাবতীয় ধর্ম্মাপেক্ষা, সুখসাধ্য ধর্ম্মালোচনায় জীবনাতিবাহিত করিতে সক্ষম হইতেছে। সেই গ্রীক এবং হিন্দু, যাহারা এত দিন স্বতন্ত্রভাবে সংস্রবশূন্য হইয়া, পরিবর্দ্ধিত বা পতিত হইয়া আসিতেছিল; বিশ্বনিয়ন্তা এবং স্রষ্টার অপরিজ্ঞেয় অভিপ্রায় সিদ্ধার্থে, আজিকে পাশ্চাত্য দ্বার দিয়া পরস্পর গুণ বিনিময় ইত্যাদি হেতু, সংমিলিত হইতে আসিয়াছে। গ্রীক একা আইসে নাই, সমগ্র ইউরোপ সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে। পশ্চিম সমুদ্র হইতে পূর্ব্ব সমুদ্র আজি দূরত্বহীন হইয়াছে; সেখানকার সেখান এবং এখানকার এখান আজি এক হইয়া গিয়াছে। এইরূপই হইয়া থাকে!

কিন্তু পরস্পরের মধ্যে এই অদ্ভুত, অভূতপূর্ব্ব গুণ-বিনিময়ে, গুণগ্রহণে এবং গুণত্যাগে, তাহাদের মধ্যে স্বভাবেরও কি পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে? অথবা আর সকলের কথায় এখন কাজ কি, ভারতের কথাই হউক।— তবে কি এখন এই বিনিময় প্রভৃতিতে ভারতের স্বভাবেরও পরিবর্ত্তন

হইবে? তাহা কিরূপে সম্ভবে? উপরে দেখিয়া আসিয়াছি যে ভারত পতিত, পদদলিত, বলতাড়িত হইয়াও আত্মস্বভাব পরিত্যাগ করে নাই। যদি তখন না করিয়া থাকে, তবে এখনও করিবে না। সংসারে যাহা কিছু লোভনীয় তাহা যখন একে একে সকলই গিয়াছিল, দুর্দশার ঘোর তরঙ্গ যখন চতুর্দ্দিকে আস্ফালন করিয়াছে, তখনও, যে ভারত সে সকলে দৃক্‌পাতশূন্য হইয়া, মৃত্যুতেও জীবিতবৎ কেবল স্বোপার্জ্জিত ধর্ম্ম ও নৈতিক আলোচনা লইয়া ফিরিয়াছে এবং তাহাতেই জীবনকে পুষ্টি দান করিয়াছে; এবং যাহার প্রভাবে ঘোর মুসলমান-উৎপীড়নের মধ্যেও, চৈতন্য, কবীর, নানক প্রভৃতি অসংখ্য ধর্ম্ম-শিক্ষকের উদ্ভব, এবং যাহার প্রভাবে বর্ত্তমান সময়েও সমাজ মধ্যে ধর্ম্মবিপ্লবের তুফান চলিয়াছে; যে জাতির গৃহনীতি, সমাজনীতি, জীবননীতি, ধর্ম্মনীতি, আর যে কিছু নীতি, সমস্তই তামসিক লোক-নয়নকে তুচ্ছ করিয়া, যথাস্বভাব দেশকাল পাত্রানুরূপ সংবর্দ্ধিত হইয়াছে; তুমি কি মনে কর, আজিকে উহাদের পাশ্চাত্য সংস্রবে সেই স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইবে, না পরিবর্ত্তিত হইতে পারে! রক্ত পরিবর্ত্তন করিতে পার, তবে পরিবর্ত্তন কথঞ্চিৎ সম্ভবিতে পারে, নতুবা নহে।

স্বভাব অপরিবর্ত্তনীয়, অথচ এই মিশামিশি হইতে চলিয়াছে। অত-এব এখন আমাদিগের কর্ত্তব্য কি,—আমরা কি ইংলণ্ডগামী নবীন যুবকদিগের ন্যায় হিন্দু ঘুচিয়া সাহেব হইব এবং গৃহলক্ষ্মীদিগকে সাহেবানী সাজাইব; অথবা আমরা যেমন খানসামা সাজি তেমনি গৃহলক্ষ্মীদিগকে আয়া করিয়া তুলিব; অথবা গতিশীল কালের বিরুদ্ধে যথাস্থিত তথাভাবে অবস্থান হেতু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, পূর্ব্বতন হিন্দুভাবে হিন্দু থাকিতে চেষ্টা করিব? এ কয়টীর একটীও যুক্তিসিদ্ধ এবং প্রকৃতিসিদ্ধ নহে। প্রথমত, হিন্দুসন্তান সাহেব এবং গৃহলক্ষ্মী সাহেবানী, উভয়ই প্রকৃতির গর্ভস্রাব; ভবরঙ্গভূমে অন্তঃসারশূন্য সং বিশেষ, সংসারকর্ম্মক্ষেত্রে অকার্য্যকর মাখাল ফল। দ্বিতীয়ত, পূর্ব্বতন হিন্দুভাবে থাকিতে যাওয়া, সেও কালের বিরুদ্ধে সংগ্রাম; এরূপ অসম সংগ্রামে কেহ কখনও জয়লাভ করিতে পারে নাই, বরং ধ্বংসই হইতে হইয়াছে; বিশেষত প্রাকৃতিক কর্ম্মকটাহে অভাবনীয়

পাচনক্রিয়ার বিষয়ীভূত যে, তাহার পূর্ব্বভাবে বসিয়া থাকা অসম্ভব। যে নিয়মে, যে প্রণালীতে, প্রাচীন ভারতে জীবন কার্য্য ও সামাজিক কার্য্য নির্ব্বাহ হইত; যাহা কিছু সাবেক ধরণের; তাহারা সকলেই একে একে বিগত হইয়া যাইতেছে; সকলেই একে একে পক্ষীর জীর্ণ পালকবৎ অঙ্গচ্যুত হইয়া খসিয়া পড়িতেছে; সকলেই ধ্বংসোম্মুখ। যে দিকে তাকাইবে, সে দিকেই প্রাচীন রীতি নীতি আদি তাবৎ কাল প্রবাহে বিলীন হইতে চলিয়াছে; আরও দৃষ্টি প্রসারিত করিলে আবার দেখিতে পাইবে, ঠিক সে বিলয়ের কোলে কোলে আর এক অভূতপূর্ব্ব বিষয় শ্রেণীর নব উৎপত্তির সূত্রপাত হইয়া আসিতেছে। ইহাতে স্পষ্টত লক্ষিত হইতেছে যে, ভারতের প্রাচীন জীর্ণ বেশের ধ্বংস এবং নূতন বেশের আবির্ভাব অনিবার্য্য ও তাহা আগতপ্রায়। সর্ব্বত্রই প্রাচীন বেশের ধ্বংস এবং নূতন বেশের আবির্ভাব চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। এ সময়ে যে প্রাচীন রীত্যাদি ধরিয়া বসিয়া থাকিতে চাহিবে, এবং অগ্রসর হইতে আগু হইবে না, সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহ এবং পূর্ণমাত্রায় বাতুল! আমাদের এ বর্ত্তমান অসার হিন্দুয়ানী ভাব নিপাত হইবে।

বাঞ্ছারাম, তোমার চিরশ্রুত নৈয়ায়িকের উপন্যাস স্মরণ আছে কি? নৈয়ায়িকের প্রত্যহ লেবু চুরি যাইত: নৈয়ায়িক চোর পাকড়াইবেন। অতএব ন্যায়যুক্তিতে সিদ্ধান্ত হইল যে চোর পালাইবার মাত্র তিন দিক, তাহার এক দিকে তিনি দাঁড়াইবেন, সুতরাং সে দিক বন্ধ; অপর দিকে ভ্রাতৃবধূ, অস্পর্শনীয়া, সুতরাং সে দিকও বন্ধ; তৃতীয় দিকে আঁস্তাকুড়, অশুচির আকর, সুতরাং সে দিকের ত কথাই নাই; এইরূপে তিন দিকই আবদ্ধ; এখন চোর যাইবে কোথায়! চোর এমন সময় আঁস্তাকুড় ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিল। পলাইয়া যাউক, কিন্তু নৈয়ায়িকের ন্যায়ের দোষ কি? তাহার জ্ঞানদর্শনে ন্যায় ঠিকই হইয়াছিল, এবং চোরও অনুরূপ নিষ্ঠা-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইলে ধরা পড়িলেও পড়িতে পারিত। কিন্তু চোর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিল না: এ সংসারে কেবল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই বাস করে না। এখানে দোষ ন্যায়ের নহে, দোষ নৈয়ায়িকের বহুদর্শিতার অভাব-ভাবের। নৈয়ায়িকের জানা উচিত ছিল যে চোর অধ্যাপক

নহে, এবং পরস্ত্রী ভ্রাতৃবধূ অথবা আঁস্তাকুড়ও মানে না; ইহা জানিয়া তাহার উপরে যদি ন্যায় খাটাইতে পারিতেন, তাহা হইলে অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা ছিল। আর এক উপায়ে চোরধৃতির সম্ভাবনা ছিল,—আঁস্তাকুড় ভাঙ্গিয়া চোরের সঙ্গে দৌড়; কিন্তু তাহাতে ফল যত হউক না হউক, চোরের সঙ্গে সম অপবিত্রতা, এবং অনভ্যস্ত দৌড়ে শারীরিক ক্লেশাদির প্রাপ্তি, অপরিমিত ঘটিত সন্দেহ নাই। ভারতসন্তান, তুমিও আপনাকে এই নৈয়ায়িকের স্থলাভিষিক্ত বলিয়া জানিও। তোমাকে বলি, অপবিত্রতা এবং অনভ্যস্ত দৌড়জন্য ক্লেশাদি প্রাপ্তি, তুমিও পারতপক্ষে পরিহার করিবে; তুমি যে পবিত্র আর্য্য হিন্দু সেই হিন্দুই থাকিবে, অথচ করিবে কি?—তোমার হিন্দুয়ানীকে সঙ্কীর্ণ দর্শন এবং সঙ্কীর্ণ কর্ম্মভূমি হইতে উঠাইয়া, বহুদর্শনভিত্তির উপরে এবং বিশ্বকর্ম্মভূমিতে স্থাপন করিবে। আপন রন্ধনগৃহের চৌকায় আবদ্ধ না হইয়া, বিশ্বগৃহ চৌকায় বিচরণ করিতে শিখিবে। তাহা হইলে লেবু চুরীর চোরও পলাইতে পারিবে না, সাহেবও সাজিতে হইবে না, অথচ তোমার হিন্দুজাতিত্ব রক্ষা এবং কার্য্যসিদ্ধি উভয়ই হইবে। এই বিজাতীয় মিশামিশিতে তদুদ্দেশে উপকরণ সংগ্রহ এবং তাহা কার্য্যে প্রয়োগ করাই, এই জাতীয় কার্য্যে আপাতত তোমার কর্ত্তব্য; এবং তদর্থেই বিশ্বনিয়ন্তার নিদেশ অনুসারে তাহারা তোমার দ্বারে উপস্থিত।

এ কর্ম্ম অতি দুরূহ, অথচ এ কর্ম্ম অতি সহজ। বাপু, এ কর্ম্ম তোমার মিল সাংখ্যাদি ন্যায়দর্শনের কথা কাটাকাটি করিলে, স্বপ্নেও মনে করিও না যে, তাহা সম্পন্ন হইবে। ন্যায়দর্শন ইহার সংস্রবেও আসিতে পারে না। ইহার নিমিত্ত পার্শ্বস্থিত ও পূর্ব্বনির্ম্মিত ভিত্তির উপর ভক্তিনিবিষ্টচিত্তে চিন্তার সহিত জ্ঞানদর্শনের একমাত্র আবশ্যক। ইহাতে সমগ্র আত্মস্বভাবের পরিস্ফূর্ত্তি ও সঞ্চালনের প্রয়োজন। যাহার আত্ম-স্বভাব প্রকৃতিস্থ, তাহার পক্ষে চেষ্টা-সম্ভব তাবৎ কার্য্যের ন্যায়, এ কার্য্যও নিতান্ত সহজ। কিন্তু যাহার আত্মস্বভাব বিকৃত, তাহার পক্ষে আবার এ কার্য্য তেমনই দুরূহ। এ কার্য্য, বা যে কোন যথার্থ কার্য্য, সভা করিয়া, সমাজ করিয়া, বক্তৃতা দিয়া, বা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, কেহ সাধন

করিতে পারে না। স্বভাবে অনুরূপ হওন ব্যতীত, কেবল প্রতিজ্ঞায় কখনও কোন যথার্থ কার্য্য সুসিদ্ধ হয় না। কোন যথার্থ কর্ম্মই এ পর্য্যন্ত রাজসিক বা তামসিক চেষ্টায় সুসম্পন্ন হয় নাই। তজ্জন্য সাত্বিক চেষ্টার আবশ্যক। সাত্বিক চেষ্টা বাচাল নহে, সাত্বিক চেষ্টা নির্ব্বাক। রাজসিক এবং তামসিক চেষ্টার ইচ্ছা রাতারাতি বড় মানুষ হওয়া; সাত্বিক চেষ্টার ইচ্ছা, ফলের কামনা পরিত্যাগ করিয়া যথাবুদ্ধি এবং যথাশক্তি প্রকৃতিকে অনুসরণ করা। সাত্বিক চেষ্টার নিমিত্ত সাত্বিক প্রকৃতির আবশ্যক।

২। বিকার।

এক্ষণে উপযুক্ত কার্য্যোপযোগী আমাদিগের সামাজিক জীবনী কতদূর; কি পরিমাণে আমরা কার্য্যনিরত হইতেছি; এবং তদর্থে আমাদিগের আত্মপ্রকৃতি কতদূর অনুকূল করিয়া তুলিতে পারিয়াছি; তাহার একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। সেরূপ আলোচনা সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্রই সুফলপ্রদ হইয়া থাকে। অতএব বাঞ্ছারাম বাবু, ইহাতে দিক্‌দারি বিবেচনা করিবেন না।

অযথা আত্মঘোষণা করিতে এবং শুনিতে যে নিতান্ত চিত্ত এবং শ্রুতি সুখকর তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই; সেরূপ আবার অন্য দিকেও ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে, সেই আত্মঘোষণা সর্ব্বদাই পরিণামে নিপাতনের কারণ হইয়া থাকে। যে দেখিবে আত্মকৃত কার্য্যের প্রতি সাহঙ্কার-দৃষ্টি প্রক্ষেপে গরিমায় স্ফীত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, তখনই নিশ্চয় জানিবে, তাহার অধঃপাতে যাইবার দশা উপস্থিত এবং দিনও তাহার অদূরে। সপদার্থের আত্মগরিমা যখন এরূপ দূষণীয়, তখন অপদার্থের আত্মগরিমা ও তাহার পরিণামের ত কথাই নাই,—তাহার পরিণাম যে কি দারুণ ও কত ভয়ঙ্কর তাহা আর বলিবার আবশ্যক রাখে না। তাই বলিয়া রাখি, বাঞ্ছারাম, যদি এই প্রস্তাব মধ্যে আত্মগরিমার পরিবর্ত্তে, আত্মধিকারের কোন উল্লেখ দেখিতে পাও, তাহাতে তোমার রুষ্ট হইবার কোন কারণ নাই। বিশেষরূপে প্রবুদ্ধ এবং

প্রকৃত যে আত্মবিকার, তাহা শুভলক্ষণ। যেখানেই তাহার উৎপত্তি, সেইখান হইতেই সুপথ গমনের সূচনা। যে মুহূর্ত্তে 'কু'কে 'কু' বলিয়া পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়, নিশ্চয় জানিবে, মানবের সে বিষয়ে চিত্ত পরিবর্ত্তনের কাল সে মুহূর্ত্ত হইতে অতি নিকট। ভারতসন্তান, এ পর্য্যন্ত তুমি অযথা আত্মগরিমায় অনেক দূর আত্মধ্বংস করিয়া আসিয়াছ, আর কেন? যদি তোমার গুণভাগ প্রকৃতই কিঞ্চিৎ উপার্জ্জিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে শূন্য হাঁড়িতে ঘুঁটী ফেলিয়া কড়্ কড়্ শব্দে লোক হাসাইবার আবশ্যক কি? প্রকৃত গুণ যাহা, তাহা নির্ব্বাক; প্রকৃত পূর্ণতা যাহা, তাহা নিস্তব্ধ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, সাত্ত্বিক প্রকৃতি সাত্ত্বিক চেষ্টার পূর্ব্বগত। উৎসস্থল যেরূপ, প্রসূত ফলও সেই প্রকৃতির হইয়া থাকে, বহুচেষ্টাতেও সে প্রকৃতি হইতে চ্যুত করিবার সম্ভব নাই। যদি তাহা করিবার চেষ্টা করা যায়, তাহা প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম; সুতরাং শ্রমবিধ্বস্ত, বহুবিভীষিকা বিঘূর্ণিত, ইহাই লাভ হইয়া থাকে; কার্য্যফলে সুফল কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণের শান্তি ভিন্ন, লক্ষণের শান্তিতে রোগ নিরসন হয় না। অতএব যে কোন সমল পদার্থের মল সংস্কার, বা যে কোন নির্ম্মল পদার্থের উৎপাদন, সাধন করিতে হইলে; সর্ব্বাগ্রে উৎসস্থানের নির্ম্মলতা সাধন অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া জানিও। উৎসস্থানকে একবার নির্ম্মল করিতে পারিলে, তাহার পরবর্ত্তী আর যে কিছু উত্তর কার্য্য তাহা নিতান্ত সহজ হইয়া আইসে; এবং লক্ষণ চিকিৎসার শতাংশের একাংশ শ্রমেই সমস্ত ব্যাপার সুসম্পন্ন হইয়া যায়।

সাত্ত্বিক চেষ্টায় সাত্ত্বিক প্রকৃতি নির্ম্মাণ করিতে পারে না; সাত্ত্বিক প্রকৃতিই সাত্ত্বিক চেষ্টাকে নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। প্রকৃতি সাত্ত্বিক হইতে আরম্ভ করিলে, সাত্ত্বিক চেষ্টাও অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ তাহাতে আসিয়া সংমিলিত হয়; এবং সেই স্থান হইতেই প্রাকৃতিক নিয়মানুকূল্যে কার্য্য ফলের আশা করিতে পারা যায়। যথায় প্রকৃতি এখনও অসাত্ত্বিক সেখানে যে কোন সাত্ত্বিকরূপদর্শী চেষ্টা, জ্ঞানত হউক বা অজ্ঞানত হউক, পরসমক্ষে হউক বা আত্মসমক্ষে হউক, ফলত উহা জুয়াচুরী ভিন্ন

আর কিছুই নহে। পুনশ্চ 'আমি যাহা বলি তাহা করিও, আমি যাহা করি তাহা করিও না'—ইহা ধূর্ত্তের কথা; এবং যে যাহা করে না, সে যদি তাহা করিবার উপদেশ দেয়, তবে তাহাকে তস্কর বলিয়া জানিবে; এরূপ প্রকৃতি মাত্রেরই পরিণাম বিশ্বাসবিপর্য্যয়-সাধক। এরূপ প্রকৃতির এবং এরূপ প্রকৃতিশিষ্যের যে চেষ্টা, তাহা সর্ব্বদাই অন্ধ এবং জ্ঞানত বা অজ্ঞানত স্বার্থপূর্ণ, সুতরাং তাহার কার্য্যফলও বিকৃত হইয়া থাকে; চেষ্টাকারকও আত্মকর্ম্মবিপাকজালে জড়িত হইয়া ক্ষত বিক্ষত হয়, এবং আত্মজীবনকে পরিণামে কর্ম্মহীন, ও আত্মদাহক অশান্তির আধারস্থল করিয়া তুলে। অতএব আবার বলিতেছি, এমন স্থলে একমাত্র সদুপদেশ এই যে, যে কোন বিষয়ের জন্য হস্ত প্রসারণ করিবার পূর্ব্বে, হস্তকে তদুপযোগী সফল-সাধকতায় অভ্যস্ত করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা কি আমাদের হইয়াছে, না সঞ্চিতই আছে? দেখা যাউক।

যে কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে হইলে, বাহ্য দৃশ্য ধরিয়া তাহার কারণের অনুভবকরণ অতি প্রশস্ত এবং হৃদ্বোধক সুতরাং আকাঙ্ক্ষাপূরক। এখানে বাহ্য দৃশ্য ধরিয়া কারণের অনুভব করিতে হইবে,—সামাজিকতা দেখিয়া সমাজের চলিত তত্ত্ব নিরূপণ করিতে হইবে। এখন দেখ, তোমার সামাজিকবর্গের প্রতি বারেক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখ। কি অদ্ভুত দৃশ্য! দ্বারদেশেই সর্ব্বগুণবিধ্বংসী দ্বৈমুখ-চতুর বিকট কপটাচার উন্মাদবৎ কি অঘোর নৃত্য করিতেছে! দেখিতেছ কি?—তোমার ভারত-ভরসাগণ একমুখে দংশন করেন, আর মুখে ঝাড়াইয়া থাকেন; এক মুখে তোষামোদ, আর মুখে তেজ; এক মুখে ভীরুতা, আর মুখে বীরত্ব; এক গালে চড়, আর গালে কথা; কাপট্য ও দ্বৈমুখ ভাবের আধারস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। কাপট্যে ইহার অস্তিত্ব, কাপট্যে ইহার বসৎ-বাস, কাপট্যে ইহার ভক্তি, কাপট্যে ইহার প্রণয়, এবং কাপট্যেই ইহার সর্ব্ব কর্ম্ম। ধর্ম্ম এবং লোকাচারে ইনি ঘরে হিন্দু, বাহিরে ব্রাহ্ম, হোটেলে সাহেব, এবং আবশ্যকের অনুরোধে কখন কখন মুসলমানও হইয়া থাকেন। ইহাদের জীবনের ধর্ম্ম এবং কর্ম্মের সার সংগ্রহ করিলে, মোটের উপর এই কয়টী বিষয়মাত্র পরিলক্ষিত হয়;—ইহাদের দেবতা

উদর, বেদ পেনাল কোড, লোকাচার সম্মুখে 'ভাই ভাই' এবং পশ্চাতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দর্শন, কর্ম্ম উদরপূর্ত্তি। অভ্যন্তরে পরিপূর্ণ শয়তান বিরাজ করিলেও, বাহির চটক যদি থাকে, তাহা হইলেই মনুষ্যমধ্যে গণনীয় হইতে পারে। যে কেহ এই অপূর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বী হইবে, তাহারই সহিত কেবল ইহাদের সুসংমিলনের সম্ভাবনা, নতুবা অন্য কোন রূপে সে সম্ভাবনা নাই। সময় দুরন্ত! স্বভাব এমনই দুরন্ত হইয়া আসিয়াছে যে, যে কোন ব্যক্তি সাত্ত্বিক প্রকৃতিমান্, তাহার পক্ষে তাহাদিগের তথাবিধ সমাজ হইতে দূরে অবস্থান ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই। ইহাদের মধ্যে সেরূপ ব্যক্তি পড়িলে হাস্যাস্পদ, পশুবৎ ব্যবহৃত এবং ঘোর বাতুলের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে; সর্ব্ব প্রকারেই সে দারুণ ঘৃণার পাত্র! ইহাদের কি আত্মিক জীবনের উন্নতি, কি সামাজিক জীবনের উন্নতি, যাবতীয় উন্নতি কেবল পোষাকাদি বাহ্য দৃশ্যে পরিসমাপ্ত। সভ্যতা বিকাশে বাবু চীনাকোট ব্যবহার করিতেছেন; দেখা দেখি ফরাসডাঙ্গার সুতারেরাও তাহা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। মহা বিপদ! মান যায়, সম্ভ্রম যায়, ভদ্রতা পর্য্যন্ত লোপ পায়; ছোটলোক সমকক্ষ হইতে চলিল, উপায়?—কোটের আকার একটু পরিবর্ত্তন করিয়া লইলেন। দেশের ছোটলোকই বা কি দুষ্ট! আবার সে পরিবর্ত্তনেরও অনুকরণ করিল। এইরূপে পরিবর্ত্তন অনুকরণ, অনুকরণ পরিবর্ত্তন, হইতে হইতে তাহাদের জ্বালায় একটু একটু করিয়া চীনা কোট শেষে, সাহেবী কোটের কাছাকাছি আসিয়া লাগিয়াছে! তাবৎ ভদ্র এবং ভদ্র-সন্তানগিরি আজি'কালি, যতদূর দেখিতে পাই, দাড়ি চসমা এবং কোটে আসিয়া সমাহিত হইয়াছে। এই ত্রিবিধ সুবেশকর পদার্থ বেশকারকের ত্রিবিধ গুণের পরিচায়ক যথা—কোট, উন্নত ভদ্র ও সৌখিনভাব; দাড়ি, তথা বীরপুরুষত্ব; চসমা, তথা জ্ঞানি-প্রবরত্ব। এই ত্রিবিধ গুণের গুণবিস্তার ক্ষেত্রও ত্রিবিধ—কোট-ভদ্রতা, কদুক্তি বা উচ্চ রবে উড়ে বেহারা ডাকিয়া; দাড়ি-বীরত্ব, ভাতের হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া; চসমা-জ্ঞানিত্ব, মকারাদির গুণ বিচারিয়া!

যাহা হউক, কোট প্রভৃতির ব্যাপার যে সে একরূপে নির্ব্বাহ হইল

যেন, হউক ; কিন্তু ঐ যে সুতার, অথবা আরও নিম্নতম ঐ যে চর্ম্মকার-পুত্র, তোমার সঙ্গে সমকক্ষভাবে বিদ্যামন্দিরে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতেছে, তাহাকে ছাড়াইয়া যাইবার কি কিছু বন্দোবস্ত করিয়াছ ? বাঞ্ছারাম, আমি অনেক দিন হইতেই জানি, তুমি সাধারণ শিক্ষার উপর দারুণ চটা ; লেখা পড়া শিখিয়া ধোপায় কাপড় কাচিবে না, ক্ষৌরকার ক্ষৌর করিবে না, তাহারা সমকক্ষ হইবে, এই তোমার প্রধান শঙ্কা এবং আপত্তিরও ইহা প্রধান কারণ। নির্ব্বোধ, মানব জীবনপ্রবাহ অনন্ত, সুতরাং তাহার গতি অনন্ত এবং জ্ঞান ও উন্নতিও অনন্তপ্রসারিণী। পথ ত তাহার কোন দিকে বন্ধ নাই ; বন্ধ করিবার সাধ্যও নাই। অতএব, তাহারা যখন আত্মিক উন্নতিমুখে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে, তখন তুমি কেন নিস্পন্দভাবে বসিয়া, তাহাদের অগ্রসারিত্ব অবলোকনপূর্ব্বক, এরূপ বালকের ন্যায় বিলাপরত এবং মুহ্যমান হইতেছ ? প্রথমত, ছোটলোক সমকক্ষ হইতে চেষ্টা করিতেছে সে ত ভাল কথা,—যথায় একঘর মানুষের মত ছিল তথায় দশঘর মানুষের মত হইয়া উঠিতেছে। দ্বিতীয়ত,সত্য সত্যই তাহাতে যদি এত ভয়, তবে ক্রন্দনপর নিস্পন্দ ভাবে বসিয়া কেন ? বেগ যাহা তাহা গমনপর, চালনা করিয়া লইয়া যাইতে পারিলে সুখদ পথে গমন করে ; নতুবা তাহাকে রুদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকিবার প্রয়াস পাইলে, ভগ্ন-বাঁধ স্রোতকল্লোলস্বরূপ উৎপতিত মুখে চালককে অতিক্রম পূর্ব্বক তাহাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া থাকে। ছোটলোক এবং তোমার মধ্যে চিরন্তন পরিচালিত ও পরিচালক ভাব বজায় রাখিয়া, এবং আপনার পূর্ব্বতন ব্যবধানে সমান থাকিয়া, তুমিও কেন অগ্রসর হইতে না থাক ? তাহা হইলে ছোটলোক লেখাপড়া শিখিয়াও, যদি সে গুণে বা পৌরুষে তোমার সমতায় আসিতে না পারে; তবে কাজেই সে ধোপার সেই কাপড় যদি আবার না কাচে, সে ক্ষৌরকার যদি সেই ক্ষৌর আবার না করে, তবে খাইবে কি ? অবশ্য কাপড় কাচিবে, অবশ্য ক্ষৌর করিবে ;—বরং লেখা পড়া শিখার ফলে পূর্ব্ব হইতে শ্রেষ্ঠতর ভাবে এবং তুমি যে উন্নত হইতেছ তোমার উন্নতভাবেরও উন্নত অভাব পূরকরূপে। কিন্তু সেরূপ অগ্রসর হওয়ার কি কোন চেষ্টা হইতেছে ?

কিছুমাত্র নহে; সে চেষ্টা কেবল নিস্পন্দ, পুরুষার্থশূন্য বিলাপে পরিণত! যে সমাজে ইতর লোক অন্ধ এবং অনুন্নত, সে সমাজের ভবিষ্যৎ পক্ষে আশা করিবার বিষয় অতি অল্পই; এবং যথায় ইতর লোক সচল, আর ভদ্রলোক নিশ্চল কাপুরুষ, তথায় ভদ্রগণ শিক্ষিতা রমণীর মূর্খ স্বামীর ন্যায় বিড়ম্বনা-গ্রস্ত হইয়া থাকে।

অপরাপর দেশে সৌভাগ্য অর্থে, সাধারণত আশাতীত কর্ম্মক্ষমতা এবং চিত্তের নিশ্চিত উৎসাহ। আমাদের দেশে তদ্বিপরীতে, সৌভাগ্য অর্থে ধারণার অতীত কর্ম্মপঙ্গুতা এবং চিত্তের নিশ্চল ভোগবিলাসী অলসতা। অপরাপর দেশে সুখ, অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়া; কিন্তু এখানকার সুখ, অর্থের অসদ্ব্যবহারে। প্রতি ব্যক্তিই নিশ্চেষ্ট বা আড়ম্বরচেষ্ট, আত্মঘাতি জীবন অতিবাহিত করিতেছে; আড়ম্বরমুগ্ধ অজ্ঞ তাহাতে করতালি ঘোষে বাহবা দিতেছে। ধনী হুঁকা ছাড়িয়া সভা, সভা ছাড়িয়া হুঁকা,—সভায় বসিয়া, বক্তৃতা করিয়া, সাহেবতোষস্থলে চাঁদা দিয়া, রাজদ্বারে মূর্খমণ্ডলে বাহবা লইতেছে; নির্ধন নির্ব্বাক, ধনীর তদর্থে ধন যোগাইতে হস্তপদবদ্ধভাবে তাহাতে রক্তারক্তি হইতেছে; আবার সাম্যসাধক মধ্যবিত্ত আপন কার্য্য ভুলিয়া গিয়া তাহাতে হাত তালি দিয়া জয় নৃত্য করিতেছে। বৃদ্ধ বয়োত্তরে প্রাপ্ত; প্রাচীন বিদায় গ্রহণের পন্থা দেখিতেছেন, এবং দেখিতে দেখিতেও মুরুব্বিবৎ তাঁহার শেষ উত্তম শিক্ষা দিতেছেন,—'ইহ সংসারে স্বচ্ছন্দতা লাভের বাঞ্ছা থাকিলে, যে কোন উপায়ে হউক সাহেব সুবোকে বা ক্ষমতা যথায় তথায় সন্তুষ্ট বিধান করিও। ক্ষতি কি? যথায় জল তথায় ছাতি ধরিয়া, নিজের কার্য্য যদি হাসিল হয়, তবে এ সংসারে বাকি রহিল কি? সমাজ এবং দেশ?—উহা বাতুলের স্বপ্ন! এক পেটে খাইয়া একটু পিঠে খাইতে কিছু মাত্র দোষ নাই।' অর্দ্ধ-বয়স্ক নিস্পন্দ; স্বচ্ছন্দ উদরপূর্ত্তি এবং বিহারাদিই জীবনের মোক্ষ ধর্ম্ম জ্ঞান করিয়া, তাহার আয়োজন-শ্রমে জীবন উৎসর্গিত করিতেছে,—কে জানে জুতা খাইয়া, কে জানে কি উপায়ে? এই শ্রেণী সংসার বাগিচার কুষ্মাণ্ড ফল! ইহাদের বিশ্বাস, যে কোন প্রকারের উদরপূর্ত্তি চেষ্টা হইতে আর যে কিছু উন্নতি তাহা আপনা হইতে

আসিয়া পড়ে। তাহার পর আরও উন্নতি চাও, নবেল লিখিতেছি, নাটক লিখিতেছি, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিতেছি; বিশেষত নবেলের ন্যায় গূঢ়-তত্বভেদী সংস্কারক বস্তু আর আছে কি?—তায় আবার বাঙ্গালা নবেল-লেখকের নবেল! এই শ্রেণীর লোকের বিশ্বাস, জাতির মধ্যে ইহারা শ্রেষ্ঠ নমুনা; এবং ভারতভাগ্যের ভাবী ফলাফল সম্পূর্ণ ইহাদের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। ভাল কথা! আমরা 'একতা' বিষয়েও লেক্‌চার দিয়া থাকি। কথিত দুই শ্রেণীর মধ্যে একের অস্ত্র তোষামোদ বা মন-যোগান; অপরের অস্ত্র, 'যে কোন পন্থা'; কিছু উন্নতি বটে! ইহাদের পর তৃতীয়ে নব্যদল; লক্ষ্যশূন্য, অভিপ্রায়-শূন্য, বাতুলবৎ চেষ্টা ঘূর্ণনে বিঘূর্ণিত।

ব্যক্তিত্যাগে সমাজের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! এ সমাজে সকলেই জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ কেহ নাই; সকলেই তর্ক করিতে উদ্যত, তর্ক শুনিতে কেহ নাই; সকলেই উপদেষ্টা, উপদেশ-পালক কেহ নাই; সবাই গুরু, শিষ্যত্ব করিতে কেহ নাই; অথচ পরস্পর সকলেরই সমাজ সন্তুষ্ট করিতে কি আগ্রহ। সকলেই নেতৃত্ব-অবলম্বী; এবং সকলেই নেতৃত্ববোধক আড়ম্বরে অপরকে বিমোহিত করণে ও তৎ প্রতি প্রশংসা আকর্ষণে উদ্যত। বহু দ্বন্দ্বী পদার্থের একত্র সমাবেশ হইলে যে ফল ফলিয়া থাকে, এখানেও তাহাই ফলিতেছে। আশ্চর্য্য! বাঞ্ছারাম, এ সমাজে প্রতি ব্যক্তিতেই জ্যেষ্ঠত্ব ও প্রতিভাস্বাতন্ত্র্য এত-বেশি যে, কখনও পাঁচ জনকে একরূপ বসন ভূষণ পরিতে দেখিলাম না; পাঁচ জনকে একরূপ আহারীয় আহার করিতে দেখিতে পাইলাম না; পাঁচ জনের পাঁচ রকম রুচি; পাঁচ রকম ধর্ম্ম অর্থাৎ পারগুপণা, নতুবা প্রকৃত ধর্ম্মের ইহারা কোন ধারই ধারে না। পাঁচ জনের পাঁচ জনই নূতন নূতন মূর্ত্তিতে, নূতন নূতন ভেক ধরিয়া, পাঁচ জনের সমক্ষে উপস্থিত হইতেছে,—উদ্দেশ্য প্রতিভাবলে পাঁচ জনের উপর টেক্কা দিয়া প্রশংসা আকর্ষণ করিব, অথবা অভাবে তাহাদিগের প্রীতিভাজনও হইব। যে বড় জেঠা, তাহার ইচ্ছা কেবল টেক্কা দেওয়া, যে কিছু কম তাহার ইচ্ছা পাঁচ জনের পছন্দসহি হইয়া প্রীতিভাজন হওয়া। কিন্তু পাঁচ জনই পাঁচ জনকে দেখিয়া পরস্পর গা টেপাটিপি করিয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে পরস্পর

পরস্পরকে উপহাস করিয়া থাকে। অথচ পরস্পর পাঁচ জনই বন্ধু, অর্থাৎ "ফ্রেণ্ড" বন্ধু যাহাকে বলে। আজি কালি তালপাতের পরেই, সাংখ্য-দর্শন বা কোমতেদর্শন অধ্যয়ন বা সমালোচনের এক ঘোর তুফানময় ফেশিয়ান উঠিয়াছে। বোধ করি এ 'ফ্রেণ্ডসীপের' কল্পনা ও ধারণা, সেই সাংখ্যদর্শনের আলোচনা সূত্রে উদ্ভব হইয়া থাকিবে। কারণঃ সাংখ্যদর্শনে আমরা দেখিতে পাই যে পুরুষ ও প্রকৃতি সংশ্রবযুক্ত হইলে বৈচিত্রময়ী সৃষ্টির প্রকটন হইয়া থাকে; আবার যোগে বা ন্যায়দর্শনে সেই সংশ্রব ছেদ করিতে পারিলে, সমস্ত নির্ব্বাণ হইয়া যায়: এ 'ফ্রেণ্ডসীপ'ও সেরূপ মদ ও খানার সংশ্রবে উৎপন্ন; আবার যোগে বা ন্যায়দর্শনে সে সংশ্রব ছিন্ন হইলেই সমস্ত নির্ব্বাণ হইয়া যায়। কিন্তু সে যাহা হউক, 'ফ্রেণ্ড' এই বন্ধুবাচক ইংরাজি শব্দটির আবরণশক্তি না জানি কতই দিগন্তপ্রসারিত! অধিক তরলতাই কি এতটা প্রসারণের কারণ? যে কোন বিষয়ের ভাক্ত ভাবেতে আসল ভাব মোহিত হইলে, আসল ভাবের দেখা পাওয়া অনেক দূরের কথা। ভাক্ত ভাব নিয়তই বিকারের পূর্ব্ব বা সহগামী।

আমাদের এই জ্যেষ্ঠত্ব, প্রত্যেকের এই স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্যভাব, ইহা কি মানবীয় প্রকৃতি-স্বাতন্ত্র্যের অনুসরণে উৎপন্ন? তাহা নহে। প্রকৃতি-স্বাতন্ত্র্যের যথার্থ অনুসরণ-ক্রিয়ার ধর্ম্ম ওরূপ নহে। কতকগুলি বিষয়-সাধারণের কোন বিশেষ সীমান্ত মধ্যে সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বজনীন ভাবে পরিচালন হেতু, জাতিসমূহের মধ্যে জাতীয়ত্ব বিশেষ সংঘটিত হয়। সেই বিষয়-সাধারণ সমূহের উদ্দিষ্ট ক্রিয়া সকলের সাধক জীব যতগুলি, তাহাদের লইয়া জাতি। উদ্দিষ্ট ক্রিয়ার আবার বিভিন্ন পর্য্যায় আছে। সেই পর্য্যায়সমূহের মধ্যে, পর্য্যায়বিশেষের সংসাধন নিমিত্ত বিভিন্ন সমাজ। পুনশ্চ,সেই পর্য্যায়বিশেষ আবার বহু-আয়োজন-সংসাধ্য হওয়ায়; সমাজ খণ্ডে খণ্ডে খণ্ডিত হইয়া, প্রতি বিভিন্ন অংশের সাধন-উপযোগী প্রতি বিভিন্ন প্রকৃতি, প্রতি ব্যক্তিতে প্রকৃতি-স্বাতন্ত্র্যরূপে পরিণত। কার্য্য বা বিষয় মাত্রের আয়োজন এবং সম্পাদন, এই দুই দিক আছে। যাহারা আয়োজনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে,তাহারা সমাজে কনিষ্ঠ পর্য্যায়;

আয়োজিত দ্রব্য লইয়া যাহারা উদ্দিষ্ট বিষয়ের মূর্ত্তি রচনা আদি করিয়া থাকে, তাহারা জ্যেষ্ঠ। আয়োজন ও সম্পাদন, স্বাভাবিক ও অপরিহার্য্য; সুতরাং কনিষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠত্ব সম্বন্ধও সেইরূপ স্বাভাবিক ও অপরিহার্য্য। এক অপরটী হইতে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধসূত্রে গ্রথিত। এ বিশ্বকর্ম্মক্ষেত্রে এইরূপ কার্য্যবিভাগে, ক্ষুদ্র হইতে বৃহত্তম, সকল কার্য্যই কার্য্যকারক-বর্গের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে দেখিতে পাইবে যে, প্রকৃতি-স্বাতন্ত্র্য বহুত্বযুক্ত হইলেও একত্ব-সূত্রে আবদ্ধ; বহুত্ব মধ্যে সর্ব্বত্রই পূর্ণভাবে একতার তার কিরূপ গূঢ়ভাবে প্রচলিত হইয়া রহিয়াছে। যে সামঞ্জস্য গুণের প্রভাবে জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, যে সামঞ্জস্য গুণের প্রভাবে প্রকৃতির শ্রী, সেই সামঞ্জস্য গুণ আসিয়া যখন মানবেতেও আশ্রয় প্রাপ্ত হয়; তখনই মানবকে যথার্থ প্রকৃতিস্থ বলিয়া গণনা করিতে পারা যায়। যেখানে একত্ব এবং বহুত্ব, জ্যেষ্ঠত্ব এবং কনিষ্ঠত্ব, নেতৃত্ব এবং নীতত্ব, উভয়ই আসিয়া প্রণয় সংমিলনে সংমিলিত হইয়া সামঞ্জস্য গুণের বিকাশ করিয়াছে, সেখানে প্রতি মানব বিভিন্ন-প্রকৃতি হইলেও, সে সামাজিকতা এবং জাতীয়ত্বে এক এবং মৌলিক ভাবাপন্ন; কনিষ্ঠের নিকট জ্যেষ্ঠভাব এবং জ্যেষ্ঠের নিকট কনিষ্ঠভাব, নীতের নিকট নেতা এবং নেতার নিকট নীত, সমাজ রক্ষা, সমাজতুষ্টি; জাতীয়ত্বরক্ষা, অথচ আত্মপ্রকৃতি-স্বাতন্ত্র্য বশে স্বতন্ত্র কর্ম্মানুসরণ, এ সকলের কিছুতেই তাহার নিকট একে অপরের প্রতিবন্ধকতা করে না। সর্ব্বত্রই সুরুচির সঙ্গীতবৎ চিত্তমোহকর ভাবে সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া থাকে; কোথাও কোন বিষয়ের নিমিত্ত কাহারও নিকট উপহাসাস্পদ হইবার আশঙ্কায় আশঙ্কিত হইতে হয় না। এক্ষণে এক কথা, উপরে যাহা কিছু বলিয়া আসিলাম তাহা সকলই সম্ভব বটে, কিন্তু কেবল এই একমাত্র সর্ত্তে, অর্থাৎ নিজ জীবন এবং জাতীয় জীবন উভয়েরই যথার্থ অর্থ এবং উদ্দেশ্য যথায় স্থিরীকৃত, নির্দ্দিষ্ট এবং হৃদগত হইয়াছে। কিন্তু যথায় তাহা না হইয়াছে, তথায় যাবতীয় বিষয় ছিন্নমূল বৃক্ষ-শাখাসমূহের দশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে আমাদের সমাজে, ব্যক্তিগত এবং জাতিগত উভয় জীবনেরই অর্থ এবং উদ্দেশ্য

এক্ষণে অস্বীকৃত, অনির্দ্দিষ্ট, এবং অজ্ঞাত। সুতরাং এরূপ দশা না হইবে কেন?

তবে আমাদের এ জ্যেষ্ঠত্ব, এ স্বাতন্ত্র্যাদি ভাব কোন শ্রেণীর, বলিতে পার? আর যে কেহ উহাকে যে শ্রেণী ইচ্ছা সেই শ্রেণী বলিয়া ধরুক, আমি উহাকে মহাপ্রলয় শ্রেণীর বলিয়া থাকি,—যে শ্রেণী হইতে মুসলমান ও খৃষ্টীয় শয়তানের উৎপত্তি হইয়াছে। যথায় বন্ধনী অভাবে নিয়মশূন্য, সংজ্ঞাশূন্য, দর্শনশূন্য পদার্থনিকর যদৃচ্ছা আলোড়িত, বিক্ষিপ্ত, বিলোড়িত, তরঙ্গায়িত, উৎক্ষিপ্ত এবং বিলুপ্ত হইয়া থাকে, ইহা সেই শ্রেণীর। ইহা সর্ব্বত্রই বেগবিক্ষিপ্ত, বেগবিলুপ্ত, স্বপদে সংস্থাপিত রাখিবার জন্য কোথাও ইহার আভ্যন্তরীণ একতা সূত্রের অস্তিত্ব নাই। তরঙ্গনিক্ষিপ্ত মলবাশিবৎ যখন যে দিক ধাক্কা পাইতেছে, তখন সেই দিক অভিমুখে ছুটিতেছে, অবলম্বন দণ্ডের সর্ব্বত্রই অভাব। পাঁচ জনের পাঁচরূপ মূর্ত্তি, পাঁচ রূপ ভেক ধরিয়া উপস্থিত হইল; পাঁচ জনের প্রত্যেকেরই মূর্ত্তি নূতন নূতন, অবলম্বন-দণ্ডের অভাবে পাঁচ জনের মধ্যে কোথাও বিষয়-সাধারণ ভাবের চিহ্ন মাত্র নাই, সুতরাং পাঁচ জনই পাঁচ জনের নিকট পঞ্চবিধর্ম্মী হওয়ায় পরস্পরের উপহাসাস্পদ হইল; অতএব সুসংমিলনও ঘটিল না, পঞ্চশক্তি একত্র হইয়া মহদুদ্দেশ্যসাধক সমষ্টি বাঁধিতেও পারিল না। কেবল বাহ্য দৃশ্যে এরূপ নহে, অন্তর্দৃশ্যেও অবিকল এরূপ। আজি তুমি বলিলে এইরূপ করিলে ভাল হয়, অমনি, সেরূপ মতে না হউক, কিন্তু মত পরিবর্ত্তিত হইল। কালি তিনি আবার তাহা দেখিয়া নিন্দা করিয়া কহিলেন, এরূপ নহে সেরূপ হইবে, আবার পরিবর্ত্তন। এই রূপে যে যাহা বলিতেছে, অমনি প্রবৃত্তি নিবৃত্তি পর পর উপর্য্যুপরি ক্রমাগত মুহুঃ পরিবর্ত্তনে ছুটিতেছে, অথচ কাহাকে কখনও সন্তুষ্ট করিতে পারিলাম না। অন্যের কথাও শুনিব না, নিজেরও নূতন করিবার শক্তি নাই অথচ নূতন করিব, আবার নানা জনের নানা কথায় কার্য্যক্ষেত্র অপসারিত করিব, এরূপ ভাবে কে কবে কাহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিয়া থাকে? অধিকন্তু দেশীয় মহলে গালি এবং সাহেব মহলে গালাগালি, লাভের মধ্যে কেবল এই টুকু। ইহা সমাজশূন্যতা বা মিথ্যা সমাজের

ফল। এ সকলেরই মূল কারণ, মূলে মূলের অভাব। এরূপ সমাজ ছিন্ন-সূত্র মালিকাবৎ; এবং সমাজস্থ জনগণের কার্য্যসমূহ সূত্রচ্যুত, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, স্তূপীকৃত, ধূলিধূসরিত, পদদলিত, কোনটা বা লোপ-পথে অগ্রসারিত, বিবিধ পুষ্পসমূহ স্বরূপ। যাহা এত অপূর্ব্ব বৈচিত্রময়ী নয়ন-রঞ্জক শোভার আধার, সূত্রছিন্নে তাহারই আবার এই শোককরী বিরূপ দুর্দ্দশা!

কেন এরূপ হইল? সকল সৃষ্টির আদি সত্য, অথবা সৃষ্টি সত্যেরই বহির্বিকাশমাত্র। প্রতি কার্য্য এক এক পৃথক্ পৃথক্ সৃষ্টি স্বরূপ; সুতরাং প্রতি কার্য্য, সত্যকে তাহার মূল না করিলে, সুসম্পন্ন হইবার কথা নহে। সকল সত্যই ঈশ্বর প্রতিরূপ। যখন সাত্বিক ভাবে সেই সত্যকে অবলম্বন করা হইবে, তখনই প্রকৃত কার্য্যারম্ভ হইল বলিয়া বলা যায়, এবং সেইরূপ কার্য্যই কেবল ঈশ্বরের অভিপ্রেত ও সেইরূপ কার্য্যই কেবল, আমরা অনুভব করিতে পারি বা না পারি, ঈশ্বর-প্রীতিকামার্থে নিষ্পাদিত। সত্যকে অবলম্বনের বাহ্য পরিচয় এই যে, যাহা আমার কর্ত্তব্য বলিয়া গৃহীত তাহার যথার্থ কর্ত্তব্যতা-ভাবের সততায় সর্ব্বান্তরীণরূপে বিশ্বাস, এবং সেই বিশ্বাসকে কর্ম্মফলানুরূপ শুভাশুভ-প্রদায়ক জ্ঞানে, তদনুযায়ী কার্য্যের অনুসরণ। এরূপ সাত্বিক-ভাবপূর্ণ মানবজীবনে কর্ম্মসমূহ বিবিধ শোভাময় কুসুমসমূহ; আত্মা-তীত শক্তি বা পাতৃসমক্ষে কর্ত্তব্যবোধ তাহাদের অভ্যন্তর-পরিচালিত গ্রন্থিসূত্র। নানা বিজাতীয় পদার্থসংঘর্ষে, হিন্দুসন্তানের জীবনে এখন সেই কর্ত্তব্যবোধসূত্র ছিন্ন; সত্যের আশ্রয়, বিশ্বাসকে অবলম্বন, এবং তদনুযায়ী কার্য্যানুসরণ এই সকল গুণের অভাব। এই নিমিত্তই, ইহাদিগের জীবন মহাপ্রলয়-সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত বাত্যা-বিঘূর্ণিত পদার্থবৎ; এই নিমিত্ত ইহাদের জীবন জগতে জাগতিক-বন্ধনশূন্য এবং উদ্দেশ্য-শূন্য; সুতরাং যে কোন বিষয়ে গাঢ় আগ্রহ এবং স্থিতিশীল চেষ্টারও অভাব; নিস্পন্দ,—তবে যে কিছু স্পন্দন দেখিতে পাই তাহা কালের তাড়নে উদ্ভূত, কিন্তু তাহা (যেমন এরূপ অবস্থায় হওয়া উচিত) সুপ্ত মনীষার নষ্ট স্বপ্নবৎ ছিন্ন ভিন্ন, বিকট বা বিভীষিকাময়। হিন্দুসন্তানের

বিশ্বাস কোন বিষয়ে নাই, সকল বিষয়েতেই তাহা ছিন্নমূল এবং ভঙ্গ-প্রদ; যাহার পর নাই দাম্পত্য প্রণয় ও সুখ, তাহাও পূর্ণ বিশ্বাসে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন কি না সন্দেহ! তবে যে ইহারা কখন কখন অথবা নিয়ত বাতুল চেষ্টায় বাতুলবৎ কার্য্যারম্ভ ও তৎসাধনে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহার মূল কর্ত্তব্যবোধ নহে; বিশ্বাস নহে; তাহা সাময়িক হুজুক। হুজুকে হিন্দুসন্তান হাটের নেড়া!

যে প্রাচীন ভারত, যাহার কীর্ত্তি এবং গৌরব বলেই কেবল আজি পর্য্যন্ত আমরা গৌরবান্বিত; এবং যে কীর্ত্তি ও গৌরব নব্যভারত কর্ত্তৃক নিত্য তুচ্ছীকৃত, উপহসিত ও তাহার কর্ত্তা পিতৃপুরুষ ব্রাহ্মণগণ নিরন্তর নিন্দিত হইলেও, কেবল একমাত্র যাহার দোহাই দিয়া আজি পর্য্যন্ত আমরা বিজাতি সমক্ষে পশুপালের ন্যায় ব্যবহৃত হওয়া হইতে রক্ষা পাইতেছি, অন্তত রক্ষা পাইবার চেষ্টা করিতেছি; সেই প্রাচীন ভারতে এক সময়ে, যে সময়েতে সেই কথিত গৌরবরাশির সমুদ্ভব হইয়াছিল, সকল কার্য্যই ধর্ম্মশাসনে সুসম্পাদিত হইত। ব্যক্তিগণ প্রতি কার্য্যেই নিয়ন্তার হস্ত, নিয়ন্তার নির্দ্দেশ দেখিতে পাইতেন; শাস্ত্রকার ও বিধানকর্ত্তারাও, যে কিছু কার্য্য কর্ত্তব্য, তাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত ও আদিষ্ট জ্ঞানে তদ্রূপ শিক্ষা প্রদান করিতেন। লোকেও, ঈশ্বর ইহলোকে মঙ্গলদাতা ও পরলোকে মঙ্গল-কর্ত্তা এবং যাঁহার আদিষ্ট সমস্ত কার্য্য যখন মঙ্গলময় দেখিতেছি ও তাহাদের মঙ্গল ফল ভোগ করিতেছি, তখন তাঁহার সমস্ত আদিষ্ট কার্য্যই অবশ্য সেইরূপ মঙ্গলময় ও মঙ্গলদায়ক হইবে এরূপ জ্ঞানে, নিরন্তর প্রাণপণে তাঁহার প্রিয় কার্য্যের অনুসরণ করিত;—যেন তাহাদিগের জীবন মরণ একান্ত সেই কার্য্য সুসম্পাদনের উপর নির্ভর করিতেছে। বস্তুত তাহাদের পক্ষে, সেইরূপই নির্ভর করিত। যাঁহারা এরূপ সর্ব্বান্তরীণ ভক্তিসংযুত কর্ম্মকারক, তাঁহাদের প্রতি কর্ম্ম-নিয়োজক ঈশ্বরের করুণাও যে অসীম হইবে, তাহা আর বলিবার আবশ্যক রাখে না। ফলেও সেইরূপ দাঁড়াইয়াছিল। প্রাচীন জগতে প্রাচীন হিন্দুরা কি না করিয়া গিয়াছেন! প্রাচীন পৃথিবীর ইহাঁরা সর্ব্বোত্তম রত্ন। অধিক কি, যুগযুগান্ত গত, তথাপি আমরা আজি পর্য্যন্ত কেবলমাত্র তাঁহাদের

দোহাই দিয়া থাকিতেছি। তাঁহারা, সেই দূরতম কালেও, যে সকল নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন, এখন পর্য্যন্ত তাহার মধ্যে অনেক বিষয় আছে যাহার ভিতরে আধুনিক জগৎ আজি পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারে নাই। তাঁহারা ছিলেন সেই, আর আমাদের দশা এই। তথাপি, তাঁহাদিগের উপযুক্ত বংশধরেরা তাঁহাদেরই মাথায়,—ভিক্ষাভোজী ব্রাহ্মণগণের মাথায়, নিরন্তর গালিগালাজ বর্ষণ করিয়া থাকেন। বংশধরদের বোধ করি আক্ষেপ এই যে, কেন তাঁহারা খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে যাহা হইয়াছে তাহা পর্য্যন্ত উদ্ভাবন করিয়া রাখিয়া যায়েন নাই, যদ্দ্বারা আমাদের তাকিয়া ঠেস এবং সৌভাগ্য উভয়ই এককালে এবং নিরাপদে চলিতে পারিত! কোন মহাপুরুষ বা আক্ষেপ করেন যে পিতৃপুরুষদের মধ্যে, তাঁহাদিগকে মানুষ করিয়া (বোধ করি, ইংরেজি ধরণে মানুষ করিয়া) আনিতে, একটী বিষয়ের অভাব ছিল—"সেটী বেকন! সেটী বেকন! সেটী বেকন।" বেকন একজন ইউরোপীয় দার্শনিক। পাষণ্ড বাঙ্গালাম, আমি বলি, সেটী বেকন নহে,—সেটী তোমার ন্যায় গুণবান উপযুক্ত বংশধরগণের গর্ভেই বিনিপাত হওয়া! গর্ভেই বিনিপাত হওয়া! গর্ভেই বিনিপাত হওয়া। মূর্খ! বেকন কালিকার লোক, তুমিও যে দিনের সেও প্রায় সেই দিনের। যে ভিত্তিকে অবলম্বন করিয়া বেকনের উৎপত্তি, তোমার ভিত্তি তাহার অপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠতর। কিন্তু বানরীয় ভিত্তি অবলম্বনে বেকন মানুষ হইল, আর মানবীয় ভিত্তি অবলম্বনে তুমি বানর হইলে! ইহাতে পিতৃপুরুষের দোষ কেন দাও? দোষ আর কাহার দিব, দোষ ভারতের ভাগ্যের। মানবের অসারতার প্রধান লক্ষণ, যখন সে পরের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হয়; এবং সেইরূপ চূড়ান্ত উচ্ছৃঙ্খলতার প্রধান লক্ষণ যখন সে পিতৃপুরুষের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। প্রকৃত সারবান নিন্দার অবসর পাইয়া উঠে না। আবার বলি, আর কোন্ দেশ কোন্ পূর্ব্বপুরুষেরা উত্তরপুরুষদিগের জন্য হিন্দু আর্য্যগণের অপেক্ষা, কর্ম্মক্ষেত্রে এরূপ সুন্দর জমি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া গিয়াছে? কিন্তু হইলে কি হইবে, কেহ বা উর্ব্বরা জমি পাইয়া শেয়াল কাঁটা লাভ করে; আবার কেহবা অকর্ষিত জমি পাইয়াও নিজের

শ্রমে কর্ষণ পূর্ব্বক সুফসল ঘোল আনায় গৃহ পূর্ণ করিয়া থাকে। আমা-দের ভাব প্রথমোক্ত। বাঞ্ছারাম, দোষ অন্য কাহারও নহে, দোষ আমা-দের নিজের।

যাহা হউক, এ অনন্ত অথচ কালবাহী জগতে সকলই থাকিবে অথচ কেহ একস্থায়ী স্ব-মূর্ত্তিতে থাকিতে পাইবে না, তাহা বলিয়া হউক বা ব্যক্তিগণের স্বাত্মনিমিত্তভূত কারণে হউক, অথবা উভয়েরই যুগপৎ সমাবেশ বা অপরাপর যে কোন কারণসমূহের সমুপস্থিতিতেই হউক, পূর্ব্ব অবস্থার অবস্থান্তরের ক্রমে উপস্থিতি হইল। পূর্ব্ব সমস্ত কর্ম্ম-পরি-পাচক পদার্থ নৈসর্গিক নিয়ম বশে পুনর্ব্বার জাগতিক কর্ম্ম-কটাহে নিক্ষে-পিত হইতে লাগিল।

যে শুভ-সূর্য্য এতদিন ভারত অদৃষ্টক্ষেত্রে সমুদিত থাকিয়া কর-প্রসারণে সমস্ত পদার্থকে প্রদীপ্ত করিতেছিলেন, তিনি এক্ষণে মধ্যাহ্ন গগন পরিত্যাগে অস্তশিখর মুখে অবতরণ করিতে লাগিলেন। সময় পাইয়া অন্ধকার ধীরে ধীরে পদ প্রসারিত করিয়া সমাগত হইতে লাগিল। ভারতসন্তানেরা পথভ্রষ্ট হইতে আরম্ভ করিলেন। নববস্তু লাভে বিরত; উপার্জ্জিত বস্তুর ভোগসুখের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। ক্রমে আলস্যজনিত জড়তার উৎপত্তি; মানবের আনুষ্ঠানিক জীবন ক্ষীণবল হইয়া আসিল, এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ শারীরিক ও মানসিক শক্তিও তাহার অনুগমন করিল। সুভাব, সৎ-উৎসাহ এবং কর্ম্মশীলতার উপর, শারীরিক ও মানসিক উভয় শক্তিই বহুলাংশে নির্ভর করিয়া থাকে; সুতরাং তাহাদের ইতরে ইতর, উৎকর্ষে উৎকর্ষ ভাব। স্পন্দহীন মানবচিত্ত এখন আত্মদোষোৎপন্ন ফল অদৃষ্টের প্রতি আরোপ করিয়া, আভ্যন্তরিক উত্তেজনা হইতে শান্তিলাভের চেষ্টা করিতে শিখিল। অদৃষ্টবাদ ও মায়াবাদের সৃষ্টি হইল। ধর্ম্মের যে কিছু উত্তেজক ও উৎসাহবর্দ্ধক বিমল জ্যোতি তাহা লোপ হইয়া আসিল। পরে ধর্ম্মকেও প্রস্থানো-দ্যত দেখিয়া, আশঙ্কায় ও আকুলতায়, চৌকিদার ব্রাহ্মণেরা বহুযত্নে তাঁহার বসনাঞ্চল আকর্ষণে ধরিয়া রাখিবার জন্য চেষ্টা পাইয়াছিল, কিন্তু ধর্ম্ম এমন স্থানে থাকিবেন কেন? তিনিও মন্ত্র প্রবঞ্চণাদিরূপ

ছিন্ন বসনাংশ তাহাদের হস্তে পরিত্যাগ করিয়া অতর্কিত ভাবে অন্তর্হিত হইলেন। এখন কর্মকাণ্ড পরিত্যাজ্য; সংসার দুঃখের মূল; যাহার পর নাই সহধর্ম্মিণী পর্য্যন্ত রাক্ষসী এবং আত্মপথে কণ্টকস্বরূপ বলিয়া বিবেচিত, এবং সহধর্ম্মিণীও ক্রমে যথার্থই রাক্ষসী মূর্ত্তিতে পরিণত হইলেন। এক্ষণে নিষ্কর্ম্মা মোক্ষই একমাত্র কি ইহজীবন, কি পরজীবন, উভয় জীবনের উদ্দেশ্য এবং অনুষ্ঠানস্থল বলিয়া আদৃত হইল। ইহ লোকেও তাকিয়া ঠেস্, পরলোকেও তাকিয়া ঠেস্! ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা শেষে এই বলিয়া স্থির হইল যে, যে কেহ কর্ম্মশূন্য ও সর্ব্ব-উদ্যম-বিবর্জ্জিত হইয়া ব্রহ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া জড়বৎ বসিয়া থাকিতে বা অপরের গলগ্রহ হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিবে, সেই জীবন্মুক্ত। ভারতে পর-অন্ন-জীবী ভিক্ষুকের সংখ্যা যত, বিশেষ নষ্ট ধর্ম্ম-ভিক্ষুকের সংখ্যা যত অধিক, এত আর ভূ-ভারতে কোথাও নাই। ইহা সেই অপূর্ব্ব অভিনব ধর্ম্মশিক্ষার ফল। অকর্ম্মশীল এতগুলি লোক, ইহারা কেবল নিজের আত্মধ্বংস সাধন করিতেছে না; যাহাদের গলগ্রহ হইতেছে, তাহাদের পর্য্যন্ত আত্মধ্বংস করাইতেছে। যদি ইহারা নির্ব্বিবাদ হইয়া কিঞ্চিৎ করভারের বৃদ্ধি হয়, তাহাও শ্রেয়ঃ। প্রকৃত দানের পাত্র যে তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। বাঞ্ছারাম, অকর্ম্মশীলতায় দান লওয়াও যে দোষ, দান দেওয়াতেও সেই দোষ; এরূপ দানে যাহার ধর্ম্ম নিহিত, গ্রহীতার সঙ্গে সেও সমান দুষ্ট-মোক্ষ-প্রয়াসী—উভয়েতেই সমান পতিত। মোক্ষ! মোক্ষ! আর শ্রম করিতে না হয়: কেবল এখন নহে, ভবিষ্যতেও যেন আবার কর্ম্মস্থলীতে যাইতে ও শ্রম করিতে না হয়; ইহাই তোমার মোক্ষ! তবে কি ঈশ্বর যে তোমার সৃষ্টিশ্রমজনিত ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা কি এই জড়প্রায় মাটির ঢিবি হইয়া বসিয়া থাকিবে বলিয়া? কর্ম্মশূন্য যে ঈশ্বরপ্রার্থনা বা যে কোন ধর্ম্মফল কামনা, তাহা নষ্টামি এবং ফেরেবী। পাষণ্ড বাঞ্ছারাম, তুমি কে যে তাই তোমাকে মোক্ষ দিবার জন্য ঈশ্বরের ঘুম হয় না? বিশ্বেশ্বরকেও কি তুমি তোমার ইংরাজ মনীব পাইয়াছ যে, কেবল 'অনার' 'লর্ডসীপ' ইত্যাদি চাটু বচনে অভীষ্ট সাধন করিয়া লইবে। যেমন তুমি সামান্য-

প্রাণ, যেমন তুমি সামান্য-মন, তোমার ধ্যান, ধারণা বা কামনা, বা তোমার মোক্ষবাঞ্ছাও সেইরূপ সামান্য! তোমারই বা দোষ দিব কি, দোষ তোমার মাতৃভূমির কপালের।

অতঃপর মায়াবাদ ও অদৃষ্টবাদ উচ্চ হইতে অধমতম সমাজের সকল পর্য্যায়েরই ব্যক্তিবর্গের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিল; এমন অবস্থায়, কোন রূপে উদর পূর্ত্তিতে দেহভার বহন ভিন্ন, আর কি কার্য্যের সম্ভাবনা থাকিতে পারে? শাস্ত্রসকলও তদনুসারী হইতে লাগিল। এই নিশ্চেষ্ট অলসভাব এবং এই অনুরূপ শাস্ত্রশাসন, উভয়ে একত্র মিলিয়া, লোক-চরিত্রকে কিরূপ অকর্ম্মণ্য এবং হত-চেতন করিয়াছিল, তাহার উদাহরণের কি আবশ্যক হইবে? যদি হয়, তবে লক্ষ্মণ সেনের সিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়নের কথা মনে কর। সে পলায়ন লক্ষ্মণ সেনের নহে, তাহা হিন্দুসন্তান মাত্রের, লক্ষ্মণ সেন কেবল প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করিয়াছিল এইমাত্র তাহার দোষ। তাহার পর আরও দেখিতে চাও, বীভৎস তমস্বঘটার প্রতি বারেক নিরীক্ষণ কর। তাহার পর, ভারতে ধর্ম্ম গিয়াছে, কর্ম গিয়াছে, উৎসাহ গিয়াছে, উদ্যম গিয়াছে, সকল গিয়াছে, তথাপি ধর্ম্মবিপ্লবের কমি নাই। প্রতি সময়ে, প্রতি স্থানে, নিত্য নূতন ধর্ম্মবিপ্লব; এবং প্রতি বিপ্লব ভারতের এক এক ঝলক রক্ত শোষণ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। রাজদ্বারে লক্ষাধিক অত্যাচারেও মাথা তুলিবে না, কিন্তু ধর্ম্মের নামে একেবারে ক্ষিপ্ত—সুধু ক্ষিপ্ত নয়, আগুনখাগী ক্ষিপ্ত! নীত এবং নেতা উভয়েই মোহান্ধ হইয়া, একই তরঙ্গে নিপতিত; ভাসিয়া চলিয়াছে। দোষ কেবল নেতার নহে; নীতের অবস্থা-প্রলোভনেই অনুরূপ নেতার সাধারণত উৎপত্তি হইয়া থাকে। এখনই কি ক্ষান্ত হইয়াছে, তাহা নহে। ভ্রান্ত ধর্ম্মপিপাসা এখন পর্য্যন্ত ভারত-সন্তানের সর্ব্বনাশ করিয়া যাইতেছে। সে যাহা হউক, যে সময়ের কথা হইতেছে তখনও, আমরা লোকচরিত্র যতটা বিকৃত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতেছি, ততটা হয় নাই। এখন মানবচিত্ত কেবল কর্ম্ম পরিত্যাগ দ্বারা পূর্ণ অলসতায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে মাত্র; নতুবা এখনও কর্ম্ম বৈপরীত্য হইতে আত্ম৲ক্ষা করিয়া আসিতেছে, তাহার কারণ এখনও

ঊর্দ্ধ দেশের সঙ্গে একেবারে সংস্রবশূন্য হইতে পারে নাই। স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও একটী রজ্জু তাহাদিগকে নরক-নিপতন হইতে স্থগিত করিয়া রাখিয়াছে। ইহার পরের দৃশ্য দেখিতে চাও, বর্ত্তমান সময়ের উপর হইতে পরদা অপসারিত কর।

অতি বিকৃত দৃশ্য! বিজাতি প্রসাদে রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ চলিতেছে, সুখের সাগরে ভাসিতেছি; ঊর্দ্ধবাহু উনবিংশ শতাব্দীর, উনবিংশ শতাব্দী যাহার হউক না কেন, ঊর্দ্ধবাহু উনবিংশ শতাব্দীর মহিমাগানে উন্মাদিত হইতেছি; কিন্তু এ দিকে কি হইয়াছে তাহা দেখিয়াছ? যে একমাত্র অবশিষ্ট রজ্জু এতক্ষণ নরক-নিপতন হইতে রক্ষা করিতেছিল, তাহা ছিন্ন হইয়াছে! কর্ত্তব্য কাহাকে বলে, কার্য্য কাহাকে বলে, জীবনের সার্থকতা কাহাকে বলে? এ সুখ সময়ে, বাহ্য সম্পদের বহ্বাড়ম্বরে, স্বচ্ছন্দে উদরপূর্ত্তি এবং সুখের বিলাস ভিন্ন আর কি শ্রেষ্ঠতর কর্ত্তব্য, কার্য্য, এবং জীবনের সার্থকতা হইতে পারে! ঈশ্বর, ঊর্দ্ধদেশিক নিয়োজন, এ সকল কাহাকে বলে? জানি না, অথবা জানিয়াই তাতে ফল কি; কেহ কখন তাহা জানিতে পারে নাই, জানিতে পারিবেও না, অতএব বৃথা কচ্‌কচিতে মাথা ধরাণর কিছুমাত্র আবশ্যক দেখি না। তোমার ঈশ্বর, ঊর্দ্ধদেশিক নিয়োজন, এ সকল না হইলেও, আমরা স্বচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করিতে পারি। পাঠশালার পাঠ্য দর্শন ও বিজ্ঞান লেখকগণ এ যুগের ধর্ম্মগুরু। মিল বা বেন্থাম ইহাদিগের পোপ। এই দর্শনশিক্ষিত মিল, যে ধর্ম্মতত্ত্ব তর্ক করিতে গিয়া ত্রিসহস্রবর্ষপূর্ব্বগত জরথুস্ত্রের শিক্ষার অংশত সমর্থন ভিন্ন, নূতন শিক্ষা দানের আর কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই; সে ত্রিসহস্রবর্ষ পরে উদ্ভূত অগ্রগামী কালবক্ষোবাহী মানবকে কিরূপে শিক্ষা দিতে সমর্থ হইবে, তাহা কেবল মিল-শিষ্যেরাই বুঝিয়া উঠিতে পারেন। এখন হইতে 'ইউটিলিটী' আদর্শ। এখন হইতে সমস্তই, আত্মিক বিষয় পর্য্যন্ত, কলে নিষ্পাদিত হইবে; সকলেই সমান সুখী, সমান ভোগী হইবে। যে কিছু অসমতা যোগের এবং রোগের। বাপ্‌ বাঞ্ছারাম, যে প্রকৃতির তুমি সন্তান, যাহার অবলম্বনে তোমার স্থিতি যাহার অবলম্বনে তোমার গতি, তাহাকে কিঞ্চিৎ ইউটিলিটী শিখাইতে

পায় ? সে বড়ই ইউটিলিটী-জ্ঞান-পরিশূন্য। মরুক না হয়, ইউটিলিটীই আদর্শস্থলীয় হইল: কিন্তু তোমার তাহাতে কি, তুমি কেন তাহাতে মাথা ঘামাইয়া দেয়ালে খেয়ালে আপন কর্ম্ম পণ্ড কর ? সাড়ে সাতশ বৎসরের পুরাতন জুতা মাথায় বহা যাহার নিত্য ব্রত, যাহার সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে গোলামের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তাহার এ ইউটিলিটী বিন্যাসে ফল ? সম্ভব যাহা, আগে তাহার লাভে সমর্থ হও ; অসম্ভব লাভের খেয়াল তাহার পরে।

লোক ক্রমে সর্ব্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া আসিলেও, তথাপি কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পিতা মাতা, সন্তানগণ পাঠশালা হইতে গৃহে আসিলে, সন্ধ্যাকালে তাহাদিগকে লইয়া, দেবচরিত, লোকচরিত, বংশাবলী-জ্ঞান, কি করা কর্ত্তব্য, কি করা অকর্ত্তব্য, যথাবুদ্ধি ও যথাশক্তি ইহা যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা দিতেন ; এবং সর্ব্বদা দেবতাদির প্রতি ভক্তি, সংসারে সন্নীতি ও সদনুরাগ, সুযোগ পাইলেই যত্ন সহকারে বালকের মনে সমুদিত করিতে চেষ্টা পাইতেন। বালকও বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সমাজে প্রবিষ্ট হইলে, কর্ম্মপথে যদিও বলদ বিশেষ, তথাপি কথিত সৎশিক্ষায় কথঞ্চিৎ অবলম্বন প্রাপ্ত হওয়ায়, সংসারে বাবেদা মত একরূপ চলিতে পারিত ; এখনকার ন্যায় সভ্য ভব্য না হইলেও, তথাপি তাহাদের অভ্যন্তরে এমন একটী সারল্য এবং সহজ বুদ্ধি ও উন্নতের প্রতি ভক্তি ভাব অবস্থান করিত, যাহা আধুনিক সভ্য ভব্যের সমগ্র জীবন অনুসন্ধান করিলে, তাহার লেশ মাত্রও পাওয়া যায় না।

এখন তাহাও নাই। পিতা মাতা এখন সৌখিন ; সন্তানদিগকে সেরূপ শিক্ষাদানে তাঁহাদিগের অবসর হইয়া উঠে না ; আফিসের কাজে, ফেণ্ড আহ্বানে, দাড়ির তদ্বিরে, চস্মা পরিষ্কারে, তিল মাত্র সময় হইয়া উঠে না। জননী যিনি, তিনি এখন ঘোষ বসু মিত্র বা মুখোপাধ্যায় বা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়া, জ্ঞান-গম্ভীর-বদনা, উপন্যাসহস্তা, 'ডিসেণ্ট'-পোষাক-উদ্ভাবন চিন্তায় চিন্তাব্যাকুলা ; সন্তানদিগকে সেরূপ শিক্ষাদান, কখন কখন বা স্তন্যদান পর্য্যন্ত, তাঁহাদিগের নিকট হেয় ; অবশ্য এগুলি মহাশয়ার মহান আশয়ের মধ্যে কখনই স্থান পাইতে পারে না। পুনশ্চ

রন্ধনশালায় যাহার মাথা ধরে, পরিজন সমক্ষে যিনি ননীর পুত্তলী, কার্পেট হস্তেই কোমলাঙ্গুলীতে যাহার শোভা বর্দ্ধন হয়, তাহাকে সে সকল কার্য্য সাজেই বা কি করিয়া। সব ভাল, কিন্তু একটা কথা, গৃহলক্ষ্মী কার্পেট বুনেন বুনুন, কথা নাই; কিন্তু যে স্বামীর এ শেয়াল কুকুরের জীবনে (পদে পদে যার গলায় হাত মাথায় লাথি) সে কার্পেট পরিতে সাধ যায়, তাহার গলায় দড়ী! আবার কথা আছে স্ত্রীজাতি শক্তিরূপিণী: অতএব যে কামিনী স্বামীকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া কর্ম্মরত করিতে না পারে এবং সমস্ত শক্তিমত্তা যার কেবল কার্পেট বুননে ব্যয়িত হয়, সে কামিনীরও গলায় দড়ী! সে যাহা হউক, যেমন পিতা তেমনি মাতা, দেশের হাওয়াও ততোধিক অনুকূল; শিক্ষকের হস্তে সন্তান নিক্ষিপ্ত করিয়া স্বচ্ছন্দে পিতৃমাতৃত্ব দায় হইতে আপনাকে মুক্ত বিবেচনা করিয়া থাকে। না হইবে কেন? যে দেশে ধর্ম্ম এবং পুণ্য পর্য্যন্ত কিনিতে পাওয়া যায়, সেখানে যে পিতৃমাতৃত্ব কিনিবার অনুষ্ঠান হইবে তাহার আশ্চর্য্য কি? সাধারণ শিক্ষাস্থান আবার, বিজাতীয় রাজশাসনে এবং বিজাতীয় প্রথায়, ধর্ম্মশিক্ষা এবং চিন্তায় চিত্তপরিচালনাদি শিক্ষার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে সম্ভাবনা-শূন্য। নীতিশিক্ষার কখন কখন চেষ্টা হয় বটে, কিন্তু তাহা মূলশূন্য নীতি। নীতিই হউক বা যে কোন বিষয় হউক, যতক্ষণ তাহার উৎপত্তি কোথা হইতে, আবশ্যকতা কি, পরিণাম কোথায়, ইত্যাদি তত্ত্ব জ্ঞাত হইতে না পারা যায়, ততক্ষণ তাহাতে কখনও আস্থা জন্মিবার কথা নহে। যদি জন্মায়, তাহা পরগাছা নীতি, তাহা হয় স্কুল পণ্ডিত নয় স্কুলের ছাত্রাদির ন্যায় অন্তঃসারশূন্য গোঁড়ামী,—আমোদে দুটাকা ব্যয় করিতে দেখিলেই মনে করিয়া থাকে, অপব্যয়ের চূড়ান্ত হইয়া গেল; আবার তদ্বিপরীতে কেহ বা একেবারে অনাস্থা সমুদ্রশায়ী, সমস্ত পুঁজি পাটা ব্যয় করিয়া, সমস্ত শরীর নষ্ট করিয়া, তবু আমোদের শেষ হয় না, অনীতি কাণ্ডের অন্ত পায় না। সুরা-নিবারক, গুলি-নিবারক, ইত্যাদি বিষয় লইয়া যতটা সভা, যতটা বক্তৃতা, যতটা পণ্ড শ্রম হইয়া থাকে; সুনীতি সমূল স্থাপনার্থে যদি তাহার শতাংশের একাংশ শ্রম কেহ স্বীকার করিত, তাহা হইলে কখনই এত পরিমাণে অনুতাপের

কারণ সম্ভবিতে পারিত না। নীতির আবশ্যকতা কি জন্য যদিই বা তাহা কথনও শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার 'জন্য' ভাব একমাত্র সমাজহিত বলিয়া শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। নীতির শেষ উদ্দেশ্য যে সমাজ-হিতে বহুলাংশে পরিণত হয় তাহা জানি; কিন্তু আমি যে সেই সমাজহিতে প্রবৃত্ত হইব, আপনার ফেলিয়া পরের করিব, তাহা কি জন্য, কি বাধ্য-বাধকতায়, কি প্রতিদানের আশায়? সমাজের কথা যাহা বলিতেছ, আমি দেখিয়াছি, অধিকাংশ সময় সমাজ আমার অপকারই করিয়া থাকে, উপকারের ভাগ অতি অল্প। মানব অপ্রত্যক্ষ সংসার প্রলোভনে অতি অল্পই কার্য্যপ্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অতএব এরূপ নীতিশিক্ষা ভ্রমাত্মক এবং অকার্য্যকর।

এখনকার শিক্ষাও অপূর্ব্ব শিক্ষায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইংরাজ রাজপুরুষগণ কি ভাবিয়া ওরূপ শিক্ষা দিয়া থাকে, তাহার তত্ত্ব তাহারাই জানে। কিন্তু আমরা কি ভাবিয়া সেরূপ শিক্ষা ইচ্ছা ও আগ্রহপূর্ব্বক করিয়া থাকি? মধ্যবিত্তের প্রধান উদ্দেশ্য প্রচুর অর্থলাভ করা; আর ধনিসন্তানের প্রধান উদ্দেশ্য, প্রজা-হায়রাণি পক্ষে প্রচুর মামলাবাজ হওয়া এবং বিদ্যা-উপাধির চটকে আত্মদৌরাত্ম্যে পরদা ঢাকা দেওয়া। এ দেশে শিক্ষার উদ্দেশ্য, প্রকৃত শিক্ষা অর্থাৎ গুণ ও জ্ঞান শিক্ষা নহে; উদ্দেশ্য সাধারনত, উপাধির চটকে লোক ভুলাইয়া অন্য অপেক্ষা উচ্চ বেতনের চাকুরী আকর্ষণ, সুতরাং (প্রকাশ্যে না হউক) প্রকারান্তরে উহা লোক ভুলান বা জুয়াচুরী। শিক্ষার উদ্দেশ্যের বিষয় এই পর্য্যন্ত। তাহার পর শিক্ষার অবলম্বন পাঠ্য পুস্তকের বিষয় দেখ। যে সকল গ্রন্থ অভিনব, সারগর্ভ বা শিক্ষা-দায়ক,তাহার সঙ্গে বিদ্যালয়ের সম্বন্ধ অতি অল্প এবং সে সকলের খবরও বড় থাকে না; সুপারিশের লোক, আত্মীয় স্বজন বা পরিচিতের ছাই, পাঁশ, ভস্ম, অপাঠ্য গ্রন্থচয় তৎপরিবর্ত্তে পাঠ্যস্থলে নির্ব্বাচিত, সুতরাং পাঠ্য বিষয় মেকি। তাহার পর শিক্ষা; শিক্ষকের অভিপ্রায় যে কোনরূপে ছাত্রকে উত্তীর্ণ করিয়া দেওন, ছাত্রের অভিপ্রায় যে কোনরূপে উত্তীর্ণ হওন; শিক্ষক নোট লিখিয়া দিতেছে, বালক মুখস্থ করিয়া রাখিতেছে, পরীক্ষাস্থলে গিয়া তাহা উগরাইয়া দিয়া আসিবে,

এবং সেই খানেই শিক্ষা, শিক্ষক ও শিক্ষানবিশের মধ্যে সম্বন্ধচ্ছেদ; সুতরাং শিক্ষা বিষয় ফাঁকি। তাহার পর পরীক্ষা; নির্ব্বাক তিরস্কার ইহার একমাত্র উপযুক্ত বর্ণনা; বলিতে কি এখানে পরীক্ষা ভণ্ডামি। তাহার পর শিক্ষিতের ভাবী ফল?—শিক্ষা-গুরুরা প্রায়ই জগতের অদ্বিতীয় নিউটন, সেই নিউটনগণের কাছে আমার শিক্ষা; তাহার পর আমি নিজে বিদ্যোপাধির চরম সীমায় উপস্থিত; ইহার পর আবার কি? বিদ্যা সমুদ্রের পর পারে উপনীত, অতঃপর আয়েস আরাম; সুতরাং ভাবী ফলে ষণ্ডামি। অতএব যাহার গোড়া হইতে আগা পর্য্যন্ত জুয়াচুরী, মেকি,ফাকি, ভণ্ডামি ও ষণ্ডামি এই কয়টী পর পর পর্য্যায়ক্রমে সন্নাবিষ্ট; সে শিক্ষা যে কিরূপ অপূর্ব্ব পদার্থ হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা বলিবার আবশ্যক রাখে না। আর একটী বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে,শিক্ষাবিভাগে এত অসংখ্য নিউটন, তথাপি কিন্তু এমন কোন একটী নিউটনকে দেখিতে পাই না,যে চোখে-ঠুলি ঘানির গরুর স্বভাব ভুলিয়া বাঁধা পথের বাহিরে যাইতে পারগ হয়। সাহেব নিউটনের কথায় দরকার নাই। তোমার দেশী নিউটন? একে বাঙ্গালায় কিছুই নাই, তথাপি যাহা কিঞ্চিৎ আছে, তাহার মধ্যে কি সাহিত্য, কি বিজ্ঞান, কি যে কোন বিষয়ে, এমন কোন একটী অভিনব গণনীয় গ্রন্থ দেখি নাই যাহা শিক্ষা বিভাগের কোন নিউটনের দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে। যাহা কিছু গণনীয় বাহির হইয়াছে, তাহা সমস্তই শিক্ষাবিভাগের বাহিরে। ইহা দ্বারা নিউটনগণের নিউটনত্বের বিষয় কিরূপ অনুমান হয়? তবে কি না ইঁহারা, পরস্পর পরস্পরের সহায়তায়, পরস্পর পরস্পরের সহায়তায় চলিত হইবার আশায়, স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ অপার এবং অসংখ্য সংখ্যায় লিখিয়াছেন ও লিখিতেছেন, ইহা সত্য! যে দেশের বিদ্যা বুদ্ধির সীমা স্কুলপাঠ্য পুস্তকে অথবা স্কুলের বাহিরে উপন্যাস পঠনে, সে দেশে উচ্চ গ্রন্থ-জ্ঞান স্কুলপাঠ্য পুস্তক বা নবেলে, এবং উচ্চলেখকত্ব তাহাদের প্রণয়নে, সমাহিত না হইবে কেন? কোন নিউটনকে আবার এমনও বলিতে শুনিয়াছি যে, কোন গ্রন্থ প্রণয়ন অপেক্ষা, বাৎসরিক রিপোর্ট লেখা অতি কঠিন এবং মহৎ কাজ; বলা বাহুল্য যে ইঁহারাও

প্রাণ ভরি। বাৎসরিক রিপোর্ট লেখার উপর জীবন মন উৎসর্গ করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করে নাই। শিক্ষার উপরেই, কি ব্যক্তিগত কি জাতিগত, কি বর্তমান কি ভবিষ্যত, কি ইহলৌকিক কি পারলৌকিক, সমস্ত জীবন নির্ভর করিয়া থাকে। সেই শিক্ষাদায়ক বিভাগই যেখানে এরূপ দশায় দশাগ্রস্ত হইয়াছে, সেখানে আর কি অধিক ভাগ্য, সৌভাগ্য আশা করা যাইতে পারে; বা সেখানে আর অধিক বক্তব্যই কি থাকিতে পারে? ভাল, বাঞ্ছারাম, এক কথা জিজ্ঞাসা করি, বিজাতি বিধর্ম্মী যাহারা তাহারা যাহা কিছু করিতে চাহে করুক, এবং সেরূপ করা কতকটা নানা কারণ হেতু সম্ভবও, কিন্তু বল দেখি, আমরা কেন আপনাপনি পাগলের হাট বাজারে মাতিয়া ও পরস্পরকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া, আত্মধ্বংস করিতে এত ব্যগ্র হইয়া ছুটিয়াছি? তোমাকে ঠকাইলে আমাকেও যে সে ঠকার অংশভাগী হইতে হয়, ইহাই বুঝিতে না পারা তাহার তথ্য।

এই অপূর্ব্ব শিক্ষাস্থলে শিক্ষা লাভ করিয়া, বালক যখন শিক্ষালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংসারক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তখন তাহার আত্মিক জীবন কর্ষণ অভাবে নির্জ্জন মরুপ্রান্তর সদৃশ। প্রায় এমন উষরত্ব আসিয়া উপস্থিত হয় যে, বহুকর্ষণেও আর মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা থাকে না। আমার সৃষ্টি কি জন্য, কোথা হইতে, আমার কর্ত্তব্য কি, কি করিতে এ সংসারে আসিয়াছি, কি কর্ম্ম করিতে আমি ক্ষমবান, সে বিষয়ে একেবারেই ভ্রূক্ষেপশূন্য, এ পৃথিবী, এ সংসার শুদ্ধ যে কেবল আহারবিহারের স্থল নহে, আরও কিছু আছে, সে বিষয়ে অন্ধ। প্রবেশদ্বারেই, তাহার ন্যায় অনুরূপ প্রকৃতি-বিশিষ্ট লোক সংগঠিত উন্মত্ত সামাজিকতা এবং তাহারই উন্মত্ত শাসন। যেখানে অপরাপর শাসনস্থলগুলি যখন শূন্য, তখন সেখানে উন্মত্ত হউক বা যাহা হউক, যে কোন শাসন নব প্রবেশীর চক্ষে লক্ষিত হয়, তাহাই সর্ব্বেসর্ব্বা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, এবং তাহাই যথাসম্ভব অনুসৃত হয়। উন্মত্ত শাসনের ফলও উন্মত্ত হইবে না ত কি হইবে? এই কারণেই প্রধানত পূর্ব্ববর্ণিত অদ্ভুত লোকচরিত্র এবং সমাজচিত্রের উৎপত্তি। সর্ব্বজন বিবর্জ্জন না করিয়া, এখনও যাহারা হিন্দুনামে পরিচয় দিয়া থাকে, তাহারাও আর হিন্দু নহে;

মুখে হিন্দু, মনে নরাধম। হিন্দুধর্ম্মের জীবন্ত ভাব যাহা তাহা অনেক দিন বিগত, এখন কেবল তাহার বীভৎস দৃশ্য চিতাভস্ম মাত্র লোকের অবলম্বন হইয়াছে; সে চিতাভস্মও ব্যবহৃত কেবল আত্মবিকৃত বদনকে আর একরূপ করিয়া দেখাইবার জন্য। হিন্দু হিন্দুয়ানী বহির্ভূত হইয়া করিতেছেন সমস্ত, অথচ চক্ষুঠারিয়া সকলই ঢাকা দিয়া জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছেন; আবার অনেকের হিন্দুয়ানী আচরণ কেবল লোকরক্ষা ও আইনরক্ষার খাতিরে! বক্রী জনগণ আবার হিন্দুয়ানী বা যে কোন ধর্ম্ম বা কোন শ্রেণীরই তোয়াক্কা রাখেন না; অথবা রাখেন যদি তবে সে সৌখীন ব্রাহ্মগিরিতে। এই ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে সাধারণত অন্য ধর্ম্মে দ্বেষ, পরনিন্দা, আত্মঘোষণা ও আত্মগৌরব, সুতরাং তামসিকতা প্রধান বিভূতি। আত্মগৌরব কেমন একটা আমাদের জাতীয় স্বভাব,—এমন কি মাতৃভাষা বাঙ্গালা না জানিলে, বা জানি না বলিয়াই, এখানে আত্মগৌরব করিতে পারা যায়! বাঞ্ছারাম চাবুক-হস্ত, হ্যাট কোটে ও খোষমেজাজে মস্ মস্ করিয়া চলিয়া বা দীর্ঘচ্ছন্দ বক্তৃতা দিয়া ভাবেন, আমি কি বীরপুরুষ। বীর পুরুষই বটে! বাপুহে বীরত্ব তোমার আইন আদালতে, বল তোমার মিমোরিয়ালে। মারিবে তুমি. নালিশ করিব; তুমি আমার গৃহে প্রবেশ করিবে, নালিশ করিব; সাহেব তুমি গালি দিবে, ইস্তফা করিব; জুলুম করিবে, মিমোরিয়াল লিখিব। পাহাড়িয়া কুকুর নির্ব্বিবাদে মারি খায়, কিন্তু বিশ হাত অন্তরে তাহার খেউ খেউ শব্দের ধূম বড়! হায় হায়, সেই না জানি কেমন দিন, যে দিন ভারতসন্তান বিজাতীয় বাহ্যিক অশন বসন, চাল চলনের মাথায় ঘৃণাকুঞ্চিত বদনে সগর্ব্বে পদাঘাত করিয়া, অগ্নিদীপ্ত, বিদ্যুৎ-ঘিক্ষিপ্তবৎ, তেজে, সাহসে, সারল্য ও বল সংমিলিত করিয়া, কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিতে শিখিবে; এবং 'রোদনং বলং' ভারত হইতে তিরোহিত হইবে।—বৃথা স্বপ্ন, সে দিন এখনও অনেক দূরে। সে যাহা হউক, ইহার পর একশত কি দুই শত টাকা বেতন বা ডিপুটীবাবু হইতে পারিলে, তবে ত আর আত্মগৌরবের কথাই নাই। সমাজমধ্যে কি ভয়ঙ্কর আত্মগৌরবের ঢেউই খেলিতেছে,—যে শত টাকার মালিক সে

দশ টাকার মালিকের সঙ্গে কথা কহিবে না, যে সহস্রপতি সে শতপতির সঙ্গে, যে জমিদার সে মধ্যবিত্তের সঙ্গে, যে রাজা সে জমিদারের সঙ্গে, যে চাকুরে সে অচাকুরের সঙ্গে, যে বড় চাকুরে সে ছোট চাকুরের সঙ্গে, কোন মতে কথা কহিবে না; এবং এ সবারই আবার ইচ্ছা ছোট লোকেরা ছোট থাকিয়া পশুপালের ন্যায় দাসপাল রহুক। এইরূপে সমাজে যখন সকলেই গৌরব হেতু পৃথক পৃথক, এক অপরের প্রতি তাচ্ছিল্যভাব-পূর্ণ, তথায় কখন পরস্পরের প্রতি কার্য্যসাধক সহানুভূতি ও ঘনিষ্ঠতা জন্মিতে পারে না। তবে ইহার মধ্যে একটী মহাতীর্থ আছে, যথায় সকলের সমান সমবেত হেতু যা কিঞ্চিৎ সুমিলনের সম্ভাবনা ঘটিয়া থাকে। সে মহাতীর্থ?—সাহেবের রাঙা পদ! বাঙ্গারাম, উহা তোমার গয়াতীর্থ, এ তীর্থের এমনই মহিমা যে এখানে ছোট বড় সবাই ভাঙ্গিয়া সমান গতি প্রাপ্ত হয়। চাষা,ধনী,মধ্যবিত্ত,রাজা,ফকীর, চাকুরে, অচাকুরে, যিনিই যেমন ছোট হউন বা যিনি যতই বড়ত্ব জাহির করুন, এ পদপঙ্কজে কিন্তু সবারই সমান গতি, সমান মুক্তি। এই নূতন পুরীতীর্থই ভারতীয়ের যাহা কিছু বর্ত্তমান একতাসূত্র! রুদ্রদেব, তুমি কোথায়! কল্কিদেব, তুমি কবে আসিবে!

ভাল সে যাহা হউক আর এক বড় আশ্চর্য্য! ছন্ন এ পদদলিত জীবনসমষ্টির ভিতর এত আত্মগৌরব, এমন সাহেবানা, এমন খোষ মেজাজী আসে কি করিয়া! আগে ভাবিতাম, কেমন করিয়া মুখে হাসি আসে, কেমন করিয়া মুখে ভাত উঠে, কিন্তু এখন দেখিতেছি সে কথাও তুচ্ছানুতুচ্ছের মধ্যে। তবে কথাটা কি, যে কোন বিষয় যতই ক্লেশদায়ক হউক, বহুদিনের অভ্যস্ত হইয়া গেলে আর তাহাতে ততটা ক্লেশ বোধ থাকে না। বাঙ্গারাম, আত্মগৌরবেরও ব্যবহার আছে; কিন্তু সেই আত্মগৌরবের যাহা সর্ব্বদাই বিনত থাকে, কেবল উদ্ধত দেখিলে উন্নত হয়, এবং শ্রেষ্ঠতা যাহার কেবল মাত্র দুঃসাধ্য কার্য্যসম্পাদনে প্রকাশ পায়। সেই না জানি কেমন দিন, যে দিনে ভারতসন্তান সে আত্ম-গৌরব বোধে প্রবুদ্ধ হইবে; পরস্পর পরস্পরকে ভাই ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিবে; ধনী নির্ধনের চক্ষুজল মুছাইবে, নির্ধন ধনীর পৃষ্ঠবল

হইবে, দরিদ্র এবং রাজা একার্থসংযুক্ত হইয়া জাতীয় কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে। কিন্তু এখানেও আবার সে দিন এখনও অনেক দূরে! সে দিন একটী জমিদার আমাকে বলিল,—প্রজার প্রতি ভদ্রতা দেখাইতে যাওয়া বা তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা, কেবল অনর্থক প্রশ্রয় দেওয়া মাত্র, 'দুধ কলা দিয়া কাল সাপ পোষা।'

এক্ষণে আর এক বার ভারত-ভরসাগণের প্রতি নেত্রপাত করিয়া দেখ। বৃদ্ধ, অর্দ্ধবয়স্ক এবং যুবা, বর্ত্তমান সমাজে ইহারা কে কি রকম তাহা উপরে উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। তাহাদের কর্ম্মকারিত্বের বিষয় একবার আলোচনা কর। পূর্ব্বকথিত বৃদ্ধ বা প্রাচীনের শিক্ষানুযায়ী জীবন মিথ্যার আধার, মিথ্যাই উহার ভিত্তিভূমি। ঐ শিক্ষার স্থূল মর্ম্ম, আত্মপ্রকৃতিতে আত্মঘাতী হইয়া, যখন যে দিকে যেরূপ দেখিবে, তখন সেইরূপে চলিয়া নিজের কাজ সাধিয়া লইবে। এ বড় দুরন্ত শিক্ষা। কিন্তু সহজ দৃশ্যে ইহা বড় মনোহর উপদেশ, এবং ইহাতে আপাতত সুখও অনেক দৃষ্ট হয়। কিন্তু ইহাও বুঝিতে হইবে যে, শয়তান যদি মিথ্যাকে এরূপ লোভনীয় আবরণে আবৃত না করে, সত্য হইতে যদি তাহার বেশী বাঞ্ছনীয় মূর্ত্তি দেখাইতে না পারে, তবে সত্য হইতে লোক ভুলাইয়া আত্মপথে লইবে কি করিয়া। স্বভাবত সত্য হইতে মিথ্যার পথ বেশী লোভনীয় হইবার কথা। সত্য যাহা তাহা স্বয়ং, নিত্য, ক্ষয়-রহিত, অপরিবর্ত্তনীয়; যথানিয়মে যথাকালে ও যথাফলে যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে, কাহারও অপেক্ষা করে না; সময় অনুসারে বা লোক অনুসারে মূর্ত্তিও পরিবর্ত্তন করে না। সত্যই সকলের অব-লম্বনীয়, সত্য কাহাকে অবলম্বন করে না। নানা মায়াধারী শয়তানের ভাব অবশ্যই ওরূপ হইবে না। উহা অবিকল গবর্ণমেণ্টের প্রলোভক রোডসেস রাস্তার ন্যায়; সহর হইতে যখন বাহির হও, তখন কেমন বাঁধান রাস্তা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দুই ধারে নিবিড় গাছের আলি। তাহার পর যত অগ্রসর হইতে থাক, তত ক্রমে বাঁধা ঘুচিয়া কাঁচা, কাঁচা ঘুচিয়া ময়দান, গাছের আলি দূরে গত, ক্রমে উঁচু নিচু, পরে ধূলা কাদা, পরে কাঁটাবন, শেষে খানা ডোবা; পথিক

হাত পা ভাঙ্গিয়া, কাঁটায় পড়িয়া, পথ ভুলিয়া, নিরাশ্রয়ে দিগ্বিদিকশূন্য হইয়া ব্যাকুলিত। শয়তানের পথও অবিকল সেইরূপ ঠিকানায় লইয়া উপস্থিত করিয়া দেয়। অর্দ্ধবয়স্কের জীবনও মিথ্যার উপর নির্ম্মিত, কিন্তু মিথ্যার এখানে চূড়ান্ত ভাব; মিথ্যা ক্ষিপ্তবৎ, আত্মশোণিত আপনি পানে রত। সুতরাং ইহার ফলাফলের বিষয়ে কোন কথা বলিতে যাওয়া বাহুল্য মাত্র। তবে কি এ পৃথিবীতে ইহাদের অস্তিত্ব অনর্থক? তাহা নহে; এ পৃথিবীতে বস্তু স্বভাবগুণে বা যে কোন কারণে যতই হেয় অবস্থায় নিপতিত হউক, একেবারে অনর্থক কেহ যাইতে পারে না। ঈশ্বর শয়তানকে দিয়াও সতের উৎপত্তি করাইয়া থাকেন! বাঞ্ছারাম, ইহা বোধ করি জ্ঞাত আছ যে, ক্ষেত্রের শক্তি একবার লোপ হইলে, তাহার শক্তি পুনর্ব্বার উদ্দীপনে ভাল ফসল উৎপন্ন করাইবার জন্য ভূমিতে সার দিবার প্রয়োজন হয়। সার সাধারণত অব্যবহার্য্য ময়লা মাটি ও পরিত্যাগযোগ্য বস্তু পচিয়া হইয়া থাকে, এবং সেই ময়লা মাটি আদি আবার যত অপকৃষ্ট ও অস্পৃশ্য হয়, সারও তত উত্তম হইয়া থাকে। ভারতীয় জীবনক্ষেত্রে উক্ত অর্দ্ধবয়স্কেরাও সার বিশেষ। ভারতের ভাগ্যে যে একদিন মহান্ সৌভাগ্যের উদয় হইবে, তাহাও উহাদের দেখিয়া একরূপ নিরূপণ ও আশা উভয়ই করিতে পারি, কারণ উহাদিগের ন্যায় নামের অযোগ্য অপকৃষ্ট জীবন ভূভারতে আর নাই। পুনশ্চ যে স্থান যত হীনতায় নামে, সেস্থান হইতে তত মহত্বের সূত্রপাত হয়।

নব্যের জীবন এই মিথ্যার প্রতি বিরক্তি ও তৎসহ সংগ্রামভাব, অথচ এখনও সত্যের আশ্রয় প্রাপ্ত হইতে পারে নাই। যে সত্য তাবৎ বিধর্ম্মী বস্তুকেও আপন আয়ত্তে আনিয়া তাহাদের বিধর্ম্ম গুণকেই প্রকারান্তরে বৈচিত্রময়ী শোভার আধার করিয়া অপূর্ব্ব সৃষ্টি রচনা করিয়া থাকেন, এবং যে সত্য তাহাদের বন্ধনরজ্জু, তাহার এখনও ইহারা দেখা পায় নাই। তদভাবে, বিধর্ম্মী পদার্থনিকর আয়ত্তক-শাসনশূন্যে দ্বন্দ্বঘূর্ণিত হইয়া ফিরিতেছে; আকর্ষণে আরও বহুবিধ পদার্থ আনিয়া তাহাতে সংযোজিত হইতেছে, কিন্তু সংযোজনে দ্বন্দ্ব কেবল ব্যাকুল হইতে ব্যাকুলতর করিয়া তুলিতেছে মাত্র। এতদবস্থা হেতু যে কোন বচনবাগীশ,—কে জানে

সার, কে জানে অসার; কে জানে স্বার্থপূর্ণ, কে জানে কে,—যে কোন বচনবাগীশ, যে কিঞ্চিৎ চটকযুক্ত বাগ্‌জাল বিস্তার করিতে পারে, সেই ইহাদিগের গুরুপদে বরণীয় হইয়া থাকে। যাহা হউক, ইহারা পূর্ব্বগত দুই শ্রেণীর ন্যায় নিষ্পন্দ নহে; তবে গতি এখনও অস্থিরীকৃত, দৃষ্টি অপ্রসারিত, কোন উচ্চ আদর্শ ভিত্তিও সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয় নাই। বর্ত্তমান মোহপ্রাপ্ত ও আত্ম-ঘাতী অবস্থা হইতে যে আমাদিগকে অবস্থান্তরে যাইতে হইবে, ইহা তাহাদের অন্তরাত্মা মধ্যে সুপ্তোত্থিতবৎ ক্ষণে ক্ষণে প্রবুদ্ধ হইতেছে বটে, কিন্তু কোথায় যাইতে হইবে, কোন পথ দিয়া, কিরূপে, তাহার কোন নিদর্শনী এখনও আসিয়া উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং, ইহারা পূর্ব্ব দুই শ্রেণীর কর্ম্ম অথবা প্রকৃত কথায় অকর্ম্ম সংসারকে আপন কর্ম্মসংসাররূপে গ্রহণ করিয়া, তাহারই প্রকারান্তর-কল্পিত আদর্শে, তাহারই পাঁচ দ্রব্যের পাঁচ মসলা দিয়া, আর এক নূতন দ্রব্য প্রস্তুতের চেষ্টা করিতেছে, অথচ মনোমত হইতেছে না,—হইবে কিরূপে? সৎ-ইচ্ছা অসৎ সংমিলনে কবে সফলতা বা কবে তৃপ্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়? মনোমত হইতেছে না, আবার ভাঙ্গিতেছে, আবার গড়িতেছে; এইরূপে কোন দিকে কিছুই সাব্যস্ত হইতেছে না। এইই কারণ হইতে আমরা দেখিতে পাইয়া থাকি, ইহারা সময়ে সময়ে নানা কার্য্য উপস্থিত করিতেছে, নানা কথা কহিতেছে, আত্মসফলতা অনুষ্ঠান মাত্রেই গণনা করিয়া চীৎকারে গগন ভেদ করিতেছে। আবার পরক্ষণেই সকল নিস্তব্ধ, ছায়াবাজিপ্রায় তাহার আবর্ত্তিত সকল কার্য্য ভিত্তিশূন্য হইয়া কোথায় মিশাইয়া গেল, পশ্চাতে চিহ্নস্বরূপ কেবল অস্পৃশ্য ক্লেদরাশিমাত্র নিপতিত রহিল। আবার ক্ষণ বিলম্বে উঠিতেছে, আবার ক্ষণ বিলম্বে ডুবিতেছে,—সৃষ্টিসংবোধক ইন্দ্রধনু এইমাত্র উঠিতেছে, আবার উঠিতে না উঠিতেই ভগ্নরতি কালমেঘে কোথায় মিশাইয়া যাইতেছে। ইহারই দৃশ্যমান অভিনয়রূপে দিনত্রয়জীবী সমাজ, বিবিধ সংস্করণ, বিবিধ বক্তৃতা, পরে তুষানল ধূম, শেষে পৃষ্ঠভাসান, নিত্য নয়নসমক্ষে দর্শকের শোকাকর্ষণ পূর্ব্বক যাতায়াত করিতেছে। বড়ই ক্ষোভের বিষয় তাহাতে সন্দেহ কি? তথাপি আনন্দের

বিষয় এই যে ইহাদের জীবন, পূর্ব্বোক্ত দুই শ্রেণীর জীবনের ন্যায় নিস্পন্দ, স্বচ্ছকাচবৎ, অনাস্থাকেন্দ্রশয়নশায়ী নহে। ইহা যদিও প্রলয়বাত্যা-বিতাড়িত নিয়মশূন্য তরঙ্গবিশেষ; দেখিতে যদিও বড় ভয়ঙ্কর, রোমহর্ষণকর; এবং ইহাতে ভুক্তভোগী যাহারা তাঁহাদের অবস্থা যদিও করুণা-উত্তেজক; তথাপি তাহা আশাশূন্য নহে। প্রলয়মাত্রেই সৃষ্টির পূর্ব্ব লক্ষণ।

এতক্ষণ সমাজস্থ বিভিন্ন লোকচরিত্রের বিষয় আলোচনা করা গেল, এক্ষণে আর এক বার সাধারণ সমাজচিত্রের প্রতি তাকাইয়া দেখা যাউক। মাথামুণ্ডু আর দেখিবই বা কি! আর সে আর্য্য লঘুত্ব গুরুত্ব নাই; আর সে আর্য্য নেতৃত্ব নীতত্ব নাই; আর সে আর্য্য গাম্ভীর্য্য নাই; আর সে আর্য্য নীতি, ধর্ম্ম, বীর্য্য, বল, সাহস, তেজ, অধ্যবসায় কিছুই নাই; সকলেই বিগত, সকলেই লুপ্ত, সকলেই পূর্ণরূপে বিগত। আগে লঘু গুরুর নিকট বিনত হইত, এখন গুরু নিজে বিনত হইয়া লঘুর নিকট মান রাখিতে আপনি তফাতে সরিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। আগে কবিরাজ মহাশয় ছয়দণ্ড নাড়ী টিপিয়া, হাল শুনিয়া, নানা চিন্তার পর ব্যবস্থা করিতেন; এখন ডাক্তার বাবু দরজার দুয়ারে পা দিয়াই প্রেসক্রিপ্সন করত ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড় দিয়া থাকেন। ডাক্তার বাবু একটী দৃষ্টান্ত মাত্র; নতুবা সকল হিন্দুস্থানের সকল কার্য্যেই প্রায় এইরূপ তরলতা ও চপলতা ঘটিয়াছে; স্থির-প্রয়োগ কোন বিষয়ে নাই। আগে বল ঊর্দ্ধে, দয়া নিম্নে থাকিত; এখন দয়া চাটুকারিতা বেশে ঊর্দ্ধে এবং বল নিম্নে অবস্থিতি করিতেছে। এখন পুরুষের নাম রমণী, সজনী; স্ত্রীর নাম নগেন্দ্র, বীরেন্দ্র; মেয়েও মেয়ে, পুরুষও মেয়ে! অথবা পুরুষ মেয়ে, মেয়ে পুরুষ হইতে চলিয়াছে; কি বিপরীত ঘটনা! বাঞ্ছারাম, কেবল স্ত্রীগুণেও ফল ফলে না, কেবল পুরুষগুণেও ফল ফলে না; স্ত্রীগুণে পুরুষগুণ সমাবেশ হওয়া আবশ্যক। কিন্তু পুরুষগুণ? তাহার সাহস এবং তেজ এখন আদালতে, অধ্যবসায় আত্মধ্বংসনে। কর্ত্তব্যবুদ্ধির অভাব হইলে সুকর্ম্মে আলস্য, আলস্যে অকর্ম্ম, অকর্ম্মে পাপ, পাপে মৃত্যু; আমাদের সমাজে এখন সেই মৃত্যুর অভিনয় চলিতেছে।

অকর্ম্ম এবং আলস্যে জড়তার বৃদ্ধি হয়, জড়তায় স্ফূর্ত্তি লোপ পায়, স্ফূর্ত্তিলোপে মানসিক বিকার, মানসিক বিকারে শারীরিক বিকার ও বীর্য্যহানি, শারীরিক বিকারে রুগ্নতা, রুগ্নতায় মৃত্যু। অতএব মনে করিও না যে তোমায় নিত্যরোগ, নিত্য মৃত্যু কেবল নৈসর্গিক কারণবশে সংঘটিত হইতেছে। দেখ তোমাদের ন্যায় অবস্থা ও কারণের অভাব যে যে বিজাতীয় জাতিতে তাহারা, তোমার রোগ ও মৃত্যু সর্ব্বজনীন হইলেও এবং সে রোগাদির অধিকার-আয়তনমধ্যে থাকিলেও, তথাপি কেমন সে সকলের অতীত হইয়া স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতেছে! অতএব এমন স্থলে কেবল মাত্র নৈসর্গিক কারণের দোষ কেমন করিয়া দেওয়া যায়। দেখিতে পাইতেছ কি, তোমার বীর্য্য ও জীবনী হানি কতদূর ঘটিয়া আসিয়াছে; দুই তিন পুরুষের মধ্যে তোমার আকার ও চেহারা অর্দ্ধহস্তেরও অধিক কমিয়া গিয়াছে, তুমি তোমার দেহের আয়তন এবং পরিমাণে যাত্রাদলের বালকের ন্যায় দাঁড়াইয়াছ। বস্তুতই, নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে, পরিমাণ দেহের মানুষ দেখা একরূপ আশ্চর্য্য ও নিতান্ত দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে। ভাবিয়া দেখ দেখি ইহাদের এই অপূর্ণ দেহ এবং ক্ষীণ বীর্য্যে আবার যে সকল সন্তান সন্ততি জন্মিবে, তাহারা কতই না গুরুতর দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইতে থাকিবে। যত শীঘ্র এবং যে পরিমাণে দেহের হ্রাস সাধন হইয়া আসিতেছে, সেই হ্রাস যদি সেই পরিমাণে অপ্রতিহতভাবে হইতে থাকে, তবে আর কে বলিবে যে বেগুণ গাছে আকর্ষি দেওয়ার ভবিষদ্বাণী ফলবতী হওয়ার দিন অধিক দূরবর্ত্তী? এদিকে দেখ, সদ্বংশ ক্রমেই লোপ প্রাপ্ত হইতেছে; যাহারা যাইতেছে, তাহাদের স্থান আর পূরণ হইতেছে না। গবর্ণমেণ্টের জনসংখ্যায় যেরূপ ফল দাঁড়াইয়া থাকে দাঁড়াক, কিন্তু আমরা প্রতিপল্লীতে প্রতিনিয়ত যাহা নিরীক্ষণ করিয়া আসিতেছি, তাহাতে আশান্বিত হওয়ার কারণ অতি অল্পই। হায়! হায়! তথাপি, এরূপ বিপ্লবময় দ্রুতগতি ধ্বংসাভিনয় দেখিয়াও আমাদের চৈতন্য হইতেছে না। বালক স্বভাবত চপলস্বভাব, কিন্তু কালমাহাত্ম্যে বালকও এখানে সে চপলতা ত্যাগে, স্ফূর্ত্তির অভাবে যেমন জুজু; বৃদ্ধও তেমনি জুজু। আগে বারোয়ারি পূজা, দুর্গোৎসব, ইত্যাদি

নানা উপলক্ষে, লোকে কতই স্ফূর্তির আধিক্য প্রকাশ করিত; তাহাদিগের যে কিঞ্চিৎ স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি তখনও ছিল, উহা তাহারই চিহ্ন স্বরূপ। সুতরাং তাহাদের শরীরও তেমন হীন ছিল না, আহারও ন্যূন ছিল না, ছিল কেবল তাহারা অজ্ঞানান্ধ ও সঙ্কীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণকারী। হৃত-সুনীতি, ভক্তি-রীতির বশ্যতায়, আসন্নকালে বিপরীত বুদ্ধি উদয়ের ন্যায়, সে সকল আমোদ, সে সকল স্ফূর্ত্তি এখন দূষণীয়। দৈহিক ক্রীড়া বা দৌড়ান পর্য্যন্ত দূরে থাকুক, দ্রুতপদে চলিতেও এখন গাম্ভীর্য্যের হানি ও লজ্জার বিষয় বলিয়া বোধ হয়। স্বাভাবিকী স্ফূর্ত্তি এবং কর্ম্মপরায়ণতা, জীবন সুভাবে অতিবাহন করিতে হইলে উভয়েরই সমান আবশ্যক। জীবনী শক্তির সহ স্বভাবসম্ভূত স্ফূর্ত্তি যাহা তাহা এখন বিগত, স্ফূর্ত্তি এখন যাহা কিছু তাহা কৃত্রিম মাদকতায় ও উন্মাদনে উৎপন্ন। স্বভাবসম্ভূত স্ফূর্ত্তির ন্যূনতা হেতুই, কৃত্রিম স্ফূর্ত্তির এত প্রাবল্য এবং আবশ্যকতা, হীনতায় ও শীর্ণতায় রোগের উৎপত্তি, রোগে রোগ টানিয়া আনে, রোগে রোগের বৃদ্ধি। কথা আছে, নগর দগ্ধ হইলে দেবালয় এড়ায় না, উপযুক্ত নিয়োগ, শ্রম, অধ্যবসায়াদির অভাবে ওদিকে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি, শিল্পাদিরও হ্রাস হইয়া আসিতেছে। নিয়ত অন্নকষ্ট, নানাকষ্ট, রোগের উপর দাড়াইয়া উপসর্গরূপে, রোগ আরও ভীষণতর করিয়া তুলিতেছে। এ সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা যাহা পরি-দর্শন করিয়া আসিলাম, তাহা পূর্ব্বোক্ত মহাপাপেরই প্রায়শ্চিত্ত মাত্র। কিন্তু এখন পরিণাম?

এ ধ্বংসাভিনয়ের পরিণাম বাস্তবিকই বড় ভয়ঙ্কর, বাস্তবিকই বড় রোমহর্ষণকর। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, এ জাতি, এ লোক, একে একে সকলেই সর্ব্বসংহারক মৃত্যু দেবতার অঙ্কগত হইবে। ভারতের ভাবী ভরসা যাহা, ভাবী নব জীবন যাহা, ইহাদিগের অতীতেও ইহাদিগের চিতাভস্ম হইতে যে অভিনব মানবজীবন অঙ্কুরিত হইবে তাহাদের হস্তে অবস্থান করিতেছে। ভারত নিশ্চয়ই আবার পুনর্জীবিত হইবে বটে, ভারতে আবার নব জাতীয় জীবনও অঙ্কুরিত হইবে বটে,—যেরূপ আমেরিকায় হইয়াছে, যেরূপ অন্যান্য স্থানে হইয়াছে,—কিন্তু তাহাতে

আমাদের এ জাতীয় জীবনের ল'ভালাভ? এ জাতীয় জীবনের আস্তিত্ব তাহা হইলে কোথায় রহিবে? সে ভাবী জাতীয় জীবনে এ জাতীয় জীবনের সুখের আশা বা হর্ষোল্লাস, আর হিন্দুশাস্ত্রোক্ত মৃত্যু-শূন্য পুনর্জন্মে আত্মার নিত্যত্ববিষয়িণী আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণ, এ উভয়ই সমান। তবে এখন উপায় কি?—এ ধ্বংসাভিনয়ের বেগ কি তবে এখনও ফিরাইতে পারা যায় না? জাতীয় জীবনের আস্তিত্ব এখনও কি রক্ষা করিতে পারা যায় না?

কিন্তু আগে একটী কথা। এ ধ্বংসাবর্ত্তের ঘোর তরঙ্গ, এতকালের পর কেবল এই দুই তিন পুরুষকাল ধরিয়া এরূপ খরতর বেগে প্রবাহিত হইতে চলিয়াছে কেন? কথা আছে জীবন সংগ্রামে যোগ্য জনেরই জয়, অযোগ্য ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কথা, মিথ্যা নহে। যথায়ই যোগ্য ও অযোগ্যে বিদ্বেষভাব, যথায়ই যোগ্য অপ্রতিহত প্রভুত্ব করিতে ইচ্ছু হইয়াছে, দেখা যায়, তথায়ই ক্রমশ অযোগ্যের ক্ষয় প্রাপ্তি সাধন হইয়াছে। সবল সংঘর্ষে শক্তিসঞ্চালনমূঢ় ক্ষীণবলের ক্ষয় প্রাপ্তি প্রাকৃতিক নিয়ম। আমাদিগের এখানেও সেই সবল সংঘর্ষ— আমাদিগের এখানেও সেই যোগ্যাযোগ্য সংগ্রাম চলিয়াছে। একে মানব অকর্ম্মণ্য ও অলসতা প্রাপ্ত, তাহার উপরেও বা যাহা কিছু কর্ম্মেচ্ছা ছিল সে ইচ্ছারও গতি উক্ত সংগ্রামে অবরুদ্ধ, সুতরাং কেন না ধ্বংসাবর্ত্তের বেগ খরতর হইয়া দাঁড়াইবে। যোগ্যাযোগ্য সংগ্রাম আরম্ভ হইলেও,যতদিন অযোগ্যের বোধশক্তি কম এবং কর্ম্মক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ থাকে, সুতরাং স্বীয় জীবনকার্য্যপ্রবাহের পক্ষে যতদিন বিশেষ প্রতিবন্ধকতা অনুভব করিতে না পারে; ততদিনও বিশেষ অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। কিন্তু যে মুহূর্ত্ত হইতে মানবের জ্ঞান হইতে থাকে যে আমি অযোগ্য, এবং যখন তাহার বিস্ফারিত দর্শনজাত জ্ঞান হইতে সম্ভূত কর্ম্মেচ্ছা সকলও প্রতিপদে অবরুদ্ধ হইতে আরম্ভ হয়, অথচ যখন তাহার প্রতীকারে শক্তি সঞ্চালন করিবার ক্ষমতা উদ্ভূত হয় নাই; তখন কাজেই মানবচিত্ত ম্রিয়মাণ এবং অবসন্ন হইতে থাকে, এবং নিতান্ত অযোগ্য হইলে, হয়ত শক্তি-সঞ্চালন ক্ষমতা উদ্ভিন্ন হইবার পূর্ব্বেই ধ্বংস হইয়া যায়। পুনশ্চ এই

অবসন্ন ভাবে আবার, স্বীয় পূর্ব্ব বিকৃতি যদি কিছু থাকে, তাহার সংযোজন হইলে ত আর কথাই নাই;—আমাদিগের বর্ত্তমান অবস্থা এই অবস্থা। যাহারা অভিজ্ঞ হইয়াছে, তাহাদিগের হইতে এ ধ্বংসাবর্ত্তের উৎপত্তি; অজ্ঞ যাহারা সংস্রবে তাহারা ফলভাগী হইতেছে, যেমন জলন্ত প্রদীপের সংস্রবে অন্য প্রদীপ প্রজ্বলিত হইয়া থাকে। আমরা যে অযোগ্য এবং আমাদের যে কর্ম্মেচ্ছা প্রতিপদে অবরুদ্ধ, তাহা আমরা গত দুই তিন পুরুষ হইতেই বিশেষরূপে অনুভব করিতে পারিতেছি; এবং এই কারণেই গত দুই তিন পুরুষ হইতে আমরা এরূপ অবসন্ন, এবং এরূপ নানা কষ্টে ও বিশৃঙ্খলতায় ও নানা দুরবস্থায় ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছি;—কে জানে আমাদের ভবিষ্যৎ ভাগ্যে আরও কি দারুণতর পরিণাম লিখিত রহিয়াছে। তাই আবার জিজ্ঞাসা করি, এ ধ্বংসাভিনয়ের বেগ কি তবে এখনও ফিরাইতে পারা যায় না?

ফিরাইতে না পারা যাইবে কেন? যখন দেখা যাইতেছে যে এ ধ্বংসাবর্ত্ত কেবল নৈসর্গিক নিয়মের ফল নহে, মানবের আত্মদোষও ইহাতে বিস্তর; এবং যখন দেখা যাইতেছে যে যোগ্যাযোগ্য সংগ্রামে বিপৎপ্রতিকার হেতু কর্ম্মপথে শক্তি সঞ্চালন করিতে উদ্যমশীল হইলেই আবার নবজীবনীর সঞ্চার হয়, তখন অবশ্যই ইহা নিশ্চয় যে আত্ম-দোষ পরিহার এবং কথিত শক্তি সঞ্চালনে উদ্যোগী হইলে, সে বেগ ফিরাইতে সমর্থ হইতে পারা যায়। কিন্তু কে তাহার তত্ত্ব উদ্ঘাটন করে, কে তাহার পথ দেখায়? কেইবা এ প্রলয়বিক্ষিপ্ত দ্বন্দ্বঘূর্ণিত পদার্থ-নিকরের মধ্যে নিয়মের সঞ্চার করিতে সক্ষম হয় এবং কেইবা তাহার নেতা হইবে? সমাজ যখন যথার্থ পথ হইতে গতিচ্যুত হয়, তখন সমাজের মধ্যে যে কোন সাত্ত্বিক ব্যক্তি থাকেন, এবং থাকেনও অনেক তাহাতে সন্দেহ নাই, তাঁহাদের কর্ত্তব্য যে সমাজের জীবনী শক্তির তাৎকালিকী পরিমাণ বুঝিয়া; তাহার জ্ঞানপথে দর্শন কতদূর, আত্মিক শক্তির অবস্থা কিরূপ, এবং অন্তর্দৃষ্টি কতদূর প্রসারিত, তাহা নিরূপণ পূর্ব্বক; সেই অবস্থায় যেরূপ পরিচালনা শুভপ্রদ হয়, সেইরূপে পরিচালন করেন। কিন্তু এ পোড়া দেশের ভাগ্যে কাঠের দেবতাও হা করেন;—

এ পোড়াদেশে কখনও সে শুভ দিন সংঘটন হইবে কি? এখানে স্বার্থের প্রতিবন্ধকতা পড়িলে, কে সাত্ত্বিক কে অসাত্ত্বিক, কে হিতৈষী কে অহিতৈষী, কিছুই অনুভব করিবার সাধ্য নাই। যাহাদের উপর অধিক আশা অধিক ভরসা, সমাজের শ্রেষ্ঠাংশ বলিয়া যাহাদের আশ্রয় গ্রহণে সফলমনোরথ হইব বলিয়া আশা করা উচিত, দেখা যায় তাহারাই সতত ও সবার আগে, চখে চখে চারি চক্ষু চাহিয়া, নৃশংস ও নিষ্ঠুর ভাবে, মাতৃভূমির গলায় ছুরিকা প্রদানে অগ্রসর! তবে কিনা আশাতেই মানুষ বাঁচে, আশাই জীবনের পরিমাণ, তাই এখনও একেবারে নিরাশ হইতে পারি না। যদিই সেরূপ পরিচালক সাত্ত্বিকপ্রাণ মহাপুরুষ আপাতত কেহ বর্ত্তমান না থাকে, তাহা হইলে অবতারিত হইবারও ত সম্ভাবনা আছে; বিশেষত যখন "কালোহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী।"

৩। সাধনা।

সাধনা মাত্রে অসাধুর নিকট যেমন জটিল এবং দুঃসাধ্য, আবার সাধুর নিকট তাহা তেমনিই সরল এবং সুসাধ্য। যে যাহার অধিকার সীমা কখন স্পর্শ করে নাই এবং করিতেও অনিচ্ছুক, সে তাহার সাধনে অপরিমিত শ্রম, ক্লেশ এবং দুঃসাধ্য ভাব নিত্যই অবলোকন করিয়া থাকে। সুমনেও সাধনা দুঃসাধ্যের ন্যায় প্রতীয়মান না হইয়া থাকে এমন নহে, কিন্তু সে যতক্ষণ সাধনাকে দূর হইতে দৃষ্টি করা যায়; নিকট হইলে বা নিকট হইতে থাকিলে, আর তাহার সে দুঃসাধ্য ভাব তিষ্ঠিতে পারে না, ক্রমে ক্রমে দুঃসাধ্য ভাবকে দূর আকাশে বিলীন হইতে হয়। সাধনাদিচয়ের দুঃসাধ্য ভাব সাধারণত ততক্ষণ, যতক্ষণ তাহার আয়ত্তীকরণে হস্ত প্রসারিত করা না যায়। বিশাল অরণ্য দূর হইতে দারুণ দুর্গমের ন্যায় অবলোকিত হইতে থাকে, বোধ হইতে থাকে যেন পশু পক্ষী পর্য্যন্ত কাহারও তাহাতে প্রবেশ করিবার সাধ্য নাই; কিন্তু একবার নিকটে যাইতে পারিলে আর সেরূপ দেখায় না, তখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহাতে সকলেরই প্রবেশপথ শত শত

পুরোভাগে উদ্ঘাটিত হইয়া রহিয়াছে। মানব মিছা আতঙ্কে অনেক কার্য্যের ধ্বংস করিয়া থাকে। যাহারা আতঙ্কে কার্য্য নষ্ট করে, প্রকৃতি তাহাদের সাধু হইলেও, ফলে তাহারা অসাধুর সঙ্গে সমান। যথায় ফল লইয়া কথা তথায় সেই ফলের ব্যতিক্রম ঘটিলে, দুষ্ট অসাধু এবং সাহসশূন্য ভগ্নপদ সাধু, এ উভয়ে প্রভেদ রহিল কি? সক্ষম অসাধু আর অক্ষম অসাধু, প্রভেদ অতি অল্পই। যথার্থ সাধু আতঙ্কে ভগ্নপদ হয় না; ঘটনাচক্রে তাহাদের সাধনা সিদ্ধ না হইলেও চেষ্টার ত্রুটি থাকে না, অন্তত সংসারের ভাবী সিদ্ধির পথ তাহারা অনেক দূর অগ্রসর করিয়া দিয়া থাকে। এরূপ সাধু যাহারা, তাহাদেরই সিদ্ধিমন্ত্র সেই নিত্যশ্রুত অথচ নিত্য-বিস্মৃত মহামন্ত্র,—'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর-পতন।' এ মহামন্ত্র সাধনার মূল সাধকের সুমনস ভাব; সুমনস ভাবের মূল সত্যে রতি; সত্যে রতির মূল স্রষ্টাসকাশে আত্মকর্ত্তব্য-বোধ। এই সাধনা সম্বন্ধে, যে যে কথা ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি কথিত, জাতীয় জীবনের প্রতিও অবিকল তাহা বর্ত্তে।

মাতঃ ভারতলক্ষ্মি, সব শুনিলাম, সকলই বুঝিলাম; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তুমি ঐ কঙ্কাল-মূর্ত্তি, আমি এই রুগ্ন সন্তান; তুমি ঐ রুক্ষকেশা ভিখারিণী, আমি এই অন্তঃসার হাড়ের মালা; আমি ভগ্নপদ, ভগ্নহৃৎ, লোলচর্ম্ম, সমলদেহ, উদরান্ন যাহার আকাশে, আহা করিতে যাহার কেহ নাই, পদদলিত করিতে যাহার সবাই আছে—আমি কি করিয়া, কোন উৎসাহে, কোন্ সাহসে, দেবি! কোন্ সাহসে সাহসী হইয়া, সাধনামন্ত্রে দীক্ষিত হই? তোমার যে দিকে যাই, সেই দিকেই নিবিড় মরুকান্তার, যে দিকে তাকাই, সেই দিকেই জীবনশূন্য বিকট-মূর্ত্তি কঙ্কালদৃশ্য; আকাশে কাল মেঘ; নিম্নে স্বচ্ছন্দ অন্ধকারপুঞ্জ দৃশ্যের দূর প্রান্ত অতিক্রম করিয়া ধাবিত; ওদিকে কাল সমুদ্রের তরঙ্গ আস্ফালন গভীর গর্জ্জনে গ্রাস করিতে অদৃশ্যে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে; আমি একাকী, সহায়শূন্য, সম্বলশূন্য; আমি এখন আপনা রাখি, না সাধনা-রত হই? পরিতাপবিলাপে দিক পরিপূরিত, হাহাকার প্রতিধ্বনিতে প্রতিনাদিত। কিন্তু শুন, ঐ শুন ঐ অস্ফুট শব্দ কল্লোলের মধ্য হইতে

ধীর নিনাদে কি ঐ স্ফুট শব্দ আসিতেছে:—নিশীথ শ্মশান, শনিবার, অমাবশ্যা, আকাশে মেঘ বিদ্যুৎ, টিপ্ টিপ্ জলের ধারায় বায়ুতুফানের সন্ সন্ শব্দ; শবের দন্ত কড়মড়ি, কুকুরের খেউ খেউ, শেয়ালের ফেউ ফেউ, কঙ্কাল্ ঠক্ ঠক্ করিয়া প্রেতগণ বিকট নৃত্য করিতেছে; ডাকিনীর হুঙ্কার, যোগিনীর ঝঙ্কার, অট্টহাসিনী সমুণ্ডখর্পর চামুণ্ডামূর্ত্তি গ্রাসব্যাগ্র লোল রসনায় বিচরণ করিয়া ফিরিতেছে; এই স্থল, এই অকাল কাল, মহাসাধন শবসাধনের আর কোন সময়? ভয় পাইও না, শব যদি—শবাকারেই শবের উপরে বসিও। "মাভৈঃ মাভৈঃ, কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা"। ঐ শুন, ঐ শুন ঐ গগন কম্পিত করিয়া আবার কি দেববাক্য আসিতেছে,—"মাভৈঃ মাভৈঃ, কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা", এবমস্তু। যদি হঠাৎ বিনষ্ট বিপদে আনন্দবান হইতে চাও, তবে আবার বলি, বারেক এই ঘোর ঘূর্ণনে শবাসনে বইস। ভয় কি, তুমি জানিতেছ না তুমি সুরক্ষিত? তোমার এক দিকে,"মাভৈঃ মাভৈঃ—শিরো মে চণ্ডিকা পাতু কণ্ঠং পাতু মহেশ্বরী, হৃদয়ং পাতু চামুণ্ডা সর্ব্বতঃ শূলধারিণী;" অন্য দিকে "কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা।" এ পথে তুমি একা নহ! লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জীবনবান তোমার আগে, এই ভাবে, এ অবস্থায়, এ পথ বাহন করিয়া গিয়াছে;—এ পথে তুমি একা নহ! আরও কি 'আহা,' আরও কি 'উৎসাহ' খুঁজিতেছ? তোমার 'আহা' স্থলে 'সর্ব্বতঃ শূলধারিণী'; 'উৎসাহ'স্থলে বিগত মহাজনগণ। তুমি সৌভাগ্যবান যে, এ মহাসাধনাস্থলেও তুমি উপযুক্ত স্থানে আমন্ত্রিত হইয়াছ। 'কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা', এ মহামন্ত্র-সাধকের নিকট স্বয়ং দেবতারাও বিনতশির হইয়া থাকেন: অন্য আপদের কথা কি কহিতেছ? লঙ্কাপতি রাবণ কুপথচারী হইলেও, এ মহামন্ত্রসাধনবলে স্বয়ং ইন্দ্রকে মালাকর, সূর্য্যকে ছত্রধর করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

দিগ্বিস্তৃত নিবিড় অন্ধকারে, অদৃশ্যভাবে যে অনর্থসমুদ্র তোমাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে, সাধনা ব্যতীত তথায় তোমার আত্মরক্ষার আর কি উপায় থাকিতে শুনিয়াছ? যে বিপন্ন

অবস্থাকে স্বতন্ত্র জ্ঞানে আত্মরক্ষার জন্য ভীত হইতেছ, তুমি কি জান না যে তুমি নিজেই সেই বিপন্ন অবস্থা স্বয়ং! যে আপনাকে বিপন্ন অবস্থার উপর গলগ্রহরূপে অবলোকন করিয়, তাহাকে হেলন পূর্ব্বক তফাত হইতেছ, তুমি কি জান না যে তাহাই তোমার সে অবস্থা হইতে উদ্ধারের একমাত্র উপায়? কিন্তু কি পরিতাপ! তুমি একমাত্র সেই সর্ব্বরক্ষক অর্থকে গলগ্রহরূপে উপেক্ষা করিয়া, অজ্ঞাতে ঘোর অনর্থসমুদ্রের দিকে তোমার কল্পিত অর্থের আশাভ্রমে ধাবমান হইতেছ; বুঝিতে পারিতেছ না যে যাহাকে পরিহার তোমার উদ্দেশ্য ও আবশ্যক, তুমি তাহারই করাল বদন অভিমুখে আপনা হইতে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছ। পথ সহজগম্য, ইহাই তোমার এ পথের প্রলোভন; অধঃপাতের পথ চিরকালই সহজগম্য রূপে দৃষ্ট হয়। যে যে নর আপনার স্বনিহিত শক্তির প্রতি উপেক্ষা করিয়া, পরশক্তি সমক্ষে উদ্ধার, সৌভাগ্য বা শুভলালসা করিয়া থাকে; তাহাদিগকে বস্তুত এই অনর্থসমুদ্রে ঝাঁপ দিবার জন্য লালসাবান বলিয়া বলা যায়। ইহাদিগের নিকট আত্মশক্তিচালনা নিত্যই দুঃখসঙ্কুলরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। আলস্য, অনাস্থা, এবং পরশক্তিতে তোমার মুক্তি! আলস্য এবং অনাস্থা কবে কোথায় ভাগ্যের দেখা পাইয়াছে? পরশক্তি: বোধশূন্য নর! তুমি পরশক্তি মোহে নিতান্ত মোহপ্রাপ্ত হইতেছ; কিন্তু বারেক ভাবিয়া দেখিয়াছ কি, তুমি নিজে করে কতটা আত্মশুভ সংসাধনান্তে, পরশুভ সংসাধনে সমর্থ হইতে পারিয়াছ? আমি দেখিতেছি, পরশুভ দূরে যাউক, তোমার আত্মশুভই সম্পূর্ণ ক্ষুণ্ণ হইয়া রহিয়াছে; এবং তাহার পূরণ জন্য, হরি হরি! তাহার সম্পূর্ণ পূরণ জন্যই তুমি অন্যের নিকট পর্য্যন্ত লালায়িত হইয়া ফিরিতেছ। নির্ব্বোধ, তুমি নিশ্চয় জ্ঞান হারাইয়াছ, নতুবা ইহাও কি তোমার নিকট একেবারে অপরিজ্ঞাত যে, তুমি যাহার নিকট লালায়িত হইতেছ, সেও তোমার মত মানব? তোমার অভাব পূরণ করিবে বলিয়া সে পৃথক সৃষ্ট হয় নাই। তবে যে তুমি তাহাতে কিছু চটুলতা দেখিয়া থাক, সেও তোমার খরচে।

তোমার সঙ্গে তাহার প্রভেদ এই, তুমি মূর্খ সে চতুর; তুমি স্বনিহিত শক্তিতে অজ্ঞ, সে স্বনিহিত শক্তিতে প্রবুদ্ধ; তুমি আপন অর্থ সাধিতে পার না, সে তাহা পারে। তোমার কাণ ধরিয়াও সে যখন তাহার অর্থে সঙ্কুলান বোধ করিতেছে না, তখন তুমি তাহার পা ধরিয়া আপন অর্থ সঙ্কুলান করাইয়া লইবে! এ বুদ্ধি অপেক্ষা মানবমণ্ডলীতে মূর্খতার অতিসীমা আর কি হইতে পারে? সাধারণত পরের নিকট পরের আশা আর সংস্কৃত কবির জীর্ণ তরুর নিকটে পথিকের আশ্রয় প্রত্যাশা, উভয়ই সমান।—"পথিকহৃদয়ঘর্ম্মস্যাপি বাঞ্ছাং করোতি।"

মূর্খ বাঞ্ছারাম, এমন স্থলে তোমার জমার আশা কোথা? তুমি খরচের খরচ পরিণত! তবে যে পরের সহবাসে ভালর দিকে কিছু কিছু নিজের অবস্থার রূপান্তর দেখিতে পাইয়া থাক, তাহা ভাক্ত; তাহা সে পরের নিঃস্বার্থ উপচিকীর্ষা গুণ হইতে তত নহে যত সহবাস গুণ হইতে, এবং কিয়দংশে পরের স্বার্থসিদ্ধির খাতিরেও বটে। এমন অনেক স্বার্থ আছে যে তাহা যাহার খরচে সংসাধিত হইবে, তাহাকে কিছু অবস্থান্তরযুক্ত না করিয়া লইলে চলে না; কিন্তু যে মূর্খবর্গ তাহাতে প্রতারিত হইয়া, ভ্রান্তি মরীচিকায় তাহাতে কেবল নিঃস্বার্থ উপচিকীর্ষা বুদ্ধি অবলোকন পূর্ব্বক স্বার্থসাধকের হস্তে অবশিষ্ট আত্মসমর্পণ করে ও স্বীয় দুঃখমোচন ও উন্নতির নিমিত্ত ক্ষণে অক্ষণে প্রিয়বচন দ্বারা তাহার মুখাপেক্ষী হয়, তাহাদের তুল্য সারশূন্য হতভাগা অধঃপাতিত জীব আর দ্বিতীয় কেহ হইতে পারে না। ইহারও উদাহরণের জন্য অধিক দূরে যাইতে হইবে না; বিধাতার লিপিবশে সমগ্র ভারতবাসী, সমগ্র ভারত স্বয়ং, আজি ইহার জীবন্ত উদাহরণরূপে দর্শিতব্য। আবার যে দিন দেখিবে, ভারতসন্তানগণ পরের তুড়িতে উন্মাদিত, পরের বাঁকামুখে সংশয়িত, পরের তোষার্থে প্রিয়রচিতে বা পরের দোলায় তুলিত হইতে ক্ষান্ত হইয়াছে; সে দিন হইতে আবার ভারতের ভাগ্য ফিরিয়াছে বলিয়া নিঃসন্দেহ আশ্বাসিত হওয়ায় ক্ষতি নাই। এরূপ পরপ্রতি অনাস্থাভাব কেবল দুই অবস্থায় সম্ভব হইয়া থাকে, এক অজ্ঞ অবস্থায়; অপর যখন শয়তান ও শয়তানীর

বিরুদ্ধে, অভ্যন্তরে নিরুদ্ধ কালাগ্নিশিখা প্রলয়বাত্যামথিতের ন্যায় ঘোর ঘূর্ণাবর্ত্তে হৃদয় বিলোড়ন করিয়া ফিরিতে থাকে।

প্রকৃত উন্নতি, প্রকৃত উদ্ধারপন্থা যাহা, তাহা সর্ব্বদাই ভিতর হইতে আইসে, বাহির হইতে আইসে না। যে কোন পৌরুষ আত্মশক্তি হইতে সম্পাদিত হইয়া থাকে, পরশক্তি দ্বারা হয় না। মোহভ্রান্ত ভারত-সন্তান, যদি নিজের উন্নতি, নিজের অভ্যুত্থান চাও, তবে নিজ অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত কর; পরমুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কি হইবে? বিধাতা তোমাকে পরপল্লব হইতে পরভাগ্যোপজীবী করিয়া সৃষ্টি করেন নাই, বিধাতা তোমাকে স্বয়ংক্ষম স্বাধীন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। নিজের অভ্যন্তরে যে সুপ্ত সিংহ শায়িত রহিয়াছে, কপালগুণে যাহার অস্তিত্বে পর্য্যন্ত তুমি অনভিজ্ঞ, তাহাকে বারেক জাগরিত কর, তোমার মঙ্গল হইবে। সে সুপ্ত সিংহ একবার জাগরিত হইলে, কি যে করিতে পারে বা না পারে, তাহার উচ্চতম উদাহরণ দেখিতে চাও যদি, তবে বারেক জ্ঞানিপ্রবর কার্লাইলের চক্ষে ফরাসিবিপ্লবের শক্তিলীলায় চিত্ত সমাহিত কর। নিঃস্বার্থ পরহিতকর পরও এক বা বহুল না আছে এমন নহে, কিন্তু তাহাতে প্রথম মুস্কিল,—কে কেমন নিঃস্বার্থ পরহিতব্যবসায়ী তাহা চিনিয়া উঠা দায়; দ্বিতীয়তঃ পাইলাম যেন তেমন ব্যক্তি, কিন্তু ফল? কতই প্রত্যাশা করিতে পার,—ফল অধিকাংশই ইচ্ছা বা বচনে পরিসমাপ্ত। সমুদ্রসিঞ্চনের যে জন্য প্রয়োজন, তথায় কেহ উপযাচক হইয়া একটা ঝিনুক দিলে, তাহাতে কি তোমার সমুদ্রসিঞ্চনের প্রয়োজন পূর্ণ হইতে পারে? তবে কিনা তেমন লোক দেখিতে ভাল, শুনিতেও ভাল।

পরশক্তি সর্ব্বদাই প্রত্যাশা এবং সন্দেহের আধার; আত্মশক্তি তেমনি সর্ব্বদাই ভয়ভয়ের নিরসক। সকল সম্পদ, সকল সৌভাগ্য, সকল উন্নতি, সকল অভ্যুত্থান, একমাত্র আত্মশক্তি চালনার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। এই আত্মশক্তি চালনার জন্যই তুমি এ পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছ। অপরে যদি কেহ তোমার খরচে আত্মস্বার্থ সাধন করে, দোষ আমি স্বার্থসাধককে দিই না; দোষ দিই তোমাকে যে তুমি কেন তোমার নিজ স্বার্থে অনভিজ্ঞ, তুমিও কেন জমা না হইয়া খরচ হইতে যাও। সে তাহার

আপন কার্য্য সাধিতেছে; তুমি তাহা পারিতেছ না; তাহার দোষ কিসে? স্বার্থপথে তোমার উপর সহস্র কঠোরতা সে অবলম্বন করিলেও, তাহাকে আমি দোষ দিই না। তুমিও বিশ্বকার্য্য সম্পাদনার্থ প্রেরিত, তুমিও মানব হইয়া প্রেরিত, জুজু হইয়া প্রেরিত হও নাই; তোমাতেও স্বার্থের কিছু অভাব নাই। পাছে তুমি বিশ্বকার্য্য হইতে বিমনস্ হও, এজন্য ঈশ্বর বিশ্বকার্য্য সহ তোমার স্বার্থও সংমিলিত করিয়া দিয়াছেন, যদ্দারা তোমার ন্যায়ানুগত সৌভাগ্য এবং সম্পদ, বস্তুপক্ষে বিশ্বকার্য্য সহ একতায় আসিয়া দাঁড়াইয়া, তাহার অংশকলাস্বরূপে অবলোকিত হইয়া থাকে। এই সৌভাগ্য এবং সম্পদ জ্ঞানযোগ ও ধারণা অনুসারে, কেহবা মতিচ্ছন্ন হেতু অপহৃত অর্থে আরোপ করিয়া থাকে; আবার কেহবা ঈশ্বরের-প্রীতিলাভরূপ স্বার্থ জগতহিতে জীবন বলিদান দিয়াও, তৃপ্তির সীমায় উপনীত হইতে পারে না। যে জগতে ক্লাইব, ওয়ারেণ হেষ্টিংসের জন্ম; পল, শঙ্করাচার্য্যও সেই জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। লোকে বলে, এ মহাপুরুষেরাও স্বার্থশূন্য ছিলেন না; সে কথা সত্য বটে আবার সত্যও নহে। তাহারাও স্বার্থশূন্য ছিলেন না সত্য, কিন্তু তাঁহাদের সে স্বার্থ দিব্য স্বার্থ; পার্থিব স্বার্থ লইয়া যথায় কথা, তথায় অবশ্যই বলিতে হইবে যে এ মহাপুরুষদিগের যে স্বার্থ তাহা 'নিঃস্বার্থ' পদবাচ্য হয়। মানবীয় কার্য্য যতদুর দিব্য স্বার্থের দিকে লীন, তাহা জগতে সেই পরিমাণে মহত্ত্বের আকর ও কল্যাণপ্রদ হইয়া থাকে। সে যাহাহউক, কি স্বার্থশূন্যে কি স্বার্থযুক্তে; সম্পদ ও সৌভাগ্য তাহা কি দিব্য কি পার্থিব কি শয়তানী, যেরূপই হউক; ইহা কিন্তু নিশ্চয় যে তাহার যে কোনটীই যথাপরিমাণে উপার্জ্জন করিতে হইলে, যথাসম্ভব আত্মশক্তির চালনা আবশ্যক হয়। কিন্তু আমি দেখিতেছি, ভারতসন্তান অকর্ম্মশীলতায় এমনই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন যে, কোন দিকেই ইঁহার জীবনী শক্তির কিছু মাত্র স্ফূর্ত্তি বা পরিচয় পাওয়া যায় না; সকল দিকেই নির্জ্জীব, নিস্পন্দ, জড়, পরমুখাপেক্ষী অসার রাশিরূপে লক্ষিত হইয়া থাকেন। যে স্বার্থের জন্য জগত ক্ষিপ্ত, যে স্বার্থ সমস্ত চরাচরকে উন্মাদিত করিয়া ফিরিতেছে; ভারতসন্তান সে স্বার্থের মোহ উপলক্ষ করিয়াও কার্য্যপ্রবৃত্ত হয়েন না,—কর্ত্তব্যবুদ্ধির

কথা ত অনেক দূরে! স্বার্থ এখন ইহাদের কুকুরবৃত্তিতে। ইহাদের কপাল গুণে, স্বার্থও ইহাদের প্রতি কৃপা বিতরণে দারুণ স্বার্থপর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতসন্তান এখন কেবল বিশ্বঘাতী নহেন, আত্মঘাতীও!

বাঞ্ছারাম, তুমি ভাবিতেছ, প্রকৃতি যখন উত্তরোত্তর উন্নতগামিনী, তখন আমাদের আর বৃথা শ্রম করিয়া ক্লেশ পাইবার প্রয়োজন কি? পরিণামে উন্নতি ত আছেই আছে। সত্য কথা, প্রকৃতি উত্তরগামিনী এবং পদার্থ তাবৎও যাহা দেখিতেছি সকলেই উত্তর গমন করিবে; কিন্তু উত্তরগমনও যে অনেক প্রকারে হইয়া থাকে, তাহা জান কি? পদার্থ কখন স্বয়ং পুনর্নির্ম্মিত অথবা পুনঃসংস্কার প্রাপ্ত হইয়া, নবজীবন প্রাপ্তে, স্বয়ং উত্তর গমন করিয়া থাকে; কখন বা অপরের নির্ম্মাণে উপকরণ স্বরূপে বিলীন হইয়া, উত্তর গমন করে। ফল, একে আত্মদীপ্তি; অপরে আত্মলোপ। প্রথম গমন আত্মবানের কার্য্য, দ্বিতীয় গমন অনাত্মবানের কার্য্য। তুমি অনাত্মবান ঢিল পাটিকেল নহ। তুমি আত্মবান হইয়া প্রকৃতির উপর দ্বিতীয় প্রকৃতি স্বরূপে যে ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছ, তাহার সফলতা সাধন পক্ষে কি করিবে? প্রকৃতি হইতে তোমার সেই আত্মস্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য কি করিতেছ? তবে তোমার আত্মলোপই কি পরম পুরুষার্থ? আত্মলোপ যদি পরম পুরুষার্থ হয়, তাহাহইলে তুমি যে প্রকৃতির উপর আত্মনির্ভর করিয়া রহিতেছ, তাহা ঠিক কাজই করিতেছ। কিন্তু তাহা নহে। তুমি কার্য্যরত হও বা না হও, ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য যাহা এবং যাহা সম্পাদন করিতে তুমি প্রেরিত, নিশ্চয় জানিও, তাহা তোমার জন্য আটক হইয়া পড়িয়া থাকিবে না: কিন্তু তোমার পুরস্কার—তোমার পরিণাম—তোমার শক্তিব্যত্যয়ের ফল? অদৃষ্টবাদের উপরে ইহাকে ওঁচাটে অদৃষ্টবাদ, এবং এরূপ আত্মহীনতার যে শুভাশুভ তাহাকে অক্ষম শুভাশুভ বলা যায়।

মানব যদি আত্মবান হয় ও তাহার আত্মস্থান যখন শূন্যের অনুপাতে না নামে, তখন তাহার যাহা কিছু সক্ষম শুভাশুভ (বলা বাহুল্য যে সক্ষম শুভাশুভই এ জগতে একমাত্র কার্য্যকর এবং উপার্জ্জনীয়) তাহা একমাত্র আত্মশক্তিচালনার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। এই

আত্মশক্তিচালনা হইতে সক্ষমতা ভাবের উৎপত্তি হয়। সক্ষমতা ভাবের অস্তিত্ব যথায়, তথায়ই কেবল মানবজীবনকে মানবজীবন বলা যায়; তদন্যত্তরে ঢিল পাটিকেল। অতএব মানবজীবন সার্থক ভাবে অতিবাহন করিতে হইলে, আমাদের প্রথম প্রয়োজন আত্মশক্তিচালনা।

আত্মশক্তিচালনা সুপথ বা বিপথ গমন, সক্ষম শুভ বা অশুভের উৎপাদন; এ উভয় কার্য্যেই পটু। কখন কখন বা তাহা সমুদ্র ছেঁচিবার জন্য নিযুক্ত হইয়া, গোষ্পদ ছেঁচিয়া পর্য্যাপ্ত জ্ঞান করিয়া থাকে; অথবা এই দৃশ্যই এ জগতে প্রবল। আত্মশক্তিচালনা স্বয়ং অন্ধ। এ হেতু, ইহাকে সুপথে ও যথাযোগ্য ভাবে চালিত করিতে কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রয়োজন হয়। বলিতে গেলে, কর্ত্তব্যবুদ্ধি উহার উত্তেজক এবং পরিচালক উভয়ই। কর্ত্তব্যবুদ্ধির অভাব হইলে, আত্মশক্তিচালনা বিপথ গমন করিয়া থাকে; অথবা ক্ষিপ্তবৎ সুপথ ও বিপথে বিঘূর্ণিত হয়। কর্ত্তব্যবুদ্ধির উচ্চেতরাদি ভাব হইতে, উন্নত বা সামান্য ব্যাপারে, সৎ বা অসৎ পথে, উহার নিয়োজন-বিষয় নিরাকৃত হয়। ঈশ্বরের নিকট যে আপনার কর্ম্মকারকত্ব বোধ, এবং তাঁহার প্রীত্যর্থে আমি কর্ম্ম করিতে বাধ্য এইরূপ যে জ্ঞান, তাহাকে কর্ত্তব্যবুদ্ধি বলে। কর্ত্তব্যবুদ্ধি ধর্ম্মের বিষয়ীভূত পদার্থ। ধর্ম্মই আমাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধির উৎপাদক, পরিপোষক এবং অবলম্বন, সকলই। ভারত-সন্তান, ধর্ম্মেই ভারতের জীবন; এ জগতের আদি হইতে ভারত পুণ্যভূমি, কেবল ধর্ম্মের প্রাবল্য হেতু। ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া ভারত উঠিয়াছে, জগৎ উজ্জ্বলিত করিয়াছে; আবার ধর্ম্মেরই খাতিরে এ জগতে তাহার যাহা কিছু অধঃপতন, তাহাও সংঘটিত হইয়াছে। ধর্ম্ম ভারতের প্রাণবায়ু এবং নীতি তাহার চৈতন্য। সেই ধর্ম্ম ও সেই নীতিতে যদি প্রবুদ্ধ না হও, এবং তাহা হইতে ভারতকে যদি চ্যুত কর, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিবে অভ্যুত্থান দূরে যাউক, ভারত এক দণ্ডও প্রাণে বাঁচিবে না। দেখ জগতের যাবতীয় প্রাচীন জাতি একে একে কোন্ কালে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ভারত এখনও, নানা উৎপীড়ন ও নানা বিপৎপাত সত্ত্বেও, আজি পর্য্যন্ত সমান প্রাণে বাঁচিয়া রহিয়াছে; তাহার কারণ, ভারতের জীবন যাহা তাহা একমাত্র নিত্য পদার্থ ধর্ম্মমূলের উপরে স্থাপিত।

ভারতের যখন সকল গিয়াছে, ভারতের যখন পেটে ভাত নাই পরণে কাপড় নাই, তখনও ভারত একমাত্র ধর্ম্মের তর্ক ও তাহার রূপ রূপান্তর আদি উপলক্ষ করিয়া, মনের সুখে দিবস অতিবাহিত করিয়াছে। সেই ভারতকে আবার সজীব, আবার অভ্যুত্থান করাইতে হইলে, কেবল এক মাত্র নিত্য ও সত্য ধর্ম্ম অবলম্বনীয়; ধর্ম্মকে অবলম্বন ব্যতীত কখন তাহা সংসাধিত হইবে না; মৃতদেহ লইয়া কবে কোন্ কার্য্য হইয়া থাকে?

কিন্তু এক কথা, ধর্ম্ম বলিলেই ভাবিও না যে, কেবল ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা, মাথাকুটা ইত্যাদি স্তব স্তুতি; মিথ্যা কহিব না, চুরি করিব না, জিতেন্দ্রিয় হইব ইত্যাদি আত্মসংস্কার; এই সকল করিলে ধর্ম্মকার্য্য সমাধা হইল, এবং ধর্ম্মের ফল যাহা তাহা মোক্ষলাভ। আমি তোমাকে সত্য সত্য বলিতেছি, আত্মসংস্কারে কিছু বাহাদুরী নাই; বিধবার একাদশীবৎ করিলে ফল নাই, না করিলে পাপ আছে; প্রত্যুত তুমি যে আত্মসংস্কারের কারণে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ, ইহাই বরং আশ্চর্য্যের বিষয়। আত্মসংস্কারে তুমি যাহা হইবে, এবং হইয়া ভাবিতেছ যাহাতে চূড়ান্ত ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিলাম ও যাহাতে আমার মোক্ষ হইবে, তাহাইত তোমার স্বাভাবিকী মূর্ত্তি। তবে যে এতদিন তুমি সে মূর্ত্তিতে ছিলে না, তাহা কেবল স্বভাব হইতে এতদিন বিচ্যুত হইয়াছিলে এই মাত্র। এখন যে তুমি প্রবুদ্ধ হইয়া আত্মসংস্কারের দ্বারা সেই আত্ম-স্বাভাবিকী মূর্ত্তিতে আবার ফিরিয়া আসিতেছ, তাহাতে ত তুমি কেবল আপনারই কার্য্য করিতেছ মাত্র। কিন্তু যিনি তোমাকে এই পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন, যিনি তোমাকে এই প্রভূত কর্ম্মশক্তি প্রদান করিয়াছেন, যিনি তোমাকে তোমার সেই শক্তি সহ পোষণ করিতেছেন, তাঁহার জন্য, তাঁহার প্রীত্যর্থে কি করিয়াছ? তোমার মোক্ষপ্রাপ্তি, তোমার পারলৌকিক শুভ ইত্যাদির জন্য সর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া, যে উপায় সকলের অনুসরণ করিতেছ, তুমি জানিতেছ না যে তাহাই তোমাকে তোমার মোক্ষ বা পারলৌকিক শুভ হইতে অনেক দূরে লইয়া ফেলিতেছে! ধর্ম্ম কাহাকে বলে তাহা পূর্ব্বে অনেক বার বলিয়াছি।

'মোক্ষ' 'পরলোক,' এ সকল লইয়া এত ব্যস্ত কি জন্য? কেন মিছা ভাবিয়া ভাবিয়া আত্মনষ্ট, সকল নষ্ট করিতেছ? তুমি যখন এই পৃথিবীতে আগমন করিয়াছিলে, তখন ডাক বা টেলিগ্রাফের খবর অথবা গোমস্তা বা পাইক পাঠাইয়া বড়ীভাড়া, আসবাব ভাড়া, আত্মীয় স্বজন ভাড়া, জনক জননী ভাড়া, আতুঁড় ভাড়া, কাঁথা ভাড়া, মায়ের স্তন্যদুগ্ধ ভাড়া, এ সকলের বন্দোবস্ত আগে ঠিক করিয়া, তবে কি তোমার এই পৃথিবীতে আসিতে হইয়াছিল? কোন অনুষ্ঠানইত হয় নাই, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ত তুমিও কাহাকে চিনিতে না এবং তোমাকেও কেহ চিনিত না; অথচ তুমি যখন নিঃসহায়, নিরুপায়, শক্তিসঞ্চালনমূঢ়, এ জগতক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলে, তখন কথিত সকল আত্মীয় ও সকল দ্রব্যই মজুত এবং হাতে হাতে সমস্তই ত প্রাপ্ত হইয়াছিলে; তুমি একটু টুঁ করিলে শত লোক দৌড়িত; আবার শত লোক তোমার উপর এমনই মমতাযুক্ত কেনা গোলামবৎ যে, কোটীশ্বর কোটি মুদ্রা খরচ করিয়াও তেমন একটী পাইয়া উঠে না। মূঢ়! যে ঈশ্বর এখানে তোমার আসিবার কালীন তোমার জন্য এমন বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন; পরলোকের ভারও কেন সেই ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আপন যথাদিষ্ট কার্য্যে রত না হও? ইহলোকও যে ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং রাজত্ব, পরলোকও সেই একই ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং রাজত্ব। তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ, নতুবা ঈশ্বরের প্রীতি প্রাপ্তির নিশ্চিত উপায় যাহা তাহা পরিত্যাগ করিয়া, অনিশ্চিতের জন্য এবং ভয়ে এরূপ ক্ষিপ্ত হইয়া ফিরিবে কেন? পরলোক পরের কথা; ইহলোক, যাহার সহিত আপাতত তোমার সম্বন্ধ, যে তোমাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া এত বড়টী করিয়াছে, যে তোমার নানা সুখসচ্ছন্দতা সাধন করিতেছে, তাহার জন্য কি করিয়াছ? যে ইহলোকের প্রতি এরূপ অকৃতজ্ঞ, পরলোকে তাহার প্রতি বিশ্বাস? ইহলোক অধিকারে যে এমন অকৃতকর্ম্মা, পরলোক অধিকারে তাহাকে কে বিশ্বাস করিবে? ইহলোক ভিত্তি স্বরূপ, পরলোক তদুপরি স্থাপিত; সেই ভিত্তির দৃঢ়তা এবং পূর্ণতা সাধন পক্ষে কি করিয়াছ? তোমার স্রষ্টা তোমাকে যে সকল শক্তি প্রদান করিয়াছেন, অবশ্যই তিনি তোমার নিকট তদতিরিক্ত কোন

কার্য্যের প্রত্যাশা রাখেন না ; তাহার পর, তোমাকে যে সকল শক্তি প্রদত্ত হইয়াছে, দেখিতেছি যে তাহা সমস্তই ইহলৌকিক কার্য্যক্ষম শক্তি, ইহলোকের অতীত কার্য্যক্ষমতা তাহার একবিন্দুও নাই ; এমন স্থলে, ইহা কি নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না যে কেবল ইহলোক, কেবল ইহ সংসারই, তোমার একমাত্র কর্ম্মভূমি এবং কর্ম্মার্থে অবলম্বনীয়?

আবর্জ্জনাশূন্য নির্ম্মল কর্ত্তব্যবুদ্ধি যাহা, তাহার উৎপত্তি এবং শিক্ষা এরূপে,—ঈশ্বর কোন পদার্থ নিরর্থক সৃষ্টি করেন না ; সুতরাং তিনি আমাদিগকে যে সমস্ত শক্তি, কি শারীরিক কি মানসিক, যাহা দিয়াছেন, তৎ সমস্তের নিশ্চিত উদ্দেশ্য এবং সার্থকতা আছে। আমরা সেই সকল শক্তির চালক ; অতএব আমরা যদি সেই সকল শক্তির সদ্ব্যবহার না করি, তাহা হইলে কখনই বলিতে পারি না যে তদ্দ্বারা ঈশ্বরের উদ্দেশ্য নষ্ট করিলাম না। তাঁহার উদ্দেশ্য পূরণ করিলে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা হইল, অতএব তাহার নাম পুণ্য ; তাঁহার উদ্দেশ্য অন্যথা করিলে অবশ্যই তাঁহার অপ্রিয় সাধন করা হইল, অতএব তাহার নাম পাপ। আমরা পাপ পুণ্যের ফলভাগী জীব। এজন্য পাপ পরিহারে যাহাতে পুণ্য সঞ্চয় হয়, শক্তিসমূহের সেইরূপ সদ্ব্যবহার করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ। আমরা, কি ইহলোক কি পরলোক, উভয় লোকের শুভপ্রার্থী হইতে হইলে, উহাই তাহার একমাত্র পন্থা ; তদ্ভিন্ন আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। অন্য পন্থা আর আছে বলিয়া যাহারা বলে তাহারা হয় ভ্রান্ত, নয় নির্ব্বোধ, নয় ক্ষিপ্ত, নয় জুয়াচোর, ইহার একতর। বাঞ্ছারাম, দেখিতে পাইবে, এ কর্ত্তব্যবুদ্ধির মূলেও কতটা স্বার্থ নিহিত রহিয়াছে ; কিন্তু স্বার্থ যখন এই অবস্থায়,এরূপ কর্ত্তব্যবুদ্ধির সহ জড়িত থাকে,তাহাকে দিব্য স্বার্থ বলে ; তদন্যত্তরে স্বার্থ পার্থিব। পার্থিব অবস্থায় যে স্বার্থ সকল অনর্থের মূল ; দিব্যাবস্থায় সেই স্বার্থই আবার সকল অর্থের মূল হইয়া থাকে। এই দিব্য স্বার্থকেই চলিত কথায় স্বার্থশূন্যতা নামে অভিহিত করিয়া থাকে। সাত্ত্বিকবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি মাত্রে প্রায়শ এই এক মাত্র দিব্য স্বার্থে স্বার্থবান হইয়া থাকেন।

দিব্য স্বার্থের আকাঙ্ক্ষা ঈশ্বরপ্রীতিলাভ। দিব্যস্বার্থবান ব্যক্তি

মানবীয় সুখ্যাতি অখ্যাতির প্রত্যাশা রাখে না, যেহেতু সে মানবীয় নিয়োজনে কর্ম্মরত হয় নাই। মানব তাহাকে শত ধিক্কার দিলেও, এবং বস্তুত দিয়াই থাকে, তথাপি সে স্বকার্য্য পরিত্যাগ করিবার পাত্র নহে। এ পথে এ লোকে 'যাহার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর' প্রায়ই এরূপ ঘটিয়া থাকে; তথাপি সময় ও সমাজ, সপক্ষ বা বিপক্ষ যাহাই হউক, তাহার পক্ষে দুই সমান, তাহাতে তাহার চেষ্টার রোধকারী কেহ এবং কিছু মাত্র হইতে পারে না। সমগ্র পৃথিবী তাহার মস্তকের উপর চাপিয়া পড়িলেও, সে তাহাতে ক্ষান্ত হইবার পাত্র নহে। যেহেতু সময়, সমাজ, পৃথিবী, তাহাদের রোষ ও তোষ, সুখ্যাতি বা অখ্যাতি, এ সকলই ক্ষণিক, এই থাকিবে, এই থাকিবে না; কিন্তু সে যাহার প্রীত্যর্থে কার্য্য করিতেছে, এবং যাহার অনুগ্রহ বা নিগ্রহ তাহার একমাত্র অবলম্বন, সেই প্রীত্যাদি অনন্তস্থায়ী এবং অনন্তব্যাপী; সুতরাং সে কি কখনও অনন্তকে রুষ্ট করিয়া অন্তকে তুষ্ট করিতে অগ্রসর হইতে পারে? যে এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চেষ্টাবান, স্বয়ং ঈশ্বর করুণা রসে তাহার সহায়তা করিয়া থাকেন; নতুবা সে সমাজ হইতে বহু ক্লেশ, বহু দুঃখ, বহু উপহাস, কঠোর মৃত্যু যন্ত্রণাকে পর্য্যন্ত, কেমন করিয়া তুচ্ছে নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হয়? যে একবার মাত্র কখনও এরূপ কর্ম্মপ্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়াছে, সেই বুঝিতে পারিবে যে, ইহার প্রভাবে অন্তঃশক্তি কিরূপ অলোকসামান্য বিকশিত এবং দুর্দ্দমনীয় হইয়া থাকে; বহু ক্লেশ-রাশির মধ্যেও কেমন একটী দিব্য সান্ত্বনা পদার্থ পরিদীপ্তিমান হয়, এবং কেমন তাহা অঘোর প্রতিকূল অন্ধকার মধ্যেও তাহাকে স্বচ্ছন্দে পরিচালনা করিয়া লইয়া যায়। এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতাবর্দ্ধক যে সমস্ত মহানুভবের নাম শুনিতে পাইয়া থাক; তাহাদের জীবন একে একে আলোচনা করিয়া দেখিও, দেখিতে পাইবে যে তাহা আমূলন্ত ইহারই জীবন্ত অভিনয় ভিন্ন আর কিছুই নহে; এবং এই কর্ত্তব্যবুদ্ধিই তাহাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল। যদি ইচ্ছা হয়, ইহাও দেখিতে পাইবে যে সাময়িক সমাজের নিকট তজ্জন্য তাহাদিগকে সময়ে সময়ে কতই ক্লেশ ও অপমান প্রভৃতি সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে তাহাদের কি হইয়াছিল? প্রতি-

মূলতা এখন লুপ্ত; তৎস্থলে তাহাদের কৃত কার্য্য যাহা তাহা দিগন্ত-ব্যাপ্ত, এবং অনন্ত কর্ম্মপ্রবাহে মহাধারারূপে তাহা এখন অনন্ত গৃহে গৃহীত। ফলত মূল যখন "মূলং কৃষ্ণব্রহ্মচ ব্রাহ্মণাশ্চ", তখন অনুষ্ঠানে বনবাস, বহুক্লেশ, বহুসংগ্রাম থাকিলেও, অন্তে সপ্তদ্বীপা সাগরাম্বরা বসুমতীর আধিপত্য নিঃসন্দেহ প্রাপ্তব্য ফল। বাঙ্গারাম, তথাপি এ পথে অগ্রসর হইতে যাহারা ভয় পায়, তাহাদের ভয় ঠিক যে ব্যক্তি অমর তাহার জুজুবিছা দেখিয়া জীবন ভীতি উপস্থিত হইবার ন্যায়। হিন্দুসন্তান, তুমি বসিয়া রহিয়াছ কি জন্য? তুমিও কেন এই মূল ধরিয়া কার্য্যারম্ভ না কর? যদিও তোমার শক্তি ক্ষুদ্র হয়, বসুমতীর আধিপত্যের পরিবর্ত্তে না হয় একখানা গ্রামও ত অবশ্য লাভ করিতে পারিবে। যেখানে সকলই ওঠবন্দি হিসাবে ভুক্ত, সেখানে এ ক্ষণস্থায়ী ওঠবন্দি ঠাকুরালীর পরিবর্ত্তে যদি কিছু স্থায়ী সম্পত্তি করিতে পার, তাহা কি প্রার্থনীয় নহে? মনুপুত্রের তাহাই করা কর্ত্তব্য; নতুবা পিতৃনাম, পিতৃপুরুষের অপমান করা হয়।

পার্থিব স্বার্থের উদ্দেশ্য আপাত-লভ্য সৌভাগ্য, সম্পদ বা স্বচ্ছন্দাদি লাভ। ইহাতে আপাতত ইন্দ্রপ্রস্থ পর্য্যন্ত অধিকারভুক্ত হইয়া, সুখ বৃদ্ধি করিল বটে; কিন্তু অন্তে কেবল অধিকার-চ্যুতি মাত্র নহে, সবংশ সহ সমস্ত লোপ। আমাদের সমাজ আপাতত যেরূপ সংগঠিত, তাহাতে সত্য মিথ্যা উভয়ের যুগপৎ একত্র সমাবেশ, অধিকন্তু মিথ্যার প্রাধান্য অধিক। এখানে নির্ব্বোধ মানব স্রোততরঙ্গে পড়িয়া সকল বিষয়েই আশুফল, আশু প্রতিকারের অনুসন্ধান করিয়া থাকে; যথা নিয়ম ও যথাকালের বড় একটা অপেক্ষা রাখে না বা বুঝে না। সুতরাং ফল এখানে যুগান্তস্থায়ী হয় না; নিরন্তর এক ভাঙ্গিতেছে আর গড়িতেছে। মিথ্যাই এখানে আসীমত প্রায় সর্ব্বত্র সর্ব্বেসর্ব্বা মূলস্বরূপ হইয়া আছে,—'মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽমনীষী'। মিথ্যা ভ্রমের আধার, ভ্রম দৃষ্টিরোধক; দৃষ্টির যেখানে রোধ, মানব সেখানে ভবিষ্যৎ পথে অন্ধ; অন্ধ ব্যক্তি কেমন করিয়া ভবিষ্যদ্‌বাহী ফলের উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে? আপাত-লভ্য ফল এবং তৎসাধনার উদ্দেশ্য, আগত সময়কে কোন

রূপে থাবাথুবি দিয়া সন্তুষ্ট রাখা; সুতরাং সে সকল নিঃসন্দেহ কেবল উপস্থিত সময়ের জন্য। অতএব, অবিরত-গতিশীল সময়, যেমন ত্বরিত গতিতে কালপথে অদৃশ্য হয়; তাহার প্রীতিজন্য অর্জ্জিত কথিত ফলাদিও আশ্রিস্থানশূন্য করিয়া, সেইরূপ ত্বরিত গতিতে, তপনতাপতপ্ত জলবিন্দুর ন্যায়, অবিলম্বে অনন্ত গৃহে হিসাব-শূন্য হইয়া বিলোপ প্রাপ্ত হয়। ইহাকে একরূপ গোঁজা মিলানে ফাঁকি বুঝান বলে। তুমি যেখানকার সেইখানেই থাকিলে, অথচ ফাঁকি দিয়া বুঝাইলে যে তুমিও চলিতেছ। আরও আশ্চর্য্য, তুমি ভাবিলে কাল তোমায় ফাঁকিতে ভুলিয়া, পিছু দিকে না চাহিয়া চলিয়া গেল! ভ্রান্ত, কালকে ফাঁকি দেয় কাহার সাধ্য। কাল না দেখিয়া যায় নাই, তোমার ফাঁকিও তাহার অবিদিত নাই, তবে যে হাতে হাতে তোমার ফাঁকির প্রতিবাদ করিল না, তাহা কেবল তোমার নষ্টামির শাস্তি দারুণতর করিয়া তুলিবার জন্য। কিন্তু যখন ধরা পড়িবে, তখন দেখিতে পাইবে যে তোমাকে কি ভীষণ বেগেই নাকে দড়ি দিয়া কাল আপন সমসূত্রে টানিয়া লইতেছে; তখন বুঝিতে পারিবে যে ফাঁকি দেওয়ার কি দুর্দ্দমনীয় প্রায়শ্চিত্ত।

সে যাহা হউক, আমাদিগের কর্ত্তব্যবুদ্ধির সূত্র অনেক দূরে, আধা পথে ফেলিয়া আসিয়াছি। আমাদিগের মানবীয় সংসারে যতগুলি সুকার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, বা যাহা কিছু মহত্ত্বের পরিচায়ক বলিয়া পরিচিত, সে সকলকে সংগ্রহ পূর্ব্বক একতার সূত্রে সংযোজন, তাহাদের সামঞ্জস্য সাধন, এবং তত্তাবতের সংসাধন, এ সমস্তই কর্ত্তব্যবুদ্ধির কার্য্য। সুকার্য্য এবং মহত্ত্ব সমুদায় নানা রত্ন ও মাণিক্য স্বরূপ; কর্ত্তব্য-বুদ্ধি প্রবর্ত্তক এবং নিয়ামকরূপে তাহাদিগের উদ্ধার, সংগ্রহ ও সংস্কৃত করিয়া, একতার সূত্রে গ্রন্থিবদ্ধ পূর্ব্বক, ভুবনানন্দদায়িকা মালিকার আকারে সজ্জিত করিয়া থাকে; তখন যে দিকে তাকাও, সেই দিকেই দিগঙ্গনাগণ মধুর হাসি হাসিয়া, প্রসন্ন মুখে তৎপ্রতি স্বীয় প্রসন্নতা ভাব জ্ঞাপন করে। কিন্তু যথায় সেরূপ কর্ত্তব্যবুদ্ধির অভাব, বা কর্ত্তব্য-বুদ্ধি যথায় বক্রুর বা ছন্ন, তথাকার দৃশ্য কি স্বতন্ত্র এবং শোচনীয়!

তথায় মণিরত্ন নানাদিকে নানা কারণে যদিও ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভাসিত হইতে থাকে বটে, কিন্তু কখনও তাহারা স্থায়ী হইয়া বা গোটা বাঁধিয়া, একতায় আগতি পূর্ব্বক অভিপ্রেত উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ করে না। তাহাদিগকে সজ্জিত করিয়া ব্যবহারভুক্ত করা দূরে যাউক, তাহাদিগকে কেবল ধরিয়া রাখার জন্যও, যত ইচ্ছা চেষ্টা করা যাউক না কেন, ফণীর মণিবৎ কোথায় দিয়া যে তাহারা তিল তিল করিয়া মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হয়, তাহার নিরাকরণ করিতে পারা যায় না। এ দৃশ্য, এ কৌতুকোদ্দীপক প্রহসনের অভিনয় দেখিবার জন্য, আমাদিগকে কোন দূর স্থানে যাইতে হইবে না; এ দৃশ্য আমাদের ঘরে, ভারতগৃহে, নিত্য নিত্য অভিনীত হইতেছে। যাবতীয় উৎসাহ, যাবতীয় উদ্যম, জাতীয় একতা, স্বদেশপ্রিয়তা, জাতীয় অভ্যুত্থান, নানা অনুষ্ঠান নানা সংস্করণ, এ সকলের শব্দ এবং আড়ম্বরে ভারত নিত্য টলটলায়মান; কিন্তু কখন দেখিয়াছ কি তাহার কোনটা গোটা বাঁধিয়া বা গ্রন্থিবদ্ধ হইয়া, কোন প্রকারের সুফল প্রসব করিতে পারিয়াছে? কুফলের অভাব নাই; অনুষ্ঠান সুফলপ্রসবীরূপে সম্পূর্ণ না হইলে, কুফল তাহা হইতে স্বতঃ-উৎপন্ন হওয়াই নিয়ম। তোমার সমস্ত আন্দোলন, সমস্ত সংস্করণ, সমস্ত কথা, সকলেই জলবুদ্বুদবৎ উঠিতেছে পড়িতেছে; মুহূর্ত্তে উদয়, মুহূর্ত্তে বিলয়; কেবলমাত্র বচনেই সকল অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হইয়া থাকে। কথা যতক্ষণ সভাস্থলে, সভার বাহিরে আর তাহার এক বর্ণও কাহার মনে তিষ্ঠে না। ইহার অর্থ এই, এ সকলের মূলদেশে কর্ত্তব্যবুদ্ধির অভাব; এ সকলের মূল কেবল মাত্র সাময়িক হুজুগ। কর্ত্তব্যবুদ্ধি যাহা তাহা প্রলয় ঘূর্ণাবর্ত্ত মধ্যে নিয়ম স্বরূপ। কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত যে বিষয় তাহার ধর্ম্ম ওরূপ নহে। কর্ত্তব্য-বুদ্ধি যথায় মূল, তথায় যাবতীয় অসংলগ্ন বিষয় সংলগ্নে আসিয়া পরিণত হয়; যাবতীয় অস্থায়ী বিষয় ক্ষণিকতা পরিত্যাগে স্থায়িত্ব পায়; তথায় অনুষ্ঠিত বিষয় কেবল সভাস্থলীয় বাক্যে পর্য্যবসিত হয় না, যতক্ষণ তাহা সংসাধিত না হয়, ততক্ষণ তাহা জীবনের ব্রত স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়, মানুষ তাহার জন্য পাগল হয়, তখন শয়নে স্বপনে কেবল এই একমাত্র ভাবনা,—'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীরপতন।' কি অপূর্ব্ব মহামন্ত্র!

শক্তিসঞ্চালনে উদ্যম এবং কার্য্যপক্ষে কর্ত্তব্যবুদ্ধি, কেবল এই দুইটী থাকিলেই, কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিতে পারা যায় ইহা সত্য বটে, কিন্তু তাহাতেও সাধনাসিদ্ধি হয় না। সাধনাসিদ্ধির পক্ষে সম্পূর্ণভাবে উপযুক্ত হইবার পূর্ব্বে, কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে সূক্ষ্ম এবং সুদক্ষ করিবার জন্য, আরও কতকগুলি বিষয়ের একান্ত প্রয়োজন; তন্মধ্যে আত্মসংস্কার এবং শিক্ষা এই দুইটী প্রধান।

আত্মসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সর্ব্বথা গুরুতর; কারণ যথায় যেমন উৎস, তাহার নিঃসৃত দ্রব্য যে তেমনি স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। আমরা জানি, প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া সুফল লাভ করিবার পক্ষে আমাদের কোন সাধ্য নাই। আমরা যেমন শুদ্ধ বা অশুদ্ধ প্রকৃতি এবং যেমন বা যে পরিমাণে পবিত্র বা অপবিত্র হইব, আমাদের কৃত কর্ম্মও সেইরূপ আকার ধারণ করিবে। অতএব যাহাতে কোন রূপে আমাদিগকে শারীরিক ও মানসিক কলুষ না স্পর্শে, তৎপক্ষে আমাদিগের ত্বরান্বিত ও চেষ্টাবান হওয়া সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। যদিও এ পৃথিবীতে অসৎ হইতে একেবারে পরিচ্ছিন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি তৎপক্ষে আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা চালনার পক্ষে ত্রুটি না হয়। চেষ্টা করিলেও যখন এমন, তখন চেষ্টা না করিলে কত অধিক অসৎ স্পর্শের সম্ভাবনা! অতএব এক মাত্র চেষ্টার সীমা, আমাদিগের আত্মসংস্কারের পরিমাণ হওয়া উচিত। আমাদের সাধ্য যতদূর, তাহা আমরা নিবিষ্ট মনে করিব, তদতিরিক্ত যাহা, তাহা দৈবের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। জ্ঞানকৃত পাপ পরিহার আমাদিগের সাধ্যের মধ্যে।

শারীরিক ও মানসিক কলুষ, এ দুয়ের মধ্যে মানসিক কলুষই গুরুতর; অথবা মানসিক কলুষই সর্ব্বস্ব, শারীরিক কলুষ কেবল তাহার ফল স্বরূপ বলিলে বলা যায়; কারণ আমরা দেখিতে পাইতেছি, মন সর্ব্বদা শরীরের বশ নহে, শরীরই সর্ব্বদা মনের আজ্ঞাকারী হইয়া থাকে। এজগতে যত প্রকার অনর্থোৎপত্তি হয়, তাহা প্রধানত এই মানসিক কলুষ হইতে। মানসিক কলুষসমূহের মধ্যে প্রধানতম কলুষ পার্থিব স্বার্থ; উহা রাজা স্বরূপ এবং নীচতা উহার মন্ত্রী, উহারা একযোগ হইয়া আর তাবৎকে

পরিচালন করিয়া থাকে। অতএব যে মানসিক কলুষ সর্ব্ব অনর্থের মূল, তাহা কি লোকত কি ধর্ম্মত, সর্ব্ব প্রকারে যথাসাধ্য পরিহার্য্য। মানসিক অসৎবৃত্তি বা অসৎবুদ্ধি সকল, সতত সত্যকার্য্যের বিরোধী; যে পরিমাণে তাহারা মানসক্ষেত্র অধিকার করিয়া থাকে, সেই পরিমাণে কৃত কার্য্যসকল ছন্ন বা অসৎ-সম্পাদিত ও অসৎপরিণামযুক্ত হয়। শক্তি সঞ্চালনে সহস্র উদ্যম এবং কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে প্রভূত ব্যুৎপত্তি থাকিলেও, যদি মানসিক কলুষ অপসারিত করিয়া মানসিক পবিত্রতা সংসাধন করা না যায়, তাহা হইলে, সে শক্তিসঞ্চালন ও সে কর্ত্তব্যবুদ্ধি কার্য্যকরী হইয়া কোন সুফল প্রসব করা দূরে থাকুক প্রত্যুত তাহারা মানসিক কলুষের দাসরূপে পরিণত হইবায়, তাহাদের যে প্রভূত কার্য্যক্ষমতা, তাহা বিরূপ দিকে চালিত হয় ও সম্ভব অপেক্ষা অপার গুণে বিকৃতির উৎপাদন করিয়া থাকে। অতএব আবার বলা বাহুল্য বা পুনরুক্তি স্বরূপ হইতেছে যে আত্মপবিত্রতা ব্যতীত, শক্তিসঞ্চালন এবং কর্ত্তব্যবুদ্ধি সমস্তই বৃথা হইয়া যায়। এজন্য, আত্মসংস্কারের দ্বারা পবিত্রতা সাধন, কর্ত্তব্যবুদ্ধির আদি ও প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া জানিও। নতুবা, ঈশ্বরের প্রীতি প্রাপ্তি যদি তোমার জীবনের উদ্দেশ্য হয়, তবে সেই প্রীতি তোমার কৃত যে সকল কার্য্যের দ্বারা আকর্ষিত হইবার সম্ভব, সে কার্য্য কখনও তোমার দ্বারা সুসম্পাদিত হইতে পারিবে না।

এই আত্মসংস্কার এ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে, একমাত্র বা প্রধানত স্বর্গের সোপান এবং ধার্ম্মির পথ বা স্বয়ং ধর্ম্মস্বরূপ বলিয়া বিশ্বাসিত, এবং ভ্রমান্ধতায় তাহা, কতই আড়ম্বর ও অতিরীতি যোগে পালিত হইয়া আসিয়াছে। উপায়, যাহা, তাহা উদ্দেশ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। দেখা গিয়াছে, ভারতীয়েরা অতিবুদ্ধিশালী প্রায় তাঁহাদের অনুষ্ঠিত তাবৎ বিষয়ে: এখানেও, সেই অতি বুদ্ধিবশে, তাঁহাদের আত্মসংস্কার প্রণালীকে উহার এমন চরম সীমায় লইয়া উপস্থিত করিয়াছেন যে, অন্য সাধনার কথা দূরে থাউক, কেবল তাহার সাধনেই, সমস্ত জীবন অতিবাহিত বা সমস্ত জীবন নিপাত করিলেও, অবসর বা সীমা পাওয়া যায় না। ইন্দ্রিয় সংযম করিতে হইবে?—খাও জল এবং ঘাসের পাতা,

যাহাতে শরীর শোষিত হইয়া,কেবল একটা ইন্দ্রিয় কেন, সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই একেবারে এবং চিরকালের মত দমন হয়। নিঃস্বার্থ হইতে হইবে?— ছাড় সংসার, ধর সন্ন্যাসমূর্ত্তি; মাঘের হিমে, আষাঢ়ের জলে, বৈশাখের অগ্নিতে,অযত্নক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া পড়িয়া রহিতে শিখ। দ্বেষ,হিংসা পরিরহিত হইতে হইবে?—হও ক ষ্টদণ্ডবৎ উলঙ্গ, সর্ব্বত্যাগী, অযাচিত ভিক্ষাজীবী। জীবন দিলেও,এ প্রকারের সিদ্ধিকে কুলাইয়া উঠা দুষ্কর! হিন্দুঠাকুরদের ঐ ঐ অতি-আচারের কার্য্যকারিতায় এত দূরই বিশ্বাস যে, ঐ ঐ আচার (আমরা বলি ঐ ঐ অতি-আচার) যদি কোন ব্যক্তিতে দৃষ্ট হওয়ার কিছু ত্রুটি থাকে, তবে তাহার যে ব্রহ্মজ্ঞান হইতে বা থাকিতে পারে, ইহা তাহাদের ধারণায় একবারেই আইসে না। বুদ্ধিবৃত্তি হিন্দুরা অতিশয় প্রশস্ত এবং আড়ম্বর-আয়ত্তক পাইয়াছিলেন; সেই বুদ্ধির মোহে, ইহাদের যে কোন গুণ এবং সাধ্যবিষয় গুলিকে এমনই বহ্বায়তন ও আড়ম্বরযুক্ত করিয়া তুলিয়াছেন যে, উপায়ের সন্নিকটে উদ্দেশ্য যাহা তাহা ঢাকা পড়িয়া, উপায়ই উদ্দেশ্যরূপে প্রতীয়মান হয়। সাধারণত. উপায় যত সংক্ষিপ্ত-আয়তন ও সুখগ্রাহ্য ও সরল হয় ততই ভাল; কিন্তু এখানে তাহার বিপরীত, এবং বলিয়াছি যে একথা খাঁটি হিন্দুয়ানীর প্রায় যাবতীয় বিষয়েতে বলিতে পারা যায়: তাহার সাক্ষ্য,—এই দেখ একটা ব্যাকরণ শাস্ত্র; উহা ভাষা শিক্ষার উপায় স্বরূপ, কিন্তু এখানে একবার ব্যাকরণ পর্ব্বের ঘটা দেখ, সহকারী না হইয়া স্বয়ং একটী বিজ্ঞান এবং কেবল তাহা নহে, দুঃসাধ্য মুখ্য বিজ্ঞানের পদবীতে উঠিয়া গিয়াছে। এরূপ বহ্বাড়ম্বরযুক্ত উপায় ঘটা বা অনুষ্ঠান সর্ব্বদা পরিহার্য্য।

বাঙ্গারাম, তোমাকে সেরূপ আত্মসংস্কার করিতে বলিতেছি না; যাহা রয় সয় তাহাই ভাল. অথবা বিজাতীয়গণের ন্যায় আত্মসংস্কার করিতেও তোমাকে অনুরোধ করিতেছি না; এক সময়ে তাহাদের আত্মসংস্কার মন্দ ছিল না, কিন্তু এখন তাহা সাধারণত অথবা সর্ব্বদা ঝোপ বুঝিয়া কোপ। চাণক্যের নীতিও অতি কুটিল অথবা সর্ব্বনাশকর নীতি; সে নীতিতে আত্মসংস্কার হয় না, আত্ম-অসংস্কার হয়; চাণক্য দ্বিতীয় মেকিয়াবেলী। অতঃপর তবে আত্মসংস্কার

সাধক কোন্ নীতির বিষয় আমি তোমাকে পরিচয় দিয়া বুঝাইব? যে পদার্থ সত্যপ্রসূত এবং নিত্য এবং সর্ব্বসুন্দর, তাহা পরিচয়ের আবশ্যক রাখে না; তবে কোথায় বা কাহার দ্বারা তাহাতে আবর্জ্জনা স্পর্শ করিয়াছে বা করিতে পারে, তাহারই পরিচয় দিবার আবশ্যক হয়। আমারও চেষ্টা সেই পর্য্যন্ত। তবে যে টের উপর এই পর্য্যন্ত বলি, সত্যকে দৃঢ়রূপে অবলম্বন করিবে, যথাসাধ্য সদ্বুদ্ধিশালী হইবে, কদর্য্য স্বার্থপূর্ণ এবং ভীরু ও নীচ অন্তঃকরণ বিশিষ্ট হইও না; ইহার মধ্যেই আর সমস্ত আত্মসংস্কার নিহিত করা রহিল। শারীরিক কলুষ পরিষ্কারের আবশ্যকতা ও শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে আর অধিক কি বলিব,—সেই শরীরই সার্থকজন্মা, সেই শরীরেরই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিণাম, যাহা সুকার্য্য সাধনে মায়া ত্যাগে প্রদত্ত হয়, কে জানে লোকের হস্তে, কে জানে কালের হস্তে। ভারতে কি আবার তেমন দিন আসিবে?

কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে পবিত্রভাবে চালনা করিবার নিমিত্ত যেমন আত্ম-সংস্কারের প্রয়োজন, তেমনি কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রশস্ততা সাধন জন্য, শিক্ষার প্রয়োজন তদধিক। শিক্ষার উদ্দেশ্যটী শুনিতে এক কথা,—প্রশস্ততা সাধন করে; প্রশস্ততা পদার্থটী কি বিপুল ও অপূর্ব্ব। উহা এমনই অপারগুণময়ী যে একা উহার আলোকে তাবৎ আলোকিত হইয়া থাকে; এবং উহার আলোকে তাবৎ বিষয় এতই সুন্দ্রপাস্তরিত হয় যে শেষে যেন সেই প্রশস্ততা, সুতরাং তদুৎপাদক শিক্ষাই, সমস্তের একমাত্র উদ্ভাবক ও নিয়ামক স্বরূপে প্রতীয়মান হয়। আর্য্যঠাকুরদের মধ্যে প্রশস্তভাব অভাব হেতু, তাঁহাদের তাবৎ কর্ম্ম কাণ্ড প্রায় অনর্থক হোম যজ্ঞাদিতে সমাহিত হইয়া আসিয়াছিল। যথায় সুগোল মধুর ফলের সম্ভব, তথায় প্রশস্ততার অভাব হইলে, ফল কীটভুক্ত হ্রস্ব কুব্জ ও কদাকার আকার ধারণ করিয়া থাকে এবং দেবভোগ্য না হইয়া কুকুর-ভোগ্য হয়।

জাতিমধ্যে সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার আবশ্যকতা যে কতদূর, তাহা পূর্ব্বেও ভারতীয়দিগের বড় একটা ধারণা ছিল না; এবং এখনও যে বড় একটা ধারণা প্রতিষ্ঠ বা বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহা হয় নাই। পূর্ব্বকালের

বিশ্বাস,—শিক্ষা যাহা তাহা কেবল অধ্যাপক ও পাটোয়ারী এই দুই জনের আবশ্যক হয়; এ শিক্ষার আবার ব্যবসায়ভেদে তারতম্য আছে, যথা, অধ্যাপকের শিক্ষিতব্য পুঁজি পাটা স্মৃতি সাহিত্য বা শ্রাদ্ধসভাজয়ের জন্য দুইটা ন্যায়ের তর্ক; পাটোয়ারীর পুঁজি পাটা শুভঙ্কর। এ কালের বিশ্বাস,—শিক্ষা যাহা তাহা চাকুরী করিবার জন্য, এবং আজি কালি মামলা মোকদ্দমা চালান ও বক্তৃতা করিবার জন্যও বটে। ইহার মধ্যে আবার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা ব্যাকরণ দুরস্ত করিয়া ইংরাজী লিখিতে বা কহিতে জানা; তদর্থে কেহবা সংবাদপত্র লইয়া থাকেন, কেহবা নভেল পড়েন; এবং ইহার যে কোটী হইতে আবার সময় কালে ব্যবহার ও (আস্তাকুড়ে ছিন্ন গোলাপের পাঁপড়ি ছড়ানর ন্যায়) প্রয়োগের জন্য, বাক্যাবলীও কণ্ঠস্থ করিয়া রাখার পক্ষে ক্রটি করেন না। ইঁহাদের বিশ্বাস,—বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে হয় না, মাতৃগর্ভ হইতেই তাহা সঙ্গে আসিয়া থাকে; সুতরাং এখন যাহা কিছু উপার্জ্জন বা শিক্ষার আবশ্যক তাহা কেবল ইংরাজী অভিধান ও ব্যাকরণের,যদ্দারা গর্ভোপার্জ্জিত পাণ্ডিত্য ব্যাকরণশুদ্ধ ইংরাজীতে প্রকাশ করিতে পারা যায়। পাণ্ডিত্য বলিয়া যে একটা পদার্থ আছে, তাহাও ইহারা কখন কখন অনুভব করিয়া থাকে বটে; কিন্তু ইহাও অনুভাবিত যে সে পাণ্ডিত্য অন্য কিছু নহে, তাহা কেবল ইংরাজী শব্দ ও ব্যাকরণশিক্ষা বাদে,বিজ্ঞান ইতিহাস প্রভৃতি আর যে সকল অনাবশ্যকীয় বিষয় অর্থাৎ যাহা চাকুরীতে লাগে না এবং যাহা অধিকন্তরূপে বিশ্ববিদ্যালয়েশিক্ষা দেওয়া হয়,সেই সকল কণ্ঠস্থ করিয়া রাখা ও স্থানবিশেষে উদ্গীরণ করা। ইহারা গ্রন্থাদি প্রণয়নও করিয়া থাকে অপর্য্যাপ্ত; প্রতি চটী চাপাটী—অপাঠ্য চটী চাপাটী হাতে ধরিয়া, আবার আজি কালি কেহ কেহ বা সংবাদপত্র লিখিয়াও, কেহ 'মহাকবি', কেহ 'প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার' এই সকল হইয়া থাকে। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, যে সকল দেশের লোক কার্লাইল, গেটে, রিক্টার প্রভৃতি লেখককে লেখক বলিয়া থাকে; তাহারা আমাদের এ ছুঁচোর কীর্ত্তন দেখিতে পায় না। দেখিতে পাইলে, আমাদিগকে না জানি কি অসার বলিয়াই মনে করিত! সে যাহা হউক, সে কালে অধ্যাপক ও পাটোয়ারী

এবং একালে চাকুরে, সাধারণত ইহারা ভিন্ন, ব্যবসায়ী, শিল্পী, কৃষক বা অপরাপর ব্যক্তিদিগের শিক্ষার যে কিছু আবশ্যকতা আছে তাহা, এই দুই কালের এককালেও ধারণা ছিলনা এবং নাই। এখানে মেয়ে লেখা পড়া শিখে না, চাকুরী করিতে পারিবে না বলিয়া; অপরাপর জাতিতে শিখে না, তদ্দ্বারা পিতৃব্যবসায়ে অপারগ হইবে বলিয়া। এ সকলের কথাত দূরের কথা; শিক্ষিতের পক্ষেও অনেক সময়ে অনেকের মুখে শুনিতে পাই,—'কেবল একরাশি কেতাব পড়িয়া কেতাবকীট হইলে কি হইবে? কাজের মানুষ হও কাজে আসিবে।' কাজ যে কোন উপায়ে স্বচ্ছন্দে উদরপূর্ত্তি! এখানে কতকগুলা বহি পড়াও উপহাসের বিষয়!

কিন্তু এ জগতে এমন অগণিত দেশ অনেক আছে, যথায় চাকরের চাকরগিরি করিতেও, লেখা পড়া প্রভৃতি নানা শিক্ষার প্রয়োজন হয়। তথায় উন্নত শ্রেণীর শিক্ষার ত কথাই নাই; সমস্ত সম্ভবপর জাগতিক শিক্ষা করতলস্থ করিয়া, তবু তাহাদের তৃপ্তি দেখা নাই; তবু শিক্ষার আবশ্যকতার বিরাম নাই। এরূপ জাতি সকলের মধ্যে যে শিক্ষা, তাহার সহ আমাদের জাতীয় শিক্ষা তুলনা করিলে, কতই অন্তরতা দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে চাকুরী চালানর অতিরিক্ত শিক্ষা, আসবাব বা উপহাসের বিষয়; অন্যত্র তাহা প্রয়োজন এবং অত্যাবশ্যক স্থলীয়। এহেতু, ফলেরও তারতম্য তথাবিধ। সেই সেই জাতিরা জগতের যাবৎ সম্পদ ও সৌভাগ্যকে করতলস্থ করিয়া, এবং কর্ম্মক্ষেত্রে অপার কর্ম্মরাশির সম্পাদন শেষ করিয়া, তথাপি তৃপ্তিবোধে ক্ষান্ত হইতেছে না; আর আমরা? ক্লেদনিহিত কীটরাশির ন্যায় ক্লেদেই জড়িত থাকিয়া তাহা হইতে বদন ফিরাইতে মমতা বোধ করিতেছি; এবং শুধু মমতা বোধ করিতেছি না, কখন কখন বা পাছে কেহ মুখ ফিরাইয়া দেয় এ আশঙ্কায় মুহ্যমান হইতেছি। অভ্যাসবশে নারকীয় নরকেও মমতা জন্মিয়া থাকে। কি দুঃস্থ বৈষম্য!

শিক্ষায় মনুষ্যের এই কয়টী বিষয় সংসাধন করিয়া থাকে;—

১ম। কালের কোন্ বিশেষ বিভাগে এবং কর্ম্মক্ষেত্রের কোন্ বিশেষ দেশে অবস্থান করিতেছি, তাহাতে প্রবুদ্ধ করিয়া দেয়।

২য়। আমার কর্ম্মস্থলীর আয়তন কতদূর, আরব্ধ কর্ম্ম আমার পূর্ব্বে কতদূর সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে, এবং আমার স্বসময়ে আমার শক্তিসাধ্য সম্পাদ্য অংশ কি পরিমাণে থাকিয়া আমার হস্ত প্রতীক্ষা করিতেছে, এবং তাহার আশু ও দূর পরিণাম কোথায়, তাহা যথাসম্ভব বা যথা আবশ্যক দেখাইয়া দেয়।

৩য়। কর্ম্মস্থলে আমার সহকারী বা নিয়োজকবর্গকে কেমন; কাহার উপরে কতদূর নির্ভর করিতে পারি বা না পারি, কর্ম্মস্থলের প্রতিকূল বা অনুকূল বিষয় কি কি, এবং তাহাদের কাহাকে কি পরিমাণে পরিহার বা বিদূরণ বা কি পরিমাণে অবলম্বন করিতে পারিব, তাহার পরিচয় দিয়া দেয়। এতদতিরিক্তে আমূলত নিত্য সহচরী রূপে সঙ্গে থাকিয়া সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে ও সর্ব্ব বিষয়েতে পরিরক্ষণ ও সহায়তা করিয়া থাকে। যে শিক্ষা দেখিবে সে সকল কিছুই করে না, অথচ শিক্ষানবিশ শিক্ষার জন্য আজীবন অভ্যাস ও অধ্যয়নাদিতে অতিবাহিত করিয়াছে, তথায় নিশ্চয় জানিবে যে সে শিক্ষা শিক্ষা নহে,—তাহা ভাক্তশিক্ষা, সে শিক্ষানবিশ শিক্ষিত হয় নাই, সে জীবন্ত পুস্তকাধার হইয়াছে মাত্র।

যখন শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং ফল এমন, এবং মানব মানবী মাত্রেই যখন এ জাগতিক কর্ম্মক্ষেত্রে নিয়োজিত, তখন বাঞ্ছারাম, কেমন করিয়া বলা যায় যে, শিক্ষা সকল প্রাণীর জন্যই সমান প্রয়োজন নহে? এমন স্থলে, তবে তুমি কেনই বা ছোট লোক মাথায় উঠিল বলিয়া সাধারণ শিক্ষার প্রতি আতঙ্কে কম্পিত হইয়া উঠ; এবং কেনই বা স্ত্রীগণ চাকুরী করিতে যাইতে পারিবে না বলিয়া, তাহাদের শিক্ষার পক্ষে আবশ্যকতা দেখিতে পাও না; এবং নিজেই বা কেন উপন্যাস বা সংবাদপত্র পাঠের অতিরিক্তে যাইতে চাহ না? ছি, তুমি বড় ভ্রান্ত! তবে যদি শিক্ষা কেবল অনর্থক জ্যেষ্ঠতাতত্ব; তবে যদি শিক্ষা কেবল বঙ্গীয় কাব্য নাটক উপন্যাসাদির পাঠ ও কার্পেট বুনানিতে পরিসমাপিত হয়, তাহা হইলে শিক্ষা যতদূর অন্তরে থাকে তাহাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু ইহাও বলি, সকল বিষয়েরই নূতন আরম্ভে, তাহাদের এরূপ ক্ষণিক হ্রস বা অসদ্ব্যবহার বা পরিমাদৃশ অপরিহার্য্য। সে যাহা হউক, আবার বলিতেছি, শিক্ষার

প্রয়োজনীয়তা ইতর হইতে উচ্চ মানব পর্য্যন্ত, সকলেরই পক্ষে সমান। তবে প্রভেদ এই, যাহার যেমন কর্ম্মস্থলী, যাহার যেমন কর্ত্তব্য নিরূপিত, তাহার শিক্ষা সেইরূপ হওয়া উচিত।

শিক্ষানবিশের শক্তির পরিমাণ, রুচি ও মতি শক্তি অনুসারে, শিক্ষার শ্রেণী, পর্য্যায়, লঘুত্ব বা গুরুত্ব আদি ভেদ হইয়া থাকে। যে মানবের শিক্ষা-শক্তি যতদূর, যদি তাহার শিক্ষা ততদূর না হয়; তবে যে পরিমাণে শিক্ষার ত্রুটি, সেই পরিমাণে তাহার কর্ম্মস্থলে সঙ্কীর্ণতা ও আনুষঙ্গিক আরও যে কোন দোষ স্পর্শিয়া থাকে। কর্ম্মও সেই পরিমাণে বন্ধুর ও অফলদায়ক হয়। সত্য বটে যে, শিক্ষা কেবল একমাত্র কেতাব পাঠে সমাহিত হইতে পারে না; কিন্তু ইহাও সত্য যে কাল ও পৃথিবীর সঙ্গে কর্ম্মকাণ্ড যত বয়ঃপ্রাপ্ত হইতেছে, ততই তাহা উত্তরোত্তর বহ্বাড়ম্বরসাধ্য হইয়া আসিতেছে; সুতরাং আনুষঙ্গিক শিক্ষাও তৎসঙ্গে বিস্তার প্রাপ্ত হইতে থাকায়, দেখিতে গেলে কেতাবই প্রধানত তাহার উপাদান স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইতেছে। কেতাব ব্যতীত, অন্য নানাবিধ রকমেও, নানাবিধ প্রকারের শিক্ষা হইতে পারে; শিক্ষানবিশের প্রয়োজন ও শিক্ষাশক্তি অনুসারে সে সমস্ত, অন্য উপায় বা কেতাব বা উভয়ত যোগে সংসাধিত হয়। যে যে কার্য্যেই লিপ্ত থাকুক না কেহ, তাহার পূর্ণতা ও সুসম্পাদনের জন্য, অনুরূপ সৎশিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। ইউরোপখণ্ডে দেখ, তথায় কূটরাজনৈতিক হইতে লাঙ্গলধারী কৃষক পর্য্যন্ত, সর্ব্বত্রেই সুশিক্ষার আবশ্যক। ইউরোপের সৌভাগ্যের প্রতি ও সেই সঙ্গে বারেক তাকাইয়া দেখ!

যেমন মানসিক শিক্ষা, তেমনি শারীরিক শিক্ষারও একান্ত প্রয়োজন। দৈহিক-বল-শিক্ষা একান্ত আবশ্যক, কারণ মানসিক শিক্ষাজনিত উচ্চ আশা ভরসা ও উদ্যমের উহা পৃষ্ঠপোষক, রক্ষক, অবলম্বনদণ্ড এবং ঠেকা স্বরূপ। কিন্তু ইহা কোন ভারতসন্তান বুঝেন না। স্কুলের অতিরিক্ত ঘরে পড়াইবার জন্য বহুব্যয়ে কেতাবী শিক্ষক নিযুক্ত করিতে পারেন, কিন্তু তাহার দশমাংশ ব্যয়ে একজন বল-শিক্ষক নিযুক্ত করিতে জানেন না, অথবা ইহা তাঁহাদের বুদ্ধির ভিতরেই প্রবেশ করে না; কারণ দেখিতে

পাওয়া যায়, বালক যত ভূত, জুজু বা কাপড়েমুতো হয়, ততই সে তাহাদের মতে ভাল ছেলে! মানব অধঃপাতে গমন করিলে কত রকমেই তাহার বুদ্ধিবিকৃতি ঘটিয়া থাকে! বালকের বল-শিক্ষায় আর কিছু না হউক, অন্তত আত্মরক্ষাও ত হইতে পারিবে, এবং অন্ধকার রাত্রে গৃহিণীর অঞ্চল অবলম্বন ভিন্ন বাহির হইতেও ত সক্ষম হইবে। ইহাও নিতান্ত সামান্য লাভ নহে! বল-শিক্ষার ব্যয়ও কিছু অধিক নহে, কেতাবী শিক্ষার দশাংশের একাংশ মাত্র। একজন বল-শিক্ষক পলোয়ানের কাছে, একগ্রাম বালক অনায়াসে দেহচালনা, এবং অপরাপর ও অস্ত্রাদির চালনাও শিক্ষা করিতে পারে, অথচ তাহার ব্যয় ৭ কি ৮ টাকার অধিক নহে; এমন স্থলে প্রতি বালকের শিক্ষাব্যয় দুই আনা কি চারি আনা করিয়া পড়িয়া থাকে। কিন্তু হইলে কি হইবে, ভারতসন্তানের ভাগ্যে এ যোগাযোগও ঘটিয়া উঠে না! শিক্ষায় বলের বৃদ্ধি হয়; কোট হ্যাট বা মদ অথবা মাংস আহারে হয় না। বলশিক্ষায় শরীর নীরোগী হয়।

বাঞ্ছারাম, এখানে সেখানে সকল জায়গাতেই যখন চৌদ্দপোয়া মানুষ, তখন সত্য সত্যই যে বলে কেহ সিংহ কেহ মূষিক এতটা প্রভেদ হইতে পারে না। অল্প ইতর বিশেষ অবশ্য নানা কারণ হেতু ঘটে বটে, কিন্তু মোটের উপর সকলেরই বল সমশ্রেণীর। সাধারণত সকল মানবীয় শরীরই সমশ্রেণীর বল ধারণে সক্ষম। কিন্তু বলিতে পার, তথাপি আমরা কেন সে বলের কোথাও অপরিমিত বিকাশ, কোথাওবা একেবারে ন্যূনতা দেখিতে পাই? আর আর বিষয়ের ন্যায় বলও তাহার স্ফূর্ত্তিবিষয়ে মনের শাসনাধীন। লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছ বোধ হয় যে, যে ব্যক্তি সহজ অবস্থায় বল বিষয়ে অতি হেয়, উন্মাদ অবস্থায় তাহারই শরীরে আবার দশ মত্ত হস্তীর বল আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে; কোন দুষ্ট-সিংহ তখন এ দুষ্ট-মূষিককে আঁটিয়া উঠিতে পারে না। কোন ভীতিস্থলে, কোন বিপদস্থলে, অথবা তথাবিধ কোন বিশেষ স্থলে, যথায় মানব মরিয়া হইয়া উঠে, তথায়ও ঐরূপ উন্মাদবৎ বলের বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। সে বল কোথা হইতে আইসে?—শিরাধমনী বা ধাতু যাহারই হউক তাহার বিকার বা অবস্থা পরিবর্ত্তনে। কিন্তু সে অবস্থা পরিবর্ত্তনের

কারণ ?—উন্মাদ অবস্থায়, বা ভীতি বা বিপদ ইত্যাদির অবস্থায়, মানবের অন্যবিষয়ক জ্ঞানজনিত যে প্রতিবন্ধকতা তাহার লোপ হয়, অর্থাৎ যাহাকে বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থা বলে ; সুতরাং তখন চিত্ত যে কোন বিষয়ে নিবিষ্ট হয়, তাহাই পূর্ণ মাত্রায় হইয়া থাকে। এই পূর্ণ মাত্রায় চিত্ত-নিবেশন বলচালনায় প্রতি প্রযুক্ত হওয়াতে, তখন সেই পূর্ণ নিবেশনের ধর্ম্ম হেতু, শরীরনিহিত তাবৎ বল সুপ্তাবস্থা হইতে জাগ্রত হইয়া ক্রিয়া-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে থাকে ; ইহা ভিন্ন বল যে সে সময়ে সহসা তৈয়ার হয় বা আর কোথা হইতে আইসে, তাহা নহে। সহজ অবস্থায়, কিন্তু এরূপ ঘটনা হয় না ; তাহার কারণ, সে সময়ে তদ্রূপ চিত্তনিবেশনের কারণ অভাব, এবং তখন মানসিক অপরাপর প্রতিকূল কুচিন্তা সকল জাগ্রত থাকায়, তাহার প্রতিবন্ধকতা করিয়া থাকে। সহজ অবস্থায়, এই প্রতিকূল কুচিন্তার ভাগ অকর্ম্মা, মূর্খ, ও আলস্যপরায়ণ ব্যক্তিতে স্বভাবত কিছু অধিক ; এ কারণে এ জগতে ইহারাই প্রধান ভীরু হয়। সুচিন্তা বলের উত্তেজক, যথায় যে প্রকারের সুচিন্তা, তথায় সেই প্রকারের বলের উদ্রেক করিয়া থাকে। সু এবং সহজ অবস্থায় কেবল একমাত্র সুচিন্তা সাহসের সোপান, সাহসে বলের বিকাশ। দৈহিক বল এরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইলেও, তাহার যথোপযুক্ত চালনার নিমিত্ত উক্ত মত শিক্ষার আবশ্যক হয়। দেখ এখন, দৈহিক বল বিকাশও কতটা মানসিক অবস্থা ও সংশিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া থাকে : যে কোন সত্য বিষয়, এইরূপেই পরস্পরের প্রতি নির্ভর করে, ও সামঞ্জস্য-সংমিলিত হইয়া কার্য্যকরী হয়। বাঞ্ছারাম, এখন দেখ আমাদের যে বল নাহি এ কথা সত্য নহে, সত্য এই কথা যে আমাদের বল-উদ্দীপক চিত্ত নাহি। চিত্তের উন্নতি বা অবনতি, স্বাধীন বা পরাধীন বুদ্ধি, ইত্যাদির ন্যূনাতিরেক অনুসারে বলের তারতম্য ঘটনা হয়। এমন স্থলে সৎকর্ম্মপ্রবৃত্তিই তৎ তৎ প্রতিকূলতা নিরসনের একমাত্র উপায় বলিয়া জানিবে। অতঃপর শিক্ষার কথা যাহা বলিতেছিলাম :—

এমনও শুভজন্মা লোক এ জগতে অনেক আছে, যাহারা কোন কেতাবের উপায়ে বা যে কোন উপায়ে, অপর কর্ত্তৃক কোন শিক্ষাবিশেষ

ধারাবাহিক রূপে প্রাপ্ত না হইলেও, শিক্ষার সাধারণ ফল যাহা, এবং তদতিরিক্তে আরও সহস্র গুণ ফল, স্বভাবত তাহাদের হস্তগত হইতে দেখা যায়; কিন্তু তেমন শুভজন্মা লোক কয় জন? কতক শিক্ষা আছে উড়ো-ভাবে, দেখিয়া বা শুনিয়া, যেমন আমাদের জাতির অধিকাংশ;—এরূপ শিক্ষায় বড় একটা ফল ফলে না। দেশীয় সাধারণ লোক সকলের শিক্ষার আর একটী প্রধান উপাদান, শিক্ষিত উন্নত শ্রেণীর সংস্রব। যে কোন দেশের বা যে কোন কালের সমাজদৃশ্য বিলোড়ন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, নিম্ন শ্রেণীরা সর্ব্বদাই উন্নত শ্রেণীর অনুকারী; এবং উন্নত শ্রেণীর যখন যে রকম রুচি, মতি, গতি ও নীতি, ইহারাও তাহার অনুকরণ করিয়া সেইরূপ মতি গতি ও রুচি আপনার করিয়া লয়; এবং যথায় যথায় তাহাদের উন্নতবর্গের সহ সংস্রবে আসিতে হইবে, তথায় তথায় উন্নতের রুচি সহ সম্মিলিত হইবার নিমিত্ত, অনুরূপ ব্যবহার অবলম্বন করিয়া থাকে। উন্নত শ্রেণী যখন সুরুচির, নিম্নশ্রেণীও তখন সুরুচির; উন্নত শ্রেণী যখন উদারচেতা ও তেজস্বী, নিম্ন শ্রেণীও তখন উদারচেতা ও তেজস্বী; উন্নতশ্রেণী যথায় জীবন উৎসর্গে উদ্যত, নিম্নশ্রেণীও তথায় জীবন উৎসর্গে উদ্যত; আবার উন্নত শ্রেণী যখন জুজু, নিম্ন শ্রেণীও তখন জুজু; উন্নত শ্রেণী যখন অকর্ম্মা, নিম্ন শ্রেণীও তখন অকর্ম্মা, মুনিবকে ঠকাইতে পারিলে আর ছাড়ে না। ইহারও প্রথমগুলির দৃষ্টান্ত ইউরোপ ও আমেরিকায়, দ্বিতীয়গুলির দৃষ্টান্ত অধঃপাতিত ভারতে জাজল্যমান। ইহার পরেও বাঞ্ছারাম বাবু আক্ষেপ করিয়া থাকেন, 'ছোট লোকটা কাজ করে না কেবল ফাঁকি দেয়।' আরে বাপু, তুমি যে নিজে কিছু কর না ও নিজেকে যে নিজে ফাঁকি দাও, যাহা দেখিয়া ঐ ছোট লোকও কাজ না করিতে ও তোমাকে ফাঁকি দিতে শিখিয়াছে, তাহা একটী বারও মনে ভাব না! এখন দেখ, শিক্ষা বিষয়ে, উন্নত শ্রেণীর জবাবদিহি কি গুরুতর ও হুনা, তাহার শিক্ষার উপর কেবল তাহার নিজের সদসৎ নহে, সাধারণ জনবর্গেরও সদসৎ অপরিসীম ভাবে নির্ভর করিতেছে। ভারতসন্তান, এ জবাবদিহিতে একবার প্রবুদ্ধ হও; ইহা তোমার অর্দ্ধেক মঙ্গলের সোপান।

শিক্ষাজনিত চিত্তপ্রশস্ততা ও প্রসারিত দৃষ্টি হইতে, নিজ এবং বহু 'নিজ' সংঘটিত জাতীয়, উভয়বিধ অভাব যাহা যাহা, তাহা সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হইতে থাকে। এই জন্য সাধারণ কথায় বলিয়া থাকে যে শিক্ষার সঙ্গে অভাবের বৃদ্ধি হয়। অভাবের বৃদ্ধিই উন্নতির নিমিত্ত স্বরূপ। যে অভাব ব্যক্তিগত, তাহা ব্যক্তিগত শক্তি দ্বারা পরিপূরিত হয়। পুনশ্চ, যে অভাব জাতিগত, তাহা কেবল একমাত্র জাতীয় শক্তি দ্বারা পরিপূরিত হইতে পারে। সমশ্রেণীভুক্ত প্রকৃতির বহুমানব লইয়া এক এক জাতি; সুতরাং আর আর বিষয়ের সহ, তাহাদের সাধারণ শিক্ষা ও শিক্ষাজনিত অভাবও, তদ্রূপ এক ও জাতীয় আকারযুক্ত হইবার কথা। এইরূপে বহু অভাব, বা অভাব বিশেষ, যখন জাতিমধ্যে সর্ব্বত্র পরিচালিত হইয়া, জাতীয় আকার ধারণপূর্ব্বক সকলকে সমান উত্তেজিত করিতে থাকে; তখনই, সেই অভাব সমূহ বা অভাব বিশেষ পরিপূরণার্থে সর্ব্বত্র সমধর্ম্মী যে শক্তিসঞ্চালন, তাহা হইতে উৎপন্ন সহানুভূতি ও যৌগিকাকর্ষণের ফলে কর্ম্মক্ষেত্রে জাতীয় একতার উৎপত্তি হয়; এবং একবার এ জাতীয় একতা উৎপাদিত হইলে, জগতে মনুষ্যশক্তিসাধ্য এমন কোন্ কার্য্য, অথবা কোন্ জাতীয় শ্রী আছে, যাহা সুসাধিত না হইতে পারে? বাঞ্ছারাম, এইরূপেই জাতীয় একতার উৎপত্তি হয় এবং ইহাই জাতীয় একতা। এ একতা দ্বারা প্রতি জাতীয়স্থ ব্যক্তি ভ্রাতৃবৎ পরিলক্ষিত হইতে থাকে; এবং এখন তুমি যে বিশ্বাসের অভাবে কোন প্রকার সমবেতসাধ্য কার্য্যে পারগ হইতে পারিতেছ না, তখন দেখিবে সেই বিশ্বাস অপনা,আপনি কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়। সমবেত সাধন তখন অনায়াসসাধ্যের মধ্যে গণিত হয়। এ জাতীয় একতা, কেবল বিশ্বাসশূন্য মৌখিক চীৎকার, সভাসমিতি বা বচনবাগীশীতে সম্পন্ন হয় না। সেরূপে একতা সাধন করিতে যাওয়া কেবল পণ্ড শ্রম মাত্র; যে শ্রমে অন্য অনেক সৎকার্য্যের সিদ্ধি হইতে পারিত। একতা সাধন করিতে চাও? তবে আবার বলি, শূন্যহৃদয়, শূন্যমন, কেবল বচনবাগীশী বা বিলাপ পরিতাপ করিলে কিছুই হইবে না। বিলাপ, পরিতাপে কখনই কিছু হয় না; কেবল আহা উহ করিলে, কেবল কাঁদিলে, কেবল পরের

মুখ দেখিয়া করুণা করিলে, কাজ হয় না। মানুষ হইয়া শিশুর আচরণ করিলে, কে কবে তাহাতে সহানুভূতি প্রকাশ করে? যদি করে, তবে সে কেবল দূর দূর, ছেঁই ছেঁই! বাপু নীডিংম্যান, তুমি উন্নত, একতা সাধন জন্য তুমি কিছু অধিক ব্যস্ত, এবং বলিতে কি তাহার চেষ্টা তোমার কর্ত্তব্যও হইতেছে; কিন্তু এরূপ মিছা চীৎকারে কি হইবে, ক্ষণেক ক্ষান্ত হও, চুপ কর, কথা শুন, অভাব অনুভব কর, হৃদয় পূর্ণ কর, তদনন্তর যাও, দেশে দেশে যাও, দুয়ারে দুয়ারে যাও, যাহাতে একতা সাধন হইতে পারে তাহার মূল মন্ত্র যাহা তাহা জাগ্রত করিতে শিখগে, শিখাওগে। দেখ, ইউরোপীয় রাজনৈতিকেরা কেবল আপন আপন দলমাত্রের উদর-পোষণ হেতু কেমন অক্লিষ্ট মনে দুয়ারে দুয়ারে বেড়াইতেছে; আর তুমি তোমার দেবারাধ্যা জন্মভূমির শ্রী-পোষণ হেতু দুয়ারে দুয়ারে বেড়াইতে পার না? কিসের আশঙ্কা তোমার? জাননা কি, আশঙ্কা অনভ্যাসে জন্মিয়া থাকে; অভ্যাসে জীবন বলিদানও আমোদের মধ্যে পড়িয়া যায়? মরণের ভয় বা যে কোন ভয় বা যে কোন বিষয়, অভ্যাস এবং প্রথায় হয়; অভ্যাস এবং প্রথায় যায়। দেখ অভ্যাসের গুণে যে পঞ্জাবী কিছু দিন পূর্ব্বে সকল শাসনের বাহির যে কাবুলী, তাহাকেও শাসন করিয়াছে; আজিকে আবার সেই পঞ্জাবী চুনোগলির চড় খাইয়া চোখের জলে বুক ভাসাইতেছে! যে রাজপুতক্ষেত্রে ইংরাজ টড্ প্রতি-পদক্ষেপে থার্ম্মপিলি ও মারাথন-ক্ষেত্র দেখিতে পাইত, সেই রাজপুতবংশ অভ্যাসদোষে এখন লম্বোদর, আফিংভোজী, কাপুরুষ, আচারে এবং আকারে বাইজীর ভেড়ুয়া বা তবলাদার! দেখ, অভ্যাস-অনভ্যাসের এমনই গুণ। এ গূঢ় রহস্য দেখিয়াও প্রবুদ্ধ হইবে না কি? বুদ্ধিমানের প্রবুদ্ধ হইতে কয় দিন লাগে। বুদ্ধিমান যদি তুমি, যাও তবে, এ মহাব্রত অবলম্বন কর গিয়া; দীক্ষিত কর, দীক্ষিত হও; একতার মূল ও মহামন্ত্র ঘরে ঘরে শিখাও। ইহাতে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হইবেন, দেশাধিপতি সন্তুষ্ট হইবে: প্রজার উন্নতিতে রাজ্যেশ্বরের লাভ ভিন্ন লোকসান নাই। আবার জিজ্ঞাসা করি, বুঝিয়াছ কি যে একতা শিখাইতে 'একতা' শব্দের আবশ্যক হয় না? পুনশ্চ নিম্ন শ্রেণীকে আহার ব্যবহারে উন্নত করিতে

চেষ্টা কর, যদ্দারা সে তোমার অভাবের অংশভাগী হইতে পারে; উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত কর, যদ্দারা তোমার অভাবজনিত একতায় সে যোগদান করিতে আগ্রহযুক্ত হয়, এবং যদ্দারা সে আপন কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে প্রবৃত্ত হইতে সক্ষম হয়। তাহাদের ফেলিয়া তুমি অগ্রসর হইলে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিবে না; তুমি চিত্তস্বরূপ, তাহারা হস্ত; চিত্তে সহস্র ইচ্ছা ও সহস্র অনুরাগ থাকিলেও, হস্ত যদি বেবশ হয়, তবে কোন কার্য্যই হইতে পারে না। তাহার পর তুমি নিজে উন্নত হও, যদ্দারা তোমার অধস্তনবর্গ তোমার সহবাসরক্ষার্থে দেখা দেখিও উন্নতি লাভ করিতে পারে। চেষ্টা কর, চেষ্টা কেবল চেষ্টা, চেষ্টায় কি না হয়, যত্নে কি না ফলে?—"কঃ ঈপ্সিতার্থস্থিরনিশ্চয়ং মনঃ, পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ।"

অতঃপর বাঞ্ছারাম, সুশিক্ষা দ্বারা চিত্তপ্রশস্ততা লভিয়া, আত্মসংস্কারের দ্বারা আত্মশুদ্ধি সাধিয়া, এবং কর্ত্তব্যবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া, কি শারীরিক কি মানসিক, তোমাতে নিহিত তাবৎ শক্তির যে সমগ্র সঞ্চালন, তাহারই নাম সাধনা বা কার্য্য; এবং এরূপ শক্তিসঞ্চালন হইতে যে পদার্থ রূপ গ্রহণ করে বা নির্ম্মিত হয়, তাহার নাম সাধনফল বা কর্ম্ম। এই কর্ম্ম করিবার জন্যই, আমাদিগের এ জগতে আগতি; এবং ইহার প্রতি ঔদাস্য করিলেই আমাদিগের অধোগতি ও অগতি। যতক্ষণ দেখিবে যে মানব বা যে জাতি কর্ম্মপরায়ণ; ততক্ষণ নিশ্চয় জানিবে, সে মানব বা সে জাতির দুর্ভাগ্য বা অধঃপাতের সম্ভাবনা নাই। সহস্র বিপৎপাত হইলেও, সে তাহা হইতে উদ্ধার হইয়া উঠিতে পারিবে; সত্যের আশ্রয় থাকিলে, বিপদ্ ঊর্দ্ধসংখ্যায় ক্ষণেক কাল মাত্র মেঘাচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে সমর্থ হয়, তদতিরিক্ত আর কিছু করিতে পারে না। কিন্তু যখন দেখিবে কর্ম্ম ঘুচিয়া তাহার স্থলে অকর্ম্মের আরম্ভ হইয়াছে, তখনই জানিবে যে সে মানব বা সে জাতির অধঃপাতে যাইবার দিন সেই পরিমাণে নিকট হইয়া আসিতেছে। এখন, এই হিসাবে, আমাদের সমাজের প্রতি একবার তাকাইয়া দেখ, তথায় কি হইতেছে। তথায় কি শিক্ষা, কি আত্মসংস্কার, কি কর্ত্তব্যবুদ্ধি, কি কর্ত্তব্যবুদ্ধির মূল ঈশ্বরে বিশ্বাস, কি শক্তিসঞ্চালন, ইহার কিছুরই গূঢ় এবং সাত্ত্বিক মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়ার যো নাই।

শিক্ষা যাহা তাহা চাকুরীর উপযুক্ত লিখন পঠন শিখিতে; আত্মসংস্কার যাহা তাহা লোক ভুলাইতে; কর্ত্তব্যবুদ্ধি যাহা তাহা উদরপূর্ত্তি করিতে এবং শক্তিসঞ্চালন যাহা তাহা চাকুরী রাখিতে। যে কয়েকটী পদার্থে মনুষ্যকে দৃঢ় এবং প্রকৃতিস্থ করিতে পারে, তাহার সকলগুলিরই যেখানে অভাব, সেখানে আর কি বলিবার আবশ্যক হয় যে কি জন্য তোমার ভারতীয় সমাজ প্রলয়বাত্যাবিতাড়িত ঘোর প্রলয়ঘূর্ণাবর্ত্তমধ্যে ওতপ্লুত হইয়া হাবু ডুবু খাইতেছে; কেনই বা এখানে নানা বিষয় একাকারে উদ্ভাসিত হয় অথচ একটীও তাহার গোটা বাঁধে না; কেনইবা এখানে তাবৎ বিষয় মৌখিক, আভ্যন্তরীণ জীবনব্রত একটীও হয় না এবং কেনই বা এখানে সমবেত সাধন কথা মাত্র, সমবেতসাধ্য কার্য্য একটীও, কখন সম্পন্ন হয় না? যেখানে সকলেই নিয়মশূন্য প্রলয়প্রতিরূপ, সেখানে কে কাহার উপর স্থির বিশ্বাস করিতে বা করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারে।

কর্ম্ম শ্রমসাধ্য; কিন্তু তুমি আয়েসবিলাসী। তুমি ভাবিতেছ, কর্ম্মের জন্য ভোগফল যাহা তাহা বহুদূরে; আপাততঃ কেবল খাটুনী সার মাত্র, কেবল আমার আয়েস আরামের ব্যাঘাত; অতএব রেখে দাও তোমার কার্য্য কর্ম্ম! নির্ব্বোধ, তাহা নহে। 'আপাতত' ধরিলেও, বৃথা খাটুনী নহে। গৌণ ভোগের কথা ছাড়িয়া দিলেও, কর্ম্মের নিকট-ভোগ বিস্তর; ইহার মধ্যে আরও একটী শ্রেষ্ঠ বিষয় এই, তোমার অকর্ম্মা আয়েস আরামের পরিণাম যাহা তাহা শোচনীয়, কিন্তু এ নিকট-ভোগের পরিণাম যাহা তাহা উত্তরোত্তর সুখকর। এ জগতে যাবতীয় কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে এক একটী আনুষঙ্গিক সুখও ঈশ্বর নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন। তোমার নৈমিত্তিক কার্য্যের কথা ছাড়িয়া দাও; নিত্য কার্য্যের মধ্যেই দেখ,—তোমার শরীর রক্ষার্থে আহার গ্রহণ, বংশরক্ষার্থে সন্তানোৎপাদন, লোকযাত্রাবশে সংসারী হওন, ইত্যাদি তোমার নিত্যকার্য্য; কিন্তু দেখ ইহার সঙ্গে সঙ্গে কতটা আশু সুখ আশু তৃপ্তি নিহিত করা রহিয়াছে; এত পরিমাণে নিহিত আছে ও তাহা এত চিত্ত-আকর্ষক যে, কখন কখন তুমি সেই গুলিকেই সুখের চরম ভাবিয়া, তাহার অতিরিক্ত উপার্জ্জনের আশায় ধাবিত হওত, আত্মধ্বংসে অগ্রসর হইয়া থাক। যেমন আশু সুখ

দেখিতেছ আহার বিহার সংসারাদিতে; এ জগতের যাবৎ কার্য্যেই কার্য্যের পরিমাণ অনুরূপ, সেইরূপ আশু সুখ নিহিত করা রহিয়াছে। তাহাও আবার এক প্রকারে নহে, নানা প্রকারে; তোমার সুকার্য্যে সুখ্যাতি, মহৎকার্য্যে মহত্ত্ব,পরোপকারে যশ,এ সকল আবার সাক্ষাৎসম্বন্ধে আশু সুখের উপর অনিত্য ভোগ্য পদার্থ। ইহার পর আরও কি বলিবে, কর্ম্মাবদ্ধ বৃথা খাটুনী? বাঞ্ছারাম, যদি সুখ ও তৃপ্তি প্রাপ্তিই উদ্দেশ্য হয়, তবে তাহার প্রাপ্তি কঠিন নহে, কিন্তু কঠিন মনের বাধা ঘুচাইয়া তাহার উপায় স্বরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া, পুনশ্চ ইহাও বলি, সকল ধাঁধা নিরসনের উপায় আবার একমাত্র কর্ম্মে প্রবৃত্তি। তুমি যাহাকে আয়েস আরাম বল, তাহা যথার্থ আয়েস আরাম নহে, উহা কোন এক বা তদধিক ভোগ্য বিষয়ের অতিরেক বা বীভৎস ভাবে গমন ও তদ্দ্বারা আত্মধ্বংসের পথ পরিষ্কারকরণ মাত্র।

তাহার পর,এ সকল কার্য্য এবং তাহার আশু সুখ ও আয়েস আরামের অতীতে,আরও কতকগুলি অতিমহৎ কর্ম্ম আছে,যাহার আনুষঙ্গিক অপর কোন আশু সুখ নাই; যাহা আছে তাহা কেবল একমাত্র চিত্তপ্রসাদ। এ কথা কেবল অতিমহৎ কর্ম্মসমূহের পক্ষে খাটে, সেরূপ কর্ম্মের সাধক যাহারা তাহারা ক্ষণজন্মা। ঈশ্বর যে এ সকল কর্ম্মের সঙ্গে অন্য কোন আশু সুখ নিহিত করেন নাই, তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, তিনি জানেন যে, এ সকল মহৎ কর্ম্ম সম্পাদনার্থে যাহারা নিযুক্ত, তাহারা তেমন স্বল্পপ্রাণ ও ক্ষুদ্রমনা নহে যে তাহাদিগকে খাড়া রাখিবার জন্য, বালকবৎ আনুষঙ্গিক সুখামোদ ও তৃপ্তির প্রয়োজন হয়। এরূপ মহামনারাই সাধারণত জগদ্‌গুরুপদবাচ্য হইয়া থাকেন। মহচ্চিত্তগণ ফলের প্রত্যাশা রাখেন না।

এক্ষণে কর্ম্মসংসারের মধ্যে কোন্ কর্ম্মে তুমি পারগ, কোন্ কর্ম্ম তুমি করিবে, কোন কর্ম্ম তুমি করিবে না বা কোন কর্ম্ম তোমার করা উচিত, তাহার নির্ব্বাচন বা নিরূপণ পক্ষে আমি কি বলিব? দেশ কাল ও পাত্র এবং শিক্ষাশক্তি ও যোগ্যতা, এতদনুসারে যে কর্ম্মে তুমি পারগ, যাহা তুমি চেষ্টা করিলে হস্তায়ত্তে আনিতে পার, তাহাই প্রাণপণে

সাধিবে; অপর যাহা যাহা তাহার প্রতিকূলতা করে, তাহার পরিহার বা তাহাকে বিদূরিত করিবে; ইহাই তোমার কর্ত্তব্য। মনুষ্যশক্তি সর্ব্বদাই অসীম এবং অনন্তমূর্ত্তিবিশিষ্ট; তাহাকে আপাদমস্তক অনুজ্ঞা বা নিয়ম-গণ্ডি দ্বারা আবদ্ধ করিতে যাওয়া মহাভ্রমের কার্য্য। শক্তিপরিচালনের সূত্র প্রদর্শন ও পরিচালনের ধারা বাঁধিয়া দেওন; এবং তাহা হইতে যাহাতে চ্যুত না হইতে পারে, এই পর্য্যন্ত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। পরিচালকের নিকট পরিচালিতেরও অধীনতা সেই পর্য্যন্ত। তদতিরিক্তে কি ধর্ম্ম কি আইন, যাহা দ্বারাই দৃঢ় বাঁধিতে যাইবে, তাহাতেই কেবল অনর্থের উৎপত্তি হইতে থাকিবে। মানব সর্ব্বত অধীন হইয়া সৃষ্ট হয় নাই; সুতরাং তাহাকে সর্ব্বত অধীন করিতে গেলে, প্রতিঘাতে বিপরীত ক্রিয়ার উৎপাদন হইয়া থাকে। নিয়ম এবং স্বাধীনতা, এ দুয়ের সামঞ্জস্য হওয়া উচিত। ইহা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছ যে,যেখানে ধর্ম্ম বন্ধনের গোঁড়ামি অধিক, সেই খানেই অধিক অনর্থোৎপত্তি; যেখানে আইনের কঠোরতা অধিক, সেই খানেই অপরাধের সংখ্যা বেশি এবং অপরাধের আকারও গুরুতর; যেখানেই দপ্তর-নিয়মের চাপাচাপি, সেই খানেই গোঁজামিলান পাটোয়ারীপণার বাহুল্য। দেখ, ইংরাজী ছাঁদনী বাঁধুনী আইনের ফল, দেশশুদ্ধ মিথ্যাপ্রাণ মামলাবাজী; ইংরাজী দপ্তর-নিয়মের ছাঁদনী বাঁধুনীর ফল, কেবল রিপোর্টপ্রাণ ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট; ধর্ম্মবন্ধনের গোঁড়ামীর ফল, ভারতের আধুনিক অধঃপতন; আর ভারতীয় রাজশাসনের ফল, মহৎপ্রাণের দূরভাব! অতএব মনুষ্যশক্তিকে ছন্দোবন্ধে আবদ্ধ করা সর্ব্ব অনিষ্টের মূল। কেবল কর্ম্মোপযোগী করিয়া দিবার নিমিত্ত ছন্দোবন্ধের প্রয়োজন; কিন্তু কর্ম্মনির্ব্বাচন ও সাধনস্থলে, পূর্ণ স্বাধীনতার একান্ত আবশ্যক বলিয়া জানিবে।

কিন্তু এই সুযোগে এখানে এই একটী কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। কোন একটী কার্য্য আপাতত সুকার্য্য বলিয়া দৃষ্ট হইলেও, সহসা তাহার মোহে মোহিত হইও না। যে কার্য্য কেবল তোমার সুখ বা শুভ উৎপাদন করে, কিন্তু সমাজ যাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহা সুকার্য্যরূপে দৃষ্ট হইলেও সু নহে। দেখ, দাতৃত্ব সুবৃত্তি এবং দান করা সুকার্য্য;

কিন্তু যদি অপাত্রে দান কর, তবে আর তাহা সুকার্য্য রহিল না। হইতে পারে সেরূপ দান করায় তোমার মনে কিঞ্চিৎ সুখোৎপত্তি হয়, কিন্তু সমাজ তাহাতে সমূহরূপেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়; কারণ, সেরূপ দানে আলস্যের প্রতি উৎসাহ হওয়ায় অলসতার বৃদ্ধি হেতু যতগুলি লোক ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে, সমাজ এক দিকে ততগুলি লোকের শ্রম এবং শ্রমোৎপন্ন ফলে বঞ্চিত, অন্য দিকে ততগুলি লোকের ভারে ভারগ্রস্ত হয়। ঐরূপ ক্ষমা করা একটী সৎকার্য্য; কিন্তু অননুতপ্ত দুষ্টকে ক্ষমা করিলে, আগে সে সঙ্কুচিত থাকায় যেখানে একটা দুষ্টামী করিত, এখন সে অসঙ্কুচিত হওয়ায় একটার স্থানে পাঁচটা দুষ্টামী করিবে; অতএব দেখ ইহাতে সমাজের লোকসানের ভাগ কত অধিক। এইরূপ দৃষ্টি তাবৎ কার্য্যে রাখা উচিত। যে কার্য্য নিজ এবং সমাজ উভয়ের সুখ বা শুভোৎপাদক, তাহা উত্তম; যাহা কেবল নিজের সুখোৎপাদক কিন্তু যাহাতে সমাজের শুভ বা অশুভ কিছুই ঘটে না, তাহা মধ্যম; যাহাতে কেবল নিজের সুখ কিন্তু সমাজের যাহাতে অসুখ তাহা অধম,—এখানে নিজের সুখের প্রতি ত্যাগস্বীকার আবশ্যক; আর যে কার্য্যে নিজেরও অসুখ সমাজেরও অসুখ, তাহা অধমাধম। সমাজ যদিও উচ্ছৃঙ্খলতা ও মতিচ্ছন্নতা হেতু সকল সময়ে ঐ সকল কু ও সু কার্য্যের মর্ম্মগ্রহ করিতে না পারুক, তথাপি তুমি, তোমারি আত্মকর্ত্তব্যবোধ অনুসারে যাহা সুকার্য্য বলিয়া স্থিরীকৃত, তাহা করিয়া যাইবে; সমাজ এখন তাহা বুঝিতে না পারিলেও, যখন তাহার মতিচ্ছন্ন ভাব বিগত হইবে, তখন তাহা বুঝিতে পারিবে। সমাজের শুভাশুভের প্রতি দৃষ্টি রাখা সম্বন্ধে সহজ কথায় তোমাকে এই একটী সঙ্কেত বলিয়া দিতেছি যে, পরিবারস্থ থাকিয়া পিতামাতার সুখাসুখের প্রতি দৃষ্টি রক্ষা পূর্ব্বক যেরূপ আত্মচালনা ও ত্যাগস্বীকারাদি করিয়া থাক, সমাজ সম্বন্ধেও অবিকল সেইরূপ করিবে; সমাজও তোমার পিতৃমাতৃস্থলীয়, এবং ভারতসন্তানের পক্ষে শুধু আবার পিতৃমাতৃস্থলীয় নহে, বৃদ্ধ বায়ান্তরে প্রাপ্ত অবুঝ পিতৃমাতৃস্থলীয়; কিন্তু তা বলিয়া কি হইবে, পিতা যাহাই হউন তথাপি তিনি—"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ"; আলেকজাণ্ডারের এক কৌটা মাঙ্

অগ্রুতে আস্তিপেতরের শত শত পত্র বানের মুখে ভাসিয়া গিয়াছিল!
বিশেষ সমাজের লোকসানে তোমার লোকসানও ত কম নহে; বরং অন্য-
বিধ লোকসানের অপেক্ষা অপার গুণে অধিক। ভারতসন্তান, আরও
একটী কথা স্মরণ রাখিও, সত্ত্ব-রজ-তম এই ত্রিগুণসমাবেশে জগৎসৃষ্টি, এই
ত্রিগুণসমাবেশে তোমার সৃষ্টি; অতএব তোমার কর্ম্মস্থলীতে এই তিন
গুণেরই সার্থকতা হওয়া আবশ্যক, নতুবা তোমার কর্ম্মজীবন বিফল
হইয়া যাইবে; কেবল সত্ত্বগুণের মোহিনী মূর্ত্তিতে মোহাভিভূত
হইও না।

এখানে আরও একটী কথার অবতারণা করা আবশ্যক। আমাদের
সাধনাস্থলে আর কতকগুলি এমন বিঘ্ন আছে, যাহা আমাদের সদিচ্ছা
সত্ত্বেও বিন্দুমাত্র অনবধান বা বিবেচনার দোষে উপস্থিত হইয়া, প্রায় সমস্ত
নষ্ট করিবার উদ্যোগ করিয়া থাকে। উহা, বলিতে গেলে, বস্তুত সাধনার
জন্য অবলম্বিত উপায়ের মধ্যে কোন এক ত্রুটি বিশেষের ফল মাত্র। কি
শারীরিক কি মানসিক, যন্ত্রগুলি যখন সামঞ্জস্য সংমিলনে ক্রিয়া নিষ্পাদন
করিয়া থাকে, তখন তাহা স্বাস্থ্যের চিহ্ন; সুতরাং পরিণামফলও সুন্দর
হইয়া থাকে; তদন্যতরে রোগ, পরিণামফলও তদ্রূপ হয়। কথিত
বিঘ্নগুলি, সামঞ্জস্যচ্যুত চিত্তবৃত্তি বিশেষের অযথা অনুসরণ হইতে উৎপন্ন
হইয়া থাকে; তন্মধ্যে অতি কল্পনা এবং অতি আশা এই দুইটী প্রধান
অনিষ্টকারী। অতি কল্পনার মোহ অতি দুরন্ত; ইহার মূর্ত্তি আশু-মনো-
হারী সুতরাং সহসা আকৃষ্ট করিয়া থাকে। মানব ইহার মোহে পড়িয়া
অকর্ম্মণ্য খেয়ালী হইয়া যায় এবং সেরূপ মানবের অনুষ্ঠানে সর্ব্বদাই 'বহ্বা-
রম্ভে লঘুক্রিয়া' অভিনীত হয়। এমনও দুর্ভাগ্যবান কল্পনাপ্রিয় অনেক দেখা
গিয়াছে, যে, যাহারা কেবল উপন্যাস পড়িয়া, উপন্যাস সংসারে বিচরণ
করত, সত্য সংসারের প্রতি বীতরাগ হয়; বিপুলা অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে
থাকিয়াও, একটা সামান্য কল্পিত সৃষ্টির মোহে মোহিত হওত, একবারে
অকর্ম্মণ্যতায় আসিয়া উপনীত হয়। অতি পরিতাপের বিষয় বলিতে
হইবে! 'সত্য বটে কল্পনা সর্ব্ব মঙ্গলের নিদান ও প্রসূতি স্বরূপ কিন্তু তাহাও,
জানিবে, কল্পনা যতক্ষণ লাগামসংযুক্ত; যতক্ষণ তাহা কর্ম্মভূমির সীমা

ত্যাগান্তে শূন্যপথে প্রধাবিত না হয় ; যতক্ষণ অপরাপর মানসিক বৃত্তি সহ সামঞ্জস্যচ্যুত হইয়া না যায়।

অতি আশার পরিণাম নিরাশা ; নিরাশার পরিণাম অকর্ম্মণ্যতা এবং জগতের প্রতি বিদ্বেষভাব। আশা অনন্ত হইলেও, দেশ কাল ও যোগ্যতা অনুসারে পরিমাণ করিয়া লওয়া আবশ্যক, নতুবা তাহা নানা বিঘ্ন উপস্থিত করিয়া থাকে। ভারতসন্তান আশার পরিমাণ করিতে না জানিয়া, এক্ষণে নিরাশায় মগ্ন হইয়া আছে ; কোন দিকেই সম্ভবতা বা কোন দিকেই সফলতা দেখিতে পাইতেছে না। বাঞ্ছারাম, ইহাই না এখন তুমি সর্ব্বদা ভাবিয়া থাক ;—যথায় কোটি কোটি মানব সমবেত, এবং যথায় জাতীয় কার্য্য কোটি কোটি মানবের সমবেতসাধ্য, তথায় আমি একা ক্ষুদ্র মানব যত্ন ও শ্রম করিলে কি গণনায় আইসে বা কি করিয়া তুলিতে পারি ? বাপু, আশার আয়তন দিগন্ত প্রসারিত করিয়াছিলে, এখন তাহার প্রত্যাবর্ত্তে জড়িত হইয়া, এ নিরাশামগ্ন হইতেছ কেন ?—কোটি মানবের ভার একা লইতে তোমাকে কেহ বলে নাই। সে ভার যাহারা লইতে পারে, তাহারা লউক ; কিন্তু তুমি আপন ভারে কতদূর ভারমুক্ত হইয়াছ বলিতে পার ?—তাহাত তোমার কাজ, সে ভার ত অন্যে লইবে না। প্রত্যেক ব্যক্তির আপন ভারে ভারযুক্ত জ্ঞান ও আপন ভারে যথাবিধি সাত্ত্বিক ভাবে ভারমুক্ত হইতে পারিলেই যে যথেষ্ট হইল ; কাজ কি তোমার অন্যের খোঁজ লইয়া। তুমি আপন খোঁজ পূর্ণ ভাবে লইতে শিখ, আপন শক্তি যথা পরিমাণে যত দিকে তুমি চালাইতে সক্ষম তাহাতে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে। তবে জাতীয় কার্য্য ? বিদ্যুৎবজ্রঘোষী ধারাবর্ষী মেঘ একেবারে সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হয় না। এক একটী নগণিত বাষ্প সম্বন্ধবিচ্ছিন্ন ভাবে, নানা দিগ্‌দিগন্তে নানাস্থানে নানা দেশে উত্থিত হইয়া, শেষে প্রবাহ বায়ুযোগে একত্রীকৃত, অনন্ত কোটি নিঃসম্বন্ধ বাষ্প সংযোজিত ও সম্বন্ধযুক্ত হইবায়, আজিকে মেঘমূর্ত্তিতে তোমার ঘর ও দেশ ভাসাইবার জন্য, আকাশমণ্ডলে সমাগত হইয়াছে। তোমারও কর্ম্ম সকল যদিও এখন নিঃসম্বন্ধ, নির্জ্জন, নগণিত বাষ্পবৎ ; কিন্তু সর্ব্বদা তাহারা সেরূপ নিঃসম্বন্ধ থাকিবে না। নৈসর্গিক নিয়ম

সেরূপ নহে। জানিবে, সত্বরেই একজাতীয় প্রকৃতি হেতু, প্রতিব্যক্তির অভাব জাতীয় অভাবে পরিণত হওয়ায়, তদুৎপন্ন একতারূপী প্রবাহবায়ু উপস্থিত হইয়া,প্রতিব্যক্তিগত কর্ম্ম, যাহা এখন নগণিত বাষ্পবৎ, তাহাদের একত্রীকরণে, মহামেঘ মূর্ত্তি রচনা করিয়া কালে ধারা বর্ষণ করিতে থাকিবে; এবং যে পাহাড় পর্ব্বত এখন দুর্ভেদ্য বলিয়া জ্ঞান হইতেছে, কালে তাহাও সে তরঙ্গাভিঘাতে ভিন্ন এবং ভগ্ন হইয়া যাইবে।

এখন তোমার পক্ষে মোটের উপর কথা এই, তোমার কাজ তুমি করিয়া যাও; পরের কাজ পরে দেখিবে; তোমার স্বনিহিত শক্তির যথা-সম্ভব সদ্ব্যবহার হইলেই যথেষ্ট। বিশেষ তোমার পাপ পুণ্যের অপরে যখন কেহ ভাগী হইবে না; এবং স্রষ্টার নিকট প্রাপ্য যাহা, তাহা সমস্তই যখন তোমার নিজের; তখন অন্যের দিকে তাকান বা অন্যের দিকে তাকাইয়া নিরাশ হওয়ার আবশ্যক? তুমি আপন মনে আপনি কার্য্য করিয়া যাও; অপর কোন সৎকর্ম্মশীল তোমার নিকটস্থ হইলে, সমধর্ম্মী যৌগিকাকর্ষণের ফলে, দেখিবে, সে আপনা হইতে আসিয়া অতর্কিত ভাবে তোমাতে সম্মিলিত হইবে; ও তুমিও অতর্কিত ভাবে আগু হইয়া সম্মিলিত হইয়া যাইবে। অতএব নিরাশায় মাতিয়া সকল পণ্ড করিও না; অথবা অপরিমিত আশাতে মজিয়াও সকল বিনষ্ট করিও না। পুনশ্চ মহৎ কর্ম্মপক্ষে ইহা জানিবে যে, মহত্ব সহসা পরিচিত হয় না, মহৎ কর্ম্মমাত্রে সহসা ফলযুক্ত হয় না। মহত্ব পরিচিত হইতে, বা মহৎকার্য্য ফলযুক্ত হইতে দেখা গিয়াছে যে বর্ষ, বহুবর্ষ, শতাব্দী, বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত অতিবাহিত হইয়া যায়। কথায় বলে এ পৃথিবীতে শয়তানেরও প্রতাপ অর্দ্ধেক: যদিও মহত্ব অবিনাশী, তথাপি তাহার প্রচার হইবা মাত্র, তাহাকে বিলোপ করিবার জন্য চারিদিক হইতে শয়তানী ফৌজ আসিয়া ঘিরিয়া বইসে। প্রথমে সাময়িক তাচ্ছিল্য, উপহাস বা অশ্রদ্ধা আসিয়া আক্রমণ করে। কালে তাহারা হটিলে, তখন ভক্তির ভেক ধরিয়া পেসাদারী টীকা, টিপ্‌নি, ব্যাখ্যা প্রভৃতি আসিয়া নানা আড়ম্বরে মহত্বের অর্থ বিরূপ করিয়া তাহার অভিপ্রায় অসিদ্ধ করিতে চেষ্টা পায়। তার পর তাহারাও যখন দূর হয়, তখন মহত্বের অর্থ কিছু

কিছু হৃদয়ঙ্গম ও ফলপ্রসূ হইতে থাকে। দেখ, এই সকল পুনক্ষে শত্রু দূর করিতেই কতদিন যায়; তাহার পর অন্য কথা। কিন্তু হইলইবা বাঞ্ছারাম, ক্ষতি কি তাহাতে? কারণ, কর্ম্ম যাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ্যর্থে, সংসার তাঁহার অনন্ত; সুতরাং যোগ বিযোগ জন্য চলিয়া যথাকালে ফলবান হইতে দেশ এবং কাল কিছুরই অকুলান পড়িবার সম্ভাবনা নাই। কেবল এই পর্য্যন্ত জ্ঞাত থাকিও, সৎকর্ম্ম যতটুকু হউক, একবার কৃত হইলে আর তাহার লোপ নাহি; তাহা আবশ্যক কালের জন্য অনন্ত গৃহে জমা হইতে থাকিবে; যথানিয়ম তথায় তাহা অঙ্কুরিত, বর্দ্ধিত, অনন্ত ফলে ফলযুক্ত ও প্রতিপ্রসবে অনন্ত বিস্তারে বিস্তার প্রাপ্ত হইতে চলিবে। তুমি অনন্ত ক্ষেত্রে সুবীজমুষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাক; তাহার পর তাহা অঙ্কুরিত, বর্দ্ধিত ও ফলবিশিষ্ট হইতে দেখা যাঁহার কার্য্য তিনি দেখিবেন। তজ্জন্য অনুরোধ অননুরোধ উভয়ই সমান। অতএব, আবার বলি, আশু ফলের দেখা না পাইয়া নিরাশ-মগ্ন হইও না। তোমার অস্তিত্বের যে সার্থকতা তাহা প্রধানত কর্ম্মসংগ্রামে রতি বা বিরতির পরিমাণে।

অতঃপর ভারতসন্তান, আর কি সাধনার কথা বলিব? বলিবার অনেক ছিল: যদি দ্বৈপায়নের ন্যায় তত্ত্বদর্শী এবং গেটের ন্যায় বাক্যবিশারদ হইতাম, তাহা হইলে কতক বলিতে সক্ষম হইতে পারিতাম। কিন্তু আমি বিদ্যাশূন্য, বুদ্ধিশূন্য, শব্দশাস্ত্রে জ্ঞানশূন্য, সর্ব্বশূন্য, আমার সে সামর্থ্য কোথায়? তবে সহজ কথায় সত্যবিশ্বাসে যাহা যাহা মনে আসিল তাহা তোমাকে বলিলাম; তুমিও সত্ত্যমনে সাত্ত্বিকী বুদ্ধিতে শুনিও। এখন আবার একবার অনুরোধ করি, নিজ গৃহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, তোমার সাধনার আবশ্যক কতদূর। সিদ্ধি ভিতর হইতে আইসে, বাহির হইতে আইসে না,—'কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা।'

যে পাষণ্ডতার স্রোতোবেগ দেশ আকুলিত করিতেছে, যাহার প্রভাবে সকলই খণ্ড খণ্ড, কেবল উঠিতেছে পড়িতেছে এবং গঠনের কোথাও চিহ্ন বা আশা মাত্র নাই; কতদিনে যে তাহার বেগ ফিরিবে তাহা কে বলিতে পারে? ভারতসন্তান, আর ঘুমে মত্ত হইও না, আর নাস্তিকতার মিছা

ঘোরে ঘুরিও না। নাস্তিকতা ভ্রম। ঈশ্বর এখনও সেই জ্যোতির্ম্ময় সিংহাসনে সমাসীন থাকিয়া রাজত্ব করিতেছেন; এখনও তিনি বিশ্বসহ তুমি আমি পিপীলিকা পরমাণুটীকে পর্য্যন্ত পরিচালিত করিতেছেন। কুতর্কে ভুলিও না। কখন কখন কুতর্কে ভুলিয়া যে প্রকৃতিতে সমস্ত আরোপ করিতেছ, যাহাকে তোমার সর্ব্বেসর্ব্বা শিক্ষয়িত্রী বলিয়া মানিতেছ, তাহারই শিক্ষা অবলম্বন কর; সেই তোমাকে তোমারই কৃত কার্য্যের দ্বারা শিক্ষা দিবে যে, কর্ত্তা ব্যতীত, চিত্ত ব্যতীত, কর্ম্ম সম্ভবে না,—তোমারও তদুভয় ব্যতীত সম্ভব হয় নাই; এবং ইহাও শিখাইবে যে এ কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মই তোমার জীবনের একমাত্র পরিমাণ ও উদ্দেশ্য। বিজ্ঞানের কুজ্ঝটিকাতে অন্ধ হইয়া ভাবিও না যে, তাহার পশ্চাতে চিরশ্রুত সূর্য্য এখন অস্তিত্বশূন্য; সেই বিজ্ঞানই তোমাকে শিক্ষা দিবে যে, সূর্য্যতেজে কুজ্ঝটিকার উৎপত্তি, সূর্য্যতেজে তাহার স্থিতি, এবং সূর্য্যতেজেই তাহার কর্ম্মকারিত্ব। তোমার বিজ্ঞানও সেই বিশ্বনিয়ন্তৃ-প্রভব-শূন্য হইলে অকার্য্যকর হইয়া থাকে। মিথ্যা সামাজিকতা পরিত্যাগ কর, আত্মপ্রকৃতিতে প্রকৃতিবান হও, আত্মাবলম্বন কর। এক এক জন লইয়া পাঁচ জন; তবে কেন তুমি সেই পঞ্চকৃত মুখসে আত্মগোপন করিয়া আত্মপ্রকাশে লজ্জিত বোধ করিয়া থাক। যে প্রকৃতি পাঁচ জনে লইতে বলে তাহা লইও না, যাহা ঈশ্বর লইতে বলেন তাহাই অবলম্বন করিও। পাঁচ জন হইতে ঈশ্বর বড়। পাঁচ জনের সুখ্যাতি-অখ্যাতি-নির্ম্মিত পন্থাকে পন্থা বলিয়া গ্রহণ করিও না; তোমার স্রষ্টানিয়োজিত কর্ত্তব্যবোধের উপর কর্ম্মমূল স্থাপিত করিয়া চলিও, এবং তাহাই পন্থা বলিয়া জানিও। এরূপ কর্ম্মমূল অতলস্পর্শ কাল সমুদ্রকে অতিক্রম করিয়া, যে ভিত্তির উপর স্বয়ং কালসমুদ্র স্থাপিত, সেই ভিত্তির উপর আশ্রয় করিয়া থাকে। সুতরাং এরূপ মূলোৎপন্ন কর্ম্ম এবং তাহার যে সার্থকতা, তাহা কালের অপেক্ষা রাখে না।

যে কোন কার্য্য করিবে, চীৎকার করিও না; এত গরমে, এত দূর প্রসারণে, যে কোন পদার্থ বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। নির্ব্বাক হইতে শিখ; শৈত্যে যৌগিকাকর্ষণের বৃদ্ধি হয়, দূরপ্রসারিত বাষ্প ঘনীভূত হইয়া পদার্থ রচনা করিয়া থাকে। নিত্য সংস্করণ, নিত্য সমাজ, নিত্য

বক্তৃতায় তুমি ব্যাপৃত, তাহাতে তোমার আদর ভিন্ন অবমাননা করি না; কিন্তু এই বলি যাহা করিতে হয়, বুঝিয়া করিও; তাহার কর্ত্তব্যভাব এবং আবশ্যকতা অবধারণ করিও। নতুবা অপরে শ্রান্ত হইয়া পিপাসার তাড়নে জলপান করিয়া সুখলাভ করিল; আমিও তাহা দেখিয়া ঘটি ঘটি জলপান করিতে বসিলাম, কিন্তু শ্রান্তি যে তাহার জলপানে সুখের একমাত্র নিদানভূত কারণ তাহার প্রতি একবারও লক্ষ্য করিলাম না; সুতরাং আমার লব্ধফল উদর ফাটিয়া যাওয়া! আর এক কথা, যাহা করিবে তাহা ভারতীয় হইয়া কর, সাহেব হইয়া করিও না; তাহা হইলে প্রকৃতিনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মস্থলার বাহিরে গিয়া পড়িবে। যে সকল লোক ভারতীয় ঘুচিয়া সাহেব হইতে চাহে; তাহাদের পরিধেয় সহস্রমুদ্রাক্রীত এবং আহারীয় লক্ষমুদ্রাক্রীত হইলেও, তুমি নিশ্চয় জানিবে, এই পৃথিবীতে মহত্বের মূল আহার বিহারের অন্তরীতে যদি আর কিছু থাকে, তাহা হইলে তোমার ঐ ছিন্ন বস্ত্র এবং ছিন্ন আহারীয় সত্ত্বেও তুমি তাহাদিগের অপেক্ষা অতুলনীয় মহৎ। তাহারা ভীরু, তুমি তাহাদিগের তুলনে বীরপুরুষস্থলীয়। তাহারা স্বজাতীয় গন্তব্য পথের দুঃখ ক্লেশে ভীত হইয়া, বিধর্ম্মী বিজাতীয় আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে; কিন্তু তুমি বীরভাবে সেই দুঃখ ক্লেশে দৃক্‌পাতশূন্য হইয়া, স্বজাতীয় গন্তব্য পথে গতিশীল হইয়াছ। তাহারা উপহাসের স্থল, তুমি সকরুণ অশ্রু-আকর্ষণের স্থল। কুকুরের কণ্ঠে সোণার কণ্ঠী হইলেও, সে কখন দারিদ্র্যপতিত দুঃখকর্ষিত মানবের সঙ্গে সমতায় আসিতে পারে না। যে জাতীয়ত্ব হেতু স্পার্টান-জননী অকাতরে স্বীয় সন্তানকে সমক্ষে বলিপ্রদত্ত হইতে দেখিয়াছে; যে জাতীয়ত্ব হেতু অপূর্ব্ব তীর্থস্থলী থার্ম্মপিলি ক্ষেত্রের উৎপত্তি; যাহার প্রভাবে রামায়ণের রাম সীতাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; যাহার প্রভাবে উইলেম টেল এবং ওয়ালেসের অদ্ভুত কীর্ত্তি; যাহার প্রভাবে অসভ্য বর্ব্বর মেক্‌সিকো ও পেরুভীয়গণও অকাতরে স্বীয় রক্তধারা বর্ষণ করিয়াছে; এবং যাহার প্রভাবে আধুনিক ভারতীয় ভিন্ন আর যে কোন জাতি অকাতরে রক্তদান করিয়াছে ও করিতে প্রস্তুত; সেই জাতীয়ত্ব যে যে জন যৎসামান্য আপাতত সুবিধার খাতিরে স্বচ্ছন্দে পরিত্যাগ করিতে

কুণ্ঠিত না হয়, মাতৃভাষা পর্য্যন্ত যাহাদিগের নিকট "জড়" বলিয়া ত্যাজ্য হয়, এই জাগতিক কর্ম্মক্ষেত্রে সে সকল লোকের মূল্যই বা কি, তাহাদের পদার্থই বা কোথায়? তাহারা প্রকৃতির গর্ভস্রাব!

সেই সকল অঘোর স্বপ্নে উন্মত্ত হইও না; আশু চাকচিক্য দৃষ্টে ভুলিও না। ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, আত্মজীবনের উদ্দেশ্যে বিশ্বাস কর, তোমার কর্ম্মক্ষমতায় বিশ্বাস কর, এবং কি জন্য তাহা তোমাকে প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে প্রবুদ্ধ হও। ঈশ্বর-প্রীতিকর তোমার কর্ত্তব্য কি তাহার অবধারণ কর;—সুকার্য্য মাত্রই ঈশ্বর-নিয়োজিত। দেখ তোমার সুশিক্ষিত আত্মবুদ্ধিতে এ সংসারে কোন্ কোন্ কার্য্য সৎ এবং মঙ্গলদায়ক, এবং কোন্ কোন্ কার্য্য অসৎ এবং অমঙ্গলদায়ক। যাহা সৎ তাহা বাছিয়া লও। তাহার মধ্যে আবার দেখ, কোন্ কোন্ গুলি তোমার সাধ্যায়ত্ত এবং তোমার মতি গতি ও রুচির পরিপোষক। যে গুলি তোমার সাধ্যায়ত্ত বলিয়া বুঝিবে, এবং যাহাতে তোমার রুচি হইবে, সেই গুলিই তোমার কর্ত্তব্য মধ্যে গণিবে। বহুকার্য্য, অথবা একটীমাত্র কার্য্য, আমূলত হয়ত একই সময়ে, একই উপায়ে, একই প্রকরণে সুসিদ্ধ হইতে পারে না। ভাল, তাহাই হউক। এখন দেখ যে গুলি তোমার কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত, তাহার মধ্যে কোন্টী বা কোন্টীর কোন অংশ, তোমার বর্ত্তমান শক্তি, সময় ও উপায়ে সুসাধ্য হইতে পারে। এরূপ বিচারণায় যে অংশ তোমার আপাতত সুসাধ্য বলিয়া অবধারিত হইবে, তাহাই প্রাণপণে অনুসরণ করিয়া সম্পাদন করিতে যত্নবান হও। দেখিতে পাইবে, উহা সুসম্পাদিত হইতে না হইতে তোমার দ্বিতীয় কর্ত্তব্য যাহা যাহা এবং তাহার উপায় আদিও যাহা, তাহারা আপনা হইতে তোমার সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। প্রাণপণে যত্ন করিও, হেলা করিও না; যেহেতু কে কত খানি কার্য্য করিল তাহা লইয়া পরিমাণ নহে, পরিমাণ কে কতখানি আত্মশক্তির প্রয়োগ করিল। এরূপে কর্ম্মনিরত হও; সমাজও, আজি হউক কালি হউক, যখন বুঝিতে পারিবে, যখন তোমারই অনুরূপ প্রণালীতে কর্ম্ম করিতে শিখিবে, তখন আর তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিবে না। তখন দেখিবে, সমাজকে তুমি ছাড়াইয়া দিলেও, সে

যাইবে না ; তোমার সম্মান করিবে ; কেবল সম্মান করিবে না, পূজা পর্য্যন্তও করিবে ;—এইরূপ স্থানেই সামাজিক নিয়োজন এবং কৃত নিয়োজন একতায় আসিয়া মিলিত হইয়া থাকে, এবং এইখানেই, একতার তার আসিয়া সমাজের মধ্যে আমূলত পরিচালিত হয়। অতএব আবার বলি, এরূপে কার্য্যনিরত হও, তোমার উন্নতি হইবে, তোমার জাতীয় উন্নতি হইবে, এবং জগতেরও উন্নতি হইবে। তখনই, আর পাঁচ কার্য্যের মধ্যে, ইহাও বুঝিতে পারিবে যে এই গ্রীকদিগের ভগ্নাবশেষ ও উত্তম ফল হইতে কোন্ কোন্ বস্তু গ্রহণ করিবে, কোন্ কোন্ বস্তু করিবে না ; এবং আত্মজাতীয় কোন্ অকার্য্যকর বস্তু ফেলিবে, এবং কোন্ বস্তু ফেলিবে না ; এবং তখনই কেবল, বিবিধ উপকরণ বিধর্ম্মী হইলেও কেমন করিয়া তাহার সামঞ্জস্য সাধন করিতে হয় তাহা জানিতে এবং তদ্দ্বারা অপূর্ব্ব সৃষ্টিরচনে সমর্থ হইতে পারিবে। উক্ত জাতীয় ভগ্নাবশেষাদি হইতে কি গ্রহণ করিবে, কি গ্রহণ করিবে না, আমি তাহা নির্ব্বাচন করিলে যদি হইত, আমি তাহা করিতাম। কিন্তু প্রত্যেক প্রকৃতি বিভিন্ন, প্রত্যেক রুচিশক্তি ইত্যাদিও বিভিন্ন, সুতরাং প্রত্যেক নির্ব্বাচনও বিভিন্ন হওয়া কর্ত্তব্য ; বহু প্রত্যেক রাশির সমষ্টি করিয়া এই বিশ্ব, বহু প্রত্যেক রাশির সমষ্টি করিয়াই পূর্ণতা, এখানেও সেই বহু প্রত্যেক রাশির সমষ্টি সংযুক্ত হইয়া পূর্ণতা সাধন করুক। আমার নির্ব্বাচনের এই পর্য্যন্ত বলিয়া ক্ষান্ত যে আর বাতুলের স্বপ্ন দেখিও না ; ইহাতে কোন কার্য্যই হইবে না ; কেবল বাতুলতা বৃদ্ধি হইবে মাত্র। প্রস্তুত হইলে এবং অধিকারী হইলে, স্বকার্য্য আপনা হইতে হাতে আসিয়া উপস্থিত হয়।

ভারতসন্তান, তবে আর স্রোতে গা ঢালিয়া থাকিও না। এই কর্ম্মক্ষেত্রে বহুকাল নিদ্রিত অবস্থায় অতিবাহিত করিয়াছ ; আর কত কাল নিদ্রিত থাকিবে ; কত বিশ্রাম করিবে ? উঠ, উঠ ; সুষুপ্তিরও সীমা আছে, সুষুপ্তি ত্যাগে জাগরিত হও, চক্ষু উন্মীলিত কর ; একবার দেখ দেখি ; তাকাইয়া দেখ, মাতৃভূমির কি দুরবস্থাই না করিয়াছ ; সুষুপ্তি তোমার কি সর্ব্বনাশই না সাধিয়াছে ; সেই সোণার মাতৃভূমি ছারখার,

তুমি নিজে ছারখার, চক্ষু থাকিলে দেখিতে পাইতে তোমার সেই জীবনান্তে অবলম্বনস্থল পিতৃস্থানও কিরূপ ছারখার হইয়া আসিয়াছে। এখনও জাগরিত হও; ভারতসন্তান, এখনও জাগরিত হও, হইয়া এখনও সময় থাকিতে স্বকার্য্য বুঝিয়া লও। সাত্ত্বিকপ্রকৃতিযুক্ত, স্বাত্মাবলম্বী দর্পবান হইতে শিখ, ইহ পরলোক উভয়েতেই আবার তোমার মঙ্গল হইবে। তোমার মঙ্গল হউক। জয় জগদীশ হরে।

ইতি উপসংহার।